ভারতকথা



ভারত কথা

Recomended by West Bengal Board of Secondary Education for all High & Higher Secondary School Without correction
Vide T. B. No. Syll./H/IX/87/42 Dated 13. 11. 87



মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভারত কথা

প্রথম খণ্ড

(নবম শ্রেণীর জন্য)

অধ্যাপক ঊষাকান্ত দত্ত এম· এ· বি· টি· (পদক প্রাপ্ত)
শিক্ষণ ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার,
ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।



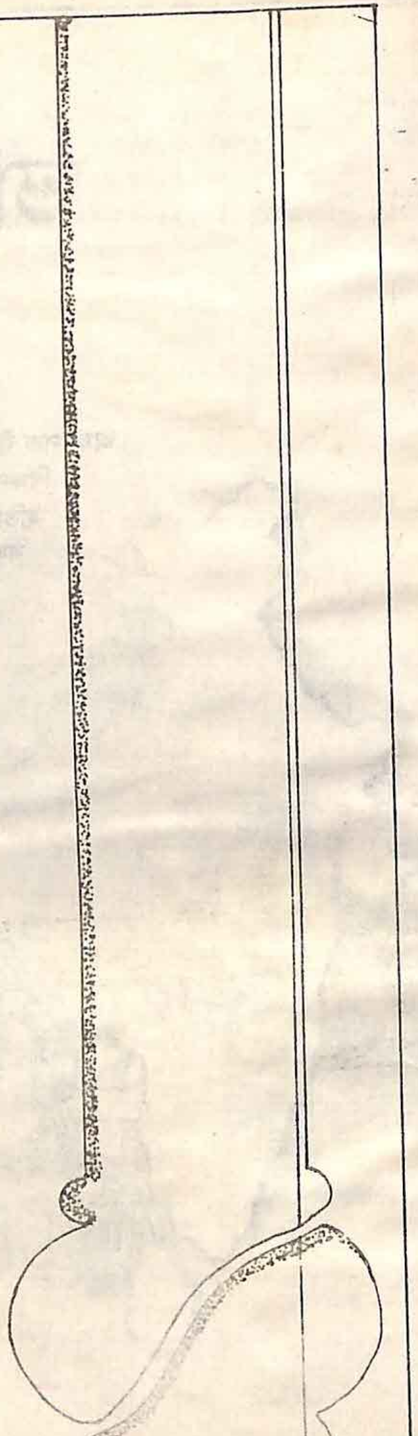
প্রকাশক:
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য-পঁচিশ টাকা মাত্র
প্রিন্টার্স: জি.আর.টি. প্রিন্টার্স,

অলংকরণ: প্রবীর কর্মকার

Art work : Barun Saha

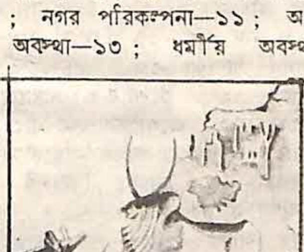




সূচীপত্র

পৃষ্ঠা



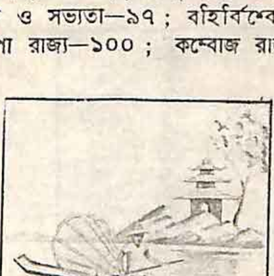






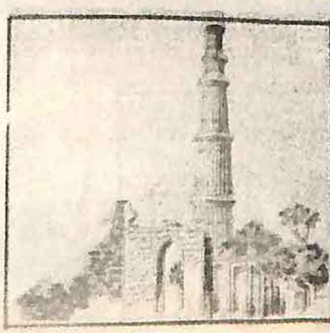


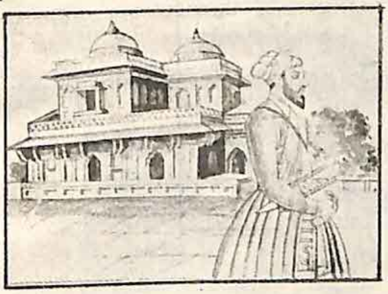


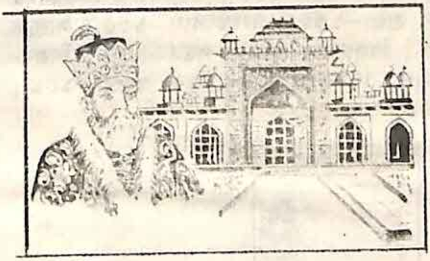










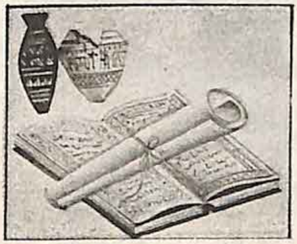






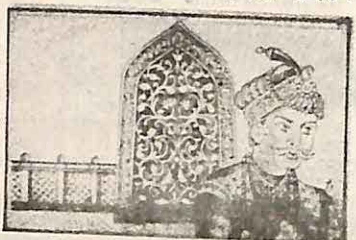


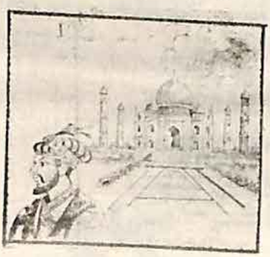








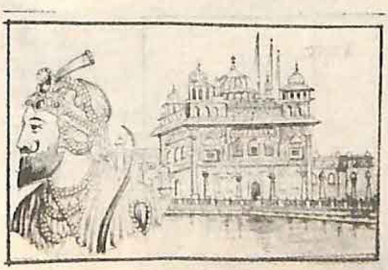










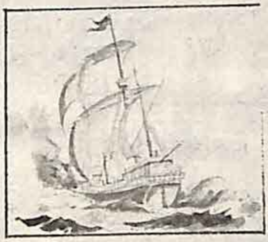






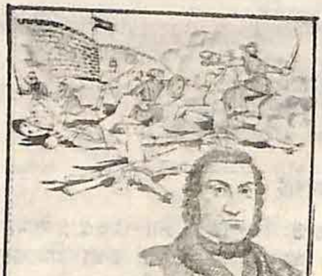














বরাহরূপী বিষ্ণু
এরাণ (প্রাচীন আইরিকিণ)-এ প্রাপ্ত/
পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ



কার্তিকেয় সহ স্কন্ধ মাতা
তানেশ্বর মহাদেব মন্দির-রাজস্থান/ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ



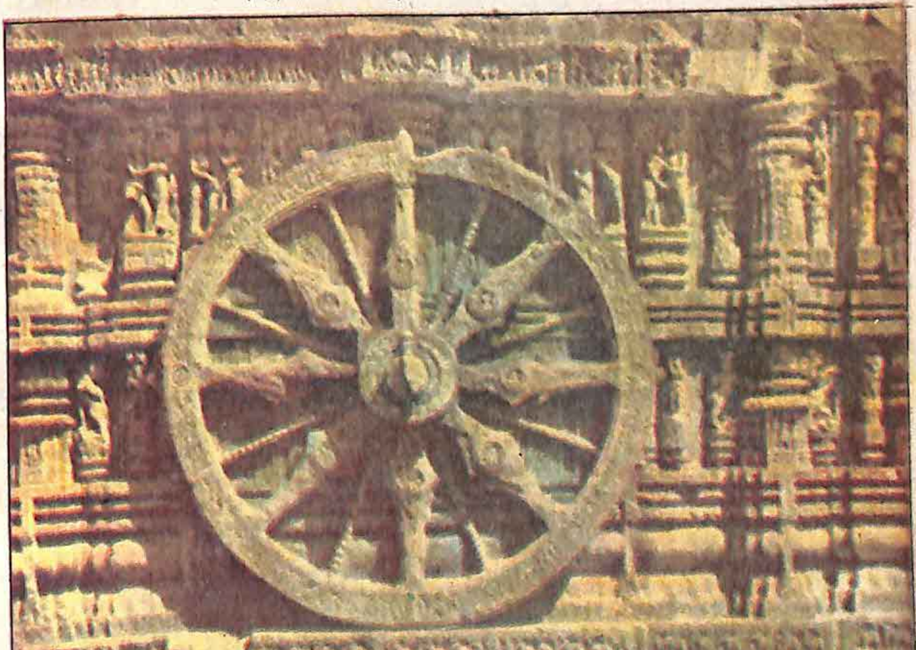
নদী-দেবী-যমুনা
পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দী (গুপ্তযুগ)



অজন্তা গুহার অভ্যন্তর দৃশ্য
(পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ)



লিঙ্গরাজ মন্দির-ভুবনেশ্বর/উড়িষ্যা খৃষ্টাব্দঃ ১১০০



প্রস্তর খোদিত চক্র, সূর্যমন্দির কণারক (উড়িষ্যা) খ্রীষ্টাব্দ ১১০০



কৈলাসনাথ মন্দির, কাঞ্চি/(দঃভারত, (অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ)

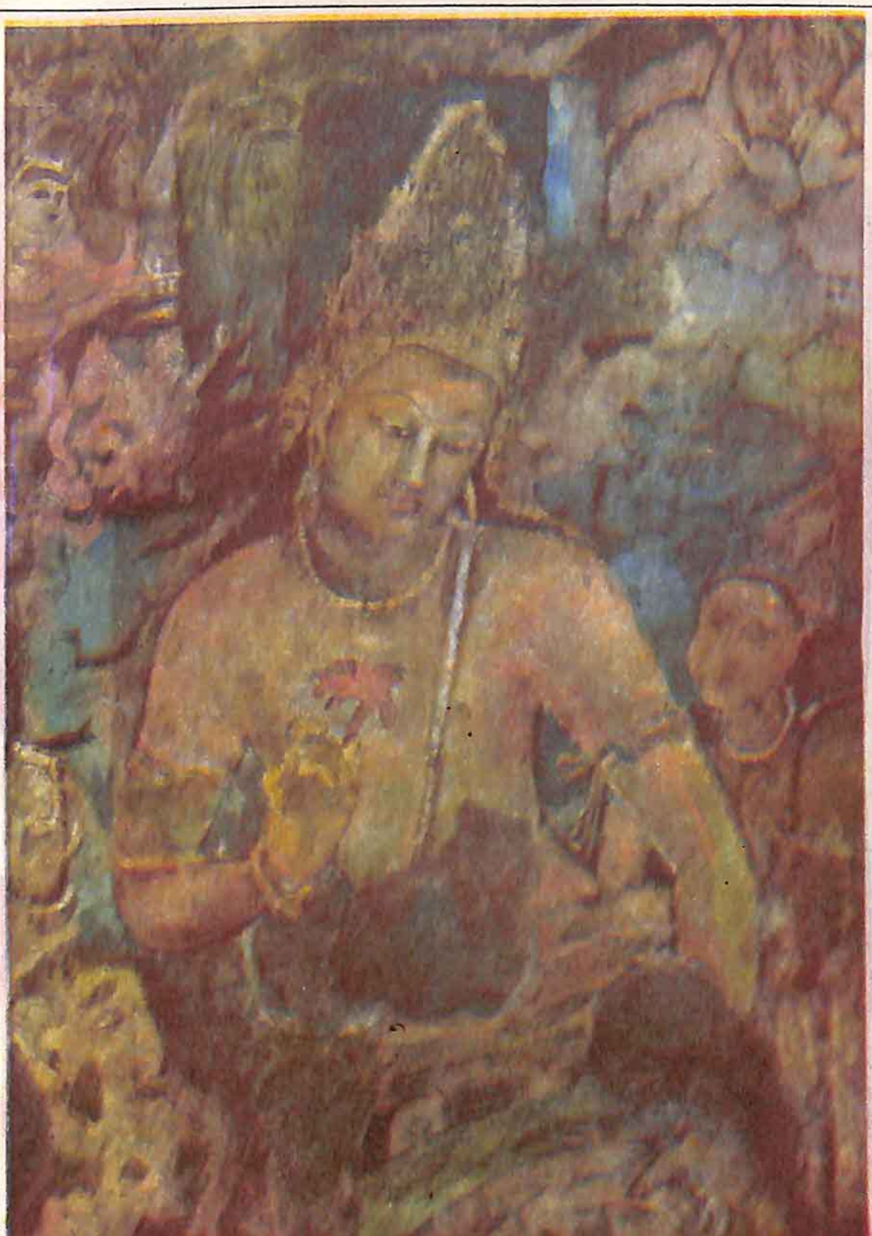




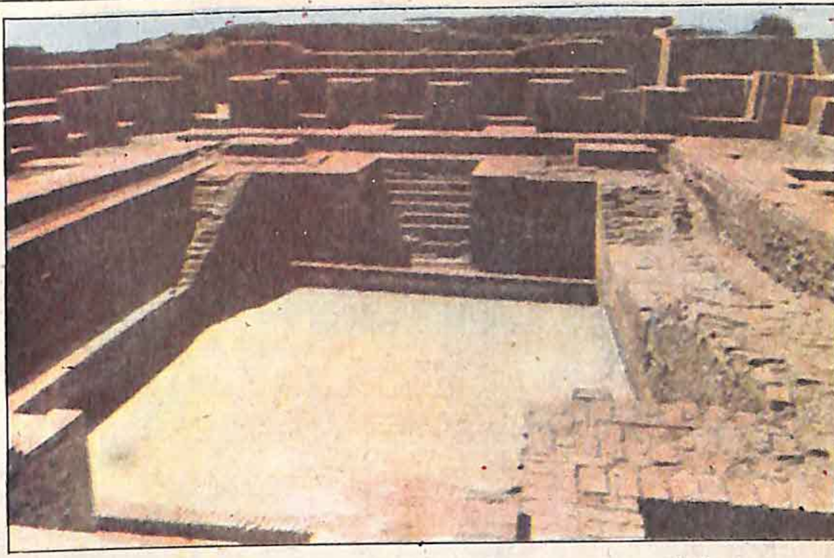
নটরাজ (ব্রোঞ্জ নির্মিত)

চোল শিল্প নিদর্শন-দ্বাদশ শতাব্দী

বুদ্ধ (ব্রোঞ্জ নির্মিত)



বোধিস্বত্ত্ব - অজন্তাগুহা (১ নং) প্রাত্রের চিত্র (৫ম শতাব্দীর শেষভাগ)



বিশাল স্নানাগার — মহেঞ্জোদরো (সিন্ধু-সভ্যতা খৃঃ পূঃ ২৩০০-১৭৫০)







অজ্ঞাত লিপিসহ শীলমোহর (মহেঞ্জোদরোয় প্রাপ্ত)



অশোক স্তম্ভ (সারনাথ) খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী
ভারতের জাতীয় প্রতীক



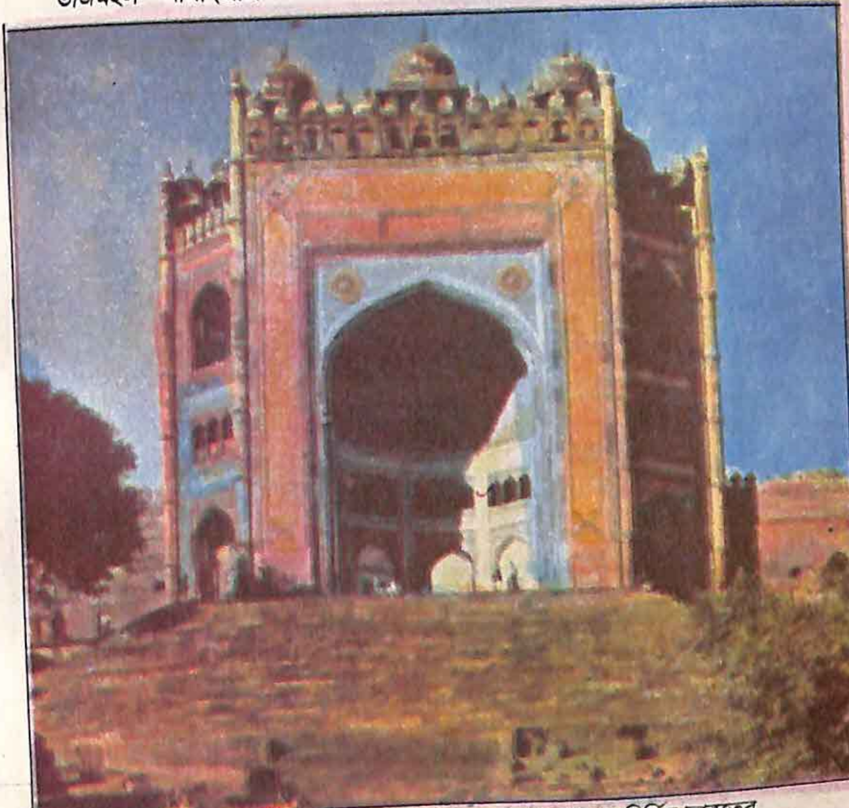
একই মুদ্রায় কণিষ্ক ও বুদ্ধমূর্তি
সম্রাট অহিণ-তোষের স্তুপ (জালালাবাদ) হইতে প্রাপ্ত
খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী



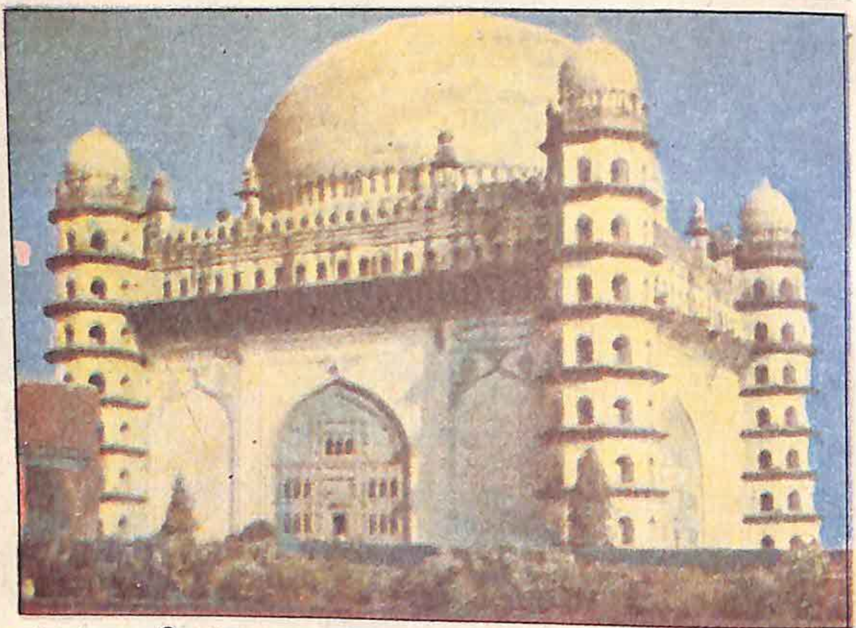
সাঁচী-স্তুপ - উত্তর তোরণ। প্রথম খ্রীষ্টাব্দ



তাজমহল - আগ্রা (খ্রীষ্টাব্দ ১৬৩৪-এ সম্রাট শাহজাহান নির্মিত বিশ্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি)



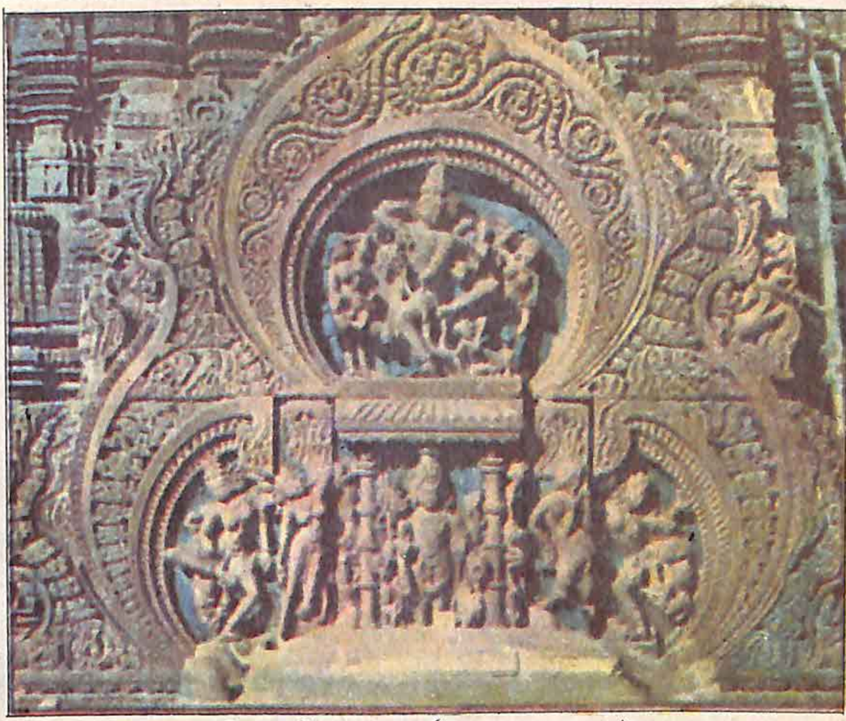
বুলন্দদরওয়াজা (ফতেপুর সিক্রী) খ্রীষ্টাব্দ ১৫৭১-এ সম্রাট আকবর নির্মিত ভারতের সর্ববৃহৎ তোরণদ্বার



গোল-গম্বুজ — বিজাপুর সুলতান আদিল শাহের সমাধি/(সপ্তদশ শতাব্দী)



গ্রাম্য-সৌন্দর্য (কাংড়া চিত্রকলা) খ্রীষ্টাব্দ ১৭৮৫



উদয়েশ্বর মন্দিরের (শিখর) কারুকার্য উদয়পুর-রাজস্থান (খৃষ্টাব্দ ১০৫৯-৮০)



কান্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির— খাজুরাহো খৃষ্টাব্দ ১০০০



ষ্ণদেব রায় - (তিরুপতি মন্দিরে রক্ষিত)



কুতবমিনার- দিল্লী (খ্রীষ্টাব্দ ১২০০)



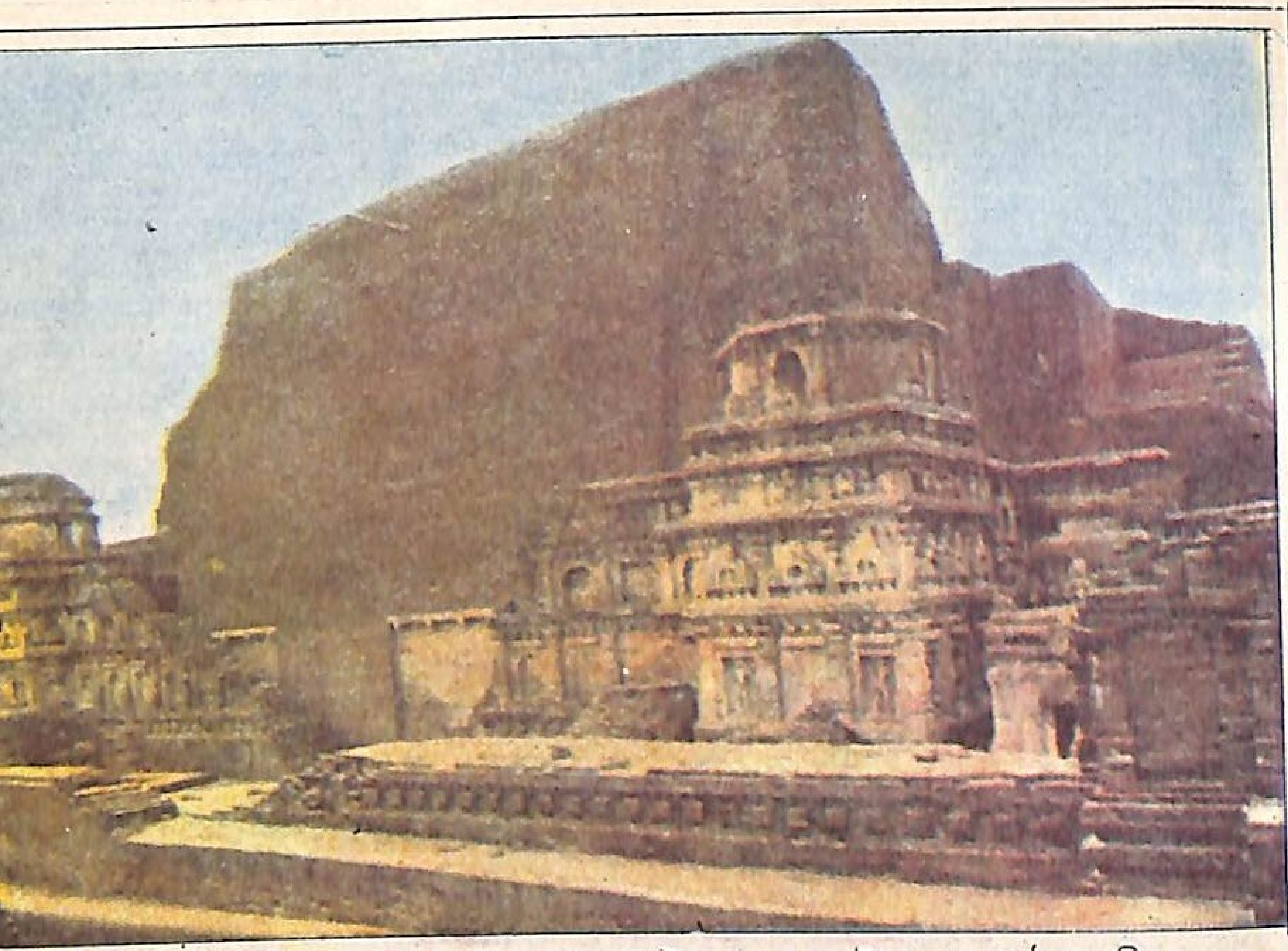
শেরশাহের সমাধি - সাসারাম (বিহার) (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩০-৪৫)



রাজরাজেশ্বর মন্দির-তঞ্জাভুর/দঃ ভারত (খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫০)



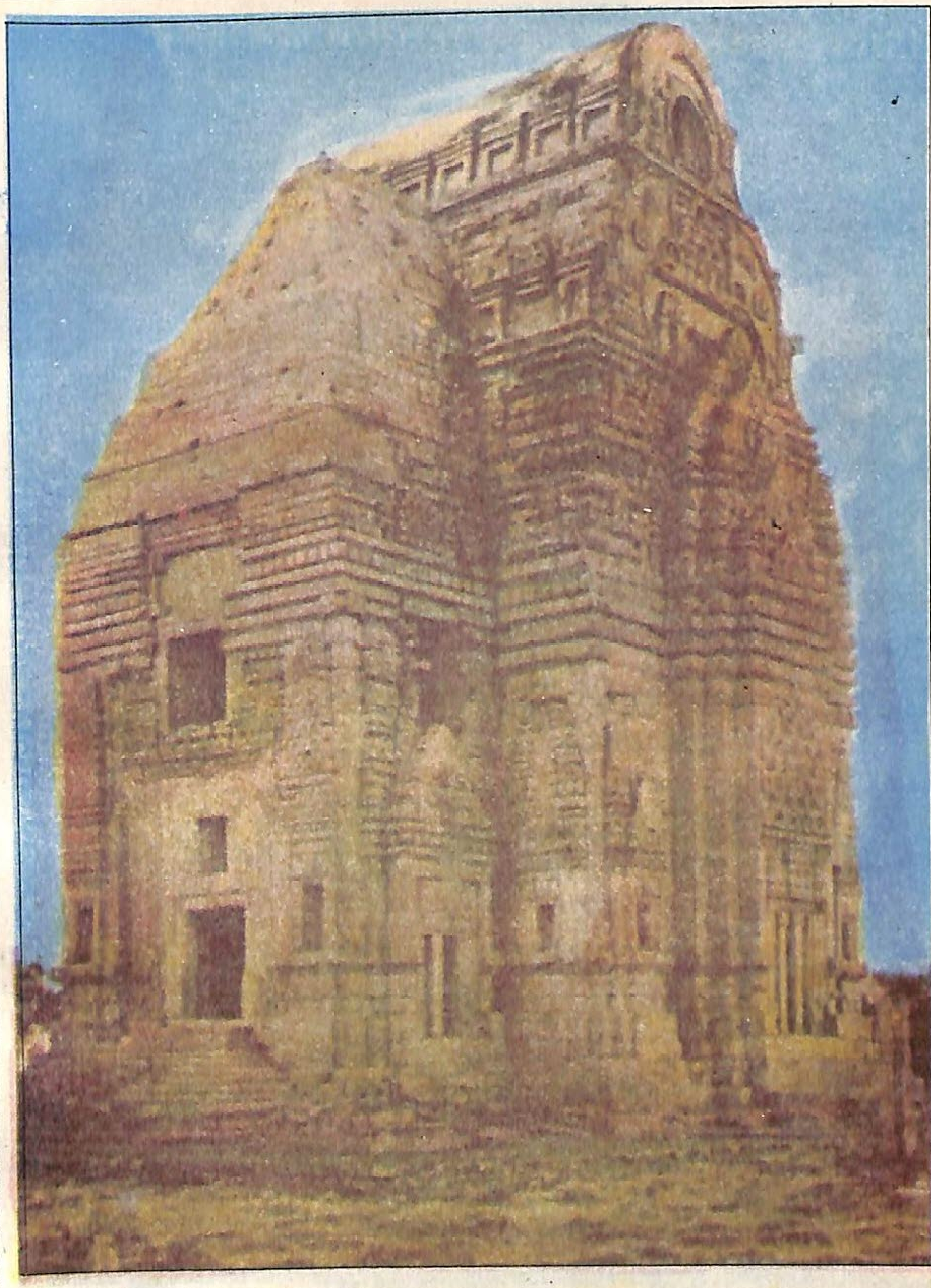
রামেশ্বরম্ মন্দিরের বিখ্যাত দালান-রামেশ্বরম্ (সপ্তদশ শতাব্দী)



প্রধান মন্দির-নালন্দা (অসমাপ্ত অবস্থায় উচ্চতা-১০২ ফুট) (পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দী)



সীমানন্দ সুলতানগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত পালযুগের ভাস্কর্য (দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতাব্দী)



তেলিকামন্দির-গোয়ালিয়র (রাজস্থান)
(৭০০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ)



চতুর্মুখ মহাদেব-নাচনা (মধ্যপ্রদেশ)



নটরাজ- নবম শতাব্দী



কৈলাসমন্দির (ইলোরা) অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Geography and History

(a) Chief physical features of the Indian sub-continent and its main ethnic elements.

(b) Influence of Geography on History.

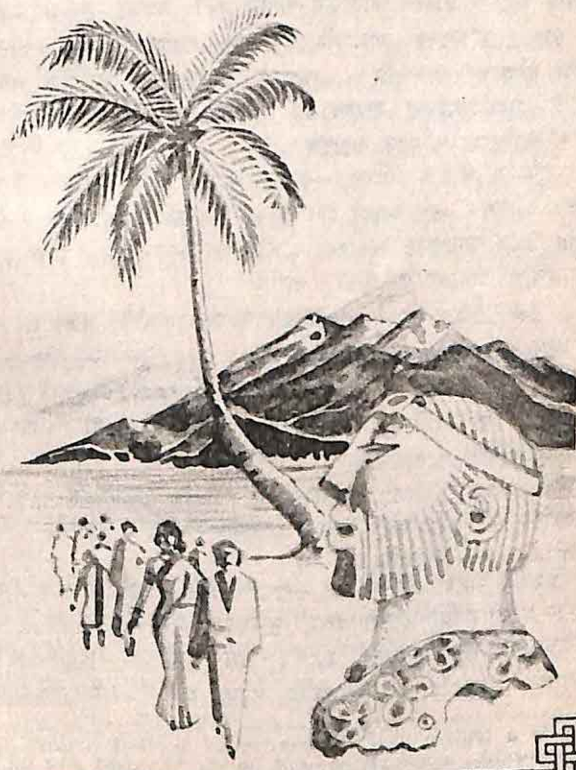
(c) The fundamental unity.

(d) Sources of ancient Indian History.

প্রথম অধ্যায়
ভূগোল ও ইতিহাস

॥ বিষয়ক্রম ॥

ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য—ভারতীয় জনগোষ্ঠীর গঠন—ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব—অন্তর্নিহিত ঐক্য—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান



ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ

ইতিহাসের বিষয়বস্তুই হল মানুষ। মানুষ হল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কারণ যে-কোন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।[১]

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ, ভূ-বিদগণ ভৌগোলিক প্রকৃতি অনুসারে এই দেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন।

এক ॥ **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল**ঃ—ভারতের উত্তরে দণ্ডায়মান অতন্দ্র প্রহরীর মত দুরতিক্রম্য হিমালয় পর্বতমালা। এই পর্বতমালা উত্তরে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালাই ভারতকে চীন ও তিব্বত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই পর্বতমালা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ভারতের প্রধান নদ ও নদীসমূহ যা এদেশের সমতলভূমিকে করেছে উর্বর ও শস্য-শ্যামলা। ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে হিমালয়ের ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই দেশকে বলা হয় হিমালয়ের দান।

দুই ॥ **সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী সমভূমি**ঃ—পশ্চিমে সিন্ধুর ব-দ্বীপ থেকে পূর্বে গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমভূমি। এখানকার মাটি খুবই উর্বর, তাই নানা শস্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্ভব। ফলে এই অঞ্চলে লোক-বসতি অত্যন্ত ঘন।

তিন ॥ **মধ্য ভারতের মালভূমি**ঃ—গাঙ্গেয় সমভূমি ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় মধ্য ভারতের মালভূমি। এই মালভূমিতেই অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বতমালা, যা উত্তর ভারতকে দক্ষিণ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই পর্বতমালা থেকেই উৎপন্ন দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদী নর্মদা ও মহানদী।

চার ॥ **দক্ষিণের মালভূমি**ঃ—বিন্ধ্য পর্বত থেকে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত অঞ্চল দক্ষিণের মালভূমি। এখানেই অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এই পর্বতমালাই মারাঠাজাতির বাসস্থান। প্রাকৃতিক এই পরিস্থিতিই মারাঠাজাতিকে এক দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত করেছে।

পাঁচ ॥ **সুদূর দক্ষিণ**ঃ—কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অঞ্চল সুদূর দক্ষিণ। এই অঞ্চল হল দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। দূরত্বের জন্যই এই অঞ্চলের উপর উত্তর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব অনুভূত নয়। উপকূল সান্নিধ্যের জন্যই নানা গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের অবস্থান এখানেই।

॥ ভারতীয় জন-গোষ্ঠীর গঠন ॥

জন-গোষ্ঠীর গঠনগত দিক থেকে ভারতবর্ষ যথার্থই মহামিলনক্ষেত্র। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি এদেশে এসেছে। কালক্রমে তারাই এদেশের মানুষে পরিণত হয়েছে। তাই ডঃ স্মিথ ভারতবর্ষকে Ethnological museum বা নৃতত্ত্বের যাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন।

পণ্ডিতেরা চোয়াল, মাথার খুলি ও অংগ প্রত্যঙ্গের গঠন অনুসারে ভারতীয় জন-গোষ্ঠীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। যথাঃ প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপাইন ও মঙ্গোলীয়।

১৯০১ সালে জন-গণনায় ভারতীয় জন-গোষ্ঠীকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথাঃ মঙ্গোলীয়, ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়, আর্য-দ্রাবিড়, স্কাইথো-দ্রাবিড় এবং তুর্কী-ইরাণ। ডঃ বি· এস· গুহ এই বিভাগকে অধিকতর সংহত করে বলেছেন ভারতীয় জন-গোষ্ঠীর গঠন হল, (১) নিগ্রোজাতীয়, (২) প্রোটো-অস্ট্রেল-

[১] "It is a truism that the course of human history in a region is, in a considerable measure, shaped by its physical and geographical features." The Vedic Age—Bharatiya Vidya Bhavan.

য়েড, (৩) মঙ্গোলীয়, (৪) ভূমধ্যসাগরীয় এবং (৫) যাযাবর জাতীয়।

॥ ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব ॥

আয়তনের বিশালত্বে এবং ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষকে সমগ্র পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়।

ভৌগোলিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল হিমালয় পর্বতমালার অবস্থান। এই অবস্থান একদিকে মধ্য এশিয়া থেকে আগত শৈত্য প্রবাহকে রোধ করে ভারতীয় জলবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণ রেখে এই অঞ্চলকে মনুষ্য বাসোপযোগী করেছে, অন্যদিকে ঐ অবস্থানই দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ুকে প্রতিহত করে এ দেশে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ঘটায়। চির তুষারাবৃত হিমালয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বিভিন্ন নদ-নদী। এইসব নদ-নদীর প্রবাহ অবশ্যই জন-বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আবার হিমালয় পর্বতমালাই এশিয়া মহাদেশ থেকে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে পৃথক অথচ নিজস্ব সত্তা।[২] এই সত্তাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চেতনাকে করেছে মহীয়ান।

একইভাবে ভারতের মধ্যস্থলে বিন্ধ্য পর্বতের অবস্থানও তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পূর্ব পর্যন্ত বিন্ধ্য পর্বত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতিরও এক আলাদা চরিত্র গড়ে উঠেছে।

একটি দেশের জীবনধারার অন্যতম নিয়ন্ত্রক হল সেই দেশের নদ ও নদী। প্রাচীনকালে সিন্ধুনদের তীরে যে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এই নদ ও তার শাখানদীগুলি ভারতে আর্যদের প্রথম বসতি স্থাপনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। একইভাবে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই যে ভারতে প্রথম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল তা-ও কোন অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। কারণ এই অঞ্চল হল গঙ্গা ও অন্যান্য নদী বাহিত পলিমৃত্তিকায় গঠিত অতি উর্বর এবং নানা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। সুতরাং এমন অঞ্চলের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই স্বাভাবিক। আর ঐ সংগ্রাম থেকেই সূচিত হয়েছিল সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন।

অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নদ ও নদী ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতকে তিনটি সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এই তিন অঞ্চলের পারস্পরিক বিবাদই হল দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল সূত্র।

কিন্তু নদ ও নদীর গুরুত্ব ও ভূমিকা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। নদীর গতিপথের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় জন বসতির, পরিত্যক্ত হয় অনেক সমৃদ্ধ জনপদ, গড়ে ওঠে নতুন জনপদ। ফলে ইতিহাসের গতিপথেরও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ভারতের তিনদিক সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী নানাভাবে ভারতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্রই ছিল এ দেশের সুরক্ষার এক চমৎকার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। আবার এই সমুদ্রই এই অঞ্চলের অধিবাসী-

---

[২] This has lent an element of individuality to India's concept of civilisation and social standards without necessarily preventing the influx of Asian contacts.

—History of India by Sinha & Banerjee

দের সামুদ্রিক বাণিজ্যে উৎসাহিত করেছে। ফলে সমুদ্রপথেই দূর প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে প্রাচীনকালেই। ক্রমশঃ বাণিজ্য থেকে এসেছে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের উৎসাহ। সেই উৎসাহে বিদেশেও ধীরে ধীরে প্রচারিত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি। গঠিত হয়েছে কালক্রমে 'বৃহত্তর ভারত'। উল্লেখযোগ্য হল এই বৃহত্তর ভারত গঠনের প্রয়াস কোন সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা নয়, বরং সাংস্কৃতিক সম্প্রচার।[৩]

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ। প্রাচীনকালে পাটলিপুত্র যে ভারতের প্রথম ও প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল তার কারণ হল ঐ নগরের সন্নিকটেই ছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। আবার এই প্রাকৃতিক সম্পদই বার বার প্রলুব্ধ করেছে ভারতে বিদেশী আক্রমণকারীদের।

সর্বোপরি ভারতের জলবায়ু হল নাতিশীতোষ্ণ। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমভূমি। এই সমভূমি নদী বাহিত পলিমাটিতে অত্যন্ত উর্বর। আবার মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট। ফলে অনায়াস কৃষিকাজের সবগুলি সুযোগ থাকায় এখানে স্বল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন সম্ভব। এই পরিস্থিতিই এখানকার অধিবাসীদের করেছে আয়াসী এবং পরিশ্রম-বিমুখ। এই মানসিকতার খেসারৎ নানা সময়ে নানা ভাবে এ দেশকে দিতে হয়েছে। আবার এই মানসিকতাই হল শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক। এখানকার অনায়াস ও সাবলীল জীবন আক্রমণকারীদেরও এতটাই প্রভাবিত করেছে যে এক সময় তারাও তাদের অজান্তেই এ দেশের বৃহত্তর জন-গোষ্ঠীর সঙ্গে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এইভাবে ভৌগোলিক পরিস্থিতিই ভারতবর্ষকে মহামিলনের পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যই ভারতের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। এই প্রবণতাই প্রভাবিত করেছে দেশের রাজনৈতিক গতি ও প্রকৃতিকে। এদেশে কখনো যে এক অখন্ড রাজনৈতিক ঐক্য স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে নি তার সবচেয়ে বড় কারণই হল ভৌগোলিক বৈচিত্র্য। আবার এ দেশের বিশালত্বের জন্যই রাজন্যবর্গ কখনো দেশের বাইরে তাঁদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন নি। তাই বহির্দেশ জয় যেমন প্রাচীন মিশর বা মেসোপটেমিয়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ভারতের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণরূপেই অনুপস্থিত[৪]

॥ ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ

বহু রঙে ভরা বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈচিত্র্যে, জলবায়ুর বৈচিত্র্যে, ভাষা-ধর্ম-পোশাক-খাদ্য-সামাজিক প্রথার বৈচিত্র্যে ভারতে বিভিন্নতার দিকই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রাজনৈতিক দিক থেকেও ভারত সর্বদাই বিচ্ছিন্ন।

অথচ এই বিভিন্নতাই কিন্তু ভারত ও তার জনগণের শেষ পরিচয় নয়। বরং সেই পরিচয় প্রচ্ছন্ন বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সাধনায়। ডঃ স্মিথ একেই বলেছেন, unity in diversity. বহু বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডের

৩The name Greater India, reminiscent of Hellas, is a pointer to the diffusion of Indian culture and civilisation in extensive areas of South-Eastern Asia."

—History of India by Sinha & Banerjee

৪While foreign conquest is an important feature in the history of Egypt and many ancient kingdoms in Mesopotamia and Iran, it never figured as an important element in Indian polity.

—The Vedic Age (Bharatiya Vidya Bhavan)

নাম ভারতবর্ষ। এই নামই একদিক থেকে এক ঐক্যবোধের দ্যোতক। যখনই ভারতবর্ষ নামক দেশটির কথা বলা হয় তখনই যে-কোন ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বিস্মৃত হতে হয়। যখনই বলা হয় ভারতীয়, তখনই ভাষা-ধর্ম-খাদ্য ইত্যাদির ব্যবধান কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু এই ঐক্যবোধের ধারণা যতটা ভাবাবেগ-প্রধান ততটা বাস্তব নয়। অবশ্য এই ঐক্যবোধের এক সুদৃঢ় বাস্তব ভিত্তি আছে।

এই বাস্তব ভিত্তির প্রধান উপকরণ হল ভারতীয় জন-মানসে হিন্দুধর্মের দূরপনেয় প্রভাব। হিন্দুধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণ বলেছেন যে এই ধর্ম হল সকল মতের ও পথের ধর্মীয় উচ্চকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের সমন্বয়। যে সর্বংসহ সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা হিন্দুধর্মের তা ভারতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে চমৎকার সংগতি রক্ষা করে। যে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ রচিত সেই সংস্কৃত ভাষা এক সময় ছিল সর্বভারতীয় যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা। সমগ্র ভারতব্যাপী বিক্ষিপ্ত হিন্দু মন্দিরগুলি চিরকালই সর্বস্তরের মানুষের মিলনক্ষেত্র।

রাজনৈতিক ঐক্য অবশ্যই সামগ্রিক ঐক্যের অন্যতম উপকরণ। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসে যদিও 'রাজ চক্রবর্তী' উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় তথাপি সর্ব ভারতীয় রাজশক্তির পরিচয় খুব একটা আমরা ভারতের ইতিহাসে পাই না। কিন্তু এই অভাব দূরীভূত হয়েছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভারতের সার্বজনীন মনোভাব। এই মনোভাব থেকেই ভারতবর্ষ উপলব্ধি করেছে যে রাজনৈতিক ঐক্য অপেক্ষা সাংস্কৃতিক ঐক্য অনেক বেশী শক্তিশালী, ক্রিয়াশীল এবং স্থায়ী।

তাই গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতীয় মানসিকতা গঠনের বিশ্লেষণ। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা ও বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস থেকে জাত বিভিন্ন মূল্যবোধ ঐ মানসিকতাকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। তাই ভারতীয় মূল্যবোধ শাশ্বত এবং সমকালীন। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও তার বিপর্যয় ঘটে নি। জওহরলাল নেহরু যথার্থই বলেছেন, ভারতীয় ঐক্য প্রকৃতপক্ষে বাইরে থেকে আরোপিত কিছু নয়। এই ঐক্য হল বাইরের ভাব এবং অন্তরের বিশ্বাসের সংমিশ্রণ। এর মূল অনেক গভীরে। তাই ঐক্য দৃঢ়তর হয়েছে বিশ্বাস আর প্রথার সহনশীল পরিচর্যার মধ্যদিয়ে। তাই ঐক্যের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা কোন বিভেদের সৃষ্টি করে নি[৬]

॥ **প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান** ॥

ভারতীয়গণ নাকি ইতিহাস-বিমুখ জাতি। অবশ্য এ অভিযোগ সত্যি হলে তা ভারতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গেই সংগতিরক্ষা করে। কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে এই ঘটনা বিশেষ বিড়ম্বনার। তাই জনৈক ঐতিহাসিক এই বলে খেদ প্রকাশ করেন যে কোন থুকিডাইডিস বা ট্যাসিটাস এদেশে জন্মান নি দেশের প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য। পন্ডিতগণ বিভিন্ন গবেষণার মধ্য দিয়ে যে সব তথ্য গ্রহণ করেছেন সেগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ সাহিত্যগত উপাদান ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

॥ সাহিত্যগত উপাদান ॥

ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ নিঃসন্দেহে সাহিত্যগত উপাদান। কিন্তু এই উপাদান যেহেতু প্রত্যক্ষতঃ ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত নয় সেহেতু এই উপাদানের ব্যবহারের

[৬] That unity was not conceived as something imposed from outside, a standardization of externals or even of beliefs. It was something deeper and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged.
(Jawaharlal Nehru)

প্রয়োজন যথেষ্ট সতর্কতার। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যগত উপাদানগুলিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথাঃ ভারতীয় সাহিত্য ও বৈদেশিক বিবরণ।

॥ ভারতীয় সাহিত্য ॥

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র। যেমন বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি। বেদ থেকে আর্যদের ভারতে বসতি স্থাপন, অনার্যদের সঙ্গে তাদের বিরোধ, বৈদিক যুগের সামগ্রিক জীবন-যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে পারি। পুরাণ আমাদের বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় জানতে সাহায্য করে। দুই মহাকাব্য থেকে আমরা সমসাময়িককালের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং অংশতঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারি।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ছাড়া উল্লেখযোগ্য হল পাণিনি ও পতঞ্জলী রচিত ব্যাকরণ, বিভিন্ন যুগে রচিত বিভিন্ন ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি। ডঃ রায়চৌধুরী এইসব উপকরণের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন।[৬] আবার বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সাহিত্যগুলি নানা ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করে।

ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ হল প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের জীবন-চরিত। এই সব জীবন-চরিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে জীবন-চরিতের পৃথক মূল্য আছে। কিন্তু জীবন-কাহিনীর ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ এই সব গ্রন্থের রচয়িতা-গণ হলেন, রাজানুগ্রহপুষ্ট সভাকবিগণ। তাই তাঁদের রচনায় অতিশয়োক্তি থাকাই স্বাভাবিক। উল্লেখযোগ্য জীবন-চরিত হল বাণভট্ট রচিত হর্ষ চরিত, বাকপতিরাজ রচিত গৌড়বহো, বিহ্লন রচিত বিক্রমাংকদেব চরিত, সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত, পদ্মগুপ্ত রচিত নবসাহসাংক চরিত প্রভৃতি।

প্রাচীন ভারতের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল কল্হন রচিত রাজ-তরঙ্গিণী। এই গ্রন্থে কল্হন প্রাচীন যুগ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীরের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে নন্দিকা কলম্বকাম ও কলিঙ্গত্তুপরাণি উল্লেখযোগ্য। সিংহলীয় সাহিত্য দীপবংশ ও মহাবংশ থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং মৌর্যবংশ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

॥ বৈদেশিক বিবরণ ॥

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতে এসেছেন। পরে ভারত সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই সব বিবরণী প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের এক মহামূল্যবান উপকরণ। কিন্তু এই বিবরণগুলি গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও কিছু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিদেশী পর্যটকগণ এদেশের ভাষা বা আচার-প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এমন কি কোন কিছু গভীরভাবে জানার মত দীর্ঘ সময় তাঁরা এদেশে কাটান নি। বহুক্ষেত্রে তাঁরা প্রচলিত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন। ফলে তাঁদের রচনায় কিছু বিভ্রান্তি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক।

বিদেশীদের মূলতঃ দুটি ভাগ। গ্রীক পর্যটক এবং চৈনিক পর্যটক। গ্রীকেরা সাধারণতঃ রাজনীতি বিষয়ে এবং চৈনিকগণ সামাজিক বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও টেসিয়াস ভারতে না এলেও তাঁদের রচনায় উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজান্ডারের সঙ্গে এসেছিলেন ঐতিহাসিক কুইন্টাস কার্টিয়াস। স্বভাবতঃই আলেকজান্ডারের ভারত

৬ The value of these works can hardly be over-estimated. They form sheet anchors of Indian History.

(Dr. Roy Choudhury)

আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর রচনা এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মেগাস্থিনিস। তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে এদেশে এসেছিলেন। তাঁর রচিত ইন্ডিকা গ্রন্থ তদানীন্তন কালের ভারত সম্পর্কে এক নির্ভরযোগ্য উপকরণ। এছাড়া ডেইমাকস ও ডায়নিসাসের বিবরণীও যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ। পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সী নামক এক অভিযান কাহিনীতে ভারতের উপকূল, বন্দর, বাণিজ্য সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। টলেমি ও প্লিনির রচনা থেকে ভারতের অরণ্য, প্রাণী, এবং খনিজ সম্পদ সম্পর্কে জানা যায়।

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চীন-ভারত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই সূত্রে বহু চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন। ঐতিহাসিক ফ্যান-ইর রচনা থেকে কুষাণ রাজাদের কথা জানা যায়। সু-মা সিয়েনের গ্রন্থে ভারত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ আছে। ফা-হিয়েনের বিবরণী গুপ্ত যুগ সম্পর্কে এক প্রামাণ্য দলিল। তা ছাড়া হিউয়েন সাং-এর বিবরণী ভারত-অভিজ্ঞতার এক পরিপূর্ণ কাহিনী। অপর পরিব্রাজক ইৎ সিং ভারত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করে যান। আরব ঐতিহাসিক আল বেরুণীর রচনাও খুবই মূল্যবান।

॥ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ॥

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উপাদান। এই সব উপাদানের সাহায্যেই প্রাচীন ভারতের বহু অজানা দিক আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, শিলালিপি, মুদ্রা ও স্মৃতিস্তম্ভ।

॥ শিলালিপি ॥

শিলালিপি সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন উপকরণ হিসেবে শিলালিপি হল প্রথম স্থানীয়। কেননা এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য। নির্ভরযোগ্য এই কারণে যে যেহেতু শিলালিপি কোন ধাতু পাথর বা পোড়া মাটির উপর খোদাই করা হত সেইহেতু এগুলির বিকৃতিসাধন সহজসাধ্য নয়। আর্যজাতি সম্পর্কে বহু তথ্য বোঘাজকোই শিলালিপি হতে জানা যায়। তেল-এল আর্মান ও নাকস্-ই রুস্তম শিলালিপিও উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু সভ্যতার শীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয় নি। হলে অনেক অজানা তথ্য জানা যেত। অশোকের শিলালিপি তো বিশ্ববিখ্যাত। এই সব শিলালিপি থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা, প্রতিবেশী রাজ্যের নাম, অশোকের ধর্মনীতি ও শাসননীতি প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা যায়। মৌর্য পরবর্তী যুগে নানাঘাট ও নাসিক লিপি, খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি ও গিরিনগর লিপি উল্লেখযোগ্য। গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিবরণ সম্বলিত এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি খুবই বিখ্যাত। এ ছাড়া কনিষ্কের মথুরা ও পেশোয়ার লিপি, স্কন্দগুপ্তের ভিতারি লিপি, হর্ষবর্ধনের নালন্দা লিপি প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

॥ মুদ্রা ॥

মুদ্রা থেকে সন, তারিখ ও রাজার নাম জানা যায়। মুদ্রার হরফ থেকে সে সময়ের লিপি এবং বৈদেশিক প্রভাব, মুদ্রার মান থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়। তাছাড়া মুদ্রার গঠনরীতি শিল্পকলা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। যেমন, ব্যাকট্রীয়, শক ও কুষাণ মুদ্রার সাহায্যে রাজাদের কালপঞ্জী রচনা সম্ভব হয়েছে। কুষাণ ও গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা এই যুগের আর্থিক সচ্ছলতা ও রোমান বাণিজ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

॥ স্মৃতিস্তম্ভ ॥

প্রাচীন সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ, ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা, সারনাথ প্রভৃতি প্রাচীন নগরীতে খননকার্যের ফলে জনগণের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস, শিল্প স্থাপত্য সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন গুহা বা মন্দিরও উল্লেখযোগ্য উপকরণ। এই প্রসঙ্গে অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র, ভিতরগাঁও ও দেওগড়ের মন্দির উল্লেখযোগ্য। বরবদুরের স্তূপ বা কম্বোজের আংকোরভাট বহুখ্যাত ঐতিহাসিক নির্দশন।



॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Dawn of Indian Civilisation

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures ;

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic), chief features—its antiquity (with special reference to its extent, urban character, town planning and social, economic and religious life), relations with outside world.

॥ বিষয়ক্রম ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতীয় সভ্যতার সূচনা



প্রাক্-ঐতিহাসিক সভ্যতা—প্রস্তর যুগ

মানুষের সভ্যতার প্রাচীনতম পর্যায়কে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়। কারণ এই যুগের কোন লিখিত বিবরণ নেই। তখন কোন হস্তলিপির ব্যবহার জানা ছিল না। এই যুগে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রই হল আমাদের সেই সময় সম্পর্কে জানার একমাত্র উপকরণ।

প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ হল প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের মানুষেরা কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না। পাথরের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র তারা নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতো। বিবর্তনের দিক থেকে প্রস্তর যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ পুরাতন প্রস্তর যুগ, পরবর্তী প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ।

॥ পুরাতন প্রস্তর যুগ ॥

ভারতে কখন থেকে মানুষ বসবাস করতে আরম্ভ করে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর আগে ভারতের মাটিতে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়। ভারতে প্রাক্-ঐতিহাসিক সভ্যতার সূচনা প্রস্তর যুগে। পুরাতন প্রস্তর যুগের সঠিক সময় নির্ধারণ এখনো সম্ভব হয় নি। অনুমান করা হয় খৃঃ পূঃ চার লক্ষ থেকে দুই লক্ষের মধ্যবর্তী কাল হল এই যুগের সময়সীমা। পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায় এবং দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

এই যুগের মানুষ ছিল মূলতঃ খাদ্য সংগ্রাহক। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করতো নানা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র। এই সব অস্ত্রশস্ত্রের গঠনগত ক্রমিক পরিবর্তনের দিক থেকে পুরাতন প্রস্তর যুগকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে পাথরের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে কুঠার। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাতলা এবং তুলনামূলকভাবে মসৃণ পাথরের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে ধারালো অস্ত্র। তৃতীয় পর্যায়ে ছেনী জাতীয় অস্ত্রের নির্মাণ আরম্ভ হয়।

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানতো না। বনের ফল-মূল এবং পশুর মাংসই ছিল তাদের খাদ্য। রন্ধন কৌশলও তাদের জানা ছিল না। তাই তারা মাংস পুড়িয়ে খেত। খাদ্য সংগ্রহের তাগিদেই তাদের জীবন ছিল যাযাবরী। বৃহদাকার বন্য পশু বধের তাগিদেই তারা দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াত। পরিবার প্রথা তখনো প্রচলিত হয় নি। পাহাড় পর্বতের গুহাই ছিল তাদের বাসস্থান।

এই সময়ও মানুষ তার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে। অবসরকালে গুহার গায়ে তারা নানারকম ছবি এঁকেছে। স্পেনের বিখ্যাত আলতামিরা গুহাচিত্রের মত ভারতের মধ্যপ্রদেশেও গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এগুলি পুরাতন প্রস্তর যুগের কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

॥ পরবর্তী প্রস্তর যুগ ॥

পরবর্তী প্রস্তর যুগে ককেসীয়গণ ভারতের পশ্চিমে এবং মোঙ্গল বংশোদ্ভূত জাতি ভারতের পূর্বে এসেছিল। জীবজন্তুকে পোষ মানানো এই যুগেই আরম্ভ হয়। এই যুগের শেষদিকে মৃৎ শিল্পের উদ্ভব এবং কৃষির সূচনা হয়েছিল।

গুজরাটের লঙ্ঘঞ্জ এই যুগের একটি পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তখনকার মানুষের প্রধান অস্ত্র ছিল পাথরের ফলা এবং ছোট ছোট পাথরের নুড়ি। এগুলি তীরের অগ্রভাগে ব্যবহৃত হত।

পরবর্তী প্রস্তর যুগের সভ্যতার ভগ্নাবশেষ ভারতের অন্যত্র, যেমন পশ্চিমে সিন্ধুদেশে, দক্ষিণে তিনিভেলিতে এবং পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সর্বত্র সভ্যতার অগ্রগতি একই হারে হয় নি। কোথাও হয়েছে বেশি, কোথাও হয়েছে

কম। খৃষ্টপূর্ব আট হাজার থেকে চার হাজার হল এই সভ্যতার সময়-সীমা।

॥ নব্য প্রস্তর যুগ ॥

পুরাতন প্রস্তর যুগের সঙ্গে নব্য প্রস্তর যুগের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। গর্ডন চাইল্ড এই পরিবর্তনকে বিপ্লব বলে চিহ্নিত করেছেন। যদিও ধাতুর ব্যবহার ছিল তখন পর্যন্ত অজানা তথাপি পাথরের অস্ত্রের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এই সব অস্ত্র এখন অনেক সুদৃশ্য, মসৃণ। অস্ত্রের সঙ্গে হাতল লাগানো হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে পাথরের চিরুণী এবং সূচ। এই সব উপকরণ সভ্যতার অগ্রগতির নির্দেশক।

খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ এখন খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছে কৃষির সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য মজুত করার ব্যবস্থাও এখন প্রচলিত। জনসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশুদের পোষ মানানোর ফলে মাংস ও দুগ্ধের সংস্থান হয়েছে নিশ্চিত।

কৃষির প্রয়োজনেই মানুষ এখন যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলো, প্রচলিত হল ক্রমশঃ পরিবার প্রথা। গড়ে উঠতে লাগলো পরিবার। কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তুলতে উৎসাহিত করলো। ডঃ কোশাম্বী বলেছেন এই সময়কার মানুষ লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষিকাজের সঙ্গে পরিচিত ছিল না।[১] পাথরের অস্ত্র দিয়ে তারা জমি খুঁড়তো। কৃষিকাজ থেকেই এসেছে ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস। আবার কৃষিকাজ যেহেতু উৎপাদন কেন্দ্রিক তাই ক্রমশঃ সৃষ্টি হল রাজনৈতিক সংগঠনের।

প্রস্তর যুগকেও মানব-সভ্যতার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। কারণ বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণে মানুষ যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছে তাই হল জীবজগতে তার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশক। সুতরাং প্রস্তর যুগকেও সভ্যতার সূচনা বলে চিহ্নিত করতে হয়।

॥ তাম্র-যুগ ॥

নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ ক্রমশঃ ধাতুর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ধাতুর মধ্যে তামার ব্যবহারই প্রথম। কারণ এই ধাতু ছিল সহজলভ্য এবং তুলনামূলকভাবে নমনীয়। বেলুচিস্তানের ঝোব, কোয়েটা, সিন্ধুর কোট দিজি, পাঞ্জাবের কালিবাঙ্গা অঞ্চলে ও হরপ্পায় এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতা উদ্ভবের আগে এই সভ্যতার উদ্ভব হয়। এই সময়ের মানুষেরা কাঁচা ইটের তৈরী বাড়ীতে বসবাস করতো। হাড়ের ও তামার তৈরী অস্ত্র-শস্ত্র তারা ব্যবহার করতো। তারা মৃৎ পাত্র তৈরী করে তাতে লাল কালো রং লাগাতো এবং নারী মূর্তি আঁকতো। এ সময় থেকেই মৃতদেহ দাহ করার প্রথা প্রচলিত হয়।

॥ হরপ্পা সভ্যতা ॥

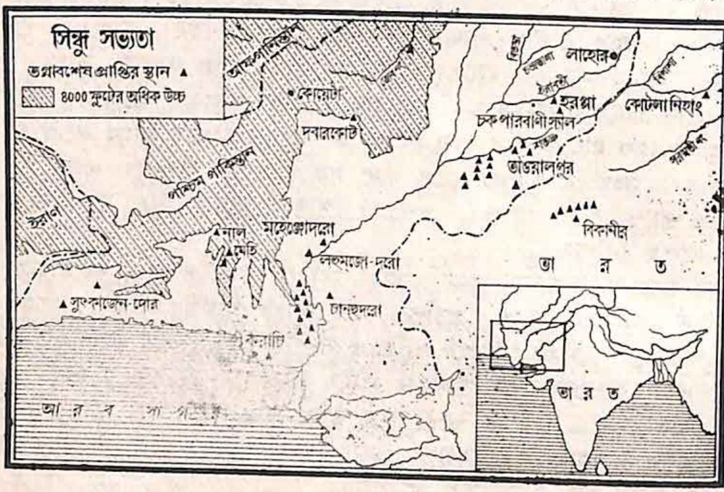
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধানে হরপ্পা সংস্কৃতির আবিষ্কার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আবিষ্কারের পূর্বে মনে করা হত ভারতীয় সভ্যতার সূচনা আর্যদের ভারতে আগমন থেকে। কিন্তু এই আবিষ্কার ভারতীয় সভ্যতার দিগন্তকে প্রসারিত করে তার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্তত পাঁচ হাজার বছরের ভারত-সভ্যতা প্রাচীনত্বের দিক থেকে মিশর-ব্যাবিলন-আসিরীয় সভ্যতার সমকক্ষতা অর্জন করেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম

১ The Neolithic men did not know agriculture by ploughing. They used to dig the earth by sharp stone instruments resembling the "Thumba" in Maharastra.

—Dr. D. D. Kosambi

সাহানী এবং স্যার জন মার্শালের প্রচেষ্টায় এই সভ্যতার উন্মোচন সম্ভব হয়েছে।

সিন্ধুনদের উপত্যকায় এই সভ্যতার প্রথম আবিষ্কার বলে এতকাল এই সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আরও ব্যাপক খননকার্যের ফলে এই সভ্যতার বিস্তৃতির যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাতে এই সভ্যতাকে কেবল সিন্ধু



উপত্যকার সভ্যতা বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই বর্তমানে এই সভ্যতাকে হরপ্পা সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়। বেলুচিস্তানের সুৎকাজেনদারো থেকে উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলার আলমগীরপুর পর্যন্ত এবং পাঞ্জাবের রূপার থেকে গুজরাটের ভোগাবর পর্যন্ত এই সভ্যতার বিস্তৃতি। ধারণা করা হয়, আরো খনন-কার্যের ফলে এই সভ্যতার বৃহত্তর বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

॥ হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ॥

॥ প্রাচীনত্ব ॥

স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তার যোগাযোগের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই সভ্যতায় কোন লৌহের ব্যবহার ছিল না। এর থেকে অনুমান করা হয় এই সভ্যতা খৃঃ পূঃ দুই হাজার বৎসরেরও পূর্বের। কারণ ঐ সময়ের আগে মধ্য প্রাচ্যেও লৌহের প্রচলন হয় নি।

খনন কার্যের ফলে এই সভ্যতার সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। এই স্তর-গুলিকে সভ্যতার প্রাচীন, মধ্য ও পরবর্তী এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনতম স্তরটি জলের নীচে থাকার ফলে সে সম্পর্কে কোন অনু-সন্ধান করাই সম্ভব হয় নি। আবিষ্কৃত স্তরকে বলা হয় হরপ্পা সভ্যতার স্তর। পণ্ডিতগণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই হরপ্পা সভ্যতার সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন খৃঃ পূঃ ২৮০০ থেকে ২৫০০-এর মধ্যে। তা হলে মনে হয় এই সভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায় খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বৎসর পূর্বেকার।

॥ স্বরূপ ॥

হরপ্পা সভ্যতা ছিল মূলতঃ নগর কেন্দ্রিক। আধুনিক নাগরিক জীবনের সুযোগ-

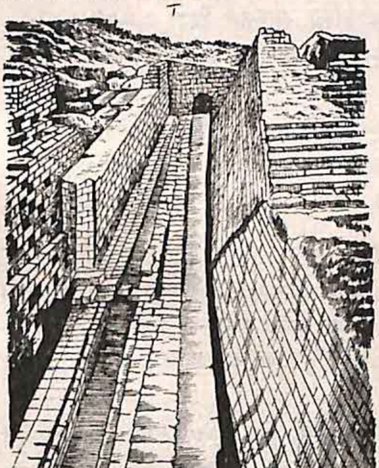
সুবিধার ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার যুগেও পাওয়া যায় এটাই বিস্ময়কর। কিভাবে তারা এই নাগরিক জীবনযাত্রার সংগে পরিচিত হয়েছিল তা এখনো অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে তাদের নগর পরিকল্পনায় যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা অবশ্যই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-লব্ধ। কিন্তু এই সভ্যতা নগর-প্রধান হলেও ছিল কৃষি-নির্ভর। নগর-নির্মাণ কালে বিভিন্ন বৃহদাকার শস্যাগারের অবস্থান থেকে এই সভ্যতার কৃষি-নির্ভরশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

॥ নগর পরিকল্পনা ॥

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া গিয়েছে মহেঞ্জো-দারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে।

মহেঞ্জোদারো সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে এখানে এসে দাঁড়ালে মনে হয় যেন আধুনিক ল্যাংকাশায়ারের কোন ধ্বংসাবশেষ।[২]

মহেঞ্জোদারো নগরটি ছিল উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে সমভাবে বিভক্ত। নগরের রাস্তাগুলি সোজা, প্রস্থে ৯ ফুট থেকে ৩৪ পর্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আধ মাইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাড়ী-ঘরগুলি সুবিন্যস্ত। পয়ঃপ্রণালীর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা সম্ভব, কোনগুলি বাণিজ্য কেন্দ্র, কোনগুলি শিল্পী-কারিগর-শ্রমিকদের বাসস্থান, কোনগুলিই বা ধনীদের অট্টালিকা। সামগ্রিকভাবে মনে হয় ক্রীটের মত অভিজাত-নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখানে প্রচলিত ছিল।[৩]



মহেঞ্জোদারোর গলিনর্দমা



সিন্ধুসভ্যতার প্রত্ন নিদর্শন



পুরুষমূর্তি

এখানকার স্থাপত্য ছিল খুবই সাধারণ, সরল এবং বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক। সুমেরের মত আড়ম্বরপূর্ণ মন্দির এখানে নেই, আবার মিশরের মত বিশালাকার পিরামিডও এখানে অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এখানে মূল লক্ষ্য ছিল আড়ম্বর ও

২ A visitor at Mohenjodard feels himself surrounded by ruins of some present-day working town'in Lancashire.

৩ The General impression is that of a democratic bourgeois economy as in Crete.

বাহ্ল্যের পরিবর্তে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগ্য করে তোলা।[৪]

হরপ্পা নগরটি ছিল মহেঞ্জোদারোর তুলনায় বড়। তবে এখানে যথেষ্ট সংখ্যক কূপের ব্যবস্থা ছিল না। হরপ্পা নগরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ১৬৯'×১৩৫' পরিমিত বিশালাকার শস্যাগার। আরও উল্লেখ্য হল দুই সারিতে পর পর সাজানো শ্রমিকদের বাসগৃহ।

উভয় নগরই ছিল ইটের তৈরী। ইটগুলি ছিল সুনির্মিত। উভয় নগরে নির্মিত ভবনগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, বাসগৃহ, বৃহদাকার অট্টালিকা ও স্নানাগার।

বাসগৃহগুলির আকারে পার্থক্য ছিল। তবে প্রত্যেক বাসগৃহে ছিল শয়নকক্ষ, রন্ধনকক্ষ, স্নানাগার ও কূপ। প্রত্যেক গৃহের নর্দমার সঙ্গে রাস্তার বড় নর্দমার সংযোগ ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক বাড়ীতে ছিল উন্মুক্ত উদ্যান।[৫] হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সুবিন্যস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, যা সমসাময়িক অন্য কোন সভ্যতায় দৃশ্যমান নয়।[৬]

যে সব বৃহদাকার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এতকাল সেগুলিকে দেবমন্দির মনে করা হত। কিন্তু সম্প্রতি মনে করা হচ্ছে এগুলি সম্ভবতঃ ছিল জন-সমাবেশক্ষেত্র অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর বাসস্থান।

স্নানাগারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার। ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে এই স্নানাগারটি কোন আধুনিক সমুদ্র-তীরবর্তী আবাসনের পক্ষেও পরম গৌরবের।[৭] সমগ্র স্নানাগারটির আয়তন ছিল ১৮০'×১০৮'। শুধু মূল স্নানাগারটি হল ৩৯'×২৩', গভীরতা ৮'। স্নানাগারের প্রবেশপথ ছয়টি। ব্যবহৃত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও ছিল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, সুবিন্যস্ত নগর পরিকল্পনা, পানীয় জলের নিখুঁত ব্যবস্থা, উন্নত পয়ঃপ্রণালী, রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত, শান্তিরক্ষায় রক্ষীবাহিনীর নিয়োগ—সব মিলিয়ে হরপ্পা সভ্যতা এক অতি উন্নত আধুনিক পৌর জীবনের পরিচয় বহন করছে।

॥ অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

নগর কেন্দ্রিক হলেও হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা কৃষিকাজ জানতো। উৎপন্ন দ্রব্য ছিল যব, গম, ধান ও নানাধরনের ফল। তারা মাছ মাংস খেত, দুগ্ধ পান করতো। তাই পশুপালনের প্রচলন ছিল। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু, মহিষ, হাতি, শূকর ও উট।

তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে তারা দেহের উপরের এবং নীচের অংশের জন্য পৃথক পৃথক পোশাক পরিধান করতো। তারা মেয়ে-পুরুষ উভয়েই সোনা রূপা ও তামার তৈরী নানা রকমের অলংকার ব্যবহার

---

[৪] **The aim in the Indus Valley was to make life comfortable and luxurious rather than refined or artistic.**

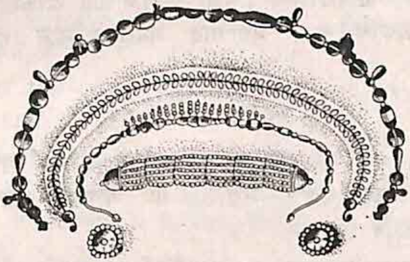
[৫] The open court was the basic feature of house planning in the Indus Valley as in Babylon.

[৬] The elaborate drainage system is a unique feature of the Indus Valley Civilisation, the like of which has not yet been found in any other city of the same antiquity.

[৭] The Great Bath which has been taken to be a part of a vast hydropathic establishment is a swimming bath on a scale which would do credit to a modern seaside hotel.

করতো। তারা বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যও ব্যবহার করতো। গৃহ সজ্জার জন্য ব্যবহৃত হত আসবাব পত্র। ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গিয়েছে শিশুদের নানা ধরনের খেলনা। সুতরাং তাদের দৈনন্দির জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থাও নিশ্চিত ছিল।


মহেঞ্জোদারোর মূর্তি


সিন্ধুসভ্যতার অলংকার


মহেঞ্জোদারোর মূর্তি

ওজন ও পরিমাপের জন্য সম্ভবতঃ কিউবিক প্রথার প্রচলন ছিল। আবার এমন সব স্কেল পাওয়া গিয়েছে যা থেকে মনে হয় তারা ফুটের পরিমাপও জানতো।

তাদের উৎপাদিত অস্ত্রের মধ্যে প্রধান হল তীরধনুক, ছোরা, তরবারী, কুঠার ইত্যাদি। এগুলি তামা বা ব্রোঞ্জের নির্মিত ছিল।

তারা বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গেও পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই তারা ব্যবহার করতো শীলমোহর। বিভিন্ন ধরনের নৌকা ও জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে তাদের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়।

॥ সামাজিক অবস্থা ॥

হরপ্পা সভ্যতায় প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, মঙ্গোলীয় এবং আলপিনিড—এই চার ধরনের মানুষের সম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলন সম্ভব হয়েছিল স্থল ও জলপথে সহজ যোগাযোগের ফলে।

ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করে হরপ্পা সভ্যতার জনসংখ্যাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথাঃ শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও শিল্পী শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণী বলতে বোঝায় পুরোহিত, চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ বক্তাদের। যারা দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তাদের বলা হত যোদ্ধা শ্রেণী। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তাঁতী প্রভৃতি ছিল শিল্পী শ্রেণীভুক্ত। আর কৃষক, মৎস্যজীবী, ভৃত্য—এরা ছিল চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত।

এখানে কোন কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। কিন্তু ছিল এক কেন্দ্রীয় শাসকশক্তি। আর সেই শাসকগোষ্ঠীর নেপথ্যে ছিল এক সামাজিক সংগঠন। তাই সেখানকার পরিকল্পিত নগর, পথঘাট, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, এক ওজন ও মাপ, একই আয়তনের ইট ইত্যাদি সম্ভব হয়েছিল।

হরপ্পা সমাজে শ্রেণী বৈষম্য কোন কোন ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। কিন্তু অনেকেই করেন। বিভিন্ন আকারের বাড়ী, বিভিন্ন আকারের কবর এই বৈষম্যের প্রমাণ।

কিন্তু এই সামাজিক সংগঠন রক্ষিত হত কিভাবে? নিশ্চয়ই শক্তির সাহায্যে নয়। কারণ যে সব সাধারণ তুচ্ছ ও দুর্বল অস্ত্র এখানে পাওয়া গিয়েছে, তার

সাহায্যে শক্তি প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই অনেকের মত সামাজিক ঐক্যের বন্ধন হল ধর্ম। ধর্মই হরপ্পা সভ্যতাকে করেছিল রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতার প্রমাণ হল, পুরানো বাড়ীর উপর নতুন বাড়ী নির্মাণ, কিংবা দীর্ঘকালের মধ্যেও অপরিবর্তিত লিপি, মৃৎশিল্প, যন্ত্রপাতি। জীবনযাত্রায় এই গতানুগতিকতাই রাষ্ট্র পরিচালনায় ধারাবাহিকতার সংকেত। ঐতিহাসিক পিগো ব্যাসাম এই অভিমতের সমর্থক। আবার হুইলার ভিন্ন মত প্রকাশ করে হরপ্পার সমাজ-জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন।

॥ ধর্মীয় অবস্থা ॥

ধ্বংসাবশেষ থেকে এই সময়কার ধর্মীয় জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে হরপ্পা সভ্যতার ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করা যায় বিভিন্ন শীলমোহর, মূর্তি ইত্যাদি থেকে।

এই সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণে যে নারীমূর্তির বাহুল্য দেখা যায় তা থেকে মনে হয় তারা মাতৃকা দেবীর পূজা করতো। তিন মুখ-ওয়ালা যে মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তাকে শিব মনে করাই যুক্তিসংগত। কারণ শিব ত্রিমূর্তি, শিব পশুপতি এবং শিব মহাযোগী। শিবের এই পরিচয়ের সঙ্গে প্রাপ্ত ঐ মূর্তিটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া প্রতীক হিসেবে যোনি ও লিঙ্গ পূজারও প্রচলন ছিল। বিভিন্ন পশুকে দেবতাজ্ঞানেও পূজা করা হতো। আবার গাছপালা, জল, আগুনও পূজিত হত। পূজানুষ্ঠানে যজ্ঞও করা হত।

বৈদেশিক সম্পর্ক ॥

সিন্ধু শহরগুলির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সুমেরীয়, মেসোপটেমিয়া এমন কি মিশরীয়দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু শীলমোহর মেসোপটেমিয়ার বহু জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু শহর থেকে সূতীবস্ত্র পশ্চিম এশিয়ার শহরগুলিতে রপ্তানী হত। মেসোপটেমিয়া থেকে আসতো নানা দামী পাথর ও প্রসাধন দ্রব্য। মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ষাঁড়ের পায়ের আকৃতিযুক্ত কাঠের টুল ও দীপাধার। এ সব জিনিসও পাওয়া গিয়েছে সিন্ধু অঞ্চলে। গর্ডন চাইল্ড মনে করেন যে সিন্ধুর ব্যবসায়ীরা সমুদ্র অতিক্রম করে ইউফ্রেটিশ ও টাইগ্রীসের তীরের শহরগুলিতে পণ্যসামগ্রী বহন করে আনতো। অনেকের মতে সুমেরীয়গণ সিন্ধু অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে এবং নগর নির্মাণ করে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগের সভ্যতাগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো না। তাই অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক।



॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

The Vedic Age

(a) The "Aryans"—their original homeland. The first literary work in India—the Reg-Vedas ;

(b) Vedic literature—later Samhitas, Brahmans, Aranyakas, Upanishads and Sutras ;

(c) Life of the people as reflected in the Vedic literature—

(i) Social, economic and rellgious life and political and administrative activities of the people as known from Reg-Vedas.

(ii) later developments

(d) Expansion of Vedic culture in the subcontinent ;

(e) Beginning of the Iron Age.

॥ বিষয়ক্রম ॥

আর্যদের পরিচয়—আদি বাসস্থান—ঋগবেদ—বৈদিক সাহিত্য—বৈদিক যুগের সামাজিক—অর্থনৈতিক—ধর্মীয় জীবন—রাজনৈতিক ব্যবস্থা—পরবর্তী পরিবর্তন—আর্য সভ্যতার বিস্তার—লৌহ যুগের সূচনা—আর্য সভ্যতার মূল্যায়ন।

তৃতীয় অধ্যায়
বৈদিক যুগ



আর্য সভ্যতা

॥ আর্যদের পরিচয় ॥

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করলে 'আর্য' শব্দের অর্থ সৎ বংশজাত ব্যক্তি। ম্যাক্স-মুলার, উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন আর্য হল ভাষার নাম। সুতরাং এই ভাষাভাষী যারা তারাই আর্য। কিন্তু ভারতে আর্য শব্দটি জাতিবাচক অর্থেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। প্রাচীন পারসিকগণও শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার করতো।

সে যাই হোক ভারত-সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার এবং স্থায়িত্ব বিধায়ক এই আর্যরা। আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করে। হরপ্পা সভ্যতার রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে আর্যগণ এনেছিল এক দুর্নিবার গতিশীলতা। অবশ্য রোমিলা থাপার ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছেন যে আর্যদের আগমনে ভারতের অগ্রগতি পশ্চাদপদ হয়েছিল। কেননা হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার পরিবর্তে আর্যগণ পুনরায় গ্রামীণ সভ্যতার সূচনা করেছিল।[১]

॥ আর্যদের আদি বাসস্থান ॥

আর্যদের আদি বাসস্থান নির্ধারণ ইতিহাসের এক বিতর্কিত প্রসঙ্গ। ডঃ এ· সি· দাস, পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা, ডঃ ত্রিবেদ, এল. ডি. কাল্লা প্রভৃতি মনে করেন ভারতবর্ষই আর্যদের আদি বাসস্থান। তাঁরা ভারতে বহিরাগত নন। মুলতান অথবা কাশ্মীর অথবা পাঞ্জাবের সপ্তসিন্ধু অঞ্চল ছিল তাঁদের বাসস্থান। কিন্তু মার্শাল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই মত আদৌ গ্রহণ করেন না। তাঁদের বক্তব্য, আর্যরা যে ভারতীয় এমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। সুতরাং তাঁরা বহিরাগত।

কিন্তু বহিরাগত হলেও আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে ইউরোপ ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান। পোল্যাণ্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে আর্যরা পশুচারণ করতো। কারণ তখন আর্যদের পশুপালনই ছিল প্রধান জীবিকা। অধ্যাপক গাইল্স-এর মতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপই হল আর্যদের আদি বাসস্থান। অন্যদিকে অধ্যাপক হার্টের অভিমত হল আর্যগণ ইউরোপ থেকে ককেশাস পর্বত অতিক্রম করে ইরাণ বা পারস্যের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ব্রানডেনস্টাইনের সিদ্ধান্ত হল বর্তমানের কিরঘিজ স্তেপি বা তৃণভূমি অঞ্চলই হল আর্যদের আদি বাসস্থান। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আর্যদের আদি বাসস্থান নিশ্চয়ই কোন দ্বীপ বা সমুদ্রতীরে ছিল না। কারণ ঐ সব ভাষায় সমুদ্র বিষয়ক কোন শব্দ নেই। দ্বিতীয়তঃ তারা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর গাছপালার সঙ্গে পরিচিত ছিল। তৃতীয়তঃ তারা স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কারণ যেহেতু তখনো আর্যদের প্রধান জীবিকা পশুপালন, তাই পশুপালনের জন্যই প্রয়োজন বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তৃণভূমি। আবার যেহেতু তারা ক্রমশঃ কৃষিকাজও আরম্ভ করছিল সেহেতু স্থায়ীভাবে বসবাসও অপরিহার্য হয়ে উঠছিল। তাই সব দিক মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ব্রানডেনস্টাইনের অভিমতই সর্বাধিক সমর্থন অর্জন করেছে।

॥ প্রথম আর্য সাহিত্য—ঋক্‌বেদ ॥

আর্য সাহিত্য হল বেদ। বেদের চারভাগ। চারভাগের মধ্যে প্রাচীনতম হল ঋক্‌বেদ। কারণ ঋক্‌বেদে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং আর্য-সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধান

[১] "The coming of the Aryans was backward step, since the Harappan culture had been far more advanced than that of the Aryans who were as yet pre-urban."

পাওয়া যায় তা থেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

কিন্তু ঋক্‌বেদের প্রকৃত রচনাকাল নিয়েও নানা সংশয়। ম্যাক্সমূলার বলেছেন খৃঃ পূঃ ১২০০ থেকে ১০০০ সনের মধ্যে ঋক্‌বেদ রচিত হয়েছিল। আবার ঋক্‌বেদের সংস্কৃতের সঙ্গে পারসিক ধর্মসাহিত্য জেন্দ আবেস্তার ভাষার অসাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ধর্মসাহিত্য যদি সমসাময়িক হয় তাহলে যেহেতু জেন্দ আবেস্তার রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১০০০ বলে ধরা হয় সেই হেতু ঋক্‌বেদের রচনাকালও ঐ সময়ই হওয়া স্বাভাবিক। দেখা যাচ্ছে এই বিশ্লেষণের সঙ্গে ম্যাক্সমূলারের অভিমতের সংগতি রয়েছে। বোঘাজকোই ও তেল-এল-আর্মানা শিলালিপি আবিষ্কার হওয়ায় ঋক্‌বেদের রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ঐ দুই শিলালিপিতে বৈদিক দেবতাদের নাম আছে। সিরিয়ার রাজাদের নামকরণেও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। সুতরাং ঐ লিপির রচনাকাল যদি খৃঃ পূঃ ১৪০০ হয় তাহলে তারও আগে ঋক্‌বেদ রচিত হতে পারে না। বাল গঙ্গাধর তিলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ঋক্‌বেদের রচনাকাল ৬০০০ খৃঃ পূঃ বলে দাবী করেন। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ নেই। অধ্যাপক উন্‌টারনিৎসের অভিমতই অধুনা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। তিনি বলেছেন ঋক্‌বেদের রচনা ৮০০ খৃঃ পূঃ নাগাদ সম্পন্ন হয়।

॥ বৈদিক সাহিত্য ॥

বেদ শব্দটি বিদ্‌ অর্থাৎ জ্ঞান শব্দ থেকে সৃষ্ট। বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মনে করা হয় যে ঋক্‌বেদের যুগে সংস্কৃত ভাষাই ছিল লোকের কথ্য ভাষা। হিন্দুগণ মনে করে বেদ অপৌরুষেয়। ঈশ্বরের কাছ থেকে বেদের বাণী শুনে ঋষিগণ তা স্মরণে ধরে রাখতো। তাই বেদকে বলা হয় শ্রুতি। আবার যেহেতু বেদকে বংশ পরম্পরায় মুখস্থ করে রাখতে হত এবং বেদের কোন লিখিত আকার ছিল না, তাই বেদকে স্মৃতিও বলা হয়। পরবর্তীকালে লিপি বর্ণমালার উদ্ভাবন হলে বেদকে লিখিতরূপ দেওয়া হয়। বেদই হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থ।

বেদের চার ভাগ—ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব। এদের মধ্যে ঋক্‌বেদই সর্বপ্রাচীন। অন্যান্য বেদ পরে রচিত হয়।

প্রতিটি বেদের আবার চার ভাগ। যথাঃ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

সংহিতা পদ্যে রচিত স্তোত্র ও মন্ত্র-প্রধান। ঋক্‌-সংহিতার বহু স্তোত্র পরবর্তী-কালে অন্যান্য বেদের সংহিতায় স্থান পেয়েছে। সামবেদের স্তোত্র যজ্ঞকালে গাওয়া হত। তাই এদের বলা হয় সামগান।

ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। এতে যাগ-যজ্ঞের পদ্ধতি, প্রকরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রের ভাষ্য গ্রথিত হয়েছে।

আরণ্যকে উচ্চ দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। কারণ যারা সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হয়ে আত্মার মুক্তির উপায় চিন্তা করতো তাদের জন্যই রচিত আরণ্যক। সুতরাং এক্ষেত্রে দার্শনিক প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। এই দার্শনিক প্রভাব থেকেই ভক্তিবাদ ও জন্মান্তরবাদের বিকাশ ঘটেছিল।

উপনিষদে ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরকে অগ্রাহ্য করে বৃহত্তর জীবন জিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। কর্মফল অর্থাৎ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগের তত্ত্ব উপনিষদে স্থান পেয়েছে। বলা হয়েছে কর্মফল এতটাই দুরতিক্রম্য যে মানুষ মৃত্যুর পরও তার ফল ভোগ করে। কারণ মৃত্যুই সব কিছুর অবসান ঘটায় না। আত্মা নতুন দেহে পুনর্বার জন্ম-গ্রহণ করে। যতক্ষণ জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে লীন না হয় ততক্ষণ আত্মার মুক্তি

নেই। উপনিষদে এই তত্ত্বই বিশ্লেষিত হয়েছে। উপনিষদ হল প্রতিটি বেদের শেষ অংশ। তাই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়।

বেদ যেন যথাযথভাবে পঠিত হয় এবং যাগ-যজ্ঞ যেন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে রচিত বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গকে বলা হয় সূত্র সাহিত্য। বেদাঙ্গও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত।

বেদাঙ্গে আছে ছয়টি সূত্র এবং ছয়টি দর্শন। ছয়টি সূত্র হলঃ (১) শিক্ষা, যার সাহায্যে শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা যায়, (২) ছন্দ—যা বৈদিক ছন্দ জানতে সাহায্য করে, (৩) ব্যাকরণ, যার সাহায্যে বৈদিক ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ জানা যায়, (৪) নিরুক্ত, যেখানে বৈদিক ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে, (৫) জ্যোতিষ, যেখানে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং (৬) কল্প, যেখানে সমাজ পরিচালনার নিয়ম, যাগ-যজ্ঞের প্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদাঙ্গের কল্পসূত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ এখানেই আর্য সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন বিশ্লেষিত। কল্প-সূত্রের চার ভাগ। যথাঃ শ্রৌত্য, গৃহ্য, শুল্ব, ধর্ম। গৃহ্যসূত্রে আছে গার্হস্থ্য জীবন যাপন প্রণালী। ধর্মসূত্রে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অনুশাসন।

আর ছয়টি দর্শন বা ষড়দর্শন হলঃ (১) সাংখ্য, যার রচয়িতা কপিল, (২) যোগ —রচয়িতা পতঞ্জলি, (৩) ন্যায়—রচয়িতা গৌতম (৪) বৈশেষিক—রচয়িতা কনাদ, (৫) পূর্ব মীমাংসা—রচয়িতা জৈমিনী এবং (৬) উত্তর মীমাংসা—রচয়িতা বেদব্যাস।

॥ সামাজিক অবস্থা ॥

আর্যগণ যখন প্রথম ভারতে আসে তখন তাদের সমাজ ছিল ত্রিধা বিভক্ত। যথাঃ যোদ্ধা বা অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ। তখন পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বিভিন্ন জীবিকা ছিল না পুরুষানুক্রমিক, কিংবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কোন বাধা নিষেধ ছিল না। আসলে এই শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা।

কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের ভেতর জাতিগত সচেতনতা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে ভারতে অনার্যদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে। কারণ ভয়ে কিংবা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদে আর্যরা ছিল অনার্যদের সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী স্পর্শকাতর। এই স্পর্শকাতরতা থেকেই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব। ক্রমশঃ আর্য সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। জীবিকাও হয়ে যায় বংশগত বা পুরুষানুক্রমিক। সমাজের রক্ষক হিসেবে ক্ষত্রিয়ের এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য শূদ্র বাদে অপর তিন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলতো।

সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রধানকে বলা হত গৃহপতি। কতগুলি পরিবার নিয়ে গঠিত হত গ্রাম। এ সময় যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বাল্যবিবাহ প্রথা জনপ্রিয় ছিল না। সঙ্গী নির্বাচনে পাত্র-পাত্রীর স্বাধীনতা ছিল। পণ প্রথাও ছিল। সাধারণভাবে নারী স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। তাদের শিক্ষালাভের অধিকারও ছিল। বিধবাদের আত্মশোধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হত। অবশ্য বিধবা বিবাহের নজীরও দুর্লভ নয়।

পরবর্তীকালে নারীর মর্যাদা বহুলাংশে হ্রাস পায়। পুরুষেরা বহু বিবাহে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ কন্যাসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হতে থাকে।

বাল্যবিবাহ ব্যাপক হতে থাকে। নারীগণ ধর্মাচরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

বাসগৃহ সাধারণতঃ কাঠ দিয়ে তৈরী হত। পরবর্তীকালে মাটি দিয়ে দেওয়াল নির্মাণ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। প্রধান খাদ্য ছিল যব, গম, দুধ, ঘি, শাক-সব্জী, ফলমূল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে চালের ব্যবহার আরম্ভ হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে মাংস ভক্ষণ ও সুরাপান অনুমোদিত ছিল। পোশাক পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ। রেশম, পশম, সুতী তিন ধরনের পোশাকই ব্যবহৃত হত। তবে অলংকারের ব্যবহার ছিল খুবই জনপ্রিয়। অবকাশ যাপনে নাচ-গান, জুয়া খেলা, রথ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত।

ঋক্‌বেদেই আর্য জীবনধারায় চতুরাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুরাশ্রম হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রতিটি ব্যক্তিজীবনকে এই চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হত। প্রথমে শিক্ষাকাল বা ব্রহ্মচর্য, তারপর সংসার পালন বা গার্হস্থ্য, এরপর সাংসারিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে অরণ্যে পারলৌকিক চিন্তা বা বাণপ্রস্থ, সবশেষে পরিব্রাজকের জীবন বা সন্ন্যাস।

বহুদিন পর্যন্ত আর্যদের কোন হস্তাক্ষর ছিল না। ৭০০ খৃঃ পূঃ নাগাদ তারা এ কৌশল আয়ত্ত করে বলে অনুমান করা হয়। বৈদিক যুগে শিক্ষা ছিল তাই মূলতঃ মৌখিক। শিক্ষা ছিল সমাজের উচ্চ বর্ণের জন্য। বেদ অধ্যয়নের অধিকার ছিল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের।

॥ অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

রোমিলা থাপারের অভিমত হল আর্যরা মূলতঃ পশুপালক হিসেবেই ভারতে এসেছিল এবং দীর্ঘকাল পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। তখন গরুই ছিল পরিমাপের মানদন্ড এবং এই সময়ই গরু ঐশ্বরিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য পশুর মধ্যে ঘোড়ার বিশেষ ভূমিকা ছিল। দ্রুতগতিতে যাতায়াত, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনে তখন ঘোড়া ছিল অপরিহার্য।

কিন্তু স্থায়ী বসবাস ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রেও এল এক পরিবর্তন। লোহার ব্যবহার যেমন জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজকে অধিকতর সহজ করে দিল তেমনি কৃষিকাজকেও উৎসাহিত করলো। অবশ্য এ কাজে আগুনের সাহায্যও উল্লেখযোগ্য। তবে আর্যগণ কাঠ পুড়িয়ে ফেলার চাইতে সংগ্রহ করতেই বেশী উৎসাহী ছিল।

প্রথমে কৃষিযোগ্য জমি ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর সম্পত্তি। তারপর গোষ্ঠীর বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসাতে জমি হল পরিবারের সম্পত্তি এবং এভাবেই উদ্ভব হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির।

কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন জীবিকার ক্ষেত্রেও নিয়ে এল নানা বৈচিত্র্য। যেমন সমাজে ছুতারের প্রয়োজন বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। কারণ যানবাহনের উপযোগী রথ নির্মাণ ছাড়াও লাঙ্গল তৈরীর জন্য তারা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। তাছাড়া কাঠের সহজলভ্যতার সুযোগে ছুতারের জীবিকা ক্রমশঃই লাভজনক হল।

অন্যান্য জীবিকাগুলি হল কর্মকার, কুম্ভকার, চর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি।

অন্যদিকে কৃষিকাজের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ব্যবসা-বাণিজ্য। জলপথই ছিল তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সহায়ক। তাই নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠতে লাগলো নতুন নতুন বসতি। যে সব জমিদার কৃষিকাজের জন্য অন্য লোক নিয়োগ করতে পারতো তারাই এখন হল প্রধান ব্যবসাদার। এইভাবেই জমিদার শ্রেণী থেকে সৃষ্টি হল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের।

পরবর্তীকালে স্বাভাবিক কারণেই পশুপালকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছিল। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে অধিক জমির মালিকগণের চাষাবাদের প্রয়োজনে শ্রমিক নিয়োগ প্রথা প্রচলিত হল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সংগঠন গড়তে উৎসাহিত হয়।

॥ ধর্মীয় অবস্থা ॥

ঋক্‌বেদ মূলতঃ ধর্মীয় গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থ থেকে আর্যদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

পরিদৃশ্যমান এই জগতে যা কিছু ছিল নিয়ন্ত্রণ ও উপলব্ধির বাইরে তাই ছিল আর্যদের কাছে পরম ভীতির কারণ এবং তাই দেবত্বে উত্তীর্ণ। এ জন্যই তাদের দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, যম প্রভৃতি।

আর্যদের ধর্মে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। স্ত্রী দেবতার সংখ্যা ছিল কম, গুরুত্বও কম। বৈদিক সমাজ ছিল পুরুষ শাসিত, ধর্মীয় চিন্তাতেও তার প্রভাব স্পষ্ট।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন ঋক্‌বৈদিক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একেশ্বরবাদ। ঋক্‌বেদের স্তোত্রে বিশ্বজনীন ঐক্যবোধের সুরও ধ্বনিত। তাই ঈশ্বর বহু নাম ধারণ করলেও তিনি এক ও অভিন্ন।

ঋক্‌বেদে দেবতাদের কোন বংশতালিকা নেই। তাই দেবতাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট তা ঠিক বলা যায় না। তবে মনে হয় যখন যে দেবতার পূজা হত তখন তাঁকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হত।

ঋক্‌বৈদিক ধর্মের উল্লেখযোগ্য দিক হল যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ছিল বৃহৎ। তাই অনুষ্ঠান পারিবারিক ছিল না, ছিল সামাজিক। দেবতার সন্তোষ বিধান এবং আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা হত। ভীতি এবং বিস্ময় মিশ্রিত এক পরিবেশ যজ্ঞস্থলকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। যজ্ঞের প্রধান প্রাণ-পুরুষ ছিলেন পুরোহিত। কারণ যজ্ঞের কলা-কৌশল ছিল একমাত্র তাঁরই আয়ত্তে।

পরবর্তীকালে ঋক্‌বৈদিক ধর্মের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ঋক্‌বৈদিক দেবতাদের পরিবর্তে পরবর্তীকালে প্রাধান্য লাভ করে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু। ব্রহ্মা কল্পিত হতেন সৃষ্টিকর্তারূপে, মানুষের রক্ষক ও সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শিব, আর মানুষের মুক্তিদাতা রূপে চিহ্নিত হলেন বিষ্ণু।

যাগ-যজ্ঞের জটিলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। ফলে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল পুরোহিতের। আর যেহেতু এখন যজ্ঞানুষ্ঠান আরও বেশী ব্যয়বহুল হয়ে গেল তাই রাজার সাহায্য হয়ে উঠলো অপরিহার্য। সুতরাং রাজ-শক্তির মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল।

বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ এই ধর্মানুষ্ঠানের পাশাপাশি পরবর্তী কালে গভীর দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এই চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে উপনিষদে। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের ধারণা এই সময়েই বিকশিত হয়।

জীবনের গভীর জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এই গভীর অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার পাশাপাশি জড়বাদী দর্শনেরও উদ্ভব হয়। জড়বাদী দর্শনে প্রাকৃতিক জগতের প্রাধান্য ঘোষিত হয়। জড়বাদী দর্শন থেকেই আসে দেহবাদী দর্শন। এই দর্শন অনুসারে যেহেতু মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি তাই জীবনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করাই বড় কথা।

॥ রাজনৈতিক অবস্থা ॥

ঋক্‌বৈদিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল পরিবার বা কুল। কতকগুলি পরিবার নিয়ে গ্রাম,

কতকগুলি গ্রাম নিয়ে বিশ, কতকগুলি বিশ নিয়ে জন, কতকগুলি জন নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হত। কুলের প্রধানকে কুলপ, গ্রামের প্রধানকে গ্রামণী, বিশের প্রধানকে বিশপতি এবং জনের প্রধানকে গোপ বলা হত।

প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক। পাশাপাশি অরাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও ছিল। এগুলিকে বলা হত গণ এবং এদের প্রধানকে গণপতি।

নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ শৃংখলারক্ষার প্রয়োজনেই রাজ-পদের সৃষ্টি হয়। তাই রোমিলা থাপার বলেছেন এই সময়ের রাজারা ছিলেন প্রধানতঃ সামরিক নেতা।[২] শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা এবং প্রজাদের ধন ও প্রাণ রক্ষাই ছিল রাজার প্রধান কর্তব্য। তাই সমাজে রাজা যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। তখন রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কোন কর সংগ্রহ করতেন না। বরং জনগণ স্বেচ্ছায় কর দিত। জমির উপর রাজার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু তিনি যুদ্ধে শত্রুর লুণ্ঠিত সম্পদের অংশ পেতেন।

রাজপদ সাধারণতঃ ছিল বংশানুক্রমিক। আবার রাজা নির্বাচনের নজীরও পাওয়া যায়। রাজা কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সভা ও সমিতি নামে দুটি সংস্থা রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতো। রাজা সর্বদাই এই দুই সংস্থার সমর্থন-লাভে সচেষ্ট থাকতেন—এতটাই ছিল সংস্থা দুটির গুরুত্ব। সভা ছিল গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠদের সংস্থা আর সমিতি ছিল সাধারণ সভা। সভার অধিবেশনে মেয়েরাও অংশ নিতে পারতো।

প্রাত্যহিক দায়িত্ব পালনে রাজাকে সাহায্য করতে নিযুক্ত ছিল কিছু রাজ-কর্মচারী। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন পুরোহিত। যাগযজ্ঞ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে পুরো-হিত তো সর্বেসর্বা ছিলেনই, সেই সঙ্গে রাজাকে তিনি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও রাজার সহযাত্রী হতেন। তিনি ছিলেন রাজার খুবই ঘনিষ্ঠ। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী হলেন সেনানী, যিনি সৈন্য-বাহিনী গঠন, অস্ত্র সংগ্রহ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতেন। এ সময়ের অস্ত্র-শস্ত্র হল তীর, ধনুক, বল্লম, কুঠার, তলোয়ার প্রভৃতি। সেনাবাহিনীর প্রধানতঃ দুই ভাগ ছিল—পদাতিক ও রথারোহী। কখনো কখনো অশ্বারোহী বাহিনীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামণী গ্রামের সামরিক ও অসামরিক দায়িত্ব পালন করতো। যেহেতু রাজা কর সংগ্রহ করতেন না সেই-হেতু কোন কর সংগ্রাহকের পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার বিচার বিভাগীয় কোন কর্মচারীরও উল্লেখ নেই। অথচ সমাজে গরু অপহরণ, জোর করে জমি ও সম্পত্তি দখল—এ সব ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। এমন অপরাধের বিচার রাজাই করতেন। সেই সঙ্গে এমন ঘটনা যেন না ঘটে—সে বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণের জন্য গুপ্ত-চর নিয়োগ করা হত। গুপ্তচর বাহিনী শত্রুর গতিবিধির উপরও নজর রাখতো।

সাধারণভাবে বলা যায় ঋক্‌বৈদিক যুগের শাসন ছিল গোষ্ঠীগত শাসন। এই শাসনে সামরিক শক্তিরই প্রাধান্য ছিল। ছিল না কোন আঞ্চলিক শাসন। আর তা না থাকাই স্বাভাবিক, কেননা তখনো অবিরত নতুন নতুন জমি দখলের লড়াই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে চলছিল।[৩]

২ The Vedic king was primarily a military leader, whose skill in war and the defence of the tribe were essential to his remaining king.
— Romila Thapar

৩ By and large it was a tribal system of government in which the military element was strong. There was no civil system or territorial administration because people were in a stage of perpetual expansion migrating from one area to another. — R. S. Sharma

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও রূপান্তর ঘটায়।

আর্যদের বসতি ক্রমশঃ বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়ে উঠতে থাকে। বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে একচ্ছত্র প্রাধান্যলাভের সংগ্রামও ক্রমশঃ তীব্রতর হয়। ফলে সম্রাট, একরাট প্রভৃতি উপাধি-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হতে থাকে।

রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে রাজার ক্ষমতাও সম্প্রসারিত হতে থাকে। হ্রাস পেতে থাকে রাজশক্তির উপর সভা ও সমিতির নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের অধিকার। এমন কি সভার গঠনগত রূপান্তরও ঘটে। কালক্রমে সভা অভিজাতদের সভায় পরিণত হয়। এই অভিজাতগণ ছিল রাজশক্তির অনুগত। ফলে সভার সমর্থনলাভের পরিবর্তে সভাই এখন রাজার সমর্থকে পরিণত হয়।

রাজ্যের আয়তন ও রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। রথিন্ নামে এক অভিজাত কর্মচারীর সৃষ্টি হল যার কাজ হল রাজাকে পরামর্শ দান। এ ছাড়া পুরোহিত, সূত বা রথচালক, সংগ্রাহিত্রী বা কোষাধ্যক্ষ, ভাগদুখ বা রাজস্ব সংগ্রাহক প্রভৃতি কর্মচারী ছিল। ছিল ক্ষত্রী এবং রাজার পাশা খেলার সঙ্গী।

রাজপদের মহিমা বহুগুণে বর্ধিত হয়। রাজপদের দৈব অধিকার অধিকতর জনপ্রিয় হয়। রাজার অভিষেক অনুষ্ঠান এই অধিকারেরই বহিঃপ্রকাশ বলে ঘোষিত হয়। সমাজে রাজা ও পুরোহিত দৈব ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচারিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক এক মর্যাদা তাদের উপর আরোপিত হয়।

॥ আর্য সভ্যতার বিস্তার ॥

বৈদিক সাহিত্যে ভারতে আর্যদের বসতি স্থাপন ও তার বিস্তার সম্পর্কে ধারাবাহিক কোন বিবরণ নেই। তবে ঐ সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে এবং কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে পণ্ডিতেরা ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

ঋক্‌বেদে আফগানিস্থানের কিছু নদ-নদী ও স্থানের নাম উল্লেখ আছে। যেমন, কুভা বা কাবুল, সুবাস্তু বা স্বাত, ক্রুমু বা কুর্‌রম, গোমতি বা গোমাল। ইত্যাদি। আবার ঋক্‌বেদে সপ্ত সিন্ধু বা সিন্ধু ও তার শাখানদীগুলির নাম উল্লিখিত আছে। হিমালয়ের উল্লেখও। কিন্তু লক্ষণীয় হল ঋক্‌বেদে ভারতের দুই প্রধান নদী গঙ্গা বা যমুনার উল্লেখ নেই। সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে এই ভৌগোলিক স্থানসমূহের উল্লেখ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে আর্যরা ভারতে আসার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাবে বসবাস করতো।

এই অঞ্চল থেকে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে আর্যদের দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। এবং এই প্রবেশেরও কতকগুলি বাস্তব কারণ ছিল। আর্যদের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোচারণ ভূমি, বনজ সম্পদ ও কৃষিক্ষেত্রের অভাব সৃষ্টি হয়। আর্যরাও ক্রমশঃ পশুপালন ত্যাগ করে কৃষিকাজকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে। সুতরাং তাদের প্রয়োজন হয় কৃষির উপযোগী সমতলভূমির। রাভি নদীর জলের ভাগ নিয়ে আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল তাও সম্ভবতঃ কৃষির কারণেই। পাঞ্জাব থেকে সোজা দক্ষিণে তাই আর্যরা অগ্রসর হতে পারতো। কিন্তু এই অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হল রাজপুতনার মরু অঞ্চল। সুতরাং তাদের অগ্রসর হতে হয় পূর্বদিকেই। এই দিকেই গঙ্গা-যমুনার বিস্তৃত উপত্যকা। এই উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর, কৃষির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাছাড়া এই অঞ্চলে সহজলভ্য ছিল তামা ও লোহা। তাই এই সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রলোভনে এবং পাঞ্জাবে স্থানাভাববশতঃ অনিবার্যভাবেই আর্যরা পূর্বদিকে

বসতি স্থাপন করে। ঋক্‌বেদের শেষ দিকে সরযূ নদীর উল্লেখ আছে। এর থেকে মনে হয় অন্ততঃ উত্তরপ্রদেশের সরযূ নদীর তীর পর্যন্ত আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল ঋক্‌বৈদিক যুগে। এ বিষয়ে রোমিলা থাপার স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ঋক্‌-বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতার বিস্তার ছিল দিল্লী পর্যন্ত।[৪]

ঋক্‌বেদের পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যরা গঙ্গা অতিক্রম করে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে কোশাম্বি, বিদেহ, কাশী, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। তখন পূর্বাঞ্চলের নাম ছিল প্রাচী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উত্তরবঙ্গকে পুণ্ড্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ তখন ছিল অনার্যদের বাসভূমি। কিন্তু মহাকাব্যের যুগে বাংলায় যে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা মহাভারতে উত্তর বাংলার করতোয়া নদীকে এক পুণ্যতোয়া নদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রোমিলা থাপার বলেছেন যেহেতু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দুই সমুদ্র এবং হিমালয় ও বিন্ধ্য—দুই পর্বতের কথাই বলা হয়েছে সেই-হেতু ধরে নেওয়া যায় সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই এই সময় আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।[৫]

কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা সম্প্রসারিত হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে অগস্ত্য যাত্রার কিংবদন্তী থেকে মনে হয় অগস্ত্য মুনিই ছিলেন দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতার বাহক। তাহলেও স্বীকার করতেই হবে ঐ অঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারে নি। বরং দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা ও দ্রাবিড় সভ্যতার সহাবস্থান ঘটেছিল।

॥ লৌহযুগের সূচনা ॥

ভারতের ইতিহাসে লৌহযুগের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লোহার ব্যবহারই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান এবং ঐতিহাসিক যুগের সূচনা চিহ্নিত করে। আনুমানিক ৯০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে লৌহযুগ আরম্ভ হয়।

উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলে আর্যদের প্রবেশ যে সহজ হয়েছিল তার প্রধান কারণই হল লোহার ব্যবহার। ঐ অঞ্চলে লোহার সহজলভ্যতার জন্য লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি ও লাঙ্গল কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অধিক উৎপাদনের প্রভাব পড়েছিল সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের সর্বত্র লৌহযুগ একই গতিতে অগ্রসর হয় নি। যেমন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নব্য প্রস্তরযুগ ও লৌহযুগের মধ্যবর্তীকালে তাম্রযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তাম্রযুগের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। সেখানে নব্য প্রস্তরযুগ সরাসরি লৌহযুগে উত্তীর্ণ। সম্ভবতঃ সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে লৌহের যথেচ্ছ লভ্যতার জন্য এমন ঘটে-ছিল।

ঋক্‌বৈদিক যুগে লোহার ব্যবহার ছিল কিনা এই প্রশ্নে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন মত। ব্যাশম অবশ্য জোর দিয়েই বলেছেন ঋক্‌বৈদিক যুগের লোকেরা লোহার

[৪] It would appear that in the Rig-Vedic period they had spread to the Punjab and Delhi regions.

— Romila Thapar.

[৫] The later Vedic sources show a wider knowledge of Indian geography; they mention the two seas, the Himalaya and Vindhya mountains and generally the entire Indo-Gangetic plain.

—Romila Thapar.

ব্যবহার জানতো না। তাঁর মতে সম্ভবতঃ মৌর্যযুগের পূর্বে ভারতে লোহার ব্যবহার অত্যন্ত বিরল ছিল।

কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা অথর্ববেদে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর ভারতে লোহার ব্যবহারকে মেনে নিয়েছেন। মহাকাব্যের যুগে লোহার প্রচলন ছিল, কিন্তু এর যোগান বেশী ছিল না। আবার পশুপালন থেকে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে লোহার ব্যবহার ছাড়া কৃষির এমন দ্রুত বিস্তার তখন সম্ভব ছিল না। আলিগড়ের নিকটবর্তী অত্রিজনখেরা ও পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদীর তীরে পাণ্ডু রাজার ঢিবি খননের ফলে খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দের কাছাকাছি লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের উত্থানের পেছনে বিহারের লৌহাঞ্চল যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা আজ ইতিহাস স্বীকৃত। একইভাবে সাতবাহন রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে লোহার চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি হয়েছিল।

॥ আর্য সভ্যতার মূল্যায়ন ॥

ভারতের ইতিহাসে সুদূর অতীতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে আর্য সভ্যতা চিহ্নিত। কিন্তু সেই সময়ের ইতিহাস রচনা যেমন অনিশ্চয়তা তেমনি অপূর্ণতার সম্ভাবনাময়। তথাপি ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনে আর্য সভ্যতার অবদান অবিস্মরণীয়। আর্যরাই ভারতের জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছে। আর্যরা আমাদের কেবল সংস্কৃতভাষা, জাতিভেদ প্রথা ভিত্তিক সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি, সেই সঙ্গে গভীর দার্শনিক চিন্তাধারাই দিয়ে যায় নি, জঙ্গলে পূর্ণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্য করে গিয়েছে তারাই।

এক সময় সংস্কৃত ভাষা ছিল সর্বসাধারণের ভাষা। কালক্রমে সেই ভাষা শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হল। ফলে আরম্ভ হল ভারতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান রচনা, আরম্ভ হল উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে ভেদাভেদ।

আর্যদের সৃষ্ট জাতিভেদ প্রথা এত বছর পরেও আজও ভারতে সমান সক্রিয়। এই প্রথার ভিত্তিতেই নির্মিত ভারতেই রাজনৈতিক কাঠামো। আর্য সভ্যতার প্রভাব এতটাই যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ঐ সভ্যতার শিক্ষাকেই মূলমন্ত্র করে। তাই অস্বীকার করা যায় না আজকের ভারতের যা কিছু অগ্রগতি তার সূচনা আর্যদের ভারতে আসা থেকেই এবং তাদের সৃষ্ট সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই।[৬] অবশ্য এর সঙ্গে অনেক ঘটনার ঘনঘটা এবং সংঘাত নিশ্চয়ই ছিল। এবং ছিল বলেই ইতিহাস এক বহমান স্রোতধারা।

---

৬ The development of India as we know it, stems from the impetus of the coming of the Aryans and the culture they brought.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Protest Movement

(a) Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical culture ;

(b) Jainism and Buddhism ;

(c) Lives and teachings of the Buddha and Mahavir.

॥ বিষয়ক্রম ॥

প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণ—সামাজিক—অর্থনৈতিক—ধর্মীয়—প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপ—আজীবিক আন্দোলন—মহাবীর ও জৈন ধর্ম—জৈন ধর্মমত—অবদান—বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম—বৌদ্ধ ধর্মমত—অবদান।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রতিবাদী অন্দোলন



প্রতিবাদী আন্দোলন

বৈদিক যুগের শেষভাগে এক প্রবল ধর্মীয় আন্দোলনের প্লাবন সমগ্র ভারত-ভূমিকে প্লাবিত করেছিল। লক্ষণীয় হল, ইউরোপের ধর্মীয় আন্দোলন ভারতের ধর্মীয় আন্দোলনের তুলনায় অনেক নবীন। অথচ ইউরোপ যেখানে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল ভারতবর্ষ সেখানে একই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিল কত অনায়াসে, অবলীলায়, বিপুল জন-সমর্থনকে সঙ্গে নিয়ে। এখানেই প্রকাশ ঘটেছে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি ভারত-বাসীর অকুণ্ঠ নিষ্ঠার ও নির্ভরতার।

ভারতে প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এর প্রস্তুতি চলে-ছিল দীর্ঘকালব্যাপী। সেই দীর্ঘ পশ্চাদপটকে বিশ্লেষণ করতে হয় সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।

॥ সামাজিক পটভূমিকা ॥

বৈদিক যুগেই ভারতীয় সমাজ চতুবর্ণে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশঃ সেই বিভাগ কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। সেই সামাজিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা ছিল সমাজের সর্বাপেক্ষা সুবিধাভোগী অংশ।

কিন্তু কালক্রমে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ব্রাহ্মণদের এই প্রশ্নাতীত প্রাধান্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তারাই ছিল যোদ্ধা এবং রাজশক্তি। তাদেরই প্রতিষ্ঠিত সুশৃংখল সামাজিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের নিরন্তর সুবিধাভোগ স্বাভাবিক কারণেই অনির্দিষ্টকাল মেনে নেওয়া চলে না। এই সময়ই প্রচারিত হয় উপনিষদের শিক্ষা। উপনিষদ কোথাও ব্রাহ্মণদের এই প্রাধান্য স্বীকার করে নি। ক্ষত্রিয়গণ যেন উপনিষদের শিক্ষাতেই তাদের আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি খুঁজে পেল। লক্ষণীয় হল, জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের প্রবক্তাই ছিলেন ক্ষত্রিয়।

বৈদিক ধর্মের যজ্ঞানুষ্ঠানও ব্রাহ্মণদের প্রতি ক্ষত্রিয়দের বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের অন্যতম কারণ। ক্রমশঃ এইসব যজ্ঞানুষ্ঠান এত বেশী ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছিল যে সাধারণ মানুষ তো দূরস্থান রাজন্যবর্গের পক্ষেও অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। প্রয়োজন ছিল এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের পথের সন্ধান।

বৈদিক সভ্যতা ভারতের পূর্বাঞ্চলে সম্প্রসারিত হওয়ার পরই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। আর প্রতিবাদী আন্দোলনে এই অঞ্চলই প্রথম প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। এর কারণ হল পাঞ্জাব থেকে আর্য সভ্যতা পূর্বাঞ্চলে এসে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার প্রথম দিকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলে আর্য সভ্যতার বিস্তারে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে এই সভ্যতা ধর্ম বিজয়ীর ধর্ম হিসেবে বিজিতের উপর আরোপিত হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পূর্বাঞ্চলে মানুষের মনের গভীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রাহ্য হয় নি। এই পরিস্থিতিই পূর্ব ভারতে প্রতিবাদী আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

॥ অর্থনৈতিক পটভূমিকা ॥

রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে, আর্য সমাজে নগরের উদ্ভব, কারিগরি শ্রেণীর প্রসার, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদির ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এনেছিল তাই ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আর্য সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি খুবই

তাৎপর্যপূর্ণ।[১] প্রথমতঃ লোহার ব্যবহারের ফলে কৃষি ব্যবস্থায় এসেছিল ব্যাপক পরিবর্তন। অনার্যদের দাস হিসেবে ব্যবহার করে জমির মালিকগণ প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন করতে লাগলো। এই উৎপাদন অল্প সময়েই তাদের ধনশালী করে তুললো। দ্বিতীয়তঃ কৃষির উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও প্রসার ঘটতে থাকে। লোহার ব্যাপক ব্যবহারে কর্মকার, চর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি কারিগর শ্রেণী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ রাজ্যের আকার বৃদ্ধির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। একদিকে অতিরিক্ত উৎপাদন অন্যদিকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শ্রেষ্ঠী নামে এক নতুন ধনশালী বণিক শ্রেণীর সৃষ্টি হল। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে সম্পদের স্ফীতি ঘটলো ঠিকই, কিন্তু সেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হল বিশেষ শ্রেণীর হাতে। আর নিম্নবর্ণের অধিকাংশ লোকেরা রইলো বঞ্চিত, দরিদ্র ও নিপীড়িত। তখনকার আর্যসমাজে ধনবন্টনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলই প্রতিবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। কারণ প্রথমতঃ সদ্য সম্পদশালী জমিদার ও বণিকশ্রেণী সমাজে সম্মানজনক স্থান লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে তারা নিম্নবর্ণ বলে সেই সামাজিক মর্যাদালাভে ছিল বঞ্চিত। ফলে তারা ক্রমশঃই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। দ্বিতীয়তঃ বৈদিক ধর্মে সমুদ্রযাত্রা বা বিদেশযাত্রা ছিল দূষণীয়। কিন্তু বণিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে উভয় যাত্রাই ছিল অপরিহার্য। সুতরাং তাদের প্রয়োজন ছিল কোন বিকল্প ব্যবস্থার। তৃতীয়তঃ বৈদিক ধর্মে অর্থ-লগ্নীর ব্যবসা পাপ বলে বিবেচিত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অর্থলগ্নী করতেই হত। তাই বৈদিক ধর্ম ছিল ব্যবসায়ীদের জীবিকা বিরোধী। চতুর্থতঃ বৈদিক যজ্ঞে অসংখ্য গো হত্যা করা হত। অথচ গো-ধন হল কৃষির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ফলে নিয়মিত বৈদিক যজ্ঞে যেভাবে গো-ধন নিধন করা হচ্ছিল তাতে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃই বিচলিত হয়ে উঠেছিল। পঞ্চমতঃ সমাজে ধনবন্টনের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে দরিদ্রের অবস্থার কোন পরিবর্তনই হচ্ছিল না। বরং বৈদিক ধর্মে দারিদ্র্যকে কর্মফল ভোগ বলেই বিবেচনা করা হত। কিন্তু ধর্মের নামে মানুষ তার দারিদ্র্যকে এমন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে অনিবার্য বলে দীর্ঘকাল মেনে নিতে পারে না।

॥ ধর্মীয় পটভূমিকা ॥

ওল্ডেনবার্গ বলেছেন যে বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর আগেই ভারতের চিন্তাজগতে এমন পরিবর্তন ঘটেছিল যার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশের পথ প্রস্তুত হয়।[২] কিন্তু কি সেই পরিবর্তন? কিভাবেই বা এসেছিল সেই পরিবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে আমাদের বৈদিক যুগের শেষভাগে দৃষ্টি দিতে হবে।

উপনিষদ মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন ঘটিয়েছিল। উপনিষদের শিক্ষায় ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরে মানুষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম-

১The changing features of social and economic life such as the growth of towns, expansion of the artisan class and the rapid development of trade and commerce were closely linked with changes in another spheres: that of religion and philosophical speculation.

— Romila Thapar.

২ For hundreds of years before Buddha's time, movements were in progress in Indian thought which prepared the way for Buddhism.

— Oldenburg.

ফলবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে ধর্মের নামে আড়ম্বর করে মানুষ কখনো তার কর্ম-ফলকে খণ্ডন করতে পারে না, জন্মান্তর থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। বরং জন্মান্তর থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন হল শুদ্ধ ও সুস্থ জীবনচর্যার। এছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

এই নতুন চিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন অরণ্যচারী সন্ন্যাসীগণ। সংসারত্যাগী এই সব সন্ন্যাসীগণ জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতর প্রশ্নে নিমগ্ন হতেন প্রাণের আকুল আহ্বানে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। সুতরাং লৌকিক কোন প্রভাব তাঁদের স্বাধীন মত প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। সংসারত্যাগী বলেই তাঁরা আরও বেশী সামাজিক যাগ-যজ্ঞের বিরোধী। এঁদের মুখপাত্র হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যেন এঁদের মর্মকথাই উচ্চারণ করেছেন এভাবেঃ নাবিক যেমন যাত্রী প্যারাপার করে জীবিকা অর্জনের জন্য নৌকা নির্মাণ করে, ব্রাহ্মণগণও তেমনি জীবিকা নির্বাহের তাগিদে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি নির্দেশ দেন। এই যে ভাবনা তাই যথেষ্ট বিপ্লবী। কেননা এই ভাবধারা ছিল প্রচলিত ধর্মীয় প্রথা ও প্রকরণকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়ার সামিল।

উপনিষদ জন্মান্তরবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। উপনিষদ অনুসারে জন্ম থেকে আরেক জন্মের এই যে আবর্তন তা কখনো যাগ-যজ্ঞ প্রতিহত করতে পারে না। বরং এই আবর্তন থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন সৎকর্ম, সৎ আচরণ, ধ্যান ও ভক্তি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপনিষদ বা বেদান্তই যেন বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রকৃতপক্ষে যে কোন বৃহৎ আন্দোলনের ক্ষেত্রে চিন্তাজগতের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক, ভারতের প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল বেদান্তই।

॥ প্রতিবাদী আন্দোলনের স্বরূপ ॥

প্রচলিত ধর্মীয় অবস্থা ও উপনিষদ তদানীন্তন আর্যসমাজের চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন এনেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে সাহায্য করেছিল সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। ভারতে প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন এরপর সহজেই গতিবেগ অর্জন করতে পেরেছিল। আন্দোলনের গতিপথ ছিল দ্বিমুখী। একটি হল নাস্তিকতামূলক। এই পথে বৈদিক দেবদেবী পরিত্যক্ত হয়েছিল, উপেক্ষিত হয়েছিল ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। দ্বিতীয়টি হল আস্তিকতামূলক। এ পথকে বলা যায় একেশ্বরবাদের পথ। তাই একমাত্র ভক্তিই ঈশ্বরের সন্তোষ লাভের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত।

॥ আজিবিক ধর্ম ॥

প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের নাস্তিকতাবাদী যে প্রবাহ তারই প্রবক্তা হল আজিবিক ধর্ম। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গোশাল জন্মেছিলেন সামান্য পরিবারে।

আজিবিক ধর্ম আপোসহীনভাবে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। মানুষ সৎ কাজ বা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তার অদৃষ্টের পরিবর্তন করতে পারে এই ধর্ম তা বিশ্বাস করে না। বিশ্বচরাচরের যা কিছু সবই অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। এর কোন ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। সুতরাং মানুষ তার অদৃষ্টের হাতে একান্তই অসহায়। এক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অজ্ঞান, উচ্চ ও নীচের কোন ভেদাভেদ নেই।

আজিবিক ধর্মের এই বক্তব্য স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী। এই ধর্মে সামাজিক বর্ণভেদের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শিত, কর্মফলবাদ যেভাবে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচিত তাতে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ এবং সদ্য সম্পদশালীগণ বিশেষ উৎসাহবোধ করে-

ছিলেন। তাছাড়া এই ধর্মের আপাত সারল্যও ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

কিন্তু অদৃষ্টবাদের প্রতি এমন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে এই ধর্ম সমসাময়িক সকল সমস্যার কোন যথোচিত সমাধান দিতে পারে নি। তাই তাৎক্ষণিকভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে এক প্রবল ধাক্কা দেওয়া ছাড়া প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনে আজিবিক ধর্ম অন্য কোন অবদান রাখতে পারে নি। বরং এর অসম্পূর্ণতা এবং অক্ষমতাই প্রতিবাদী আন্দোলনকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে বিকল্প পথের সন্ধান করতে বাধ্য করেছিল।

॥ জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ॥

প্রতিবাদী আন্দোলনের আস্তিকতাবাদী দ্বিতীয় যে প্রবাহ তারই ফলশ্রুতি হল জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন এই দুই ধর্ম হল প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদী হিন্দু ধর্মই। কোন সন্দেহ নেই বৈদিক ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি। উভয় ধর্মই বেদের অপৌরুষেয়তা ও দেবদেবীর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। বিরোধী চতুরাশ্রম ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথারও। আসলে উভয় ধর্মের উৎসই হল উপনিষদের চিন্তাধারা। উপনিষদের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ উভয় ধর্মকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বলা যেতে পারে বৈদিক ধর্মের যে পরিমার্জিত তাত্ত্বিক রূপলাভ করেছিল উপনিষদের দর্শনে, তারই সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ হল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম।

॥ মহাবীরের জীবন কথা ॥

জৈন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত হলেও মহাবীরের আগেও জৈন ধর্ম ছিল এই হল জৈন ধর্মশাস্ত্রের অভিমত। এই ধর্মের মোট ২৪ জন তীর্থংকর বা প্রচারক ছিলেন। মহাবীর হলেন সর্বশেষ প্রচারক। কিন্তু প্রথম ২২ জন তীর্থংকরের কোন ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থংকর পার্শ্বনাথের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

৫৪০ খৃঃ পূর্বাব্দে বিহারের বৈশালী নগরের কাছে মহাবীরের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন এক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর নেতা, মাতা ছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা। মহাবীর ক্ষত্রিয়সুলভ শিক্ষালাভ করেছিলেন। যশোদা নামে এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি এক কন্যা সন্তানের পিতাও হয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের মুক্তির উপায় অনুসন্ধানই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তিনি প্রায় তের মাস নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় মগ্ন থেকেও কোন ফল না পেয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রও ত্যাগ করেন এবং সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন। ঐ অবস্থায় আরও দীর্ঘ ১২ বছর কঠোর সাধনায় অতিবাহিত হয়। তারপর তিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেন। তিনি হন জিন্ বা জিতেন্দ্রিয়।

সত্যজ্ঞান লাভ করার পর মহাবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে, মতান্তরে ৮০ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন।

জৈন ধর্ম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত প্রসারলাভ করে। কারণ এই ধর্মে বাণিজ্যিক গুণাবলী, সততা ও মিতব্যয়িতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অহিংসার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষকশ্রেণী এই ধর্ম গ্রহণ করে নি। কেননা কৃষিকাজে অনেক কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করতে হয়। তাছাড়া জৈনধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তা কেবল ভূসম্পত্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই কারণেই জৈন ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদর লাভ করে আর

সেই সূত্রে, রোমিলা থাপার যথার্থই বলেছেন, জৈন ধর্ম ভারতের নগর সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।[৮]

॥ জৈন ধর্মমত ॥

জৈন ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে মহাবীরই এই ধর্মের একমাত্র প্রচারক নন। তাই মহাবীর তাঁর মত প্রচারে তাঁর পূর্ববর্তী প্রচারক পার্শ্বনাথের 'চতুর্যাম' বা চারটি নীতিকে গ্রহণ করেন এবং এর সঙ্গে একটি অতিরিক্ত নীতিকে তিনি যুক্ত করেন। চতুর্যাম হল, (১) অহিংসা, (২) সত্য ভাষণ, (৩) মায়ামুক্ত থাকা, (৪) চুরি না করা। আর মহাবীরের সংযোজিত নীতিটি হল ব্রহ্মচর্য পালন।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে জৈনগণ বেশী আগ্রহী নন। কিন্তু তাঁরা কর্মফলে বিশ্বাসী। কর্মফল থেকে অব্যাহতির জন্য জৈন ধর্মে ত্রিরত্নের কথা বলা হয়েছে। ত্রিরত্ন হল, সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান, সৎ আচরণ। প্রাকৃতিক জগতের সব কিছুতেই জৈন-গণ প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই এই ধর্মে অহিংসার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত। জৈনগণ বিশ্বাস করেন মানুষ তার কর্মফল দ্বারাই জীবনকে অপবিত্র করে। জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে প্রয়োজন কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস, তপস্যা ও অহিংসা। জীবনের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্নেই জৈনধর্মে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। পার্শ্ব-নাথ তাঁর অনুচরদের দেহের নিম্নাঙ্গে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করার কথা বলতেন। কিন্তু মহাবীর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকার কথা বলেছেন। তাই পার্শ্বনাথের মতাবলম্বীগণ পরি-চিত হলেন শ্বেতাম্বর বলে, আর মহাবীরের অনুচরগণ পরিচিত হলেন দিগম্বর বলে। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক তত্ত্বগত কোন পার্থক্য ছিল না। সাধারণভাবে বলা যায় জৈনগণ সাধারণ মানুষকে সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করার কথা বলতেন।

॥ জৈন ধর্মের অবদান ॥

জৈনধর্মই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার কুফল ও যাগ-যজ্ঞ প্রধান বৈদিক ধর্মকে পরিমার্জিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। জৈনধর্মের প্রভাবেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ উৎসাহ লাভ করে। সবচেয়ে বড় কথা হল, জৈনধর্মই দেশের আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বিকাশে প্রভূত সহায়তা দান করে। কারণ জৈনগণ ধর্ম-প্রচারে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের কথ্যভাষা প্রাকৃত ভাষাকে গ্রহণ করে। ফলে এই ভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পায়। এই ভাষা থেকেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন সৌরসেনী ভাষা, মারাঠী ভাষা ইত্যাদি। অপভ্রংশ ও তার ব্যাকরণ জৈনদেরই প্রথম রচনা। জৈন সাহিত্যের অজস্র পান্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত এবং গুজরাট ও রাজস্থানের জৈন মন্দিরসমূহে সংরক্ষিত। কানাড়া ভাষার বিকাশেও জৈনদের অবদান অনস্বীকার্য।

॥ গৌতম বুদ্ধের জীবন কথা ॥

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী প্রাচ্যের ধর্মীয় ইতিহাসে গভীর তাৎপর্যবহ। কারণ এই শতাব্দীতেই চীনে কন্‌ফুসিয়াস, পারস্যে জরথুস্ট্র এবং ভারতে মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। কিন্তু বৃহত্তর বিশ্বে বুদ্ধ যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অন্য কারো পক্ষেই তা সম্ভব হয় নি। এই জন্যই ব্যাশাম বুদ্ধকে ভারতের এতাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। কোশাম্বী বুদ্ধকে বিদেশের কাছে ভারতের সর্বোৎ-কৃষ্ট দান বলে উল্লেখ করেছেন।

---

৮ "Thus Jainism came to be associated with the spread of urban culture."
— Romila Thapar.

গৌতম বুদ্ধের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। কারণ অভাব নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদানের। বিভিন্ন ধর্মীয় সাহিত্যই এই বিষয়ে আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

বুদ্ধের সাংসারিক নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন উদাসীন ও ভাবুক। তাঁকে সংসারাসক্ত করতে পিতা অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁর কোন পরিবর্তন হল না। মানুষের জরা, দুঃখ, মৃত্যু তাঁকে সর্বক্ষণ আলোড়িত করে। তিনি এইসব অনিবার্যতা থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করেন। এরই মধ্যে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এবার তিনি বিচলিত হলেন। কারণ তাঁর মনে হল ক্রমশঃ তিনি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হচ্ছেন। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণকে বলা হয়েছে 'মহানিষ্ক্রমণ'।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হন। কিন্তু এতে শারীরিকভাবে শীর্ণ হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন কেবল কৃচ্ছ্রসাধন তিনি যে পথের সন্ধানী তার সন্ধান দিতে পারে না। তাই তিনি কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করে গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক স্থানে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে পুনরায় তপস্যায় বসেন। ঐভাবে ৪৯ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি দিব্যজ্ঞান বা বোধি লাভ করেন। তিনি হলেন বুদ্ধ।

এরপর বারাণসীর কাছে সারনাথে প্রথম তিনি তাঁর প্রাক্তন পাঁচ সঙ্গীর কাছে নিজ উপলব্ধির কথা প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এই ঘটনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে পরিচিত। তারপর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর বুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। শেষ পর্যন্ত ৮০ বৎসর বয়সে তিনি কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগ বৌদ্ধদের কাছে 'মহানির্বাণ' বলে চিহ্নিত।

বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাস ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এক বিপ্লব।[8] গভীর দার্শনিক তর্কজাল বিস্তার না করে সকলের বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মীয় বাণী প্রচার করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তার আবেদন ছিল অনেক আবেগময়। বিশেষ করে বর্ণপ্রথাকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধদেব সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। নারীদেরও তিনি উপেক্ষা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্ম ছিল অনেক উদার ও গণতান্ত্রিক।

অনার্যদের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক প্রভাব ছিল সর্বাধিক। মগধের অধিবাসীগণ ব্যাপকভাবে এই ধর্ম গ্রহণ করে। কারণ আর্যরা অনার্যদের প্রতি যে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করতো তাই অনার্যদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পর্কে বিরূপ করে তুলেছিল। বুদ্ধদেব এই সুযোগই গ্রহণ করেছিলেন।

তাছাড়া বুদ্ধদেবের শান্ত, বিনম্র ও অমায়িক ব্যক্তিত্বও তাঁর ধর্মমতের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। কখনো তিনি উত্তেজিত হতেন না। তাঁর সৌম্য দর্শন শ্রদ্ধা জাগ্রত করতো। ভালবাসা দিয়ে হৃদয়জয় করতেই তিনি ছিলেন তৎপর। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিল আকর্ষণীয়। দ্রুত মানুষের হৃদয়-দুয়ারে পৌঁছুতে তিনি

---

[8]This can be taken as a kind of revolution in the history of Indian religions.

— R. S. Sharma.

সাধারণের কথ্যভাষা পালিভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্মমতকে একটি সংহত রূপ দিতে তিনি সংগঠিত করেছিলেন সংঘ। এই সংঘে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। শুধু প্রবেশকারীকে বুদ্ধ, সংঘ এবং ধর্মের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ করতে হত। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে এবং স্থায়িত্বে এই সংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

॥ বৌদ্ধ ধর্মমত ॥

বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে জানতে হলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ 'ত্রিপিটকের' উপর নির্ভর করতে হয়। ত্রিপিটক অর্থাৎ তিন পিটক। যথাঃ বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক ও অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংঘজীবন সম্পর্কে বিধানাবলী হল বিনয় পিটকের আলোচ্য বিষয়। সুত্ত পিটকে আলোচিত এই ধর্মের নৈতিক দিক। আর অভিধর্ম পিটকে আছে বৌদ্ধ ধর্মের আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক বিষয়। অবশ্য তিনটি পিটকে গ্রথিত সকল বাণী যে বুদ্ধের বাণী এমন মনে করার কারণ নেই। পরবর্তীকালে তাঁর প্রধান শিষ্যদের অনেক বাণীরই অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিভিন্ন পিটকে।

বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানুষকে জীবন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথের সন্ধান। বুদ্ধদেব কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি বলতেন, মানুষকে জন্মালেই কর্ম করতে হয়। আর কর্ম করলেই তার ফল তাকে ভোগ করতে হয়। কারণ কর্ম থেকেই আসে আসক্তি, আর আসক্তি থেকেই দুঃখ। তাই মানুষ এক জন্মের পর আরেক জন্ম নিচ্ছে আর প্রতি জন্মের কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে চলেছে। তাই মানুষ যদি পুনর্জন্ম রোধ করতে পারে তাহলেই সে দুঃখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, সে লাভ করবে নির্বাণ। এই নিরবচ্ছিন্ন পরিক্রমা থেকে বুদ্ধদেব চারটি প্রধান সত্যে বা 'আর্যসত্যে' উপনীত হলেন। সেগুলি হলঃ (১) মানুষের জীবনে দুঃখ আছে। জন্মই তার দুঃখের কারণ। (২) জীবনে দুঃখ আসে কামনা, বাসনা, আসঙ্গলিপ্সা, তৃষ্ণা প্রভৃতি থেকে। (৩) মানুষ যদি এই কামনা-বাসনা ইত্যাদি ত্যাগ করতে পারে তাহলেই তার দুঃখ নিবারিত হতে পারে। (৪) দুঃখ নিবারণের জন্য সঠিক মার্গ বা পথের অনুসরণ প্রয়োজন।

কিন্তু সঠিক পথ কি? বুদ্ধদেব আটটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন, যা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। আটটি পথ হলঃ (১) সৎ বাক্য (২) সৎ কর্ম (৩) সৎ জীবন বা জীবিকা (৪) সৎ চেষ্টা (৫) সৎ চিন্তা (৬) সৎ চেতনা (৭) সৎ সংকল্প (৮) সৎ দর্শন। বুদ্ধদেব বলেন যে প্রথম তিনটি পথ অনুসরণ করলে মানুষ শুদ্ধশীল হবে। তার পরের তিনটি পালন করলে চিত্তের প্রশান্তি বা স্থিরতা আসবে। শেষের দুটিও অনুসরণ করলে মানুষ পরম জ্ঞান অর্জন করবে।

কিন্তু অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে ঠিক কি বোঝায়? ডঃ কোশাম্বী তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে সৎ বাক্য বলতে বোঝায় এমন কথা না বলা যার ফলে সমাজ বা অন্যের ক্ষতি হয়, সৎ কর্ম হল সমাজকল্যাণের কাজ করা এবং কায়মনবাক্যে অহিংসাকে পালন করা, সৎ জীবন বা জীবিকা হল অপরের ক্ষতি না করে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা, সৎ চেষ্টা বলতে বোঝায় অপরের সঙ্গে সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে আত্মোন্নতিতে উদ্যোগী হওয়া, সৎ চিন্তা হল মন থেকে কুচিন্তা দূর করা, সৎ চেতনা হল দেহে ও মনে পবিত্রতা বজায় রাখা, সৎ সংকল্প বলতে বোঝায় অপরের ক্ষতি না করে নিজ উন্নতির সংকল্প, এবং সৎ দর্শন হল সত্য, প্রেম, অহিংসাকে সর্বদা ধ্যান করা।

এই পথে জীবন চালিত করার জন্য বুদ্ধদেব মধ্য পথ অবলম্বনের কথা বলেছেন।

মধ্য পথ হল অতিরিক্ত ভোগবিলাসে নিমজ্জিত না হওয়া আবার অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র-সাধন না করা। এর সঙ্গে মনে প্রাণে অহিংসাকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অহিংস পথেই। বুদ্ধদেব সৎ আচরণের উপরও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ সৎ আচরণ দ্বারা পাঁচভাবে লাভবান হওয়া যায়। প্রথমতঃ সৎ আচরণ পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ আহরণ সম্ভব করে। দ্বিতীয়তঃ সৎ আচরণ খ্যাতি অর্জনে সহায়ক। তৃতীয়তঃ সৎ আচরণ আত্মবিশ্বাস জন্মায়। চতুর্থতঃ সৎ আচরণ মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেয়। সর্বশেষে সৎ আচরণ নির্বাণলাভে সহায়ক। এই নির্বাণই হল মুক্তি—জন্মান্তর থেকে মুক্তি কর্মফল থেকে মুক্তি এবং এই মুক্তিই মানুষের একমাত্র প্রার্থিত।

॥ বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব ও অবদান ॥

ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে চমৎকার সংগতি রক্ষা করে বৌদ্ধধর্ম, প্রকৃতপক্ষে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সব মৌলিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার যেন এক অতি বাস্তব সমাধান হিসেবে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব।

প্রথমতঃ লৌহের ব্যবহারে কৃষির দ্রুত উন্নতি এবং তারই ফলশ্রুতিতে অধিক উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি সমাজে এক নতুন বিত্তশালী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল। এই বিত্ত যেমন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান করেছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, তেমনি ধনবন্টনের ভিত্তিতে সামাজিক বৈষম্যও ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতেই বৌদ্ধধর্ম সম্পদ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। দারিদ্র্যই, হিংসা ও ঘৃণাকে উস্কে দেয়। তাই বুদ্ধদেব বলেছেন কৃষককে দিতে হবে বীজ ও অন্যান্য সুবিধা, ব্যবসায়ীকে দিতে হবে সম্পদ এবং শ্রমিককে মজুরী। দারিদ্র্য দূরীকরণে এর চেয়ে বাস্তব পন্থা আর কি হতে পারে? আবার যখন তিনি বলেন. দরিদ্র ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দান করে পরজন্মে তার পরিবর্তন করতে পারে তখন তা সমাজের অসহায় মানুষগুলোকেও এক অপার্থিব স্বস্তিবোধের সুযোগ এনে দেয়। দেখা যাচ্ছে তৎকালীন পরিবেশে বুদ্ধের এই উপদেশবাণী ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ যা সর্বস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করেছিল, প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে।

দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণবিধি প্রণয়নে বুদ্ধ আবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। ভিক্ষুদের ব্রহ্মচর্য পালন, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্জন, একান্তই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংঘবাসী সন্ন্যাসীদের নির্বাণ লাভের নিশ্চিত আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে সন্ন্যাসীদের এই জীবনধারণ পদ্ধতিই কেবলমাত্র জনগণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তুলতে পারে এবং জনগণের নৈকট্যে তাদের নিয়ে আসতে পারে। আর তা পারলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার যেমন সহজসাধ্য হয় তেমনি জনগণকে বুদ্ধ নির্দেশিত পথে জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

তৃতীয়তঃ বৌদ্ধধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল অহিংসা। অহিংসার ধর্মীয় দিক যাই থাক সেই সময়ে এর সামাজিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। বৈদিক যাগ-যজ্ঞে শেষভাগে যেভাবে পশুহত্যা বিশেষ করে গো-হত্যা চলছিল তা বন্ধ করাই ছিল সেই মুহূর্তের প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মে প্রাণীহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এক বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে।

চতুর্থতঃ প্রচলিত চতুর্বর্ণের পারস্পরিক উগ্র অধিকারবোধকে কেন্দ্র করে সমাজ জীবনে যে উত্তেজনা ক্রমশঃ সঞ্চিত হচ্ছিল, বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদের উর্ধ্বে এক নতুন

সম্প্রদায় সৃষ্টি করে সেই সামাজিক উত্তেজনার তীব্রতাকে মন্দীভূত করতে সমর্থ হয়েছিল।

পঞ্চমতঃ বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন তাঁর ধর্মকে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিমুখী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। প্রথমটি হল বৌদ্ধ ধর্মাচরণের ব্যয়ভার ছিল যৎসামান্য। অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচরণের ব্যয়বহুলতার জন্যই ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ধর্ম পরিণত হচ্ছিল আড়ম্বরে, কুক্ষিগত হচ্ছিল সম্পদশালী ব্যক্তির সামর্থে। ধর্মের এই অধঃপতন রোধে সক্ষম হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম। দ্বিতীয়টি হল ধর্মকে মানুষের বোধগম্যতায় নিয়ে আসতে বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন সাধারণ মানুষের ভাষা পালি ভাষাকে। ভাষার প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধদেব ধর্মকে মানুষের মনের দরজায় পেঁছে দিয়েছিলেন।

ষষ্ঠতঃ নারীসমাজ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু প্রগতিশীল নয়, বিস্ময়করও বটে। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সমাজে নারী আর শূদ্রে কোন পার্থক্য ছিল না। নারীসমাজকে তিনি শুধু দীক্ষিতই করেন নি, সংঘেও প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন।

সপ্তমতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় আসে বিরাট পরিবর্তন। অন্ধ বিশ্বাস নয়, যুক্তি-তর্ক দিয়ে কোন কিছুকে গ্রহণ করাই হল বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষকে যুক্তিবাদী হতে সাহায্য করে। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রগুলি রচিত হয় পালি ভাষায়। সেই সুবাদে পালি ভাষার অগ্রগতিও সহজ হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ভারতের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণার উৎস। সম্ভবতঃ ভারতে বুদ্ধদেবই প্রথম দেবতাজ্ঞানে পূজিত হন। সেই সূত্রে আরম্ভ হয় তাঁর মূর্তি নির্মাণ। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী ভারতের স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে চিত্রশিল্পে যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আজও বিশ্ববাসীকে একইভাবে সম্মোহিত করে, আবিষ্ট করে।

তা ছাড়া ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বৌদ্ধ সংস্থাগুলির ভূমিকা শুধু অগ্রগণ্যই নয়, গৌরবোজ্জ্বল। কালক্রমে বৌদ্ধ সংঘগুলি জ্ঞান-চর্চার উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই উন্নতমানের ছিল যে তা বহির্ভারতকেও জ্ঞানান্বেষণের তাগিদে আকর্ষণ করেছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার আজও সমগ্র বিশ্বে ভারতের এক উদ্ধত অহংকার।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র এক ধর্মীয় আন্দোলন নয়, ভারতের সামগ্রিক জীবন-চেতনায় এক নতুন উপলব্ধি। তাই সময়ের প্রয়োজনকে চরিতার্থ করেও বৌদ্ধধর্ম এখনো শাশ্বত মূল্যবোধের এক অবিনশ্বর মানদণ্ড। আর এ কারণেই হয়তো বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র ভারতের ভৌগোলিক পরিসীমায় আবদ্ধ থাকে নি, ব্যাপ্ত হয়েছে বিস্তৃত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশসমূহেও। এভাবেই বৌদ্ধধর্ম এক সময় রূপান্তরিত হয়েছিল ভারতীয় ধর্ম থেকে বিশ্বধর্মে।

The Age of Imperialism and Political Unification

(a) Reference to Sixteen Mahajanapadas.

(b) A bare outline of the history of the growth of the power of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of Mauryas ;

(c) History of the Maurya empire—with special reference to the periods of Chandragupta (his achievements, administration of the age as known from the account of Megasthenes and the Arthasastra of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoka (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his own Dharma, his humanitarian works, his contacts with outside world and his place in world history).

(d) Invasions of India by foreigners—

(i) Reference only to the extension of the Achaemenid empire to parts of the Indian subcontinent—Alexandar's invasion and its effects.

(ii) After the fall of the Mauryas—reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas.

(iii) Social and economic condition—with reference to agriculture, trade and industry—foreign elements in the population—contacts with the outside world—Mauryan Art.

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্য গঠন ও রাজনৈতিক ঐক্য



(e) History of the Kushana empire with special reference to the reign of Kanishka (his probable date, his conquests, limit of his empire, his patronage of Buddhism and Indian art and culture) and to India's contact with outside world in the Kushana age—cultural importance of the Kushana period in Indian History.

(f) The Satvahana empire—(i) its extent—(ii) achievements of its greatest ruler—Gautamiputra Satakarni.

(g) History of the Gupta empire—with special reference to—

(i) the periods of Samudragupta (his conquests and achievements, war against the Saka Kshatrapas—his other achievements) Chandragupta II a legendary figure.—Evidence of Fa-Hien—Kumargupta I and Skandhagupta (his success against the Huns)

(ii) causes of the downfull of the Gupta Empire—distinctive features of the Gupta culture.

॥ বিষয়ক্রম ॥

ষোড়শ মহাজনপদ—মগধের উত্থান: বিম্বিসার—অজাতশত্রু—হর্যঙ্ক বংশের অন্তিমকাল—শিশুনাগ ও শিশুনাগ বংশ—মহাপদ্মনন্দ ও নন্দ বংশ—মৌর্য বংশ: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য—চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা—চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব—বিন্দুসার—অশোক—অশোকের সাম্রাজ্যসীমা—অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার—অশোকের ধম্ম—অশোকের জনহিতকর কার্যবলী—অশোকের সঙ্গে বহির্দেশের সম্পর্ক—ইতিহাসে অশোকের স্থান—পরবর্তী মৌর্য সম্রাটগণ—ভারতে বিদেশী আক্রমণ: পারসিক অভিযান—পারসিক আক্রমণের ফল—আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ—আক্রমণের ফলাফল—ইন্দো-গ্রীকদের আক্রমণ—শক আক্রমণ—পহ্লব আক্রমণ—মৌর্য যুগের অবস্থা: সামাজিক—অর্থনৈতিক—ভারতীয় জনগোষ্ঠীতে বিদেশী সংমিশ্রণ—বহির্ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক—মৌর্য-শিল্প—কুষাণ সাম্রাজ্য: কুষাণ জাতির উৎপত্তি ও ভারতে আগমন—কুজুল কদফিসেস—বিম কদফিসেস—কনিষ্ক—কনিষ্কের শাসনকালের সময়—কনিষ্ক ও বৌদ্ধধর্ম—কনিষ্ক ও ভারতীয় সংস্কৃতি—কুষাণ যুগে বৈদেশিক সম্পর্ক—কুষাণ যুগের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব—সাতবাহন সাম্রাজ্য: গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী—গুপ্ত-সাম্রাজ্য: গুপ্ত বংশের উদ্ভব—প্রথম চন্দ্রগুপ্ত—সমুদ্রগুপ্ত—সমুদ্রগুপ্তের মূল্যায়ন—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—ফা হিয়েনের বিবরণ—কুমারগুপ্ত—স্কন্দগুপ্ত—পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ—সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—গুপ্ত সংস্কৃতি—গুপ্ত সাহিত্য—বিজ্ঞান—দর্শন—ধর্মীয় বিবর্তন—গুপ্ত শিল্পকলা।

ষোড়শ মহাজনপদ

৬০০ খৃঃ পূর্বাব্দ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট গতিপথ পেয়ে যায়। কারণ ঐ সময় উত্তর ভারত জুড়ে রাজ্য স্থাপন আরম্ভ। রাজ্যগুলির কোনটা ছিল রাজতন্ত্রী, কোনটা গণতন্ত্রী।

গণতন্ত্রী রাজ্যে যৌথ শাসনব্যবস্থা অব্যাহত থাকলেও রাজতন্ত্রী রাজ্যে রাজার ক্ষমতা ছিল ক্রমবর্ধমান। এর কারণ হল গণতন্ত্রী রাজ্যগুলির তুলনায় রাজতন্ত্রী রাজ্যগুলো ছিল বৃহদায়তন। ফলে দূরত্বের কারণে সেখানে নিয়মিত সভা বা সমিতির অধিবেশন আহ্বান সম্ভব ছিল না। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও রাজ্যগুলির শিল্প বাণিজ্য থেকেও অর্থাগম হতে লাগলো।

রাজ্যগুলির রাজনৈতিক গঠনেরও পরিবর্তন হত। যেমন কম্বোজ রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এমন ঘটনা রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে খুব কমই ঘটতো। তবে গণতন্ত্রী রাজ্যগুলির তুলনায় রাজতন্ত্রী রাজ্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে উপজাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরতার ফলে রাজতন্ত্রের অগ্রগতি দ্রুত হচ্ছিল।[১]

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় এই সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ষোলটি রাজ্য বা মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। রাজ্যগুলি হলঃ

(১) **কম্বোজ**—এই রাজ্যের অবস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গান্ধারের নিকটে। এখানে ছিল বৈদিক সংস্কৃতির কেন্দ্র। ভারতে প্রবেশ পথে আর্যগণ এখানে বসবাস করে। কিন্তু আর্যগণ ধীরে ধীরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কম্বোজের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

(২) **গন্ধার**—গন্ধার বলতে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের পাঞ্জাবকে বোঝায়। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী গান্ধারী ছিলেন এই রাজ্যেরই রাজকন্যা। সামরিক দিক থেকে এই রাজ্যের অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) **কুরু**—এই রাজ্য ছিল দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত। মহাভারতের যুগে এই রাজ্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে এই রাজ্য মগধের অন্তর্গত হয়ে যায়।

(৪) **পাঞ্চাল**—বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। মহাভারতের যুগে এই রাজ্য ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) **কাশী**—তদানীন্তন ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী রাজ্য। কাশীর রাজধানী ছিল বারাণসী। বরুণা ও অসি নামে গঙ্গার দুই শাখা নদী বারাণসীকে ঘিরে প্রবাহিত ছিল বলে ঐরূপ নামকরণ।

(৬) **কোশল**—উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই রাজ্য ছিল কাশীর প্রতিবেশী বৃহৎ সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী। অযোধ্যা, শ্রাবস্তী প্রভৃতি বিখ্যাত নগর এই রাজ্যে অবস্থিত। কোশল রাজ মহাকোশল ছিলেন মহাভারত খ্যাত ইক্ষ্বাকু বংশজাত। মহাকোশলের পর রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন ভগবান বুদ্ধের গুণমুগ্ধ ভক্ত।

(৭) **বৎস**—বর্তমান এলাহাবাদের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল এই রাজ্য। কৃষিতে এই রাজ্য ছিল খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ। এ রাজ্যের রাজা উদয়ন ছিলেন এক নাটকীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই তিনটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। যথা মহাকবি ভাসের স্বপ্ন বাসবদত্তা, হর্ষবর্ধন রচিত রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা।

১ The decline of tribal culture in combination with a growing dependence on an agrarian economy, stimulated the growth of monarchies.

—Romila Thapar

(৮) **মৎস্য**—বর্তমান রাজস্থানের জয়পুর, ভরতপুর ও আলোয়ার নিয়ে গঠিত ছিল এই রাজ্য। মহাভারতের বিখ্যাত বিরাট রাজা ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে এই রাজ্য চেদি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৯) **চেদি**—এই রাজ্য বর্তমান বুন্দেলখন্ড নিয়ে গঠিত। এই রাজ্য অতি প্রাচীন।

(১০) **সুরসেন**—বর্তমান মথুরা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এই রাজ্য। মহাভারতের যুগে এখানে যদুবংশ রাজত্ব করতো।

(১১) **অবন্তী**—এই রাজ্য মালব ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। উজ্জয়িনী এই রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত নগর।

(১২) **অঙ্গ**—বিহারের পূর্বভাগে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। মহাভারতের কর্ণ এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। রাজধানী চম্পা বৌদ্ধ সাহিত্যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর বলে বর্ণিত।

(১৩) **মগধ**—বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা নিয়ে গঠিত এই রাজ্য। আদি রাজধানী রাজগৃহ বা রাজগীর। এই রাজ্যের জমি খুবই উর্বর, অফুরন্ত খনিজ সম্পদ, জনগণ সাহসী ও পরিশ্রমী।

(১৪) **বৃজি**—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত প্রজাতন্ত্রী এই রাজ্য। মোট আটটি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে ঐ প্রজাতন্ত্র গঠিত ছিল। এমনি একটি গোষ্ঠী হল শাক্য, যে গোষ্ঠীতে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়।

(১৫) **মল্ল**—সম্ভবতঃ এই রাজ্যের অবস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায়। রাজধানী কুশীনগর। এই রাজ্যও ছিল গণতন্ত্রী।

(১৬) **অস্মক**—পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই রাজ্যের অবস্থান ছিল গোদাবরীর দক্ষিণে। এখানে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন বলে ধরা হয়।

এই ষোলটি মহজানপদের মধ্যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত রাজ্যগুলিই ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই লড়াইতে প্রাধান্য লাভ করে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। এই রাজ্যগুলিই অন্যান্য রাজ্যগুলিকে অধিকার করে নেয়। কিন্তু এই চার শক্তির মধ্যে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য আরম্ভ হয় আরেক সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত সেই সংগ্রামে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে মগধ।

॥ মগধের উত্থান ॥

॥ বিম্বিসার ॥

সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক সর্বময় শক্তি হিসেবে মগধের উত্থান এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই উত্থান সম্ভব হয়েছিল একদিকে যেমন কয়েকজন অসীম শক্তিশালী যোগ্য নেতৃত্বের সাহায্যে, অন্যদিকে তেমনি মগধের অবস্থানগত সুবিধার সুযোগে। গঙ্গার তীরে অবস্থিত মগধ ছিল খুবই উর্বরা, জন-বহুল, শস্য-শ্যামলা সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল। গঙ্গার জলধারা বেয়ে চলতো মগধের বাণিজ্য তরী। মগধের অরণ্য থেকে আসতো জাহাজ তৈরীর উপযোগী কাঠ। মগধের খনি যোগান দিত অফুরন্ত লোহা, যা দিয়ে তৈরী হত যুদ্ধাস্ত্র, কৃষি ও গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি আর বাড়তি লোহা রপ্তানি করে পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত ধন সম্পদ। এ জন্যই কৌটিল্য মগধের খনিগুলিকে মগধ সাম্রাজ্যের গর্ভগৃহ বলে বর্ণনা করেছেন।

বৌদ্ধ মহাবংশ ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বলা হয়েছে যে মগধের প্রথম বিখ্যাত রাজা বিম্বিসার ছিলেন হর্যংক বংশ জাত। বিশেষজ্ঞগণ এই মতকেই গ্রহণ করেছেন।

বিম্বিসার যখন মগধের সিংহাসনে বসেন তখন মগধ ছিল ষোড়শ মহাজনপদের

একটি জনপদমাত্র, যার পরিধি ছিল বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলায়। বিম্বিসার ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষ। মগধকে তিনি সেভাবেই গড়ে নিতে চাইলেন। তাই গ্রহণ করেছিলেন আক্রমণাত্মক নীতি।

এই নীতিকে বাস্তবায়িত করতে বিম্বিসার প্রথমেই তাঁর সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করলেন। বিম্বিসার তাঁর সম্প্রসারণবাদী নীতিকে সফল করে তুলতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি কোশলরাজ মহাকোশলের কন্যাকে বিবাহ করে বারাণসী যৌতুক হিসেবে পান। এরপর তিনি বিবাহ করেন বৈশালীর রাজকন্যাকে। গঙ্গার উত্তর তীরে বৈশালীর মিত্রতা মগধের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করলো। তিনি বিদেহর রাজকন্যা এবং পাঞ্জাবের মদ্ররাজকন্যাকেও বিবাহ করেন। এই সব বিবাহ বিম্বিসারকে তাঁর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছিল। ফলে অনেক নিশ্চিন্ত মনে দক্ষিণ-পূর্বদিকে রাজ্যকে সম্প্রসারিত করার কথা ভাববার তিনি সুযোগ পেলেন।

এই দিকে তিনি প্রথম অঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। অঙ্গরাজ্য ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই রাজ্য জয় করার ফলে শুধু মগধের সীমাই বিস্তৃত হল না, অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই সাফল্য ছিল খুব লাভজনক।

শুধু রাজ্য জয়ে নয়, রাজ্য শাসনেও বিম্বিসার যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। রোমিলা থাপার বলেছেন বিম্বিসারই হলেন প্রথম ভারতীয় রাজা যিনি সুদক্ষ প্রশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন।[২]

বিম্বিসার ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী। আবার জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪৫০ মাইল বিস্তৃত সশাসিত এবং সমৃদ্ধিশালী এক রাজ্য রেখে যান।

॥ অজাতশত্রু ॥

বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করে অজাতশত্রু সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার রাজ্যবিস্তার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। রাজধানী রাজগৃহ ছিল এমনিতেই প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত। অধিকতর সুরক্ষার জন্য অজাতশত্রু নিকটবর্তী পাটলীগ্রামে এক দুর্গ নির্মাণ করেন।

মাতুলালয় হলেও তিনি কোশল আক্রমণ করেন এবং কোশলরাজকে পরাজিত করেন। তিনি লিচ্ছবি রাজ্য আক্রমণ করলে লিচ্ছবিসহ ছত্রিশটি গণরাজ্য একত্রিত হয়। দীর্ঘ ষোল বৎসর এই যুদ্ধ চললেও শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রুই বিজয়ী হন। এই সাফল্য পূর্ব ভারতে মগধকে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করলো।

॥ হর্যঙ্ক বংশের অন্তিমকাল ॥

অজাতশত্রুর পর সিংহাসনে বসেন উদায়িন। তিনি পাটলীগ্রাম দুর্গকে পাটলীপুত্র নগরে পরিণত করেন। তাঁর সময়ে অবন্তীর সঙ্গে মগধের বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। উদায়িনের পর কয়েকজন অযোগ্য রাজা সিংহাসনে বসেন। শেষ পর্যন্ত হর্যঙ্ক বংশের শেষ রাজা দর্শক বা নাগদশককে হত্যা করে তাঁর সভাসদ শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

॥ শিশুনাগ ও শৈশুনাগ বংশ ॥

শিশুনাগ থেকেই আরম্ভ হয় শৈশুনাগ বংশের শাসন। শিশুনাগের কৃতিত্ব হল, তিনি মগধের দীর্ঘকালের প্রতিদ্বন্দ্বী অবন্তীকে পরাস্ত করেন। তিনি সম্ভবতঃ

২ Bimbisara was the earliest of Indian kings to stress the need for efficient administration.

— Romila Thapar.

বৎস রাজ্যও অধিকার করেন। পরবর্তী রাজা কালাশোকের সময় মগধ উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। রাজধানী রাজগৃহ থেকে স্থায়ীভাবে পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু কালাশোক ও তার দশপুত্র এক শূদ্রের হাতে নিহত হলে শৈশুনাগ বংশের অবসান হয়।

॥ মহাপদ্মনন্দ ও নন্দ বংশ ॥

কালাশোকের হত্যাকারী শূদ্রই হলেন মহাপদ্মনন্দ, নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন এক বিশাল সেনাবাহিনীর অধিপতি। তিনি কোশল, পাঞ্চাল, কাশী, কুরু, সুরসেন, মৈথিল, বিতিহোত্র (পশ্চিম ভারতে অবস্থিত), অস্মক, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য জয় করে এক সাম্রাজ্য গঠন করেন। তাঁর সাম্রাজ্য পাঞ্জাব থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তিনি সাম্রাজ্য সুশাসনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করেন। ডঃ নীলকান্ত শাস্ত্রীর মতে শূদ্র হলেও তাঁর কৃতিত্ব ইতিহাসে স্বীকৃত। মহাপদ্মনন্দের কৃতিত্বকে অন্যভাবে দেখেছেন ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী। তিনি বলেছেন, বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষাত্রিয়ের নেতৃত্বে ধর্মীয় আন্দোলন আর ক্ষাত্রিয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর এক শূদ্রের উত্থান—ঘটনা দুটি বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি মহাপদ্মকে উত্তর ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলে অভিহিত করেছেন।[৩]

মহাপদ্মনন্দের পর আরও আটজন রাজা রাজত্ব করেন। শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। তাঁর ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার মেটাতেই ধননন্দকে করভার বিপুলভাবে বাড়াতে হয়। ফলে সৃষ্টি হয় প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের সুযোগ নিয়েই চন্দ্রগুপ্ত ধননন্দকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দবংশের সাম্রাজ্য গঠন দেখে রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন যে ভারতীয়দের মনে উদিত হল এমন এক সাম্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনা,যার অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে কৃষি-নির্ভর।[৪]

॥ মৌর্য বংশ ॥

॥ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ॥

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ভারত মৌর্য শাসনের সূচনার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক সুস্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য হল। কারণ উপাদানের প্রাচুর্য এবং কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় ভারতের ইতিহাস রচনা এখন থেকে অনেক সহজ ও সাবলীল হল।

মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ পরিচয় সম্পর্কে নানা বিতর্ক আছে। বিষ্ণুপুরাণ, মুদ্রারাক্ষস নাটক ও কিংবদন্তীতে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্র বংশজাত বলা হয়েছে। গ্রীক ঐতিহাসিক জাস্টিন মনে করেন চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়েছিল সাধারণ বংশে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে চন্দ্রগুপ্তকে পিপ্পলীবনের ক্ষাত্রিয় মৌর্য বংশজাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই যেন চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব। প্রথমতঃ জায়মান মগধ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা ও তার সম্প্রসারণ করা, দ্বিতীয়তঃ

৩ Mahapadma is the first great historical emperor of Northern India.
—R. K. Mukherjee

৪ The possibility of an imperial structure based on an essentially agrarian economy began to germinate in the Indian mind.
—Romila Thapar

সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করা, তৃতীয়তঃ বিচ্ছিন্ন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা, চতুর্থতঃ বিচিত্র কর্ম প্রবাহকে উৎসাহিত করে ভারতীয় মানসিকতায় নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি, পঞ্চমতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করা—সব মিলিয়ে ভারতে এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তখন। প্রয়োজন ছিল সেই পরিস্থিতির সুষম সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সুযোগ্য নেতৃত্বের। সেই নেতৃত্ব নিয়েই যেন আবির্ভাব হয়েছিল চন্দ্রগুপ্তের। এবং চন্দ্রগুপ্তের পক্ষেও এটা পরম সৌভাগ্যের যে তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সমর্থন এবং পরামর্শ পেয়েছিলেন চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের।

চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করে মগধের সিংহাসন দখল করেছিলেন তার কোন সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় না। একথা ঠিক নন্দ রাজাকে পরাভূত করার মত সম্পদ তাঁর ছিল না। সুতরাং কূট-কৌশলের আশ্রয় নিশ্চয় তাঁকে নিতে হয়েছিল। ফলে নন্দ রাজাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তিনি লাভ করেন।

এরপর চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করতে অগ্রসর হন। আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সেই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব দখল করে নেন। সিন্ধুও চন্দ্রগুপ্তের অধিকার আসে। তা ছাড়া গুজরাট, মালব ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশও চন্দ্রগুপ্ত জয় করেন।

দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে নানা সাক্ষ্য প্রমাণ ঘেঁটে মনে হয় তামিলনাড়ু ও মহীশূর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্বে বঙ্গদেশ যে চন্দ্রগুপ্তের অধীনে ছিল তা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন।

রাজত্বের শেষভাগে চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসের আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। সেলুকাস ভারতে হৃত গ্রীক সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সেলুকাস সেই চেষ্টায় সফল হন নি। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তান ছেড়ে দেন। কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দেন। মেগাস্থিনিস নামে এক দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করেন। এর ফলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা পশ্চিম হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

॥ চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থা ॥

শুধু সাম্রাজ্য বিজেতা হিসেবে নয়, শাসক হিসেবেও চন্দ্রগুপ্ত অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণী এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি।

মেগাস্থিনিসকে দূত হিসেবে সেলুকাস পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়। তিনি ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইণ্ডিকা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে ঐ গ্রন্থটি আর পাওয়া যায় না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আমরা মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারি।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে যে অর্থশাস্ত্র মৌর্য শাসনের কয়েক শতাব্দী পর সংকলিত হয়। কিন্তু তা হলেও অর্থশাস্ত্র মৌর্যযুগের শাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতি সম্পর্কে জানার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপকরণ।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা যে পুরোপুরি চন্দ্রগুপ্তের সৃষ্টি তা মনে করা যায় না। কেননা তাঁর আগে মগধে একটা শাসন-কাঠামো ছিল। চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয়ই সেই কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন। কেবল প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই কাঠামোর পরিবর্তন বা পরিমার্জন করেছিলেন।

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন রাজা সকল ক্ষমতার আধার ও প্রতীক রূপে। রাষ্ট্রের প্রধান শাসক ও ধর্মরক্ষক হিসেবে রাজার কাজ ছিল প্রজাদের ধন ও প্রাণরক্ষা। এজন্য তাঁকে কর্মচারীদের সাহায্যে সারাদেশে শান্তিরক্ষা করতে হত। দেশরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রা করতে হত। যোগ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন রাজপদে নিয়োগ করতে হত। রাজা আবার ছিলেন সর্বপ্রধান বিচারক। মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন চন্দ্রগুপ্ত সারাদিন রাজসভায় বসে প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন ও বিচার করতেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মৌর্য সম্রাট ছিলেন আইন, শাসন ও বিচার সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ভিনসেন্ট স্মিথ তাই মৌর্য রাজতন্ত্রকে বাধাহীন স্বৈরতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন।

মন্ত্রিগণ ছিলেন রাজার ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। এঁরা রাজ্য শাসন নীতি, পররাষ্ট্র নীতি সকল বিষয়েই রাজাকে পরামর্শ দিতেন। কৌটিল্য নিজে এমনি এক মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীগণ ছিলেন নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং বিশ্বাসী।

রাজকার্যে সাহায্যের জন্য সম্রাট অমাত্য ও সচিব নামে কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। মেগাস্থিনিস এদের একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সব কর্মচারীদের সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হত। তাই সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস এদের একটা পৃথক জাতি বলে ভুল করেছেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে থাকতো অধ্যক্ষ। অর্থশাস্ত্রে এরকম ৩২ জন অধ্যক্ষের নাম আছে। কর্মচারীগণ নগদে বেতন পেতেন।

শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হত। প্রদেশকে বলা হত 'দেশ'। প্রদেশ বিভক্ত ছিল জেলায় বা 'বিষয়ে'। জেলা বিভক্ত ছিল জনপদে। জনপদ গঠিত হত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। সীমান্তবর্তী বা গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলির দায়িত্ব দেওয়া হত রাজপরিবারের লোকদের উপর। প্রদেশের শাসনের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ রাখতে নানা ধরনের কর্মচারী তো থাকতোই, তাছাড়া ছিল অতি সুদক্ষ এবং সুগঠিত গুপ্তচর বাহিনী, যারা সরাসরি সকল সংবাদ সম্রাটের কাছে পৌঁছে দিত।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে পাটলিপুত্র নগরশাসনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিবরণ অনুসারে ত্রিশজন সদস্য দ্বারা গঠিত ছয়টি সমিতির উল্লেখ করেছেন। সমিতিগুলি ছিল স্ব-শাসিত। ছয়টি সমিতি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতো। যথাঃ (১) শ্রমশিল্প (২) বৈদেশিকদের তদারকি (৩) জন্ম-মৃত্যুর হিসাবরক্ষা (৪) খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় পরিচালনা (৫) শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় (৬) বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রয় থেকে কর আদায়।

চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সেনাবাহিনী রাখতেন। মেগাস্থিনিস বলছেন প্রতিটি সমিতিতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ছয়টি সমিতি ছিল। এরা নৌবহর, যোগাযোগ ও সরবরাহ, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তি বিভাগগুলি পরিচালনা করতো। ব্যাশাম অবশ্য মেগাস্থিনিসের এই বিবরণ গ্রহণ করেন নি। কেননা এর সমর্থনে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

রাজ্যের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য বিস্তৃত কর ব্যবস্থা ছিল। রাজস্বের প্রধান উৎস

ছিল ভূমি রাজস্ব। রাজস্বের হার ছিল ১/৬ বা ⅙ অংশ। রাজস্ব ছিল দ্বিবিধ। ভাগ ও বলি। ভাগ হল সাধারণ কর। বলি বিশেষ কারণে সংগৃহীত কর। এছাড়া শিল্প কর, বাণিজ্য শুল্ক, চুঙ্গি কর, জল কর, খনি কর প্রভৃতি আদায় করা হত।

মেগাস্থিনিস বলেছেন কৃষকদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল, দেশে দুর্ভিক্ষ হত না। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্যবস্থাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

॥ চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব ॥

মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীক আক্রমণ থেকে ভারতভূমির রক্ষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতবর্ষকে শুধু বিদেশী আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্তই করেন নি, এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী চন্দ্রগুপ্তকে ভারতের প্রথম বৃহৎ ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বলে বর্ণনা করেছেন।

রাজ্যজয়ের মত রাজ্যশাসনেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। শুধু রাজ্যজয় নয়, সুশাসনের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ রাখাই যথার্থ কৃতিত্ব। চন্দ্রগুপ্ত এ ক্ষেত্রে চরম সাফল্য লাভ করেন।

শিল্পচর্চাতেও তাঁর অনুরাগ ছিল ঈর্ষণীয়। পাটলীপুত্রকে তিনি অসাধারণ নগরে পরিণত করেন। মেগাস্থিনিস এই নগরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

ভারতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গে সংগতিরক্ষা করেই শেষ জীবনে তিনি রাজকার্য ত্যাগ করে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। মহীশূরের শ্রাবণগোলায় তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত রাজর্ষি চন্দ্রগুপ্তে উত্তীর্ণ হলেন।

॥ বিন্দুসার ॥

চন্দ্রগুপ্তের পর ৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। এই সময় মৌর্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কিছু বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ হয়েছিল। বিন্দুসার সকল বিদ্রোহই দমন করেন। তাঁর কৃতিত্ব হল তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

॥ অশোক ॥

বিন্দুসারের পর মৌর্য সিংহাসনে বসেন বিশ্ব-বিশ্রুত অশোক। বিন্দুসারের মৃত্যু হয় ২৭৩ খৃঃ পূর্বাব্দে। অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় ২৬৯ খৃঃ পূর্বাব্দে। দুটি ঘটনার মধ্যে এই ব্যবধান কেন ঘটেছিল তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

সম্রাট হবার পর তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মত রাজ্যবিস্তার নীতিই অনুসরণ করেন। এই নীতির অনুসরণেই তাঁর রাজত্বকালের বহু আলোচিত ঘটনা কলিঙ্গ জয়ে তিনি অগ্রসর হন।

নানা ঐতিহাসিক নানাভাবে কলিঙ্গ অভিযানের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্লিনি বলেন, কলিঙ্গ একদা মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন হয়ে যায়। তাই অশোক কলিঙ্গ পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হন। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডঃ ত্রিপাঠির বক্তব্যে। ভান্ডারকার মনে করেন চোল ও কলিঙ্গ উভয়েই ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের শত্রু। বিন্দুসার যখন চোল অভিযান করেন তখন কলিঙ্গ চোলকে সাহায্য করে। তাই অশোক কলিঙ্গকে শায়েস্তা করতে প্রয়াসী হন। তিব্বতী বিবরণ থেকে অনুমান করা হয় দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের স্থলপথ ও জলপথ উভয়কে অশোক নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। স্থলপথ তাঁর অধিকারেই ছিল, জলপথ নিয়ন্ত্রণে কলিঙ্গ অভিযান তাঁর পক্ষে অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া কলিঙ্গের ক্রম-

বর্ধমান সামরিক শক্তিও সম্ভবতঃ অশোকের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোকের জয়লাভ সহজসাধ্য হয় নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় অশোকের এক শিলালিপিতে। ঐ শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে কলিঙ্গ যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়েছিল, একলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, আরও অনেক বেশী লোক প্রাণ দিয়েছিল অন্য ভাবে।

রোমিলা থাপার মগধ ও ভারতের ইতিহাসের দিক থেকে কলিঙ্গ যুদ্ধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫] অশোকের জীবনের এক মাত্র যুদ্ধে যে বিপুল ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় তাতে তিনি মানসিকভাবে গভীরভাবে বিচলিত হন। ফলে তিনি যুদ্ধজয়ের নীতি পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই অশোকের পরিবর্তনের এই সহজ যুক্তি মেনে নেন না। কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের রাজ্যশাসননীতির কোন মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল রোমিলা থাপার তা মনে করেন না। কারণ তাঁর মতে, প্রথমতঃ অনুতপ্ত অশোক কলিঙ্গ রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন নি, দ্বিতীয়তঃ যে শিলালিপিতে তিনি তাঁর অনুতাপের কথা প্রকাশ করেন তা কলিঙ্গে স্থাপন না করে অন্যত্র করেন, তৃতীয়তঃ কলিঙ্গ যুদ্ধেই প্রকৃতপক্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যের সংহতি সম্পূর্ণ হয়েছিল, আর কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই ছিল না, চতুর্থতঃ অশোক সেনাদল ভেঙ্গে দেন নি, এবং বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করেন নি। ডঃ কোশাম্বী অশোকের যুদ্ধনীতি ত্যাগের এক আর্থ-নীতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যা হল, মৌর্য সাম্রাজ্যের যে অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর সেই অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখতে প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল শান্তি ও সুস্থিরতার, তাই অশোকের যুদ্ধত্যাগ। ভাণ্ডারকর ও ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী ব্যবহারিক প্রয়োজনেই যে অশোক যুদ্ধত্যাগ করেছেন তা স্বীকার করেছেন।

কিন্তু কারণ যাই হোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তিনি অহিংসাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন।

॥ অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা ॥

অশোক তাঁর শিলালিপিতে নিজেকে মগধরাজ বলে ঘোষণা করলেও তাঁর সাম্রাজ্য ছিল প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতব্যাপী। তাঁর সাম্রাজ্যের প্রকৃত সীমা নির্দেশ করার একটি সহজ উপায় হতে পারে যে, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে যে সাম্রাজ্য পেয়েছিলেন তার সঙ্গে কলিঙ্গ রাজ্যকে যুক্ত করা। কারণ তিনি নিজে কলিঙ্গ ছাড়া অন্য কোন স্থান জয় করেন নি।

তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশ করতে অন্য এক পথও গ্রহণ করা যেতে পারে। তা হল তাঁর শিলালিপিসমূহের অবস্থান এবং শিলালিপিসমূহের বক্তব্য থেকে সীমা স্থিরীকরণ। হুলৎস্ বলেছেন যে, অশোকের সাম্রাজ্যের পরিধির মধ্যেই যেহেতু তাঁর শিলালিপিগুলির অবস্থান সেই হেতু সেই অবস্থান থেকেই তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।[৬]

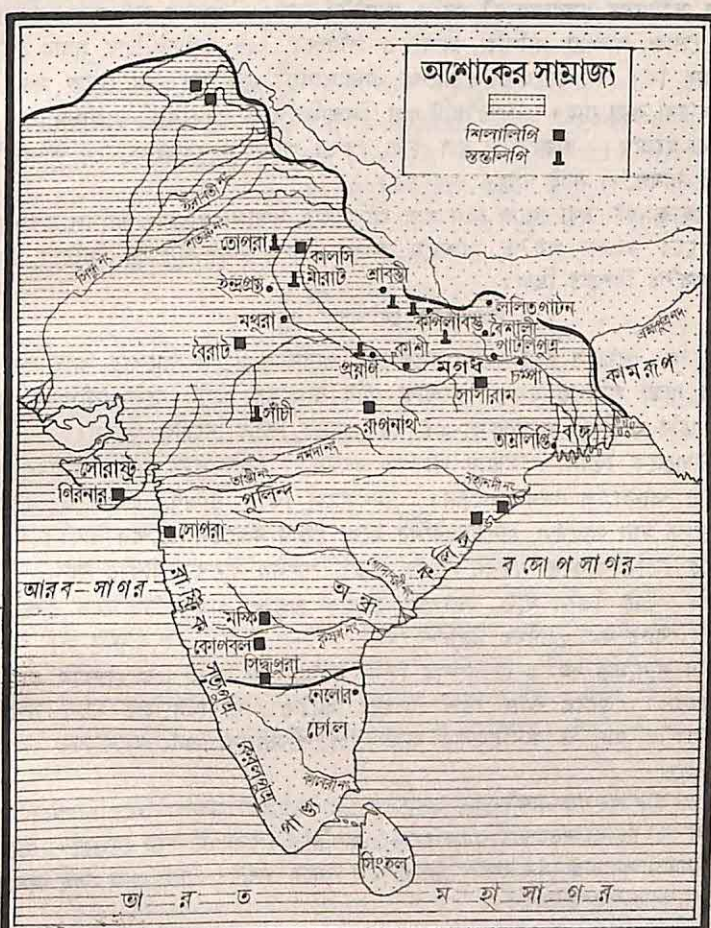
৫ The conquest of Kalinga was a great landmark in the history of Magadha and of India.

—Romila Thapar

৬ The extent of Ashoke's empire may be guessed from the distribution of the rock edicts which were engraved along the confines of his territories.

— Hultzsch

প্রথমে শিলালিপিসমূহের অবস্থান অনুসরণ করা যাক্। মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমায় কলিঙ্গের গঞ্জাম জেলায় ধৌলি ও জৌগড় গ্রামে অশোকের দুটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এটাই হল অশোকের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা। এরপরেই বঙ্গোপসাগর। লুম্বিনী ও নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমা নির্দেশ করা যায়। দেরাদুন জেলার কাকসী গ্রামে পাওয়া গিয়েছে শিলালিপি। তাই হিমালয়ের পাদদেশে এই ছিল অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা। বর্তমানে



পাকিস্তানের হাজারা জেলার মালসেরা গ্রামে এবং পেশোয়ার জেলায় শাবাজগাঁওতে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সীমা নির্দেশ করা যায়। আফগানিস্তানের জালালাবাদ ও গান্ধারের তক্ষশিলায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে বোঝা যায় উত্তর-পশ্চিমে সাম্রাজ্যের সীমা হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাথিয়াবাড়ের জুনাগড় ও মহারাষ্ট্রের সুপর্কে শিলালিপির অবস্থান থেকে বোঝা যায় পশ্চিমে সাম্রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্ধ্রের কুর্নুল ও মহীশূরের চিতল দুর্গে প্রাপ্ত শিলালিপি দক্ষিণে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি নির্দেশক। পূর্বে বঙ্গদেশে কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি। কিন্তু মহাস্থানগড় শিলালিপি এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরে

অশোকের স্তূপ ছিল বলে হিউয়েন সাং উল্লেখ করায় ধরে নেওয়া যায় বঙ্গদেশ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু কামরূপ সম্ভবতঃ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কল্হন জানিয়েছেন কাশ্মীর তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

এবার দেখা যাক্ শিলালিপিতে সাম্রাজ্যের সীমা সম্পর্কে কোন তথ্য উল্লিখিত ছিল কিনা। শিলালিপিতে দু ধরনের তথ্য উল্লেখ করা আছে। একটি হল অশোকের সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী জাতি গোষ্ঠীর নাম। এগুলি হল যবন বা গ্রীক, কম্বোজ, ভোজ, গান্ধার. রাষ্ট্রিক, অন্ধ্র ও পরিন্দ। এই জাতিগুলির সবার পরিচয় পাওয়া যায় নি। না গেলেও সীমান্তে বসবাসকারী এই সব নাম থেকে সাম্রাজ্যের সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়টি হল, শিলালিপিতে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যগুলি হল চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্বপর্নি। অবশ্য এই নামগুলি সবই দক্ষিণ ভারতের।

যাই হোক এই তথ্য থেকে বলা যায় অশোকের সাম্রাজ্য দক্ষিণে তামিল রাজ্যগুলি পর্যন্ত, পূর্বে ব্রহ্মনদ পর্যন্ত, পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়া, উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

॥ অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার ॥

এইচ. জি. ওয়েলস মনে করেন অশোকের প্রচেষ্টার ফলেই গাঙ্গেয় সমভূমির এক ধর্ম বিশ্ব ধর্মে পরিণত হয়। অশোক তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অবশিষ্ট শাসনকাল এই ধর্ম প্রচারে তিনি নিয়োগ করেন।

বিহারযাত্রাকে তিনি ধর্মযাত্রায় পরিণত করেন। সেই সূত্রে তিনি বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতি-পূত স্থানগুলি ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণকালে তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও বৃদ্ধদের অকৃপণ হস্তে দান করতেন, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন বুদ্ধের বাণী।

শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন কেবল একক চেষ্টায় বুদ্ধের বাণীর ব্যাপক প্রচার সম্ভব নয়। তাই তিনি যুত, মহাপাত্র, রাজুক প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের রাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দেন।

তাছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই তিনি ধর্মমহাপাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি, রাজকীয় দান ও জনহিতকর কাজগুলি পরিচালনা এবং অশোকের 'ধম্মে'র নীতি প্রচার।

অশোক তাঁর ধম্মের বাণীগুলি প্রচারের জন্য আরেক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সেই ব্যবস্থা হল পাহাড় বা স্তম্ভের গায়ে ধম্মের বাণীগুলি খোদাই করে দেওয়া। উদ্দেশ্য হল, জনসাধারণ সর্বদাই যেন বাণীগুলি দেখতে পারে, পড়তে পারে এবং সেই অনুসারে নিজেদের চালিত করতে পারে।

অশোক তাঁর শাসন ব্যবস্থাতেও বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ অহিংস নীতিকে প্রাধান্য দেন। যুদ্ধ জয় পরিত্যক্ত হয়। প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধ ধর্মে অধিকতর সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্মের বিতর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐক্যমতে আসার চেষ্টা করা হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ প্রচারের ব্যবস্থাও করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রসারেও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কাশ্মীর, নেপাল, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও বারাণসীতে প্রচারক পাঠিয়ে স্থানীয় বৌদ্ধদের মতপার্থক্য দূর করেন। ভারতের বাইরে পাঁচটি গ্রীক শাসিত দেশ যথা,

সিরিয়া, মিশর, কাইরেনী, ম্যাসিডন ও এপিরাসে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটান। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলেও এই ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন গ্রীকদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সম্পর্কে অশোকের দাবী রাজকীয় বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ গ্রীসদের মত আত্ম-সচেতন জাতির পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু নানা সময়ে গ্রীক-দের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের যে নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে তাতে মনে হয় অশোকের দাবী ভিত্তিহীন নাও হতে পারে।

ধর্মীয় দিক ছাড়াও অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের প্রয়াসে শিল্প ও সাহিত্যও উপকৃত হয়েছিল। স্তম্ভ ও প্রস্তর লিপির প্রয়োজনে প্রস্তর শিল্পের অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। পালিভাষা ও ব্রাহ্মী লিপির ব্যাপক প্রসার ঘটে। সারা ভারতব্যাপী ব্রাহ্মী লিপি প্রচলিত হয়। বলা যেতে পারে অশোকের এই প্রয়াসের ফলে ভারতে সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত হয়।

॥ অশোকের ধম্ম ॥

অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে তিনি আত্মনিয়োগও করেছিলেন সর্বান্তঃকরণে—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ধম্ম বলতে যা বোঝাতেন, যে আদর্শ প্রচার করেছেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের বিষয় হল বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তত্ত্বগত দিক থেকে অশোকের ধম্মের কতটা সংগতি, কতটা অসংগতি।

সংস্কৃত ধর্ম থেকে এসেছে প্রাকৃত শব্দ ধম্ম।

ধম্ম বলতে বোঝায় এমন এক আচরণবিধি যা সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে সহায়ক।[৭] মানুষের প্রতি মর্যাদা এবং মানবতাবোধই হল ধম্মের প্রাণশক্তি। তাই ধম্মের নীতিসমূহ বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক নয়, বরং ধর্ম নিরপেক্ষ, সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। ধম্ম দাঁড়িয়ে ছিল তিনটি মূল নীতির উপর। প্রথমটি হল সহনশীলতা। সহনশীলতা প্রয়োজন পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য, প্রয়োজন বিভিন্ন মতবাদের সহাবস্থানের জন্য। দ্বিতীয় নীতি হল অহিংসা। তৃতীয়টি হল জনগণের কল্যাণসাধন।

ধম্মের এই চরিত্রই পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। যেহেতু ধম্মে নেই চতুর্যামের উল্লেখ, অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বা নির্বাণের প্রসঙ্গ তাই অনেকে ধম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যবধান লক্ষ্য করেছেন। ডঃ ফ্লিট বলেছেন, ধম্ম হল রাজনৈতিক ও নৈতিক বিধি। স্মিথও বলেছেন ধম্ম কোন বিশেষ ধর্ম থেকে সৃষ্ট নয়, বরং সকল ভারতীয় ধর্মের নৈতিক ব্যাখ্যা। ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জীও এই মত সমর্থন করে বলেছেন ধম্ম কোন নির্দিষ্ট ধর্ম জাত নয়, বরং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে নৈতিক বিধি।[৮]

অন্যদিকে ভাণ্ডারকর মনে করেন গৃহীদের জন্য যে বৌদ্ধ ধর্ম তারই ভিত্তিতে গঠিত অশোকের ধম্ম। নীলকান্ত শাস্ত্রী মনে করেন শুকনো তত্ত্ব থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তোলেন অশোক তাঁর ধম্মের সাহায্যে। অধ্যাপক পাণ্ডেও

৭ Dhamma was aimed at building up an attitude of mind in which social responsibility, the behaviour of one person towards another was considered of great relevance. — Romila Thapar

৮ Dhamma is not any particular Dharma or religious system, but a moral law independent of caste or creed. —R. K. Mukherjee

মনে করেন ধম্ম বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী নয়। বরং ধম্মের মাধ্যমে অশোক বৌদ্ধ ধর্মে এক সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর চরম সাফল্য, উদ্দেশ্যের সার্থকতা।

॥ অশোকের জনহিতকর কার্যাবলী ॥

পিতাসুলভ মনোভাব নিয়েই অশোক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সকল প্রজাকেই তিনি নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। রমেশ মজুমদার বলেছেন সম্ভবতঃ অপর কোন সম্রাট রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এমন সহজ ও মহৎ ভাবে প্রকাশ করেন নি।[১]

এই মনোভাবকে বাস্তব রূপ দিতে অশোক দ্বিবিধ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। একটি হল প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অন্যটি জন-কল্যাণকামী কাজ।

প্রশাসনিক দিক থেকে রাজকর্মচারীদের নিয়মিত সরেজমিনে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রজাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও সদ্ভাব জাগ্রত করতে ধম্ম মহাপাত্র নামে পৃথক রাজ কর্মচারী তিনি নিয়োগ করেছিলেন। দান-ধ্যান ব্যবস্থা সর্বদাই অব্যাহত থাকতো। অশোক নিজেও প্রজাদের প্রয়োজনে সর্বক্ষণ তৎপর থাকতেন। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করে শাস্তি অনেক পরিমাণে তিনি হ্রাস করেন। প্রতি বৎসর তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিন অপরাধীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থাও ছিল।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রজাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাচ্ছল্য বিধানের জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, রাস্তা নির্মাণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ, সরাইখানা স্থাপন, চিকিৎসার সুবিধার জন্য ওষধি বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি।

শুধু পার্থিব জীবন নয়, প্রজাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্যও অশোকের আকুলতা কম ছিল না।

এমন কি মনুষ্যেতর জীবজন্তুর জন্যও অশোক ছিলেন গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। তাই পশুহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছিল তাঁর সাম্রাজ্যে।

বস্তুবাদী ঐতিহাসিকগণ অবশ্য অশোকের এই মনোভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে। তারা বলেছেন অশোকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা। সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই তাঁর প্রজাহিতৈষী কর্মসূচী। এর চেয়েও বড় কথা হল সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে জনগণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টির যে সম্ভাবনা ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবেই অশোক জনকল্যাণকামী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।

॥ অশোকের সঙ্গে বহির্দেশের সম্পর্ক ॥

বহির্দেশের সঙ্গে অশোকের সম্পর্কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রাক-কলিঙ্গ যুদ্ধ পর্যায় এবং কলিঙ্গ যুদ্ধোত্তর পর্যায়।

প্রাক-কলিঙ্গ যুদ্ধ পর্যায়ে অশোক আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছিলেন ভারতের অভ্যন্তরে এবং একই সঙ্গে গ্রীক রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে বন্ধুভাবাপন্ন। এই সব রাষ্ট্রের সঙ্গে দূত বিনিময় হত। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এই পর্যায়ে বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল।

কলিঙ্গ যুদ্ধোত্তর কালে অহিংস নীতির প্রভাবে অশোকের বৈদেশিক সম্পর্কের ভিত্তিই ছিল বন্ধুত্বের সম্প্রসারণ। সিরিয়া, মিশর, এপিরাস, ম্যাসিডন প্রভৃতি দেশে

১ Probably no ruler ever expressed the relation between the king and the subjects in a simpler and nobler language.

—R. C. Majumder.

তিনি ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সব দেশে তাঁর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা সংশয় আছে। সিংহল ও ব্রহ্ম দেশের সঙ্গেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভারতের অভ্যন্তরে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, তাম্র-পর্ণী প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে অশোকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই ছিল।

॥ ইতিহাসে অশোকের স্থান ॥

অশোকের প্রশস্তিকালে এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেছেন, ইতিহাসের অজস্র রাজার মধ্যে অশোক যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।[১০] তাঁর সামর্থ্যের পরিমাপ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন যে অশোকের ছিল চন্দ্রগুপ্তের উদ্যম, সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা এবং আকবরের ঔদার্য।[১১]

প্রকৃত পক্ষে সামরিক নেতা এবং শান্তির প্রবক্তা উভয় ভূমিকাতেই অশোক অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাবা যায় না, যিনি রাজনীতির কূটজালে আবদ্ধ থাকেন তিনিই আবার বৌদ্ধ ভিক্ষুর সান্নিধ্যে পরম প্রশান্তি অনুভব করেন। অশোক অহিংসার পূজারী ছিলেন তখন যখন উৎসবে-অনুষ্ঠানে, ধর্মে-রাজনীতিতে হিংসার প্রকাশই ছিল যুগধর্ম। তাঁর অসাধারণ ধর্মীয় সহনশীলতার প্রকাশ ঘটে তখন যখন ধর্মীয় অন্ধত্বই ছিল সংস্কার। অপরিমিত ক্ষমতা তিনি ভোগ করেছেন। কিন্তু ক্ষমতা তাঁকে মদমত্ত করে নি, করেছে দায়িত্বশীল। অপরিমেয় সম্পদ ছিল তাঁর কোষাগারে, অথচ তিনি যাপন করেছেন অনাড়ম্বর জীবন। জাগতিক সব কিছু সম্পর্কে যিনি গ্রহণ করে-ছিলেন নির্বিকার দৃষ্টিভঙ্গী তিনি আবার শিল্পচর্চায় উৎসাহী শুধু নন, নতুন পথের প্রদর্শকও বটে। বৈপরীত্যের এমন চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল অশোক-চরিত্রে। বিস্ময়াবিষ্ট ঐতিহাসিক তাই স্বীকার করেন অশোক ভারত ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তিত্ব।

শাসক হিসেবেও অশোক ভারতীয় সংহতির জনক বলা যেতে পারে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন প্রাচীন ভারতে এই প্রথম এক সরকারী নির্দেশ পেশোয়ার থেকে বাংলা এবং কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত অনুসৃত হত।[১২]

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ অশোকের চরিত্রের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক। অপর কোন শাসক এমন ভাবে যুদ্ধ জয়ের নীতিকে পরিত্যাগ করে হৃদয়-নীতিকে গ্রহণ করেন নি। যে বৃহত্তর বিশ্বজনীন আদর্শে এবং মহান মানবতাবাদে অশোক উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাতে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের পরিচয় আমরা অশোকের নেতৃত্বেই প্রথম পাই।

অনেকে অশোকের নীতিতে রাজনীতিগত বিচ্যুতি খুঁজে পেয়েছেন। ভাণ্ডারকর বলেছেন অশোকের নীতিই ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্নকে বিনষ্ট করেছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে অশোকের অহিংস নীতি মৌর্য সেনাবাহিনীকে হতাশাগ্রস্ত করেছিল। ফলে পতন হয়েছিল এই সাম্রাজ্যের।

---

১০ Amidst the tens of thousands of names of monarchs the name of Ashoka shines and shines almost alone a star.

—H. G. Wells.

১১ Ashoka had the energy of Chandragupta, the versatility of Samudra-gupta and the catholicity of Akbar.

—H. C. Roychudhury.

১২ A single writ of the Emperor ran from Peshwar to Bengal and from Kashmir to Mysore which never happened in Ancient India.

— R. C. Majumdar.

এই অভিযোগ তত্ত্বগত ভাবে যতটা যথার্থ মনে হয় বাস্তব ক্ষেত্রে তা নয়। কারণ অশোকের পক্ষে আর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগই ছিল না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে অশোক যদি আংশিক দায়ী হয়েও থাকেন তা হলে তা ক্ষমার্হ। কেননা যে কোন সাফল্যের তুলনায় মানবতার সাফল্য অনেক বড়।[১৩]

ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অশোকের অবদান অবিস্মরণীয়। পালি-ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপিকে সর্বভারতীয় ভাষা ও লিপিতে পরিণত করে অশোক জাতীয় সংহতিকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার স্রষ্টাও ছিলেন তিনি। বৌদ্ধ ধর্মকে স্থানীয় ধর্ম থেকে বিশ্ব ধর্মে পরিণত করেন তিনি।

ডঃ কপ্‌লস্টোন বলেছেন অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের কনস্টানটাইন, গ্রীসে বৌদ্ধ ধর্মের আলেকজাণ্ডার এবং নিঃস্বার্থ নেপোলিয়ন।[১৪] কিন্তু এ'রা কেউই অশোকের সমপংক্তির নন। কনস্টানটাইন, শার্লামেন, আলফ্রেড, জুলিয়াস সীজার, আলেক-জাণ্ডার, নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অমিত প্রতিভাশালী। কিন্তু সকল প্রতি-ভার একই ব্যক্তিতে সমন্বয় একমাত্র অশোক ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রেই ঘটে নি। আকবর নিশ্চয়ই অশোকের মতই উদার সহনশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই ঔদার্য, সহনশীলতা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অপর দিকে অশোক অশোকই।

॥ ভারতে বিদেশী আক্রমণ ॥

॥ পারসিক অভিযান ॥

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে যখন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল মগধের নেতৃত্বে ঐক্য-বদ্ধ হচ্ছিল তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ছিল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত এবং পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান। অথচ এই অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধশালী। হিন্দুকুশের গিরিপথ দিয়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করা ছিল খুবই সহজ।

এই সুযোগেই মগধের সমসাময়িক পারস্যের আকেমেনীয় রাজবংশের শাসকগণ ভারতে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ঐ রাজবংশের কাইরাস ভারত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু আকেমেনীয় বংশের তৃতীয় সম্রাট দরায়ুস ৫১৬ খৃঃ পূর্বাব্দে গন্ধার, সিন্ধু ও পাঞ্জাব জয় করেন। পরবর্তী জেরাক্সিসের সময়ে গ্রীকদের সংগে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ পারসিক বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। মনে হয় আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে পারসিক অধিকার অক্ষুণ্ন ছিল।

॥ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ॥

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে চলেছিল এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের অধিকার নিয়ে। আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকগণ শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারসিকদের পরাভূত করে। ম্যাসিডনের রাজা আলেক-জাণ্ডার এশিয়া মাইনর, ইরান ও ইরাক জয় করেন। ইরান থেকেই তিনি ভারত অভিমুখে অগ্রসর হন। হেরোডোটাস জানাচ্ছেন ভারতীয় সম্পদই সম্ভবতঃ ভারত সম্পর্কে তাঁকে আগ্রহী করেছিল। ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসাও ছিল তাঁর প্রবল। তাছাড়া একজন অসাধারণ দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবে খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর

---

১৩ It seems pardonable to feel that his failure was worth more to humanity than the success of many others.

— N. K. Sastri.

১৪ Ashoka was the Constantine of Buddhism, the Alexander with Buddhism for Hellas, an unselfish Napoleon with 'mettam' in place of 'glorie'.
— Dr. Copleston.

ছিল।

তখনকার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের পরিস্থিতি ছিল আলেকজান্ডারের পরিকল্পনার সহায়ক। সমগ্র এলাকা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাদের মধ্যে ছিল না সদ্ভাব। একে একে এই সব রাজ্য জয় করা আলেকজান্ডারের পক্ষে কণ্টকর হয় নি। কেবলমাত্র তক্ষশিলার রাজা অম্ভি এবং ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা পুরু সম্মিলিত হলে আলেকজান্ডারকে প্রতিহত করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে তা-ও সম্ভব হয় নি।

ইরান জয় করে আলেকজান্ডার কাবুলে পেঁছান। সেখান থেকে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে উপনীত হন। অম্ভি বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কেবল পুরুই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, তাহলেও তিনি পরাজিত হন। আলেকজান্ডার তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ পুরুকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। এরপর তিনি বিপাশা নদী পর্যন্ত এসে পেঁছান। ভারতের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা আলেকজান্ডারের ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত সেনাবাহিনী তাঁর ইচ্ছায় বাদ সাধলো। সম্ভবতঃ তারা মগধের নন্দবংশের সামরিক শক্তির সংবাদ পেয়েছিল। পুরুর বিরুদ্ধে তাদের সাফল্য অনায়াসলব্ধ না হওয়ায় ভারতের সামরিক শক্তি সম্পর্কে তাদের ভীতির মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং আলেকজান্ডার তাঁর ইচ্ছাকে অপূর্ণ রেখেই প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হলেন।

॥ আক্রমণের ফলাফল ॥

কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আলেকজান্ডারের আক্রমণকে প্রাচ্যে গ্রীক সভ্যতা বিস্তারের প্রয়াস বলে বর্ণনা করেন। অধ্যাপক বিউরী মনে করেন বাণিজ্যই ছিল আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য।[১৫]

কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন তা সফল হয় নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাও বিনষ্ট হয়। গ্রীসের সঙ্গে ভারতের এমন কোন বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপিত হয় নি। এমন কি ভারতীয়গণ গ্রীসের উন্নত সামরিক সংগঠন বা সমর কৌশল কোনটাই গ্রহণ করে নি। সুতরাং স্মিথের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় যে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান এক বিরাট সামরিক অভিযান মাত্র, ভারতে এর কোন স্থায়ী প্রভাব নেই।[১৬]

কিন্তু এই আক্রমণের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া উপেক্ষণীয় নয়। নানাভাবেই পরবর্তীকালে এই আক্রমণ ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে।

প্রথমতঃ আলেকজান্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছোট ছোট রাজ্যগুলির অস্তিত্ব ধ্বংস করে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যের পথই প্রশস্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগাযোগের সূচনা হয়। এই যোগাযোগের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। গ্রীক প্রভাবেই ভারতে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব। কারো কারো মতে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের

---

১৫ The Solid interests of commerce underlay the ambitions of the Macedonian conqueror.

— Bury

১৬ His campaign in effect was no more than a brilliantly successful raid on a giganatic scale which left upon India no mark.

— V. Smith

প্রাসাদ নির্মাণে গ্রীক প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। মৌর্য শাসনে কেন্দ্রীয়-করণের প্রবণতা—তাও গ্রীক প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাতেও গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক-পদ্ধতির অনুসরণে সম্ভবতঃ ভারতীয় নাটকে যবনিকার প্রথা প্রচলিত হয়। ভারতের ইতিহাস রচনায় গ্রীক রচনাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম। আবার গ্রীকরাও ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

॥ ইন্দো-গ্রীকদের আক্রমণ ॥

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল ভারতে কোন কেন্দ্রীয়শক্তি ছিল না। কিন্তু ঐ সময় মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মধ্য এশিয়া থেকে আগত অনেকগুলি রাজবংশ রাজত্ব করে।

খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে ভারতে পর পর কতগুলি বিদেশী আক্রমণ হয়েছিল। প্রথম আক্রমণকারী ব্যাকট্রিয়াতে বসবাসকারী গ্রীকগণ।

ইন্দো-গ্রীক বা ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিমে বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। শোনা যায় তারা অযোধ্যা ও পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় দুটি রাজবংশকে পাশাপাশি রাজত্ব করতে দেখা যায়। সর্বাধিক খ্যাতিমান গ্রীক শাসক ছিলেন মিনান্দার। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান শিয়ালকোটে। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

॥ শক-আক্রমণ ॥

গ্রীকদের পর শকগণ ভারত আক্রমণ করে। ভারতে তাদের অধিকৃত অঞ্চল গ্রীকদের তুলনায় বেশী বিস্তৃত ছিল। শকগণ পাঁচভাগে বিভক্ত ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে রাজত্ব করে। একটি শাখা আফগানিস্থানে, একটি পাঞ্জাবে, একটি মথুরায়, একটি পশ্চিম ভারতে এবং একটি দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে রাজত্ব করতো।

ভারতে প্রবেশ পথে শকগণ বিশেষ কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নি। কেবল ৫৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ উজ্জয়িনীর এক রাজা শকদের বিতাড়িত করে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

॥ পহ্লব আক্রমণ ॥

শকদের পর ভারতে আসে পার্থিনিয়ানগণ। সংস্কৃতে এরা পহ্লব বলে উল্লিখিত। শক ও গ্রীকদের তুলনায় ভারতে এদের প্রাধান্য ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সংকীর্ণ সীমানায় সীমাবদ্ধ। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পহ্লব রাজা হলেন গণ্ডোফারনেস। তাঁর শাসনকালে সেন্ট টমাস ভারতে এসেছিলেন খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। শকদের মত পহ্লবগণও কালক্রমে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

॥ মৌর্যযুগের অবস্থা ॥

॥ সামাজিক ॥

ভারতের সামাজিক কাঠামো জাতিভেদ প্রথার উপর নির্ভরশীল। মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণীতে সমাজে সাতটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনা চতুর্বর্ণের সঙ্গে মেলে না। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হল বৃত্তি ভিত্তিক। তাই অনুমান করা হয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং গ্রীক আক্রমণের ফলে মৌর্য যুগে জাতিভেদ প্রথা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। সাতবাহন রাজারা যে শক-রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তা থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই মেগাস্থিনিস ভারতের বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ডঃ কোশাম্বী মনে করেন যে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা হ্রাসের ফলে সমাজ জীবনে শৈথিল্য আসে। তা থেকে সমাজকে রক্ষা

করতেই অর্থশাস্ত্রে কঠোর দণ্ডবিধির কথা বলা হয়েছে। অশোক সমাজে যে সংঘাতের কথা বলেছেন তা সম্ভবতঃ নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস। বিশেষ করে বৈশ্য সম্প্রদায় যখন ধনসম্পদ অর্জন করে সামাজিক মর্যাদালাভে অতিশয় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল তখন সামাজিক সংঘাত স্বাভাবিকই ছিল।

মেগাস্থিনিস ভারতে দাস প্রথা ছিল না বলে লিখেছেন। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে ও অশোকের শিলালিপিতে দাসপ্রথার অস্তিত্ব স্বীকৃত। আসলে ভারতে দাসরা ছিল গৃহদাস। তাই মেগাস্থিনিস এদের অস্তিত্ব টের পান নি। সাধারণতঃ যুদ্ধবন্দীরাই গৃহদাসে পরিণত হত। অর্থশাস্ত্রে দাসদের নানা অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

মৌর্য যুগে চার প্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহ এবং চাররকম অশাস্ত্রীয় বিবাহের প্রচলন ছিল। মেগাস্থিনিস বলেছেন বিবাহ নিজ সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পুরুষেরা বহুবিবাহ করতো। সমাজে নারীর বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না। গ্রীক লেখকদের মতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীদের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করা হত।

তখন সংস্কৃত ভাষা ছিল উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার বাহন। পাঞ্চাল, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী ও বারাণসী ছিল তখনকার বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। ব্যাকরণ ছাড়া চিকিৎসা-শাস্ত্র লোকে শিখতো।

মৌর্য যুগে বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ মৌর্য সম্রাটগণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করতেন।

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তারা ছিল সৎ ও পরিশ্রমী। দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায় ছিলই না। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল চাল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। ধনী ও দরিদ্রের পোশাকে স্বভাবতঃই পার্থক্য ছিল। ধনীরা মূল্যবান পোশাক পরতো। অর্থশালী লোকেরা সাধারণতঃ শহরে বাস করতো। তারা ছিল বিলাসী ও আরাম প্রিয়। অন্যান্য লোকেরা বাস করতো জনপদে।

॥ অর্থনৈতিক ॥

মৌর্য সম্রাটদের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল ভূমি রাজস্ব। মেগাস্থিনিস জানাচ্ছেন ভারতে রাজাই ছিলেন সকল জমির মালিক। জার্মাণ গবেষক ব্রেলারও এই মত সমর্থন করেছেন।[১৭] কিন্তু ডঃ ইউ. এন. ঘোষালের মতে তখন জমি ছিল দুই প্রকারের। (১) কৃষকের বংশানুক্রমিক মালিকানার জমি। এই জমির জন্য কৃষক রাজাকে ফসলের ১/৬ অংশ কর দিত। (২) সীতা জমি অর্থাৎ যে জমির উপর রাজার মালিকানা। কৃষক ১/২ অংশ ফসল পাওয়ার সর্তে এই জমি চাষ করতো। ডঃ কোশাম্বী ডঃ ঘোষালের মতই সমর্থন করেছেন।

ভূমি রাজস্ব ছিল দুই ধরনের। এক, ভাগ অর্থাৎ কৃষকের মালিকানাধীন জমির জন্য রাজা যে কর নিতেন। দুই, বলি অর্থাৎ ভূমি রাজস্বের অতিরিক্ত কর। এছাড়া ছিল জলকর।

ভূমি রাজস্ব ছাড়া রাষ্ট্রের আয়ের অন্যান্য উৎস হলঃ (ক) বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত কর (খ) বাণিজ্য শুল্ক, (গ) চুঙ্গিকর, (ঘ) খনি, বন, মাছের ভেরী থেকে আদায়ীকৃত কর, (ঙ) পেশা কর, (চ) জিনিষপত্রের উপর সরকারী শুল্ক।

১৭ State ownership of land was an axiom of ancient Indian Public law. —Brelar.

মেগাস্থিনিস বলেছেন এই সময় কৃষকদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হয়তো তা ছিল না। কারণ মেগাস্থিনিস বলেছেন দেশে দুর্ভিক্ষ হত না। অথচ অর্থশাস্ত্রে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক ব্যবস্থাবলী বর্ণিত।

পশুপালন ছিল মৌর্য যুগে একটি অন্যতম জীবিকা। রাজার পতিত জমি গোচারণ ক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হত।

এই যুগে হস্তশিল্পের ব্যাপক প্রসার হয়েছিল। হস্তশিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল লোহা, কাঠ, চামড়া, মাটি, বাঁশ ও পাথরের শিল্প। সোনা ও রূপার অলংকার শিল্পেও চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বয়ন শিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল এই সময়। বাংলা, কর্ণাটক, কাশী ও কোংকন ছিল দেশের প্রধান প্রধান বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র।

এই সময় দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপিত হয়েছিল, ছিল শান্তি ও শৃংখলা, উন্নতি হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার। ফলে স্বভাবতঃই শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। জিনিসপত্রের চাহিদাও বেড়েছিল অনেক। শিল্প-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ ও অধিকতর লাভজনক করতে শিল্পীরা বিভিন্ন শিল্পে সংঘ গড়তো—এমন তথ্যও পাওয়া যায়।

বাণিজ্য চলতো যেমন স্থলপথ ও জলপথে, তেমনি ছিল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য। শ্রাবস্তি থেকে মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, শ্রাবস্তি থেকে বিহারের রাজগৃহ, পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত এবং পাটলিপুত্র থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত রাজপথ ছিল। এই রাজপথগুলো ধরেই চলতো অন্তর্বাণিজ্য।

বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তক্ষশিলা ছিল স্থলপথের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। তক্ষশিলা থেকে ভারতীয় পণ্য, ব্যাকট্রিয়া হয়ে কাস্পিয়ান ও ককেশাস দিয়ে ইউরোপ পৌঁছে যেত। আবার তক্ষশিলা থেকেই কাবুল, কান্দাহার, পারস্য হয়ে পশ্চিম এশিয়ায় মাল যেত। জলপথে বিখ্যাত বাণিজ্যিক বন্দরগুলি হল গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ, মহারাষ্ট্রের সোপারা, কল্যাণ ও বাংলার তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলতো।

মৌর্য যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সহজ হয়েছিল। স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল সুবর্ণ ও নিবক। রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হত পান ও থাবক। তাম্র মুদ্রাকে বলা হত কার্ষাপণ।

এই সময় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগতির ফলে এক নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কৃষির সাহায্যে যারা সমাজে অর্থ, জমি ও প্রতিপত্তি ভোগ করতো তাদের বলা হত গহপতি। বাণিজ্যের দ্বারা যারা সম্পদশালী হত তাদের বলা হত শ্রেষ্ঠী। এরা এত বেশী অর্থশালী হয়ে ওঠে যে পরে বিভিন্ন খাতে মূলধন খাটিয়ে এরা মহাজনী ব্যবসা আরম্ভ করে। এইভাবে মৌর্য যুগেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয়।

॥ ভারতীয় জন-গোষ্ঠীতে বিদেশী সংমিশ্রণ ॥

মৌর্য পরবর্তী যুগে ব্যাকট্রীয়, শক, পার্থিয়ান ও কুষাণ জাতির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতে এক ভিন্ন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই সব বিদেশীগণ উন্নত ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করে ভারতীয় মহাজাতিতে সম্মিলিত হয়। সম্মিলিত হলেও এই সব বিদেশীদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবিকৃত থেকে যায়। যেমন রাজপুত জাতির মধ্যে শক ও হূণ জাতির প্রভাব নৃতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন। আবার বিদেশীদেরও অনেক আচার পদ্ধতি ভারতীয় সমাজে গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে এভাবেই তো সমন্বয় ঘটে। অস্বীকার করা যায় না বিদেশীদের শৌর্যের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনে ভারতীয়গণ এক নতুন প্রাণশক্তি লাভ করেছিল।

ভারতীয় সমাজ বর্ণ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিদেশীদের স্থায়ীভাবে এদেশে অবস্থানের ফলে জাতিভেদ প্রথায় এক নতুন সংকট সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীলগণ নিজস্বতা রক্ষার তাগিদে সামাজিক বিধিনিষেধ আরো কঠোরভাবে আরোপ করতে উদ্যোগী হয়। তাই রচিত হয় মনুর বিধান। কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির মৌল চরিত্র যেখানে সমন্বয়বাদ সেখানে রক্ষণশীলগণ তাদের স্থবির ধারণাকে টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। তাই কালক্রমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিদেশীগণও ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হন। রক্ষণশীলগণ তখনো তাদের পতিত ক্ষত্রিয় বলে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু যাই চান না কেন বিদেশীদের আগমণ ভারতের বর্ণপ্রথার উপর যে এক প্রচণ্ড আঘাত তা অস্বীকার করা যায় না।

॥ বহির্ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ॥

মৌর্যোত্তর যুগে বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অভারতীয় রাজাদের সহায়তায় ব্যবসা সম্প্রসারিত হল অজানা নতুন অঞ্চলে। ভারতীয় গ্রীক রাজারা পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন। শক, পার্থিয়ান ও কুশানদের শাসনকালে মধ্য এশিয়া যুক্ত হল এবং সেই সূত্রে চীনও। মশলা ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যে রোমানদের আগ্রহ ভারতীয় বণিকদের নিয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং রোমান বণিকদের নিয়ে এল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে।

রোমানদের অর্থনৈতিক প্রভাব দক্ষিণ ভারতেই সবচেয়ে বেশী অনুভূত হলেও গ্রীক-রোমান চিন্তা ও শিল্পের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল উত্তর ভারতেই বেশী। পণ্য বিনিময়ের সূত্রে এল ভাব বিনিময়। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও শিল্পকর্মের মধ্যে এই বিনিময় প্রয়াস লক্ষণীয়। গ্রীকদের কাছে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছিল। কারণ এই ধর্মের সাহায্যে ভারতীয় জনগণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ছিল যতখানি বর্ণ-প্রথা দ্বারা আবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাহায্যে তা ছিল না। গ্রীক সূত্রেই ভরাতীয় উপকথা ও লোককথা পশ্চিমী জগতে উপনীত হয় এবং তারপর বিভিন্ন ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচারিত হয়।

গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের ফলেই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন পুঁথি পড়ে ভারতের ব্যাপক উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, স্ট্রাবোর ভূগোল, আরিয়ানের ইণ্ডিকা, প্লিনির ইতিহাস, টলেমির ভূগোল ইত্যাদি। সর্বাধিক প্রভাব দেখা গেল শিল্পক্ষেত্রে। ইন্দো-গ্রীক ধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে গান্ধার শিল্প। এই শিল্পের সূচনা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক-রোমান শিল্পরীতি থেকে।

সমসাময়িক ভারতীয় চেতনা প্রভাবিত করেছিল পশ্চিম এশিয়াকেও। এই প্রভাব স্পষ্টতঃই অনুভূত হয় ম্যানিকিয়ান, নস্টিক্স ও নয়া প্লেটোবাদীদের মতবাদে। তাই দেখা যায় যীশুর জীবনের কোনো কোনো ঘটনার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনকেও মিলিয়ে দেওয়া হল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধধর্মও প্রভাবিত হয়েছিল পারস্যের জরথুস্ট্র মতবাদের দ্বারা। ভারতীয় ধর্মের কয়েকটি আচার পাশ্চাত্য জগতেও খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, কঠোর তপশ্চর্যা, স্মৃতিচিহ্ন উপাসনা, জপমালার ব্যবহার।

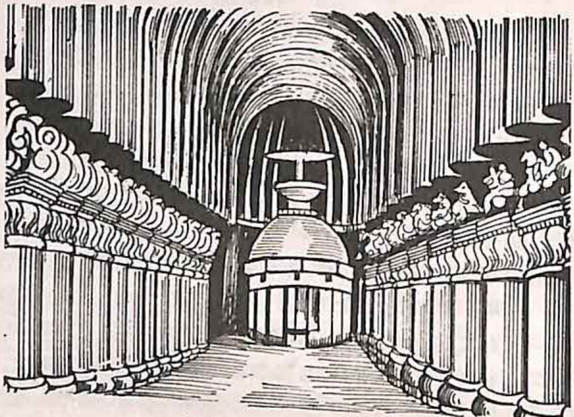
প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলেই চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আবার চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কেননা ঐ পথেই চীনে যেতে হত। ব্রহ্মদেশ, জাভা, কাম্বোডিয়ায় এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়।

॥ মৌর্য শিল্প ॥

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মৌর্য যুগ এক অবিনশ্বর অধ্যায়। এই সময় শিল্প-স্থাপত্যে অসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। ডঃ শাস্ত্রী বলেছেন যে, স্থাপত্য ও শিল্পে মৌর্য যুগ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।[১৮] ডঃ কোশাম্বী সিন্ধু সভ্যতাকে স্মরণে রেখেও বলেছেন যে, ভারত-সংস্কৃতির মহামূল্যবান অঙ্গ শিল্প-স্থাপত্য প্রকৃত-পক্ষে অশোকের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে।[১৯] মৌর্যশিল্পের নিদর্শনগুলি হল স্তূপ, স্তম্ভ, গুহা, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য।



অশোক স্তম্ভ



চৈত্যগৃহ (মৌর্য যুগ)

স্তূপ নির্মিত হত সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য। বিখ্যাত সাঁচীর স্তূপ অশোকের পরে নির্মিত হলেও সেখানে মৌর্য শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট।

অশোকের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর নির্মিত স্তম্ভগুলি। তিনিই প্রথম পাথর খোদাই করে স্তম্ভ তৈরী আরম্ভ করেন। স্তম্ভগুলি ছিল দীর্ঘ এবং শীর্ষে নানারকমের সাজসজ্জা সম্বলিত। ঘন্টার আকারের বা উল্টানো পদ্ম, অথবা সিংহ-মূর্তি শীর্ষে শোভা পেত। চূড়াগুলি আলাদা তৈরী করে তারপর স্তম্ভের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হত। স্তম্ভগুলি কিন্তু কোন গৃহ বা প্রাসাদের অংশ হিসেবে নির্মিত হয় নি। স্তম্ভগুলির নির্মাণশৈলীতে বিস্মিত ডঃ স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে এগুলি মসৃণ করার কাজ এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে মনে হয় আধুনিক সময়েও বোধহয় এতটা মসৃণ করা সম্ভব না।[২০] সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ হল গৌরিয়া নন্দরগড় স্তম্ভ। সারনাথের সিংহ শীর্ষ স্তম্ভ তো খুবই বিখ্যাত। এই স্তম্ভের শীর্ষই স্বাধীন

১৮ In architecture and art the age of the Maurya constituted a notable epoch.
— Dr. Sastri.

১৯ Indian art and architecture, not the least valuable part of Indian culture may be said to begin from Ashoka in spite of Indus valley civilisation.
— Dr. Kosambi.

২০ The art of polishing was carried to such perfection that it is said to have become a lost art beyond modern powers.
— Dr. Smith.

ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসেবে গৃহীত। মার্শাল বলেছেন শীর্ষে অবস্থিত সিংহ-মূর্তিগুলি হল প্রভুত্বব্যঞ্জক শক্তির প্রকাশ। ডঃ স্মিথ প্রাচীন পৃথিবীর কোথাও পশু মূর্তি নির্মাণে এর চেয়ে বেশী দক্ষতা দেখতে পান নি।[২১]

পাহাড় কেটে গুহা নির্মাণ কৌশলে মৌর্য যুগ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। গুহাগুলি সন্ন্যাসীদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত। গয়ার কাছে বারবার গুহা, সুদাম গুহা, নাগার্জুনি গুহা প্রভৃতি অশোকের গুহা শিল্পের চমৎকার নিদর্শন।

মেগাস্থিনিস পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই প্রাসাদ ছিল কাষ্ঠনির্মিত। ফলে এর ধ্বংসাবশেষও আজ অবশিষ্ট নেই। বহু পরে ফা-হিয়েন অশোকের রাজপ্রাসাদের নির্মাণ শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ভরা মন্তব্য করেছিলেন যে এমন প্রাসাদ সম্ভবতঃ কোন মানুষের নির্মিত নয়।[২২]

মৃৎশিল্পেও মৌর্য যুগের উৎকর্ষতা প্রমাণিত। কাল রং-এর পালিশ করা উত্তর ভারতের মৃৎপাত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকেই এই শিল্পে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

মৌর্য যুগের মুদ্রা নির্মাণেও ছিল গ্রীক প্রভাব। কোন কোন মুদ্রায় থাকতো সূর্যের চিহ্ন, যা সার্বভৌমত্বের অথবা চাঁদের চিহ্ন যা মৌর্য বংশের প্রতীক বলে ডঃ কোশাম্বী মত প্রকাশ করেছেন। তখনকার মুদ্রায় রাজার নাম বা সন-তারিখ উল্লেখ করা থাকতো না।

ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার বলেছেন, সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখল পরিবেশে এবং লোকের বিলাসপ্রিয়তায় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়।[২৩] এই পরিস্থিতিই ছিল মৌর্য যুগে, তাই ত্বরান্বিত হয়েছিল শৈল্পিক অগ্রগতি। মৌর্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল, প্রথমতঃ পাথরের চমৎকার ও সুনিপুণ ব্যবহার। দ্বিতীয়তঃ শিল্পের ধর্মীয় ভিত্তি। ভারতে অবশ্য সব সময়ই ধর্মকে ভিত্তি করে শিল্পের বিকাশ হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়কেই শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ জীবনের যা কিছু উপভোগ্য তাকেও একই সঙ্গে শিল্পে স্থান দেওয়া হয়েছে মৌর্য যুগে। প্রাসাদ ইত্যাদির নির্মাণ কৌশলে ও সূক্ষ্মতায় এই সত্যই প্রকাশিত।

এখন প্রশ্ন হলো মৌর্য শিল্পে বিদেশী প্রভাব কতটুকু। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। মার্শাল বলেছেন, মৌর্য ভাস্কর্যে একই সঙ্গে দুটি ধারা বহমান। একটি ধারা সম্পূর্ণ ভারতীয় যার প্রকাশ ঘটেছে পারখাম শৈলীর মূর্তিতে। দ্বিতীয়টি হল পারসিক ও গ্রীক প্রভাব যার বহিঃপ্রকাশ হল সারনাথ স্তম্ভ। অনেকে পাটলীপুত্রের কাঠের রাজপ্রাসাদ নির্মাণে পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তাদের মত হল অশোকের প্রাসাদও পারসিক সম্রাট দরায়ুসের প্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত। অশোকের স্তম্ভলিপিও নাকি পারসিক অনুকরণ। এমন কি সারনাথের স্তম্ভ চূড়ায় নির্মিত ঘন্টার অনুকরণও নাকি পারসিক ভাস্কর্যের অনুকরণ।

[২১] It is difficult to find in any country an example of ancient animal sculpture superior to or even equal to this beautiful work of art.
— Dr. Smith.

[২২] No human hands of this world could accomplish this.
—FaHien.

[২৩] A life of ease and luxury is favourite for the growth of art and literature and the period under review witnessed remarkable progress of both.
— R. C. Majumdar.

কিন্তু ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ হ্যাভেল এই মত স্বীকার করেন না। তাঁর অভিমত হল মৌর্য শিল্পে আর্য ও অনার্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। সারনাথের স্তম্ভচূড়ায় যাকে ঘণ্টা বলা হয় তা হল প্রকৃতপক্ষে উল্টানো পদ্ম, যা হল ভগবান বিষ্ণুর নীল পদ্মের প্রতীক। পারসিক স্তম্ভগুলি নির্মিত হত কোন অট্টালিকার অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু অশোকের স্তম্ভগুলি একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই পারসিক স্তম্ভগুলির পৃথক কোন ব্যবহার ছিল না। কিন্তু অশোকের স্তম্ভগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত ও ব্যবহৃত।

সুতরাং বলা যায় বিদেশী রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও মৌর্য শিল্প ছিল সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক উন্নত। বরং বিদেশী রীতি ও পদ্ধতিকে গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পী তাকে এমনভাবে আত্মস্থ করেছিল যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ভারতীয় শিল্পের জন্ম হয়েছিল মৌর্য যুগে।

॥ কুষাণ সাম্রাজ্য ॥

॥ কুষাণ জাতির উৎপত্তি ও ভারতে আগমন ॥

চীনা ঐতিহাসিক সুমা-শিয়েন ও পান-কুর রচনা থেকে জানা যায় কুষাণরা ছিল যাযাবর ইউচি জাতির শাখা। ইউচিগণ প্রথমে পশ্চিম চীনে বাস করত। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা আরো পশ্চিমে ইসিককুল হ্রদের তীরে উপনীত হয়।

এখান থেকে ইউচিদের একটি শাখা দক্ষিণদিকে যাত্রা করে। কিন্তু মূল শাখা আরো পশ্চিমে শিরদরিয়া উপত্যকায় এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে তারা আরো অগ্রসর হয়ে শকদের বিতাড়িত করে ব্যাকট্রিয়া দখল করে।

ব্যাকট্রিয়াতে বসবাসকালেই ইউচিগণ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে। কিন্তু তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে তারা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। পরে খৃঃ পূঃ ৩০ অব্দ নাগাদ এই পাঁচটি শাখার একটি শাখা কুষাণ শাখার নেতা কুজুল কদফিসেস ইউচি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং কুষাণ রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

॥ কুজুল কদফিসেস ॥

ইউচি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পর কুজুল পার্থিয়া, কাবুল, পেশোয়ার ও কাশ্মীর জয় করেন। তিনি ভারতের আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি। তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ জয় করে নেন। তিনি দীর্ঘ আশি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর কিছু মুদ্রায় তাঁকে 'সত্যধর্মাসম্থিত' বলা হয়েছে। এর থেকে ধারণা হয় তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

॥ বিম কদফিসেস ॥

কুজুল কদফিসেসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিম কদফিসেস সিংহাসনে বসেন। স্টেন কোনোর মতে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিম কদফিসেস সিংহাসনে বসেন এবং সেই সন থেকে শকাব্দ প্রবর্তন করেন। কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী বলেন শকাব্দ সম্ভবতঃ কনিষ্ক প্রবর্তন করেছিলেন।

বিম তক্ষশিলা ও পাঞ্জাব জয় করেছিলেন। নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। মথুরায় পাওয়া গিয়েছে তাঁর মূর্তি। এর থেকে মনে হয় ঐ দুই অঞ্চলও তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চৈনিক ঐতিহাসিক ক্যান ইর মতে বিম কদফিসেসই প্রথম কুষাণ যিনি ভারত জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্য এশিয়ার তুর্কীস্থান থেকে গঙ্গার উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তাঁর শাসনকালে চীন ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল। রোমিলা থাপার বলেছেন যে রোমান স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে বিম স্বর্ণমুদ্রা প্রব-

র্তন করায় বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

॥ কনিষ্ক ॥

দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল বিম কদফিসেসের পর কুষাণ সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। কনিষ্ক ক্ষমতায় এসে সেই ভাঙন রোধ করেন এবং সাম্রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। মনে করা হত, কনিষ্ক বিম কদফিসেস বংশজাত ছিলেন না, তিনি কুষাণ সাম্রাজ্যে এক ভিন্ন বংশের শাসনের সূচনা করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে এই ধারণা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মনে করা হয় কনিষ্ক কোন ভিন্ন বংশজাত ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিম কদফিসেসেরই উত্তরাধিকারী।

স্বভাবতঃই সে ক্ষেত্রে কনিষ্ক উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। কিন্তু কনিষ্ক সেই সাম্রাজ্যের সীমা আরও বিস্তৃত করেন। তাঁর শিলালিপি, মুদ্রা ও চৈনিক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গান্ধার তাঁর অধিকারে ছিল। পূর্ব ভারতে সারনাথ, বারাণসী, অযোধ্যা ও মথুরা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অনেকে মনে করেন পাটলিপুত্র, পশ্চিমবাংলা এমন কি উড়িষ্যাও তাঁর অধিকারে ছিল। পশ্চিম-ভারতে শক অধিকৃত মালব সৌরাষ্ট্র তিনি দখল করতে পেরেছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মধ্য ভারতে সাঁচী প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তরে কাশ্মীর তাঁর দখলে ছিল। সামগ্রিকভাবে ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর যে রাজ্য-সীমা সুনিশ্চিতভাবে স্থির করা যায় তা হল পূর্বে বারাণসী ও সারনাথ, পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা, দক্ষিণে সাঁচী ও উত্তরে কাশ্মীর।



কণিষ্কের মুদ্রা

ভারতের বাইরে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি সম্পর্কে বলা যায় যে তাঁর অধিকারে ছিল ব্যাকট্রিয়া, কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ, পামীর অঞ্চল ও চীনা তুর্কীস্থানে কিছু অংশ এবং প্রায় সমগ্র আফগানিস্থান। তা হলে অক্ষ নদীর উপত্যকা থেকে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর এই সাম্রাজ্যে সমবেত হয়ে ছিল নানা ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী। তাই তিনি ক্ষত্রপ বা স্থানীয় শাসনকর্তাদের সাহায্যেই দেশ শাসন করা অনেক যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন।

॥ কনিষ্কের শাসনকালের সময় ॥

কনিষ্কের শাসনকাল ঠিক কখন থেকে আরম্ভ হয় তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য। কনিষ্কের সময়ের যে সব লিপি ও মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যা নিয়েও মতবিরোধ থাকায় কনিষ্কের শাসনকালের সময় নির্ণয় আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

ফ্লিট, ক্যানিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন কনিষ্ক যে অব্দ প্রবর্তন করেন তার আরম্ভ ৫৮ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে। এই মত মেনে নিলে দেখা যায় কনিষ্ক ছিলেন বিম কদফিসেসের পূর্ববর্তী। কিন্তু অন্যত্র দেখা যাচ্ছে কনিষ্ক সারনাথ অবধি অধিকার করেছিলেন। অথচ বিম কদফিসেসের রাজ্যসীমা গান্ধার পর্যন্ত যে ছিল তা স্বীকৃত। তাহলে কনিষ্ক কিছুতেই বিমের পূর্ববর্তী হতে পারেন না। তাছাড়া কুজুল ও বিম কদফিসেসের মুদ্রায় যেখানে শক প্রভাব সেখানে কনিষ্কের মুদ্রায় রোমান প্রভাব। তদুপরি তক্ষশিলায় খননকার্যে কনিষ্কের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে মাটির উপরের স্তরে, আর

কদফিসেসের মুদ্রা মাটির নীচের স্তরে। সুতরাং এই সব তথ্য থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে কনিষ্ক ছিলেন বিম কদফিসেসের পরবর্তী সম্রাট। আর তাহলে ৫৮ খৃঃ পূর্বাব্দের সঙ্গে কনিষ্কের কোন সম্পর্কই ছিল না।

মার্শাল, সেটন কোনো, স্মিথ প্রভৃতি চীনা সূত্র ও তক্ষশিলার খননকার্য থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কনিষ্কের শাসনকালের সূচনা ১২৫ থেকে ১২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

কিন্তু মার্শাল ইত্যাদির অভিমতও অগ্রাহ্য করেছেন ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। তাঁর যুক্তি হল, রুদ্রদামনের জুনাগড় লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর রাজত্বকাল নিশ্চিতভাবে ১৩০ থেকে ১৫০ খৃষ্টাব্দ। আর তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন রাজা। তাহলে ঐ সময় কনিষ্ক কিছুতেই সম্রাট হতে পারেন না। তাছাড়া ঐ সময়ে কোন রাজা নতুন অব্দ প্রবর্তন করেন নি। কিন্তু কনিষ্ক যে এক নতুন অব্দ প্রবর্তন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মার্শালের বক্তব্যের যে মূল উপাদান চৈনিক সূত্র তা-ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং মার্শালের অভিমত প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা যায় না।

ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারের মতে কনিষ্কের শাসনকালের সূচনা ২৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে। এই তারিখ ধরলে কনিষ্কের বংশধর বাসুদেবের শাসনকালের সূচনা হয় ৩৪৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ততদিনে গুপ্ত শাসনের সূচনা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া গুপ্ত-বংশের আগে মথুরায় রাজত্ব করতো নাগবংশ। সুতরাং বাসুদেব কিছুতেই তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে আসতে পারেন না। একারণেই ঐতিহাসিক মজুমদারের মত গ্রাহ্য হয় নি।

ফার্গুসন ৭৮ খৃষ্টাব্দকে কনিষ্কের রাজ্যারোহণের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। এবং ঐ তারিখেই শকাব্দ প্রবর্তিত হয় বলে অভিমত দিয়েছেন। ১৯১৩ সালে লণ্ডনে ভারততত্ত্ববিদগণের সম্মেলনে ফার্গুসনের অভিমতকেই সমর্থন জানানো হয়। এই মতের সমর্থক ডঃ রায়চৌধুরী, ওল্ডেনবার্গ প্রমুখও। এই মতের বিরোধীদের প্রধান যুক্তি হল কনিষ্ক কুষাণ হয়েও তাঁর প্রবর্তিত অব্দ শকাব্দ কেন হবে? এই যুক্তিকে খণ্ডন করে বলা হয় কুষাণদের উপর শকদের প্রভুত্বপ্রভাবের ফলেই এরকম নামকরণ।

১৯৬০ সালে ভারততত্ত্ববিদদের দ্বিতীয় সম্মেলনে রুশ পণ্ডিত ডঃ গোবেল দেখিয়েছেন কনিষ্ক প্রথম শতাব্দীতেই রাজত্ব করতেন। ডঃ দানি কনিষ্কের মুদ্রা নানা-ভাবে পরীক্ষা করে একই মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ ব্যাসামও ৭৮ খৃষ্টাব্দকেই কনিষ্কের শাসনকালের সূচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

॥ কনিষ্ক ও বৌদ্ধধর্ম ॥

কনিষ্ক ছিলেন জন্মে বিদেশী, গ্রহণে ভারতীয় আর বিশ্বাসে বৌদ্ধ। ডঃ রায়-চৌধুরী মনে করেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেই কনিষ্ক ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করেছেন।

পাটলিপুত্র অভিযানকালে কনিষ্ক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। অশ্বঘোষের প্রভাবেই তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ হলেও তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর মুদ্রায় হিন্দু, পারসিক, গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এটা তাঁর পরমত-সহিষ্ণুতার পরিচায়ক।

বৌদ্ধ হিসেবে কনিষ্কের সর্বাধিক কৃতিত্ব হল এই ধর্মের মতভেদ দূরীকরণে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কাশ্মীরে মতান্তরে জলন্ধরে এক বৌদ্ধধর্ম সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনেই বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ সুনির্দিষ্টভাবে

গ্রহণ করা হয়। এই মতবাদ বুদ্ধের দেবত্বে বিশ্বাসী, তাই আরম্ভ হয় বুদ্ধের মূর্তিপূজা।

শুধু মতপার্থক্য দূরীকরণ নয়, মহাযান মতবাদের প্রচারেও কনিষ্ক প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ারে এক বহুতল চৈত্য নির্মাণ করেন। এই চৈত্য ছিল ভুবন বিখ্যাত। সম্ভবতঃ গ্রীক স্থপতি এজেসিলাস এই চৈত্যের নক্সা তৈরী করেছিলেন। হিউয়েন সাং ও আলবেরুনী উভয়েই এই চৈত্যের উল্লেখ করেছেন।

কনিষ্ক ভারত ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেন। ফলে এই সময় মহাযান মতবাদ ভারতে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ভারতের বাইরে খোটান, চীন, জাপান ও কোরিয়ায় এই মতবাদ বিস্তৃত হয়েছিল। মহাযান মতের প্রভাবে গান্ধার-শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কেননা ব্যাপকভাবে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ আরম্ভ হয়। তক্ষশিলা, কাশ্মীর ও মথুরায় কনিষ্ক অনেক চৈত্য নির্মাণ করেন।

॥ **কনিষ্ক ও ভারতীয় সংস্কৃতি** ॥

গুপ্তযুগে ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে যে নবজাগরণ হয়েছিল তার পথিকৃৎ হিসেবে কনিষ্ককে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ মৌর্যযুগে সংস্কৃতভাষা যেভাবে উপেক্ষিত অনাদৃত ছিল তা থেকে ঐ ভাষাকে পুনরায় নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন কনিষ্ক। মহাযান মতবাদ এই ভাষাতেই গ্রথিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানীগুণীর সমাদরে কনিষ্ক যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। বৌদ্ধ পন্ডিত অশ্বঘোষ, দার্শনিক নাগার্জুন, রাষ্ট্রনীতিবিদ মাথর, বৌদ্ধ পন্ডিত বসুমিত্র, চিকিৎসক চরক কনিষ্কের অবারিত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। অশ্বঘোষ ছিলেন বিখ্যাত বুদ্ধচরিত রচয়িতা। তিনি জাতিভেদকে আক্রমণ করেও গ্রন্থ রচনা করেন।

তৃতীয়তঃ শিল্প-স্থাপত্যের অনুশীলনেও কনিষ্কের শাসনকাল অবিস্মরণীয়। ভাস্কর্যে এই সময়ে সারনাথ, মথুরা, অমরনাথ ও গান্ধার এই চারটি পৃথক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে গান্ধার পদ্ধতি সবচেয়ে বিখ্যাত। অসংখ্য স্তূপ নির্মাণে এই সময়ের স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষপুরের চৈত্য এই যুগের স্থাপত্যের এক চমৎকার নিদর্শন। পুরুষপুর ছাড়াও তক্ষশিলা ও মথুরাকে কনিষ্ক নয়নাভিরাম শহরে পরিণত করেছিলেন।

॥ **কুষাণ যুগে বৈদেশিক সম্পর্ক** ॥

জওহরলাল নেহরু বলেছেন কুষাণ সাম্রাজ্য এক বিশাল জলস্তম্ভের মত একদিকে গ্রীক-রোমান, অন্যদিকে চীন জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।[২৪] এই মন্তব্যে কুষাণ যুগে বিদেশের সঙ্গে ভারতের বিস্তৃত যোগাযোগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চীন ও রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে কুষাণদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্যবসায়ীগণ পশ্চিম এশিয়া ও সিরিয়া থেকে ভারত, চীন ও মধ্য এশিয়ায় যাতায়াত করতো। ভারতের বিভিন্ন বন্দর থেকেও পশ্চিম এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চলতো। সিন্ধু প্রদেশের বন্দর-সমূহ ছিল এ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২৪ Kushana empire sat like a colossus astride the back of Asia, in between the Greeko-Roman world of the West, the Chinese world in the East and the Indian world in the South. —Jawaharlal Nehru.

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলতো স্থলপথে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে। ফলে তখন তক্ষশিলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তক্ষশিলা ছাড়া আরেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল খোটান।

কুষাণ যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও ভারতের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এই অঞ্চলে আরিকামেডু ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। অন্য বিখ্যাত বন্দর হল কাবেরীপট্টম ও তাম্রলিপ্ত।

॥ কুষাণযুগের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ॥

কুষাণ সংস্কৃতির মূলকথা হল স্বাঙ্গীকরণ। বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিয়ে গঠিত ছিল কুষাণ সাম্রাজ্য। তাই স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও কুষাণ সংস্কৃতি প্রধানতঃ বিভিন্ন ঐতিহ্যের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এই সময় ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি এক নতুন ঐশ্বর্য লাভ করেছিল।

রাজনৈতিক দিক থেকে কুষাণ সাম্রাজ্যের গঠন লক্ষণীয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ, উত্তর-পশ্চিম ভারত এমন কি মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কুষাণ সাম্রাজ্য। এই বিশাল এলাকা ছিল সুশাসিত। ফলে এতকাল ধরে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দিক থেকে যে বিচ্ছিন্ন ছিল তা দূর হয়ে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার এই সম্পর্কের সম্প্রসারণেও বিশেষ সহায়তা করেছিল।

ধর্মীয় দিক থেকে কুষাণযুগের অবদান অবিস্মরণীয়। মহাযান মতবাদের উদ্ভবের ফলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন সম্প্রদায় অধ্যুষিত কুষাণ সাম্রাজ্যে মহাযান মতবাদ ছিল সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং এই মতবাদই মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কজে করেছিল। সমন্বয়বাদী কুষাণ সম্রাটগণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ছিলেন পরমত সহিষ্ণু। তাঁদের এই দৃষ্টি-ভঙ্গী সাম্রাজ্যের গঠনগত দিক থেকেও যথেষ্ট উপযোগী ছিল।

শিল্পে-স্থাপত্যেও কুষাণযুগ অমরত্ব অর্জন করেছে। স্থাপত্যশিল্প ছিল মূলতঃ মন্দির ও বিহার কেন্দ্রিক। কারণ এ যুগের ভারতীয় ও বৈদেশিক শিল্পীগণ ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতেই শিল্প সৃষ্টি করেছেন। কুষাণযুগের ভাস্কর্য বলতে প্রধানতঃ গান্ধার শিল্পরীতিকেই বোঝায়। তাছাড়া মথুরা অমরাবতী ও মধ্য এশিয়ার ব্যাকট্রিয়াতে বিভিন্ন শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধের জীবনকেন্দ্রিক গান্ধার ভাস্কর্যে বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও দেশীয় ঐতিহ্যও যে উপেক্ষিত নয় তা অনস্বীকার্য। মথুরা শিল্পে ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়ও গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে অমরাবতীর শিল্পরীতি ছিল একান্ত-ভাবেই স্থানীয়। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া ও আফগানিস্থানের কয়েকটি স্থানে ভাস্কর্যের যে নতুন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে ঐতিহাসিকেরা তাকে বলেছেন ব্যাকট্রিয় শিল্পরীতি। কারণ এই শিল্প গান্ধার, মথুরা এমন কি পার্থীয় ও গ্রীক রীতি থেকেও ভিন্ন।

কুষাণ যুগে সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই উন্নতিতে সর্বাগ্রে স্মরণীয় হলেন একাধারে কবি নাট্যকার ও দার্শনিক অশ্বঘোষ। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সৃষ্টি হল বুদ্ধ চরিত। তাঁর দার্শনিক চিন্তার মূল কথা হল চরম সত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। অশ্বঘোষের পর অপর উল্লেখযোগ্য নাম হল নাগার্জুন। তিনি ছিলেন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তাই বলা হয় তাঁর মাধ্যমে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সেতু রচিত হয়েছিল।

ভেষজ বিজ্ঞানেও কুষাণ যুগ বিশেষ সাফল্য লাভ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল চরক ও সুশ্রুতের নাম। তবে এঁরা ঠিক কোন সময়ের লোক ছিলেন তা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে।

॥ সাতবাহন সাম্রাজ্য ॥

সাতবাহন সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ গোপালাচারী বলেছেন যে মৌর্যগণই প্রথম ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে রাজনৈতিক ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। এর পরবর্তী কৃতিত্ব হল সাতবাহন সাম্রাজ্যের।

সাতবাহনগণ প্রথমে ছিলেন মৌর্য সম্রাটদের কর্মচারী। পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হলে তারা দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পুরাণের বর্ণনা অনুসারে অন্ধ্রজাতীয় শ্রীমুখ সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা প্রথম সাতকর্ণী তাঁর রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের উত্তর ভাগ অর্থাৎ নর্মদা উপত্যকা, বিদর্ভ ও পশ্চিম মালব তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ছিল। পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সাম্রাজ্য। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন যে প্রথম সাতকর্ণীর নেতৃত্বে গোদাবরীর উপত্যকায় একটি সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সাম্রাজ্য আয়তন ও শক্তির দিক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার শুঙ্গ সাম্রাজ্য ও পঞ্চনদের গ্রীক সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয় ছিল।

কিন্তু প্রথম সাতকর্ণীর পর শক জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত সাতবাহনগণ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের উপর দখল হারিয়ে পূর্বদিকে অন্ধ্রদেশে সরে আসতে বাধ্য হন। শকগণ সাতবাহনদের বিতাড়িত করে মহারাষ্ট্রের উত্তর ভাগ দখল করেন।

॥ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ॥

শক আক্রমণ বিধ্বস্ত সাতবাহনদের যিনি পুনরায় নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি হলেন সাতবাহন রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা গৌমতীপুত্র সাতকর্ণী। তাঁর সম্পর্কে জানতে তিনটি শিলালিপি বিশেষ সাহায্যকারী। একটি তাঁর শাসনকালের অষ্টাদশ বর্ষে রচিত। এটি নাসিক লিপি নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি শাসনকালের চতুর্বিংশ বৎসরে মাতা গৌতমী বলশ্রীর সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত। তৃতীয়টি হল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এটি নাসিক প্রশস্তি নামে পরিচিত। পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা এটি রচনা করেন। তাই এটি পুত্রহারা মাতার পুত্রের সমাধি ভাষণ বলে বর্ণিত। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে এই শিলালিপি খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখ, রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখ বা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়।

গৌতমীপুত্রের রাজত্বকালের সময় নির্ধারণের প্রধান উপায় হল শক ক্ষত্রপ নহপনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের তারিখ। শক লিপি থেকে জানা যায় ১২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে নহপানের সঙ্গে গৌতমীপুত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। নাসিক প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে যে এই যুদ্ধ হয়েছিল গৌতমীপুত্রের রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষে। তাহলে ১২৪-১৮ অর্থাৎ ১০৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ গৌতমী সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি তাঁর জীবনের শেষ শিলালিপিটি শাসনকালের চতুর্বিংশ বর্ষে মাতার সঙ্গে যুক্তভাবে রচনা করেন। এরপর তিনি আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং যদি তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়ে থাকে ১০৬ খৃষ্টাব্দে তাহলে তাঁর শাসনকালের স্থায়িত্ব ছিল ১৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রকে 'সাতবাহন-কুল-যশঃ-প্রতিষ্ঠাপনকর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি নহপানকে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করেন। তিনি শকদের অধিকার থেকে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মালব, বেরার ও উত্তর কোঙ্কন দখল করেন। নাসিক প্রশস্তিতে বলা হয়েছে তিনি পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন।

নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন' বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

যবন বলতে বোঝায় গ্রীক এবং পল্লব বলতে পার্থিয়ানদের বোঝায়। কিন্তু গ্রীক ও পার্থিয়ানদের সঙ্গে গৌতমীর সংঘর্ষের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। শকদের সঙ্গে সংঘর্ষে শকদের অন্যতম শাখা ক্ষহরত শাখার শাসক নহপানকে তিনি নিঃসন্দেহে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু শকদের অন্য একটি শাখা কার্দমক শাখা গৌতমীপুত্রকে পরাজিত করেছিল। টলেমির রচনা ও জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় এই শাখারই রুদ্রদামন গৌতমীকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু তিনি সাতবাহনদের ধ্বংস করেন নি। কারণ গৌতমী শক আক্রমণের তাণ্ডব থেকে অব্যাহতি পেতে নিজ পুত্রের সঙ্গে রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহ তদানীন্তন পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থারও এক প্রমাণ। কারণ ব্রাহ্মণ সাতবাহন যখন এক শক কন্যাকে গ্রহণ করেন তখন তা সামাজিক বিবর্তনেরই ইঙ্গিত দেয়। এই বিবাহের মধ্য দিয়ে শক-দের ভারতীয়করণের যেমন সূচনা তেমনি এক ব্রাহ্মণ সন্তানের ভিন্ন অনার্যের কন্যাকে গ্রহণ জাতিভেদ প্রথার ক্রমিক শৈথিল্যেরই এক উদাহরণ।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র কেবলমাত্র একজন যোদ্ধা হিসেবেই নয়, একজন যথার্থ সংস্কারক বলেও বর্ণিত হয়েছেন। ডঃ গোপালাচারি এই অভিমত দিয়েছেন যে যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির ক্ষেত্রেই গৌতমীপুত্র অধিকতর সাফল্য লাভ করেছেন। নাসিক প্রশস্তি অনুসারে তিনি ক্ষত্রিয়দের অহংকার চূর্ণ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ ও নিম্নতম শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথার সংরক্ষণে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্রীয় আইন ও মানবতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসেরই প্রতিফলন হয়েছে তাঁর রাজস্ব-সংস্কার ব্যবস্থার মধ্যে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে দরিদ্র শ্রেণীর উপর করভার লাঘব করেন।

গৌতমীপুত্রের পর তাঁর পুত্র বশিষ্ঠিপুত্র পুলুমায়ির শাসনকালেও সাতবাহনদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তারপর থেকেই দ্রুত সাতবাহনদের ক্ষমতার অবক্ষয় হতে থাকে।

॥ গুপ্ত সাম্রাজ্য ॥

মৌর্য যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নেরও অবসান হল না, বরং দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন রাজবংশ সেই চেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে করেই গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে গুপ্ত বংশের সূচনা সেই স্বপ্নের আংশিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল। কারণ ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে কেন্দ্রীয় শাসন যদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নির্ণায়ক হয় তবে গুপ্ত যুগও মৌর্য যুগের সাফল্য লাভ করতে পারে নি।[২৫] তবে ভৌগোলিক পরিধি যদি সাম্রাজ্যের পরিচয়জ্ঞাপক হয় তাহলে গুপ্ত যুগ অনেকটাই সফল হয়েছিল।

অথচ ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ ধ্রুপদী যুগ বলে চিহ্নিত। কিন্তু এই যুগ সীমাবদ্ধ ছিল কেবল উত্তর ভারতেই। কোন কোন ঐতিহাসিক গুপ্ত যুগকে বলে-ছেন সুবর্ণ যুগ। অস্বীকার করা যায় না গুপ্ত শাসনকালেই ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

॥ গুপ্ত বংশের উদ্ভব ॥

ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার, ডঃ গয়াল প্রভৃতি বলেছেন যে, মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে ভারতে যে

২৫ Centralized control, an essential of an imperial structure was not fully realised in the Gupta Government as it had been under the Mauryas.

— Romila Thapar.

বৈদেশিক আক্রমণ ও প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছিল গুপ্ত যুগের উত্থান হল তারই বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। কিন্তু গুপ্ত শাসনের সূচনায় কোন জাতীয় চেতনা যে কাজ করে নি তা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ তখনো জাতীয় চেতনার কোন ধারণা জন্মলাভ করে নি। তবে তখন উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকাকে কেন্দ্র করে এক নতুন রাজশক্তির জেগে ওঠার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। মগধ ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল তখন বিদেশী শাসনাধীন। তদুপরি গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল অতিশয় উর্বর এবং ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র।

এই পরিস্থিতিতেই ডঃ কে. পি. জয়সোয়াল এলাহাবাদকেই গুপ্তদের আদি বাসস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে তাঁদের বংশপরিচয় সম্পর্কে বিতর্ক আছে। কারো মতে তাঁরা ছিলেন জাঠ, কারো মতে তাঁরা ছিলেন 'ধারণ' গোত্রের লোক। কারো মতে ব্রাহ্মণ।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীগুপ্ত। তিনিই প্রথম তাঁর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন ঘটোৎকচ গুপ্ত। উভয়েরই উপাধি ছিল মহারাজা। সম্ভবতঃ তাঁরা ছিলেন সামন্ত রাজা। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

॥ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ॥

ঘটোৎকচ গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় সামন্ত রাজ্য থেকে চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

তিনি প্রতিবেশী কোশল রাজ্যের মঘ বা মাঘ বংশকে উৎখাত করে কোশল জয় করেন। কোশাম্বীও তিনি দখল করেন। নিশ্চিত ভাবেই তিনি মগধ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তখন মগধে কারা রাজত্ব করতো তা সংশয়াতীতভাবে বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে বলা যায় উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ, বিহার ও পশ্চিম বাংলা নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য গঠিত ছিল।

তাঁর শাসনকালের সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হল লিচ্ছবি রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ। এই বিবাহ সম্পর্কে নানা ঐতিহাসিক নানাভাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তকে লিচ্ছবি-দৌহিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উল্লেখ থেকেই ঐ বিবাহের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন এই বিবাহের ফলে পাটলিপুত্রের উপর চন্দ্রগুপ্তের অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু ই-সিং লিখেছেন পাটলিপুত্র শ্রীগুপ্তেরই এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। অন্যদিকে এ্যালান মনে করেন যে ঐ বিবাহের ফলে গুপ্তদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু মানবধর্মশাস্ত্রে [illegible]দের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথা ঠিক [illegible] বিবাহ কোনমতেই গুপ্তদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয় না। তবে [illegible]গুপ্তের মুদ্রা থেকে মনে হয় ঐ বিবাহকে গুপ্তদের সৌভাগ্যের প্রতীক বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলতেকার মনে করেন এই বিবাহ লিচ্ছবি রাজ্যের উত্তরাধিকার গুপ্ত রাজার উপর অর্পণ করেছিল। সাম্প্রতিককালে ডঃ গয়াল এই বিবাহ সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে বিবাহ থেকে সৃষ্ট লিচ্ছবি-গুপ্ত মৈত্রী উত্তর ভারতের রাজনীতিতে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। শুধু তাই নয়। এই মৈত্রী গুপ্তদের দক্ষিণ বিহারের লোহখনির উপর অধিকার দান করেছিল। ফলে গুপ্তদের পক্ষে উত্তর ভারতের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হওয়া সহজ হয়েছিল।

ডঃ গয়াল এই বিবাহের আরেকটি প্রতিক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। গুপ্ত

ও লিচ্ছবি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ঐতিহ্য ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। গুপ্ত রাষ্ট্র ছিল রাজতান্ত্রিক আর লিচ্ছবি রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক। গুপ্তগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ধারক আর লিচ্ছবিগণ বৌদ্ধ সংস্কৃতির। এই দুই বিপরীতমুখী রাষ্ট্রের মিলনে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার প্রতিফলন ঘটে রাজসভায় এবং তা অনুভূত হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ ভাগে যখন রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণী দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠপুত্র না হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। এই নিয়ে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে অভিজাতরাও সামিল হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষোভ ব্যক্তিগত স্তরকে অতিক্রম করে আদর্শগত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কারণ সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবি পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। আর চন্দ্রগুপ্তের অন্য পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন যুবরাজ কাচ। যাই হোক প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কতকাল রাজত্ব করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

॥ সমুদ্রগুপ্ত ॥

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যে কয়জন সম্রাট রাজ্যবিজেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত একটি সাধারণ রাজ্যকে তিনি নিজ বাহুবলে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। অবশ্যই তাঁর এই সাফল্যের পেছনে ছিল সমসাময়িক অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কিন্তু তাহলেও তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

তাঁর শাসনকালে প্রচলিত বিভিন্ন মুদ্রা, মধ্যপ্রদেশের এরাণলিপি ও এলাহাবাদের বিখ্যাত স্তম্ভলিপি তাঁর সম্পর্কে জানার নির্ভরযোগ্য উপকরণ।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্তের লক্ষ্য ছিল সমগ্রদেশ জয় করে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং নিজেকে একরাট বা রাজচক্রবর্তী রূপে ঘোষণা করা। রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে অধিকৃত রাজ্য বিজিত রাজাকেও প্রত্যর্পণ করেছেন। হরিসেনের মতে এই নীতি হল পরিমোক্ষ নীতি। এই দ্বিমুখী নীতির কারণ হল সুদূর উত্তর ভারতের পাটলিপুত্র থেকে দাক্ষিণাত্যের দূরবর্তী রাজ্যগুলিকে সুশাসনে রাখা সহজ ছিল না তাই তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে করদ রাজ্যে পরিণত করেই তৃপ্ত ছিলেন।

হরিসেন রচিত এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ঐ বিবরণ অনুসারে উত্তর ভারতে যে সব রাজাকে তিনি পরাজিত করেছিলেন তারা হলেন অহিচ্ছত্রের রাজা অচ্যুত, পদ্মবতীর রাজা নাগসেন, নাগবংশের রাজা গণপতি নাগ, এবং কোটার রাজা। এছাড়া সম্ভবতঃ বাকাটকের রাজা রুদ্রদেব, মণ্ডিল, নাগদত্ত নন্দীন, বলবর্মন, চন্দ্রবর্মন প্রভৃতি উত্তর ভারতের রাজাদেরও তিনি পরাজিত করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে তাঁর কাছে পরাজিত রাজারা হলেন কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কোরলের মন্তরাজ, পিষ্ঠপুরমের মহেন্দ্রগিরি, কোত্তুরের স্বামীদত্ত, এরণ্ডপল্লের দামন, কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ, বেঙ্গীর হস্তিবর্মন, অবমুক্তার নীলরাজ, পলাক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, এবং কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়।

তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী সীমান্ত রাজ্য ও উপজাতির রাজ্যগুলিও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। মনে হয় তিনি এই সব রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারের মতে প্রত্যক্ষ ও সামন্ত রাজ্য মিলিয়ে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা হল কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজপুতনা, সিন্ধু ও গুজরাট বাদে সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণে উড়িষ্যার ছত্তিসগড় হয়ে পূর্ব উপকূল ধরে তামিলনাড়ুর চিঙ্গেলকোট জেলা পর্যন্ত।

স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ রায়-চৌধুরী মনে করেন ভারতের ধর্মীয় শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী রাজে চক্রবর্তী হবার মানসে সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হন। রোমিলা থাপার মনে করেন সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের মাধ্যমে গাঙ্গেয় উপত্যকার ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি লাভ করে। অনেক ঐতিহাসিক রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে যে নীতি গ্রহণ করেন তাতে তিনি যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ডঃ গয়াল মনে করেন দাক্ষিণাত্যের যে অপরিমিত ধনসম্পদ সমুদ্রগুপ্তকে দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রলুব্ধ করেছিল তা পূর্ণ হয়েছিল ঐ অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে করদ রাজ্য রেখেই।

যাই হোক মৌর্য ও কুষাণ যুগের অবসানের পর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে পূর্ণ করে দিতেই যেন সমুদ্রগুপ্তের আবির্ভাব এবং এক প্রবলপরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ, যার ফলে যাবতীয় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছিল।

অর্জিত সাম্রাজ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমুদ্রগুপ্ত এক সুচিন্তিত বৈদেশিক নীতিও গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি হল সীমান্তে অবস্থিত বিভিন্ন উপজাতি ও অন্যান্য রাজ্যগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহ ও প্রত্যক্ষ শাসনাধীন সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী নিরাপদ বলয় সৃষ্টি। পূর্বে এই নিরাপদ বলয়ে ছিল সমতট, দবাক, কামরূপ ও নেপাল। পশ্চিমে ছিল মালব, অর্জুনায়ন, খরপরিগণ। দক্ষিণে ছিল চারটি করদ রাজ্য।

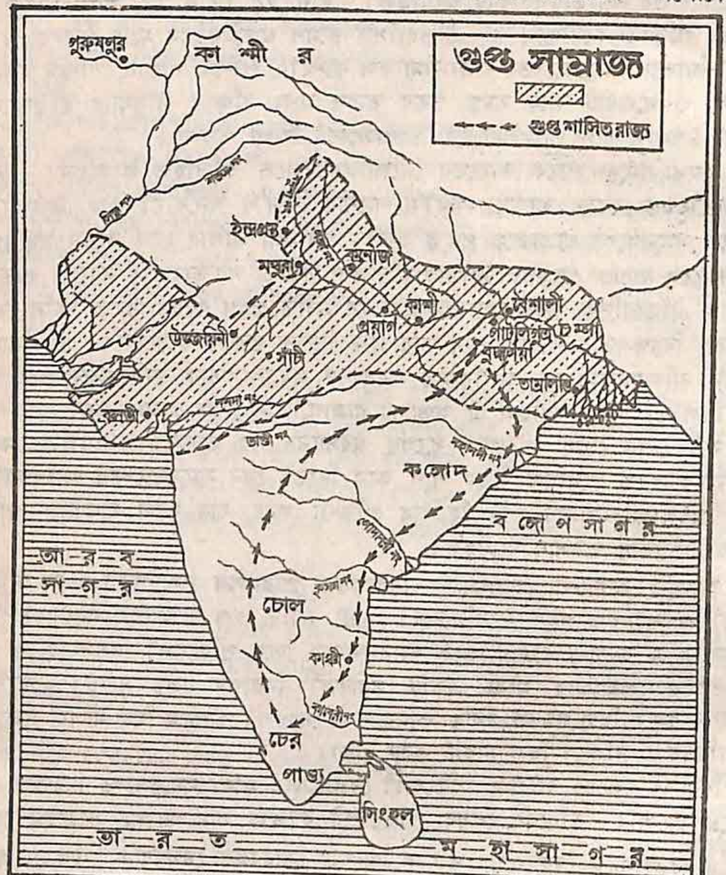
নিরাপদ বলয়ের বাইরের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত মিত্রতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখেন। হরিষেণ যেসব প্রতিবেশী রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল উত্তর-পশ্চিমে দৈবীপুত্র, শক মুরুণ্ড ও সিংহলের মেঘবর্ণ। এছাড়া হরিষেণ 'সর্বদ্বীপবাসিন' কথাটির উল্লেখ করেছেন। ডঃ রমেশ মজুমদার এর অর্থ করতে গিয়ে মালব, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপের কথা বলেছেন। ভারতের অভ্যন্তরে সমুদ্রগুপ্ত শকদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেলেও বাকাটক শক্তিকে উচ্ছেদ করেছিলেন।

॥ সমুদ্রগুপ্তের মূল্যায়ন ॥

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্ত এক অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। নিজ বাহুবলে তিনি এক সাধারণ রাজ্যকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা না করলেও তাঁর পরাক্রম কাহিনী শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয় বাইরেও ছিল সর্বজন কাহিনী। বরং বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিয়ে গুপ্ত বংশের ভিত্তিকেই দৃঢ়তর করেছিলেন।

অনেকেই সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়কে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে একত্রিত করেছেন। অস্বীকার করা যায় না গুপ্ত যুগে যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল তার ভিত্তিই ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং রাজশক্তি। রোমিলা থাপার অবশ্য মনে করেন যে এই নবযুগ ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। রণবিদ্যা, কাব্য রচনা, সংগীত চর্চা, শিল্পানুশীলন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অনায়াস গতায়াত। অশোকের মত



তিনিও ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও প্রজাহিতৈষী। তবে উভয়ের দৃষ্টিভংগী ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান।

॥ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ॥

এরণ শিলালিপি থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু বিশাখদত্তের দেবীচন্দ্রগুপ্তম নাটকে বলা হয়েছে যে সমুদ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন রামগুপ্ত। কিন্তু রামগুপ্ত শকদের কাছে পরাজিত হয়ে অপমানজনক সর্তে সন্ধি করলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। বিদিশা শিলালিপি থেকেও এ কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

সন্দেহ নেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। দেবীচন্দ্রগুপ্তম নাটকের কাহিনী সত্য হলে ধরে নেওয়া যায় তিনি শক শক্তিকে পরাভূত করে গুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তবে অবশ্যই তিনি পিতার মত দিগ্বিজয়ে বের হন নি।

ডঃ হেমচন্দ্র চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে গুপ্তরাজগণ তাঁদের বৈদেশিক নীতি



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

নির্ধারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন।[২৬] দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংকট ছিল শকদের দিক থেকে। তাই তিনি শকদের শক্ত হাতে মোকাবিলা করে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বে আনতে চেয়েছিলেন আর এই উদ্দেশ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর দুই প্রবল প্রতিবেশী নাগ ও বাকটদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন। কারণ পশ্চিম ভারতে শকদের দমন করতে হলে এই দুই প্রতিবেশীর সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি নিজে নাগ রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর কন্যা প্রভাবতী গুপ্তর সঙ্গে বাকাটক রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ দেন। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা এই দুই প্রতিবেশীর সমর্থন লাভের ফলে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে শকদের পরাস্ত করা সহজ হয়েছিল। অন্যদিকে কর্নাটক বা কুন্তল রাজ্যের সঙ্গে নিজ পুত্রের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি ঐ রাজ্যেরও সমর্থন লাভ করেছেন।

পশ্চিম ভারতে শকদের পরাভূত করাই হল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সবচেয়ে বড় সামরিক সাফল্য। অনেকে অবশ্য তাঁর সঙ্গে শকদের যুদ্ধ আদৌ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন শিলালিপিতে এই যুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী বীরসেনের উদয়গিরি লিপি, সেনাপতি আম্রকার্দপের সাঁচী লিপি এবং তাঁর রৌপ্যমুদ্রা থেকে শকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যাই হোক এই যুদ্ধের ফলে পশ্চিম ভারতে আরব সাগর পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটও এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় বলে অনেকে মনে করেন। পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ বন্দর গুপ্তদের অধিকারে আসার ফলে বিশাল সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুবিধা, বিশেষতঃ রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভোগ করতে থাকে। এই সময় থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয়। সেই সুবাদে মালবের উজ্জয়িনী নগরের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে উজ্জয়িনী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়।

অনেকে বলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমুদ্রগুপ্তের পদাংকই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ডঃ গয়াল এই মত সমর্থন করেন না। কারণ একমাত্র শকদের বিরুদ্ধে অভিযান ছাড়া তাঁর রাজত্বকালে অন্য কোন সামরিক সাফল্যের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। দক্ষিণ ভারতে তাঁর ভূমিকা কেবল বিবাহ-বন্ধন ও কূটনীতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবে দিল্লীর নিকটস্থ মেহেরউলি স্তম্ভলিপি থেকে মনে হয় তিনি বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ ও যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সময় ও সুযোগের অপচয় করেছিলেন। তাঁর এই উদাসীনতার খেসারৎ দিতে হয়েছিল পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীদের। তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ রমেশ মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পুত্রের জন্য যে সুসংগঠিত সাম্রাজ্য রেখে যান তা নিশ্চয়ই তাঁর বিরাট সামরিক প্রতিভা, যোগ্য রাষ্ট্র

২৬ Matrimonial alliance occupied a prominent place in the foreign policy of the Guptas.

—Dr. H. C. Roychoudhury.

পরিচালনা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।[২৭] তাঁকে অনেকে কিংবদন্তীর শকারি বিক্রমাদিত্য মনে করেন। কিন্তু এরূপ মনে করার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ী বীর অপেক্ষা শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক রূপে অধিক এবং স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেছেন। গুপ্তযুগে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সৃজনী-শক্তির বিকাশ ঘটেছিল তার পেছনে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অবদান নিশ্চয়ই ছিল।

॥ ফা-হিয়েনের বিবরণ ॥

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন নামে এক চীনা পরিব্রাজক ভারতে আসেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-পথে তিনি ভারতে এসে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত করেন এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এসেছিলেন মূলতঃ ধর্মীয় কারণে। তাই তিনি রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু তিনি যে বিবরণী রচনা করেন তা থেকে তখনকার দিনের ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি তাঁর বিবরণীতে কোথাও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ করেন নি। তিনি 'মধ্যদেশের' কথা লিখেছেন। পণ্ডিতেরা বলেন এই মধ্যদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

তিনি লিখেছেন, দেশের অসংখ্য মানুষ সুখে ও শান্তিতে বাস করতো। রাজ-কর্মচারীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতো না। তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতো। সরকারী আইন ছিল নমনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীদের জরিমানা করা হত। রাজদ্রোহী ছাড়া কঠোর শাস্তি দেওয়া হত না।

সাধারণ মানুষ ছিল নিরামিষভোগী ও অহিংসপন্থী। দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব থাকলেও লোকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিল। জাতিভেদ প্রথা ছিল। পথের ধারে ছিল সরাইখানা। দরিদ্রদের জন্য ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়। লোকে নিরাপদে যাতায়াত করতো। তাম্রলিপ্ত ও সুপর্ক ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ফা-হিয়েন তিন বৎসরকাল পাটলিপুত্রে কাটান। এখানে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বীদের জন্য দুটি পৃথক বিশালাকার বিহার ছিল। সারা-দেশ থেকে বৌদ্ধভিক্ষুরা এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য আসতো। এখানে অশোকের রাজ-প্রাসাদ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট ফা-হিয়েন বলেছিলেন এমন প্রাসাদ কখনো মনুষ্য-নির্মিত হতে পারে না। পাটলিপুত্রের লোকেরা সচ্ছল জীবন-যাপন করতো। তাদের দান-শীলতা ও পরোপকারী মনোভাবের প্রশংসা করেছেন ফা-হিয়েন।

॥ কুমারগুপ্ত ॥

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর ৪১৫ খৃষ্টাব্দে কুমারগুপ্ত পিতার সিংহাসনে বসেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পিতার মতই সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কোন ব্যবস্থাই তিনি নিতে পারেন নি।

প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রায় ব্যাঘ্র-বল পরাক্রম উপাধি খোদিত থাকায় ডঃ রায়-চৌধুরী মনে করেন তিনি ব্যাঘ্র-সংকুল নর্মদা অঞ্চল জয় করেন। সাম্প্রতিক অনু-সন্ধান ও গবেষণাতেও এই অভিমত সমর্থিত হয়েছে। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই অঞ্চল জয় করার পরই তিনি ঐ যজ্ঞ করেন।

তবে তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফল সাম্রাজ্যের পক্ষে সুখকর হয় নি। কারণ

---

[২৭] The peaceful and well-knit empire which Chandragupta II left as a legacy to his son must have been the fruit of long endeavour not only of a great general and able statesman but also of a striking personality.

— R. C. Majumdar.

এই অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল উপেক্ষিত হয়। ফলে পরবর্তীকালে এদেশে হূণ আক্রমণ সহজ হয়েছিল। অন্যদিকে নর্মদা অঞ্চলের উপজাতি পুষ্যামিত্রগণ প্রতিশোধ নিতে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ চালায়। তারা বাকাটকদের সমর্থনও লাভ করেছিল। কারণ কুমারগুপ্ত তাঁর পিতার মত বাকাটকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন নি। সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কুমারগুপ্তের শাসনকালে নর্মদা অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। দামোদরপুর লিপি থেকে কুমারগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর আমলে বহু সত্র স্থাপিত হয়েছিল। তখন কার্তিকেয় ও শিবের উপাসনা ব্যাপক প্রসারলাভ করে। বংশানুক্রমিকভাবে কুমারগুপ্তও ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।

॥ স্কন্দগুপ্ত ॥

৪৫৫ খৃষ্টাব্দে কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। কুমারগুপ্তের প্রধানা মহিষীর সন্তানই ছিলেন সম্ভবতঃ সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত ছিলেন অনেক যোগ্য, সেনাবাহিনীর প্রিয় এবং শাসন ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ। ফলে দুই ভ্রাতার মধ্যে স্বভাবতঃই সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এই অভিমত দিয়েছেন ডঃ মজুমদার। ডঃ রায়চৌধুরী এই অভিমত না মানলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মনে করেন, স্কন্দগুপ্তের সিংহাসনলাভ সহজ হয় নি, তাঁকে আপন বাহুবলে তা অধিকার করে নিতে হয়।

সিংহাসনে বসার আগেই পুষ্যমিত্র ও বাকাটক জোটের আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে দুর্ধর্ষ হূণদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত সম্পর্কে গুপ্তদের নীতিগত ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে যায়। অবশিষ্ট ভারতের উপর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে যে এই সীমান্ত অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার তা গুপ্ত সম্রাটগণ উপলব্ধি করেন নি। সামরিক গুরুত্ব ছাড়া এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বও ছিল। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণ যে তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেন নি তার পিছনে ভৌগোলিক অসুবিধাও ছিল। কারণ গঙ্গা ও সিন্ধু উপত্যকার সংযোগরক্ষাকারী যে সংকীর্ণ ভূভাগ তখন তা ছিল গভীর অরণ্য সংকুল ও দুর্গম। তাই গাঙ্গেয় উপত্যকার কোন শক্তির পক্ষে তখনকার দিনে সিন্ধু উপত্যকার উপর স্থায়ীভাবে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ ছিল না।

বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতেই হূণদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের সাফল্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই জন্যই রমেশ মজুমদার তাঁকে 'ভারতত্রাতা' বলে অভিহিত করেছেন।[২৮] অনেকে অবশ্য স্কন্দগুপ্তের এই কৃতিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না। তাদের বক্তব্য হল হূণদের প্রধান শাখা গিয়েছিল ইউরোপে। যে শাখ ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিল তারাও এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে আরো দুর্বল হয়ে যায়। কারো কারো মতে হূণগণ একাধিকবার ভারত আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এই অভিমতও ভুল বলে প্রমাণিত।

শুধু যুদ্ধ নয়, দেশশাসনেও স্কন্দগুপ্ত যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনই ছিল তাঁর শাসনের মূল কথা। সৌরাষ্ট্রের সুদর্শন হ্রদ অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অতি দ্রুত তিনি তার সংস্কারসাধন করেন। শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। ধর্মের দিক

২৮ It was a great achievement for which Skanda Gupta may well go down in history as the savior of India. — R. C. Majumdar.

থেকে তিনি নিজে বৈষ্ণব হলেও অন্যের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করেন নি। হিউয়েন সাং লিখেছেন যে তিনি নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও তিনি স্থাপন করেছিলেন।

॥ পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ ॥

স্কন্দগুপ্তের পর দ্রুত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। প্রকৃত পক্ষে স্কন্দগুপ্ত শেষ প্রধান গুপ্ত সম্রাট। শেষের দিকে একমাত্র বুধগুপ্তই সাম্রাজ্যকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারপর আর তা-ও সম্ভব হল না। নরসিংহ গুপ্তের শাসন-কালেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

॥ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ॥

ইবন বতুতা বলেছেন মানুষের মতই প্রতিটি সাম্রাজ্যের উত্থান, বিকাশ ও অবক্ষয় অনিবার্য। কিন্তু এই অনিবার্যতা সত্ত্বেও তথ্যানুসন্ধানীগণ প্রতিটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন। দেখা গিয়েছে ভারতে প্রতিটি সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে রয়েছে কতগুলি কারণ। যেমন রাজ পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের বিদ্রোহ, বিদেশী আক্রমণ। পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রমেশ মজুমদার গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়েছেন।

প্রথমতঃ রাজতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে রাজার যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। স্কন্দ-গুপ্তের পরবর্তীকালে গুপ্ত রাজবংশে যোগ্যতাসম্পন্ন শাসকের ছিল একান্ত অভাব। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেবার মত সামর্থ তাদের ছিল না। তদুপরি শেষের দিকের সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে অহিংস ও নিষ্ক্রিয়তার নীতিকে গ্রহণ করায় পরি-স্থিতি অনিবার্য পরিণতির দিকেই অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর থেকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার সং-ক্রান্ত বিরোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট এবং নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়। রাজপরিবারের এই অন্ত-র্দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সামগ্রিক শাসনব্যবস্থায়। অস্বীকার করা যায় না উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ রাজপদের নৈতিক ভিত্তিকেও দুর্বল করে ফেলেছিল।

তৃতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যের বাকাটকগণ গুপ্তদের কেবলমাত্র শক্তিশালী নিকট প্রতিবেশীই ছিল না, তাদের ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তাই তিনি বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা ঐ প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটগণ এই দূরদর্শিতার পরিচয় না দিয়ে বাকাটক-দের সঙ্গে সংঘর্ষের পথকে বেছে নেয়। ফলে পশ্চিম ভারতে কর্তৃত্ব হারিয়ে চরম-মূল্য দিতে হয় গুপ্ত সম্রাটদের।

চতুর্থতঃ গুপ্ত যুগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুযোগে রাজসভা বিলাস ও বৈভবে প্লাবিত হয়ে যায়। যে অভিজাত সম্প্রদায় থেকে দেশের শাসক শ্রেণী সংগৃহীত হত তারাও বিলাস-ব্যসনে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল। তারাও রাজনীতি ও সমরনীতির চর্চা ত্যাগ করে শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে আপ্লুত হয়ে যায়। ফলে দেশে আরম্ভ হয় ক্ষাত্র-তেজের অবক্ষয়। সাম্রাজ্য রক্ষায় এই মানসিকতা নিশ্চয়ই সহায়ক নয়।

পঞ্চমতঃ ডঃ আর. এস. শর্মা দেখিয়েছেন কিভাবে গুপ্ত যুগে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। সামন্ত প্রথা ততক্ষণই গঠনাত্মকভাবে ক্রিয়াশীল যতক্ষণ কেন্দ্রিয় শক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়ন্ত্রণে সামান্য শৈথিল্য লক্ষিত হলেই সামন্ত প্রথা তার প্রচ্ছন্ন আগ্রাসী অবয়বে প্রকট হয়ে ওঠে। গুপ্ত যুগের সামন্ত প্রথাতেও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। বুধগুপ্তের সময় থেকেই সামন্তদের

নগ্নরূপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে, যার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কোন বিকল্প থাকে না।

ষষ্ঠতঃ সামন্তদের স্বেচ্ছাচারী প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছিল গুপ্ত যুগের বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা। কারণ এই শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনেক ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হত। তদুপরি গুপ্ত রাজকর্মচারীগণ নগদে বেতন পেতেন, না জমির ভোগদখল ভোগ করতেন তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও তারা বিপুল পরিমাণ জমির মালিক ছিলেন তা নিশ্চিত। ফলে তাদের ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার সুযোগ ছিলই। তাই কেন্দ্রিয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে সামন্তগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে মূল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

সপ্তমতঃ গুপ্ত যুগে ভূমিদান ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। গুপ্ত সম্রাটগণ ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ নিঃশর্তভাবে দান করতেন। ফলে এমন এক নতুন অভিজাত জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হল যাদের রাষ্ট্রের প্রতি কোনরকম দায়দায়িত্ব ছিল না। এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব সাম্রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপূরক যে কখনোই হতে পারে না তা সহজেই অনুমেয়।

অষ্টমতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুপ্ত যুগ নীতিগত কারণেই এক সংকটের সম্মুখীন হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বা জনপদ গড়ে তোলার নীতি অনুসৃত হবার ফলে অন্তর্বাণিজ্যের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল। কেননা অধিক উৎপাদনের উৎসাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এই নীতির ফলে। আর অতিরিক্ত উৎপাদন ছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিস্তার সম্ভব নয়। কেবল বহির্বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে গুপ্ত অর্থনীতির এই অন্তর্নিহিত সংকট প্রকট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এক বিশাল সেনা বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের অপরিহার্যতা এবং ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ ও হূণ আক্রমণ গুপ্ত অর্থনীতির প্রচ্ছন্ন সংকটকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

নবমতঃ হূণ আক্রমণ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমাধিতে শেষ পেরেকের ব্যবহার। স্কন্দগুপ্ত যদিও যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন তথাপি তাঁর মৃত্যুর পর তোরমাণ ও মিহিরগুলের নেতৃত্বে হূণগণ পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটের অক্ষমতা ও অযোগ্যতাকে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করে দেয়। হূণগণ যে এক বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছিল শুধু তাই নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহকে উৎসাহিতও করেছিল মূল গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে। সুতরাং এরপরও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না।

॥ গুপ্ত সংস্কৃতি ॥

গুপ্ত যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে অসাধারণত্ব অর্জন করেছিল তার জন্য অনেকে এই যুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহাসিক বার্নেট গুপ্ত যুগকে গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২৯] ভিনসেন্ট স্মিথ তুলনা করেছেন ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে। কেউ বলেছেন গুপ্ত যুগ হল ভারত-সংস্কৃতির ধ্রুপদী যুগ। কে· এম· মুন্সী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন, গুপ্ত রাজারা জাতীয় চেতনার প্রতীকে পরিণত হন, জীবন গুপ্ত যুগের থেকে বেশী সুখী আর কখনো ছিল না, ভারত-সংস্কৃতি এর থেকে বেশী সৃজনশীল আর কখনো ছিল না।[৩০]

কিন্তু সাম্প্রতিককালে রোমিলা থাপার প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা গুপ্ত যুগ সম্পর্কে অনেক বেশী বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী। তাদের বক্তব্য হল গুপ্ত যুগ

২৯ The Gupta period is in the annals of classical India almost what the Periclean Age is in the histotry of Greece. — Barhett.

ছিল প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুত্থানের যুগ। আর এই পুনরুত্থানের অর্থ হল জাতিভেদ প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিম্নবর্ণের মানুষের উপর শোষণের প্রত্যাবর্তন। তাঁরা অবশ্য গুপ্ত সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মতে এই সংস্কৃতি হল মূলতঃ দরবারী সংস্কৃতি (court culture)। কারণ তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল উচ্চ শ্রেণীর হাতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কর্তৃত্বে। তাই এই শ্রেণীর বিনোদনের জন্যই গুপ্ত সংস্কৃতির সৃষ্টি। তাই সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা প্রাকৃত ছেড়ে এই যুগের সাহিত্য রচিত হয়েছিল কাব্যময়, অলংকারবহুল সংস্কৃত ভাষায়। উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জনের তাগিদেই রচিত উৎকৃষ্ট নাটকসমূহ মিলনান্ত, অর্থাৎ সেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা-হতাশা উপেক্ষিত। শিল্প-ভাস্কর্যও সৃষ্টি হয়েছিল উচ্চশ্রেণীর রুচিবোধের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে। তাছাড়া গুপ্ত-সংস্কৃতি ছিল প্রধানতঃ উত্তর ভারত কেন্দ্রিক। সর্বভারতীয় ব্যাপকত্বও তার ছিল না।

কিন্তু এই সব মতের বিরুদ্ধ যুক্তিও রয়েছে যথেষ্ট। প্রথম কথা হল সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা গুপ্ত যুগেই প্রথম আরম্ভ হয় নি। কেবল মৌর্য যুগে প্রাকৃত ভাষার প্রাধান্যে সেই চর্চা কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল। শক-কুষাণ যুগে সংস্কৃত ভাষা পুনরায় নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গুপ্ত যুগে সেই ধারা অব্যহত ছিল মাত্র। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় নাট্যরীতিতে তখনো মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক নাটক রচনা আরম্ভ হয় নি। তাই কেবল মিলনান্তক নাটক রচনার যুক্তি গ্রহণীয় নয়। তৃতীয়তঃ গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হয়েছিল ঠিক। কিন্তু সে ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের পার্থক্যও ছিল অনেক। চতুর্থতঃ গুপ্ত সাহিত্য-শিল্প-ভাস্কর্যে উচ্চশ্রেণীর রুচিবোধের প্রকাশ পেয়েছে এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে সাধারণ লোকের অবসর বিনোদনেরও নানা ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান ছিল। ফা হিয়েন এই সব ব্যবস্থা ও বিনোদনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। পঞ্চমতঃ গুপ্ত সংস্কৃতির বিকাশে উচ্চ শ্রেণীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যুক্তিহীন। কেননা যে কোন নবজাগরণের ক্ষেত্রে সমাজের বিদগ্ধ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। ইউরোপীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বা অভিনব কিছু হয় নি।

॥ গুপ্ত সাহিত্য ॥

গুপ্ত যুগে সাহিত্যে যে অসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল তার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। ম্যাকসমূলার তাই গুপ্ত যুগ সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সংস্কৃত ভাষা কখনোই উপেক্ষিত ছিল না। তাই পুনরুত্থানের প্রশ্ন আসে না। তবে গুপ্ত সম্রাটগণ এই ভাষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের ফলে অবশ্যই বৈদিক সংস্কৃতের তুলনায় অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল এবং সমৃদ্ধও হয়েছিল।

সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ অগ্রগতিতে সর্বাধিক অবদান মহাকবি কালিদাসের। ডঃ দেবস্থলি বলেছেন সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য কালিদাসের প্রতিভার আলোক-বিচ্ছুরণে আলোকিত হয়েছে।[৩১] নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সংস্কৃতে ভারতীয় কাব্য-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ। তাঁর রচিত অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্ ইউরোপীয় সাহিত্য জগতেও

[৩০] The Gupta emperors became the symbols of a tremendous national upsurge. Life was never happier, our culture never more creative than during the golden prime of India. — K. M. Munshi.

[৩১] Kalidas the most brilliant luminary of the Gupta Age shed his lustre on the whole of Sanskrit litarature." —Dr. Devasthali.

এক বিস্ময়। তাঁর অন্যান্য রচনা রঘুবংশম্ মেঘদূতম্ কুমারসম্ভবম্ ইত্যাদি। তাঁর রচনার সর্বাধিক আকর্ষণীয় দিক হল মনোরম উপমার অনুপম প্রয়োগ।

গুপ্ত যুগের অন্যান্য সাহিত্যকারগণ হলেন মুদ্রারাক্ষস নাটকের রচয়িতা বিশাখদত্ত, মৃচ্ছকটিকম্ নাটকের রচয়িতা শূদ্রক, কিরাত অর্জুনীয়মের রচয়িতা ভারবি। এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনও ছিলেন কবি। গদ্যসাহিত্যে বিষ্ণুশর্মা রচনা করেন পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী। দণ্ডিন ছিলেন এই সময়ের সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার। অমর সিংহ রচনা করেন ছন্দাকারে সংস্কৃত অভিধান।

॥ বিজ্ঞান ॥

বিজ্ঞানের অনুশীলনেও গুপ্ত যুগের বৈজ্ঞানিকদের অবদান আজও ভারতবর্ষ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বাণভট্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। বরাহমিহির ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী আর্যভট্টই প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান এবং আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি।

॥ দর্শন ॥

গুপ্ত যুগে দার্শনিক চিন্তারও অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছিল। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন এই সময় অনেক নতুন দার্শনিক চিন্তার জন্ম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র রচনার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে গুপ্ত যুগকে। দার্শনিক ঈশ্বরকৃষ্ণ রচনা করেন সাংখ্য দর্শন। আসঙ্গ রচনা করেন নাগাচার শাস্ত্র। বসুবন্ধু রচনা করেন পরমার্থ সপ্ততি। পক্ষিল স্বামিন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। দিন্নাগাচার্য বৌদ্ধ দর্শন ব্যাখ্যা করেন। শংকরের গুরু গৌড়পাদ তাঁর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তবাদ তত্ত্ব এই সময়ই প্রচার করেন। ধর্মীয় সাহিত্যে বৃহস্পতি স্মৃতি, নারদ স্মৃতি, দেবল স্মৃতি প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয় এই সময়। পুরাণ ও খুব সম্ভব মহাভারতও এই সময় পুনর্লিখিত হয়।

॥ ধর্মীয় বিবর্তন ॥

গুপ্তযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই সময় শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। ফলে যে নতুন হিন্দুধর্মের সৃষ্টি হয় তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত। বৈদিক দেবতাদের পরিবর্তে নতুন দেব-দেবী যথা শিব, বিষ্ণু, কার্তিক, গণেশ স্থান গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম পুরাতন ও নতুন ধারণার সম্মিলনে এক বিরাট সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত হয়।[৩২] এই সময়ই তন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে দেবতার তুলনায় দেবীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। পূজানুষ্ঠানে যজ্ঞ থাকলেও তার পুরানো গুরুত্ব হ্রাস পায়। আড়ম্বরের চেয়ে ভক্তিই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে। মূর্তি পূজার ব্যাপক প্রচলনও হয় এই সময়।

বৌদ্ধধর্মেও এই সময় বজ্রযান মতবাদের উত্থান ঘটে। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মেও তন্ত্রের মতবাদ স্থান লাভ করে। বুদ্ধের পুনর্জন্মের মতবাদ গৃহীত হবার ফলে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের দূরত্ব হ্রাস পায়।

॥ গুপ্ত শিল্পকলা ॥

সাহিত্যের মত শিল্পকলার চর্চায়ও গুপ্তযুগের সাফল্য বিস্ময়কর। ভিনসেন্ট স্মিথ এই সাফল্যকে বলেছেন অসাধারণ।[৩৩]

[৩২] It was a vast mosaic of various patterns combining the religious ideas of both Old and New. — Dr. R. K. Mukherjee.

[৩৩] The three closely allied arts of architecture, sculpture and painting attained an extra-ordinary high points of achievements. — V. Smith.

স্থাপত্য শিল্পে গুপ্তযুগের প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে গুহামন্দিরের নির্মাণকৌশলে। অজন্তা, ইলোরা, বাঘ গুহার নির্মাণে পাহাড় কেটে চৈত্য বা বিহার নির্মাণ গুপ্ত-যুগেই আরম্ভ হয়। মন্দির নির্মাণে ইঁট, পাথর প্রভৃতি স্থায়ী উপকরণের ব্যবহার এর আগে হত না। নির্মাণশৈলীর তিনটি ভাগ ছিল। যথা প্রথমে প্রধান ফটক পেরিয়ে প্রশস্ত অঙ্গন, তারপর ভক্তজনের সমাবেশের জন্য নাটমন্দির, সর্বশেষে বিগ্রহের অধিষ্ঠানের জন্য গর্ভগৃহ। মন্দিরের চারপাশে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। এই যুগেই প্রথম মন্দিরের চূড়া নির্মাণ প্রচলিত হয়। মধ্য প্রদেশের তিগওয়ার বিষ্ণু মন্দির, উত্তর প্রদেশের অজয়গড়ের পার্বতী মন্দির, সাতনার একলিঙ্গ শিব মন্দির, কানপুরের কাছে ভিতরগাঁওয়ের মন্দির গুপ্ত স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভাস্কর্য শিল্পে গুপ্তযুগের কৃতিত্ব হল বৈদেশিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ভারতীয় শৈলী গড়ে তোলা। সারানাথের বুদ্ধ মূর্তি গুপ্ত ভাস্কর্যের চমৎকার উদাহরণ। গান্ধার শিল্পরীতির বিদেশী প্রভাব মুক্ত হয়ে মথুরা শিল্পরীতির পার্থিবতা ও অমরাবতী শিল্পরীতির ইন্দ্রিয়তা অতিক্রম করে গুপ্ত ভাস্কর্য এক অতীন্দ্রিয় স্তরে উত্তীর্ণ হয়। তাই গুপ্তযুগের মূর্তি যেন হৃদয়ে পরমজ্ঞানের উদ্ভাসে মৃদু হাস্যযুক্ত ও অর্ধনিমীলিত। মূর্তির সামগ্রিক অঙ্গ-সৌষ্ঠবে এক কোমল পেলবতা।

গুপ্ত চিত্রকলার অনবদ্য প্রকাশ অজন্তার গুহাচিত্র যার চিরন্তন আবেদনে আজও বিশ্ববাসী বিধুর। এই সব চিত্রে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা সুখ নানা দুঃখ কথা প্রতিফলিত।

ধাতুশিল্পেও গুপ্তযুগ কম উন্নত ছিল না। দিল্লীর নিকটস্থ মেহেরউলী লৌহ-স্তম্ভে কখনো মরিচা পড়ে নি। এই স্তম্ভের মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য দেখে লৌহ নির্মিত বলে মনেই হয় না। মুদ্রা নির্মাণেও গুপ্ত সম্রাটগণ যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।

স্মিথ বলেন গুপ্ত যুগে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে অনায়াস সাফল্য তা সম্ভব হয়েছিল বৈদেশিক প্রভাবে। নিঃসন্দেহে বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গুপ্ত-যুগে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু কেবল সেই জন্যই এই সাংস্কৃতিক বিকাশ এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না। আসলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সৃষ্টির মানসিকতাই গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক সাফল্যকে নিশ্চিত করেছিল। হয়তো বৈদেশিক সম্পর্ক সেখানে অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। ব্যাশম বলেছেন গুপ্ত ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাব থাকলেও মূলতঃ তা ছিল ভারতীয়। সুতরাং গুপ্ত সম্রাটদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়, জনগণের অন্তরের তাগিদে এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির আনুকূল্যে গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক সাফল্য ভারতবাসীর চিরকালীন অনুপ্রেরণার উৎসবিন্দু।

Struggle for Domination

(a) North India—(i) Reference to the Hunas—Yasodharman.

(ii) Rise of Gouda under Sasanka, his relations with Bhaskarvarman of Kamrupa, and Harshabardhan of Thaneswar and Kanauj.

(iii) Conquests of Harshabardhan—limits of his kingdom—account of Huan-tsang.

(iv) Rise of the Pratihara and Pala empires—brief reference—to the tripartite struggle and its outcome.

(v) Important Pala and Sena rulers—Dharmapala-Devapala-Mahipala I—Rampala, Vijay Sen and Lakshman Sen.

(b) Deccan—(i) the early Chalukyas of Badami

(ii) Achievements of Pulakesi II

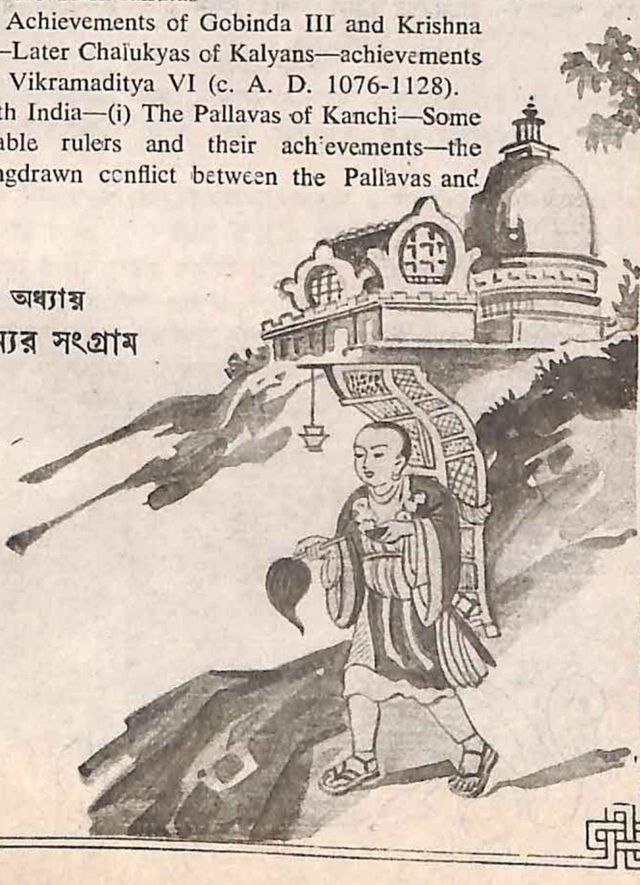
(iii) the Rashtrakutas

(iv) Achievements of Gobinda III and Krishna III—Later Chalukyas of Kalyans—achievements of Vikramaditya VI (c. A. D. 1076-1128).

(c) South India—(i) The Pallavas of Kanchi—Some notable rulers and their achievements—the longdrawn conflict between the Pallavas and

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাধান্যের সংগ্রাম



and Chalukyas.

(ii) The Cholas of Tanjore.

(iii) Achievements of Rajarja I and Rajendra I with special reference to their overseas campaigns.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

হূণ আক্রমণ—যশোধর্মণ—গৌড়ের ইতিহাস: শশাংক—হর্ষ-বর্ধন: রাজ্য জয়—রাজ্যসীমা—হিউয়েন সাং-এর বিবরণ—প্রতিহার ও পালদের উথান: প্রতিহার বংশ—পাল বংশের উথান—ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব—বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজাগণ: ধর্মপাল—দেবপাল—প্রথম মহীপাল—রামপাল—বিজয় সেন— লক্ষ্মণ সেন-দাক্ষিণাত্য: বাতাপির চালুক্য বংশ—দ্বিতীয় পুলকেশী—রাষ্ট্রকূটগণ: তৃতীয় গোবিন্দ—তৃতীয় কৃষ্ণ— কল্যাণের চালুক্য বংশ: ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য—সুদূর দক্ষিণ: কাঞ্চীর পল্লবগণ—তাঞ্জোরের চোল বংশ: প্রথম রাজরাজ—প্রথম রাজেন্দ্র চোল।

হূণ আক্রমণ

মধ্য এশিয়া হল হূণদের আদি বাসস্থান। পরে তারা চীন-সীমান্তে চলে আসে। তাদের একাংশ রাশিয়া অতিক্রম করে ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। অপর অংশ যাদের নাম অ্যাপথেলাইট বা শ্বেত হূণ পারসিক ও ভারত সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়। তখন ভারতে গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের শাসনকাল। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের নৈপুণ্যে ও সমর কুশলতায় হূণগণ পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে হূণগণ আর ভারত আক্রমণে সাহসী হয় নি।

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষার বিষয়ে পুনরায় উদাসীন হয়ে যান। ফলে তোরমানের নেতৃত্বে হূণগণ ভারতের অভ্যন্তর অবধি অগ্রসর হয়। কিন্তু এই সাফল্য হূণরা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি। গ্রীক লেখক কোসমাসের রচনা থেকে জানা যায় এই সময় হূণগণ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে রাজত্ব করতো। অনেকে মনে করেন মালবের গুপ্ত শাসনকর্তা ভানুগুপ্ত ও তাঁর সামন্ত গোপরাজ হূণদের পিছু হঠতে বাধ্য করেন। যাই হোক তোরমান হূণ হলেও ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তাঁর মুদ্রায় ছিল সূর্যের প্রতীক।

তোরমানের পর বিখ্যাত হূণ আক্রমণকারী হলেন মিহিরকুল। তোরমানের সংগে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ভারতীয় সূত্র অনুসারে মিহিরকুল ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু। গ্রীক লেখক কোসমাস ও কলহনের রচনা থেকেও মিহিরকুলের এই পরিচয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর মুদ্রা থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি ছিলেন শৈব। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সংহারকারী রূপেই তাঁকে বৌদ্ধ লেখকরা চিত্রিত করেছেন। বৌদ্ধ সূত্র অনুসারে তাঁর রাজধানী ছিল পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে।

পাঞ্জাব থেকে মিহিরকুল চেয়েছিলেন রাজপুতনা ও মালবের উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে। ফলে তাঁর সঙ্গে গুপ্ত সম্রাট ও তাঁর সামন্তদের সংগে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। জানা যায় ভানুগুপ্তের সামন্ত কোপরাজ মিহিরকুলের সংগে যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু গুপ্তদের আরেক সামন্ত যশোধর্মন মিহিরকুলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বালাদিত্য বা নরসিংহ গুপ্তর সংগেও মিহিরকুলের সংঘর্ষ হয়েছিল। কারণ যশোধর্মনের মৃত্যুর পর যখন মিহিরকুল আরেকবার আক্রমণ করেন তখন গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্যই সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। এর পরে মিহিরকুলের ক্ষমতা পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

॥ যশোধর্মন ॥

মালবের গুপ্ত সামন্ত যশোধর্মন হূণ বিজেতা হিসেবেই সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হলে যশোধর্মন আপন প্রাধান্য বিস্তার করে স্বাধীনতা ঘোষণায় সচেষ্ট হন। মান্দাসোর লিপি অনুসারে তিনি গৌড়, উড়িষ্যা হয়ে পূর্বঘাট পর্যন্ত রাজ্য জয় করেন। ঐ লিপিতে দাবী করা হয়েছে যে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল রাজ্য জয় করেন। কিন্তু মান্দাসোর লিপির সমর্থনসূচক অন্য কোন সূত্র পাওয়া যায় না। তাই ঐতিহাসিকগণ যশোধর্মনের প্রকৃত সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে একথা ঠিক যশোধর্মন যা কিছুই অর্জন করুন না কেন তা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সংগেই শেষ হয়ে যায়।

॥ গৌড়ের ইতিহাস ॥

॥ শশাঙ্ক ॥

গুপ্ত বংশের পতনের পর বাংলায় গৌড় ও বঙ্গ নামে দুটি রাজ্যের উদ্ভব হয়।

গৌড় ছিল উত্তর ও পশ্চিমবাংলা নিয়ে গঠিত। আর দক্ষিণ ও পূর্ববাংলা নিয়ে বঙ্গ। উভয় রাজ্যের সীমানার রকমফের অবশ্য ঘটেছে মাঝে-মধ্যেই। তবে তখন থেকে পুরাতন নামগুলির পরিবর্তে গৌড় ও বঙ্গ এই নাম দুটিরই ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হলে গৌড়ের অধিকার নিয়ে মৌখরী বংশের সঙ্গে গুপ্ত বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। তখন পর্যন্ত গৌড়ের উপর গুপ্ত বংশের প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্ত কলচুরি শক্তির হাতে পর্যুদস্ত হলে গৌড়ের উপর গুপ্তদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায়। সেই সুযোগে শশাংক গৌড় অধিকার করে নেন।

শশাংকের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কারণ তখন বাংলা কেবল একটি স্বাধীন রাজ্যই ছিল না, উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ছিল এক স্বীকৃত শক্তি।

কিন্তু শশাংকের রাজত্বকালের কোন নিরপেক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে জানার সূত্র হল হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট ও চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং-এর রচনা। উভয়েই ছিলেন হর্ষ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত। সুতরাং শশাংক সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

শশাংকের বংশপরিচয় নিয়েও রয়েছে নানা সংশয়। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে গুপ্ত বংশোদ্ভূত বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। কিন্তু ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই মত সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। তবে বর্তমানে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন শশাংক ছিলেন মহাসেন গুপ্তের সামন্ত। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ নগরে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় এই নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

বঙ্গের উপর শশাংকের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে তিনি প্রথমে সমগ্র বাংলার উপর আপন আধিপত্য স্থাপন না করে বহির্বাংলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবেন না। কারণ সেই সময় বাংলার প্রাকৃতিক সীমা বলতে বোঝাতো পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে শোণ ও গন্ডক উপত্যকা, দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ ও উত্তরে হিমালয়। এই সীমা অর্জিত না হলে রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা থেকে যায় সর্বদাই। তাই শশাংকের রাজ্য বিস্তার নীতির মূল লক্ষ্যই ছিল বাংলার এক সুরক্ষিত প্রাকৃতিক সীমা অর্জন।

দুবি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় গৌড়রাজ কামরূপের ভাস্করবর্মাকে পরাজিত করে বন্দী করেন। যদিও ঐ লিপিতে শশাংকের নামোল্লেখ নেই তবে গৌড়রাজ বলতে তাঁকেই বোঝায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দক্ষিণে যে তিনি দন্ডভুক্তির রাজাকে পরাজিত করে উড়িষ্যা জয় করেছিলেন তার সপক্ষে বহু প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন।

এইবার শশাংককে দৃষ্টি দিতে হল পশ্চিমে। কারণ এদিকে কনৌজরাজ মৌখরী-গণ দীর্ঘকাল যাবৎই গৌড় অধিকারে সচেষ্ট ছিল। শশাংকের সময় থানেশ্বরের শক্তিশালী রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণের বিবাহ হলে স্বভাবতঃই থানেশ্বর-কনৌজ মৈত্রী গড়ে ওঠে। এই মৈত্রী ছিল গৌড়ের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শশাংক মালবের দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আর তা সহজেই সম্ভব হয়। কেননা মালব ছিল থানেশ্বরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

এরপরই শশাংক মগধ জয় করেন এবং বারাণসী পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় শশাংকর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হলে কনৌজ-থানেশ্বর মৈত্রীতে কিছুটা তাৎক্ষণিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং সেই সুযোগে শশাংক ও দেবগুপ্ত যুক্তভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন। গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হলেন। ততক্ষণে থানেশ্বরের রাজা হয়েছেন প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন। সিংহাসনে বসেই রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করেন এবং দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি শশাংকের হাতে নিহত হন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু নিয়েও নানা বিতর্ক। কেউ কেউ বলেন রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হয় যুদ্ধে। কেউ কেউ বলেন শশাংক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। রাজ্যবর্ধনের পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন।

এই সময় হর্ষবর্ধনের সঙ্গে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার মিত্রতা স্থাপিত হয়। কিন্তু হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাংকের যুদ্ধের ফলাফল নিয়েও নানামত। কেউ কেউ বলেন হর্ষ শশাংককে পরাজিত করেছিলেন।

তবে ডঃ রমেশ মজুমদার, স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিক মনে করেন মৃত্যু পর্যন্ত শশাংকের শক্তি অব্যাহত ছিল। হিউয়েন সাং-ও প্রকারান্তরে তা স্বীকার করেছেন। লক্ষণীয় হল বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং—কারো রচনাতেই হর্ষের হাতে শশাংকের পরাজয়ের কথার উল্লেখ নেই। অথচ এত বড় ঘটনা ঘটলে তা উল্লিখিত হতই। তাই অনেকে বলেন হর্ষ সম্ভবতঃ শশাংককে পরাজিত করতে পারেন নি। তবে শশাংকের পুত্র মানবদেব হর্ষ ও ভাস্করবর্মার সম্মিলিত বাহিনীর কাছে যে পরাজিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ হর্ষবর্ধন ॥

॥ রাজ্য জয় ॥

থানেশ্বর রাজ্যের এক সংকটময় মুহূর্তে হর্ষবর্ধন সে রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি শুধু সেই সংকটের অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণই হন নি, বরং স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ইতিহাসে অমরত্বের আসন লাভ করেছেন।

একদিকে থানেশ্বরের সংকট, অন্যদিকে পরম মিত্র রাজ্য কনৌজের শূন্যতা, তদুপরি তাৎক্ষণিক কতগুলো জরুরী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপরিহার্যতা—সকল ক্ষেত্রেই হর্ষবর্ধন অসাধারণ রাজনৈতিক স্থৈর্য এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিলেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার মুহূর্তেই।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণের পরই হর্ষবর্ধন তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রীর পক্ষে তাঁর মৃত স্বামী গ্রহবর্মণের রাজ্য কনৌজ অধিকার করেন। ডঃ ত্রিপাঠি অবশ্য বলেছেন যে কনৌজের অমাত্যদের অনুরোধেই হর্ষবর্ধন কনৌজ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্তমানে এই অভিমত পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কনৌজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই হর্ষবর্ধনের রাজ্য বিস্তারের সূচনা।

প্রথমেই তিনি গৌড়রাজ শশাংকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রার ফলশ্রুতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। বরং প্রমাণিত হয়েছে শশাংক নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যু পর্যন্ত আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে শশাংকের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা ছিল অর্থহীন।[১] তবে তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে

[১] From the point of view of permanent results, Harsha's campaign against Sasanka was futile.

— R. C. Majumdar.

শশাংকের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায় যে শশাংকর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন উড়িষ্যা, মগধ ও পশ্চিম বাংলা জয় করেছিলেন। পশ্চিম ভারতে তিনি বল্লভী রাজ্য অধিকার করার চেষ্টা করেন। কারণ গুজরাটের গুর্জর ও রাজপুতনার মালব সহ বল্লভীর সঙ্গে হর্ষের বিবাদ ছিল। এই রাজ্যগুলি চালুক্যরাজ পুলকেশীর সহায়তায় হর্ষকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টায় ছিল। বল্লভীরাজ ধ্রুবসেন হর্ষের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু গুর্জর-রাজের সহায়তায় নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। পরে তিনি হর্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। নানা সূত্র থেকে জানা যায় হর্ষ কাশ্মীর অভিযানও করেছিলেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।



হর্ষবর্ধন

হর্ষ যখন উত্তর ভারতে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে ব্যস্ত তখন দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী দাক্ষিণাত্যে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। তাছাড়া পুলকেশীর প্রভাব উত্তর ভারতেও বিস্তৃত হচ্ছিল। তাই হর্ষের পক্ষে তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামা ছাড়া বিকল্প ছিল না। কিন্তু নর্মদার তীরে উভয়ের পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাতে হর্ষের পক্ষে পুলকেশীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং দক্ষিণ ভারতে হর্ষের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ব্যাহত হয়।

॥ রাজ্যসীমা ॥

হর্ষের রাজ্যসীমা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন। হিউয়েন সাং লিখেছেন হর্ষ পাঞ্জাব, কনৌজ, বাংলা, দ্বারভাঙ্গা ও উৎকলের অধিপতি ছিলেন। বাণভট্টের বক্তব্য অনুসারে হর্ষ সমগ্র ভারতে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক ঘোষণাপত্র জারী করেছিলেন। চালুক্য বিবরণীতে হর্ষ 'সকল উত্তরাপথ নাথ' বলে অভিহিত।

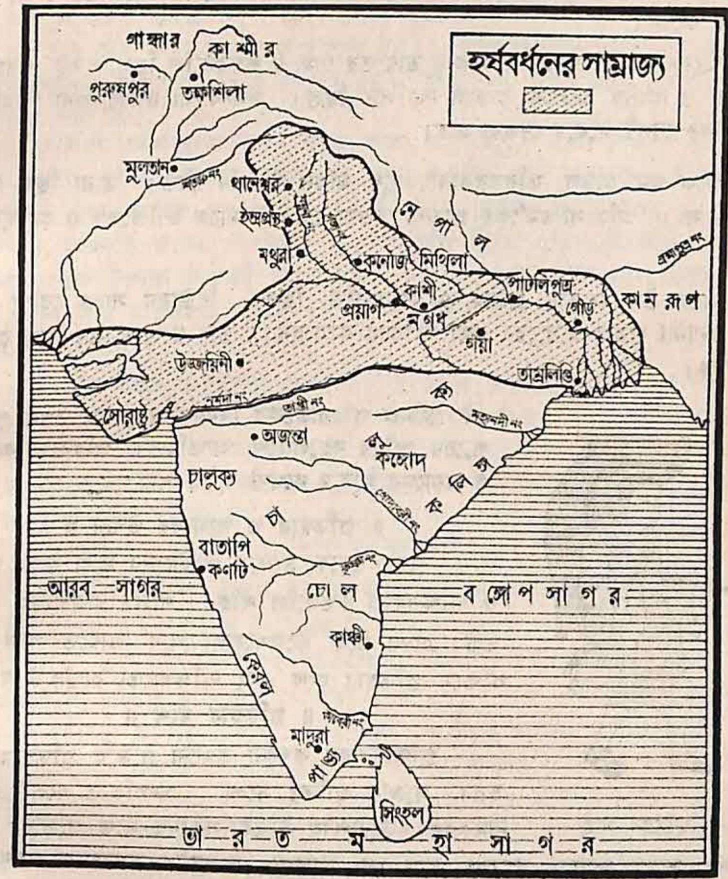
আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁকে উত্তর ভারতের সার্বভৌম অধিপতি বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২] পাণিক্কর এটিংহাউজেন প্রভৃতি এই মত সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে শেষ হিন্দু সম্রাট বলে চিহ্নিতও করেছেন। আবার রমেশ মজুমদার সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি হিসেবে হর্ষকে চিহ্নিত করতে চান না।

সাধারণভাবে বলা যায় হর্ষ উত্তাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন থানেশ্বর। পরে অধিকার করেন কনৌজ। কিন্তু মগধ, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা তিনি জয় করলেও এগুলি তাঁর রাজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল, না সামন্ত রাজ্য ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যদি ধরেও নেওয়া যায় এই রাজ্যগুলি তিনি নিজ শাসনাধীনে রেখেছিলেন তাহলেও কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট রাজপুতনা, নেপাল, উত্তর ও পূর্ব বাংলা ও কামরূপ তাঁর রাজ্যের বাইরেই ছিল। এক্ষেত্রে হর্ষকে সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি কখনোই বলা যায় না। দক্ষিণ ভারতে তিনি অগ্রসরই হতে পারেন নি। তবে তাঁর রাজ্যের সীমার তুলনায় তাঁর প্রভাব যে সমসাময়িক ভারত-

২ With all possible reservations it cannot be doubted that Harsha achieved the proud position of being the paramount soveriegn of the whole of Northern India.

— R. K. Majumdar.

বর্ষে অনেক ব্যাপক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।



॥ হিউয়েন সাং-এর বিবরণী ॥

বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল তিনি এদেশে অতিবাহিত করেন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন।

ভারতে তাঁর অভিজ্ঞতা সি-ইউ-কাই নামক গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেন। শুধু হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেই নয়, তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জানার জন্য হিউয়েন সাং-এর বিবরণী এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই স্মিথ মনে করেন যে এই বিবরণীর কাছে ভারতের ইতিহাসের ঋণ অপরিসীম।

হিউয়েন সাং লিখেছেন শাসক হিসেবে হর্ষ সর্বদাই প্রজাদের সঙ্গে সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতেন। তিনি নিয়মিত শহরে ও গ্রামে ভ্রমণ করতেন। হিউয়েন সাং জানাচ্ছেন হর্ষ তাঁর আদায়ীকৃত রাজস্ব চারভাবে খরচ করতেন। যথাঃ রাজ্যশাসন ও ধর্মীয় উপাসনার জন্য, কর্মচারী বেতন ও ভরণপোষণ বাবদ, বুদ্ধিজীবী ও গুণী-দের বৃত্তিদানের জন্য, ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দান হিসেবে। তিনি হর্ষের বিশাল সৈনাবাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাং-এর প্রভাবেই হর্ষ মহযান

বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হন এবং তাঁর সম্মানেই হর্ষ কনৌজে এক বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেন।

হিউয়েন সাং দেখেছেন তখনকার ভারতের গ্রাম ও শহরগুলি ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন। বাসগৃহ ও বাজার আলাদা অঞ্চলে স্থাপিত ছিল। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্নতার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত।

লোকে গম, চাউল, তরিতরকারী, দুধ, মাখন ইত্যাদি খেত। তারা ছিল পরিশ্রমী ও সৎ। অহিংসা ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। সমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল।

সমাজে উচ্চ শ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। হিউয়েন সাংও বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শূদ্ররা ছিল কৃষক-শ্রেণীভুক্ত।



হিউয়েন সাঙ

এই চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ অনুসারে তখন পাটলীপুত্রের গৌরব বহুলাংশে অস্তমিত। পরিবর্তে কনৌজ ও প্রয়াগের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

॥ প্রতিহার ও পালদের উত্থান ॥

৭৫০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যে কতগুলি শক্তি- শালী রাজশক্তির উত্থান ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ব ভারতে পাল বংশ, পশ্চিমে প্রতিহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট বংশ।

॥ প্রতিহার বংশ ॥

প্রতিহারদের কখনো কখনো গুর্জর প্রতিহার বলা হয়। গুর্জর জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই এরূপ নামকরণ। ইউরোপীয় ইতিহাসিকদের মতে গুর্জর জাতি হূণদের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে লীন হয়ে যায়। প্রতিহারগণ অবশ্য নিজেদের রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের বংশধর বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই দাবীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

হরিশ্চন্দ্র ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী রাজা প্রথম নাগভট্ট আরব বাহিনীকে প্রতিহত করে খ্যাতি লাভ করেন। মালব, গুজরাট ও রাজপুতনার কিছু অংশ নিয়ে তাঁর রাজ্য স্থাপিত হয়।

এরপর সিংহাসনে বসেন বৎসরাজ। গাঙ্গেয় উপত্যকার কনৌজের অধিকার রক্ষায় তিনি পাল ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। তিনি পালদের পরাজিত করলেও রাষ্ট্রকূটদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টও পিতার নীতি অনুসরণ করে কনৌজ থেকে চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। মুঙ্গেরের যুদ্ধে পালরাজা ধর্মপালকে বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধে রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত হন। তবুও দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহারদের এক সর্বভারতীয় শক্তিতে পরিণত করেন।

দ্বিতীয় নাগভট্টের পর রামভদ্র রাজ্যভার পান। পরবর্তী রাজা প্রথম ভোজ বা

মিহির ভোজই ছিলেন প্রতিহার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রথমে প্রতিহার শক্তিকে সুসংহত করার দিকে নজর দেন। এরপর তিনি কালাঞ্জর ও দক্ষিণ রাজপুতনা জয় করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু সেখানে দেবপালের কাছ থেকে বাধা পেয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। সেখানেও রাষ্ট্রকূটদের প্রবল প্রতিরোধে সাফল্য পান না।

এর মধ্যে দেবপালের মৃত্যু হলে পাল শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্রকূটরাও চালুক্যদের সঙ্গে বিবাদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই সুযোগে ভোজ পালদের পরাজিত করে কনৌজ জয় করেন। রাষ্ট্রকূটদের পরাস্ত করে মালব ও গুজরাটের একাংশ অধিকার করেন। পাঞ্জাব ও অযোধ্যাও তিনি দখল করেন। ফলে উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য তিনি গঠন করেন। তাঁর শাসনকালে আরব পর্যটক সুলেমান তাঁর রাজসভায় আসেন। তিনি মিহির ভোজের শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

পরবর্তী রাজা মহেন্দ্রপাল মোটামুটি প্রতিহার প্রাধান্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। মহেন্দ্রপাল ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী। মহেন্দ্রপালের পর দ্বিতীয় ভোজ ও তারপর মহীপাল প্রতিহার সিংহাসনে বসেন। মহীপালের শাসনকালে রাষ্ট্রকূটদের প্রবল আক্রমণে প্রতিহারদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ঐ ক্ষতি পূরণ করে তাঁদের পুনরুত্থান আর সম্ভব হয় নি।

॥ পাল বংশের উত্থান ॥

শশাংকের মৃত্যুর পর থেকে বাংলায় দীর্ঘ এক শতককালব্যাপী এর চরম অরাজক অবস্থা চলছিল। তদুপরি বৈদেশিক আক্রমণ এখনকার জনজীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতেই খলিমপুর তাম্রপট্টলিপি থেকে জানা যায় বাংলার 'প্রকৃতিপুঞ্জ' বাংলার সিংহাসনে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে অস্থির জনজীবনে স্থিরতা আনতে উদ্যোগী হয়। এই গোপালই হলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রকৃতিপুঞ্জ বলতে সম্ভবতঃ তখনকার বাংলার সামন্তদের কথাই বলা হয়েছে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন অরাজকতায় অস্থির হয়েই।

গোপালের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি তাঁর মৃত্যুর আগেই সমগ্র বাংলায় তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। গোপালের পরবর্তী রাজা ধর্মপালের সময় থেকে আরম্ভ হয় উত্তর ভারতের বিখ্যাত ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব।

॥ ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব ॥

হর্ষের সময় থেকেই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মর্যাদার প্রতীক রূপে গৃহীত হয় কনৌজের উপর আধিপত্য, ঠিক যে মর্যাদা পরবর্তীকালে দিল্লী ভোগ করে। অষ্টম শতকের শেষার্ধ থেকেই পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণ পরস্পরের সঙ্গে এক দীর্ঘ মেয়াদী আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয় কনৌজের অধিকার নিয়ে। রাজনৈতিক দিক ছাড়াও কনৌজের অন্য গুরুত্বও ছিল। কনৌজ অধিকারের অর্থ ছিল উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকার সমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিকার লাভ।

প্রথমে প্রতিহার রাজ বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। কিন্তু গুজরাট ও মালব জয় করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হয়ে ধর্মপালকেও পরাস্ত করেন। তথচ এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরেও ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। এর থেকে মনে হয় তিনি কনৌজ অধিকারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি কেবল প্রতিহারদের ক্ষমতা খর্ব করতেই উৎসাহী ছিলেন।

এর মধ্যে ধর্মপাল পুনরায় নিজ শক্তিকে সংহত করে কনৌজ অধিকারে অগ্রসর হন। তিনি কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে চক্রায়ুধকে তাঁর সামন্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু ধর্মপালের এই সাফল্যও দীর্ঘস্থায়ী হল না। কেননা দ্বিতীয় নাগভট্টের নেতৃত্বে প্রতিহারগণ সংহত হয়ে কনৌজ থেকে চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করে। নাগভট্ট ধর্মপালকে মুঙ্গেরের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পুনরায় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে নাগভট্ট পরাজিত হলে প্রতিহারদের কনৌজ অধিকারে রাখার প্রয়াস বানচাল হয়ে যায়।

আবার রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল কনৌজের অধিকার পুনরুদ্ধার করেন। ধর্মপালের পর দেবপাল প্রতিহাররাজ রামচন্দ্র ও মিহির ভোজ উভয়কেই পরাজিত করে কনৌজের উপর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর পালশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্রকূটরাও দক্ষিণে চালুক্যদের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যায়। এই সুযোগে প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ কনৌজ থেকে পালদের বিধ্বস্ত করেন। তিনি রাষ্ট্রকূটদেরও পরাজিত করেন। পরবর্তী রাজা মহেন্দ্রপালও পরাস্ত করে কনৌজ বিধ্বস্ত করেন। এরপর তুর্কী আক্রমণে প্রতিহারগণ, চালুক্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রকূটগণ এবং চোল আক্রমণে পালগণ দ্রুত দুর্বল হয়ে যায়।

কনৌজের অধিকার নিয়ে ত্রি-শক্তির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রকৃতপক্ষে আত্মক্ষয়ী। লক্ষণীয় হল প্রায়ই একই সঙ্গে এই তিন শক্তির পতনও বিস্ময়কর নয়। কারণ ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় সামরিক খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার মেটানো তিন শক্তির পক্ষেই অসম্ভব হয়ে উঠছিল। তদুপরি ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় নিজ নিজ সামন্তদের সম্পর্কে তারা উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে সামন্তদের মধ্যে স্বাধীন হবার প্রবণতা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে। এই অবস্থায় তুর্কী ও চোল আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সামান্য সম্ভাবনাকেও ধূলিসাৎ করে দেয়। ফলে পুনরায় উত্তর ভারত কতগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

॥ বাংলার উল্লেখযোগ্য পাল ও সেন রাজাগণ ॥

॥ ধর্মপাল ॥

বাংলার পালবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল পালরাজ্যকে এক সর্বভারতীয় শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি তাঁর সমসাময়িক দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মপাল মগধ জয় করে প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এইবার তিনি বৎসরাজ প্রতিহারের কাজে পরাজিত হন। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুবর কাছেও পরাজিত হন। কিন্তু ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করেন।

ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে সামন্ত হিসেবে চক্রায়ুধকে অধিষ্ঠিত করেন। কনৌজে তিনি এক দরবারও অনুষ্ঠিত করেন। খলিমপুর লিপি থেকে এই দরবারে উপস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। যথাঃ ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কাংরা উপত্যকা ইত্যাদি। ডঃ মজুমদারের মতে বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের প্রত্যক্ষ শাসনে, আর বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ছিল তাঁর সামন্ত রাজ্য।

ধর্মপালের শাসনকালের শেষভাগে তাঁকে পুনরায় প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়। প্রতিহার রাজ নাগভট্ট সিন্ধু, বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে কনৌজ আক্রমণ করেন এবং চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। ধর্মপাল দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অগ্রসর হয়ে মুঙ্গেরের যুদ্ধে নাগভট্টের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় গুপ্ত ক্ষমতা উদ্ধার করেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালের শাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। সামরিক কুশলতার সঙ্গে কূটনীতির চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব সমগ্র উত্তর ভারতে সম্প্রসারিত করেছিলেন। এই জন্যই এক গুজরাটী কবি তাঁকে উত্তরাপথ স্বামী বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার বলেছেন যে কনৌজ শশাংকের পতনের কারণ হয়েছিল সেই কনৌজই ধর্মপালের সাফল্যের মূল বিন্দু এবং সেই সঙ্গে বাংলার এক ভারতীয় শক্তিতে পরিণত হবার স্বপ্নও চরিতার্থ হয়।°

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মগধের বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্ভবতঃ ওদন্তপুরী বিহারও তিনিই স্থাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম সম্পর্কেও ছিলেন উদারভাবাপন্ন। তাঁর মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। ফলে ঘটেছিল বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি।

॥ **দেবপাল** ॥

দেবপাল ছিলেন পিতা ধর্মপালের সুযোগ্য পুত্র। আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করে তিনি সাম্রাজ্যকে অধিকতর সম্প্রসারিত করেন। তাঁর এই কাজে তাঁকে সহায়তা করে-ছিলেন তাঁর মন্ত্রী দর্ভপাণি ও কেদারমিশ্র।

দেবপাল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী উৎকল, হূণ, দ্রাবিড় ও গুর্জরদের পরাস্ত করেন। মুঙ্গেরলিপি অনুসারে তিনি গাড়োয়াল ও কাম্বোজ জয় করেন। তিনি দ্রাবিড় দেশও অধিকার করেন। কামরূপও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে দেবপাল উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন। তিনি রামচন্দ্র ও মিহিরভোজকে পরাজিত করে প্রতিহারদের দুর্বল করে ফেলেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল পাঞ্জাব থেকে আসাম এবং কাশ্মীর থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত।

শুধু রাজ্যজয়েই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেবপালের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিদ্বানদের সমাদর করতেন। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন বৌদ্ধধর্মানুরাগী। রমেশ মজুমদার ধর্মপাল ও দেব-পালের রাজত্বকালকে বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মহান যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

॥ **প্রথম মহীপাল** ॥

পাল বংশের সংকটময়কালে প্রথম মহীপাল হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেন। তাই তাঁকে পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। উত্তরা-ধিকার সূত্রে তিনি কেবল মগধের সিংহাসন পান। কিন্তু আপন বাহুবলে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন।

মহীপাল উত্তর বাংলা এবং পূর্ব বাংলার একাংশ পুনরুদ্ধার করেন। ডঃ নীহার রায় মনে করেন মহীপাল দক্ষিণ রাধা, ভঙ্গ ও দণ্ডভুক্তি অধিকার করতে পারেন নি। তাছাড়া তিনি সমগ্র বিহার জয় করেন। সম্ভবতঃ বারাণসী পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

° The lure of the imperial city of Kanauj which proved the ruin of Sasanka's Kingdom, paved the way for his grand success and Bengal's dream of founding an empire in Northern India was at last fulfilled.
— R. C. Majumdar.

তাঁর শাসনকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল রাজেন্দ্র চোলের বাংলা দেশ আক্রমণ। এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল রাজেন্দ্র চোলের এক সেনাপতির দ্বারা এবং তা স্থায়ী ছিল দীর্ঘ দুই বৎসর কাল। অবশ্য যে সব অঞ্চলে চোল আক্রমণ হয়েছিল সেগুলি মহীপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। এই আক্রমণের উপর কোন গুরুত্ব দিতে চান না ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী। কেননা এই অভিযানের কোন স্থায়ী প্রতিক্রিয়া ছিল না। তবে অভিযানের একমাত্র পরোক্ষ ফল হল, চোল সেনাবাহিনীর সংগে আগত কিছু কর্ণাটকী সামন্ত বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এদের থেকেই পরবর্তীকালে সেন রাজবংশের উদ্ভব হয়। তবে মহীপালের রাজত্বকালের শেষভাগে ১০২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় কলচুরী আক্রমণ হয়। এই আক্রমণে মহীপালের রাজ্যের কিছু অংশ হস্তচ্যুত হয়।

মহীপাল শুধু পাল বংশের অনিবার্য পতনকেই স্তব্ধ করেন নি, তিনি রাজ্যের সীমানাও বহুদূর সম্প্রসারিত করে রাজবংশের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তাঁর শাসনকালেই সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেছিলেন। সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে ভারতীয় রাজাদের এক শক্তিজোট গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। মহীপাল সেই চেষ্টায় কোন আগ্রহ দেখান নি। তাই অনেকে তাঁকে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সংকীর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বলে নিন্দা করেছেন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, ইতিহাসের অনিবার্য নিয়ম অনুযায়ী উত্তর ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে বাংলার রাজার উদাসীন থাকা যে চলে না তা মহীপাল বুঝতে পারেন নি। ডঃ রমেশ মজুমদার অবশ্য ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছেন যে চোল ও কলচুরীদের আক্রমণ নিয়ে মহীপাল এতই বিব্রত ছিলেন যে অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু মহীপাল শাসক হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। উত্তর বাংলায় মহীপাল-গীত নামে যে লোকগাঁথার তখন যে ব্যাপক প্রসার হয়েছিল তা থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয়।

॥ রামপাল ॥

পালবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন রামপাল। সে সময় বরেন্দ্রভূমি ছিল কৈবর্তরাজ দিব্যের অধীনে। রামপাল অশেষ কষ্ট করে কৈবর্তদের হাত থেকে বরেন্দ্রভূমি পুণরুদ্ধার করেন। তাঁর সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে' তাঁর এই সাফল্যের কাহিনী বর্ণিত আছে।

এরপর রামপাল পূর্বঙ্গ পুণরুদ্ধার করে রাঢ় দেশের দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার সামন্তগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। এরপর তিনি উড়িষ্যা জয় করেন। তাছাড়া চালুক্য ও গাহড়বালদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রামপাল এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাংলাদেশের লুপ্ত শক্তি বহুলাংশে পুণরুদ্ধার করে তিনি নিজ শক্তির যথোচিত পরিচয় দেন। তাঁরই নেতৃত্বে তিনি এক সুদৃঢ় রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন।

॥ বিজয় সেন ॥

পালবংশের পর বাংলাদেশে সেন বংশের শাসনের সূচনা হয়। যদিও হেমন্ত সেনকে সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তথাপি হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনই ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা।

রামপালের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে বিজয় সেন আপন ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। প্রথমে তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে রাঢ় দেশে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তারপর তিনি দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন।

মিথিলার রাজা নান্যদেবকেও তিনি পরাজিত করেন। কলিঙ্গরাজ ও গৌড়রাজকেও পরাজিত করে তিনি কলিঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন। এইসব সাফল্যের ফলে সমগ্র বাংলাদেশে বিজয় সেনের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজয় সেনের এই সাফল্য শুধু কৃতিত্বপূর্ণই নয়, ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। কারণ সাধারণ সামন্ত থেকে সম্পূর্ণ নিজ শক্তিতে তিনি এক দৃঢ় সার্বভৌম রাজশক্তি গড়ে তোলেন। তাছাড়া পালবংশের পতনে বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য বিপর্যস্ত হবার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তাও তিনি প্রতিহত করেন।

॥ লক্ষ্মণ সেন ॥

১১৭৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের কয়েকটি তাম্রশাসন, সভাকবিদের প্রশস্তি ও মুসলমান ঐতিহাসিক মিনাজউদ্দীন রচিত 'তবকাতে-নাসিরী' প্রভৃতি থেকে লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে জানা যায়।

তাঁর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে তিনি গৌড় কলিঙ্গ কামরূপ ও কাশী জয় করেছিলেন। পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে তিনি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন।

সামরিক দিক থেকে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল কনৌজের গাহড়বাল বংশীয়দের বিরুদ্ধে। এরা মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ায় সেন-শাসনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্মণ সেন শুধু তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করেছিলেন তাই নয়, তাঁর রাজ্যসীমা মগধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের শাসনের শেষভাগে ১২০২ খৃষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন বখ্‌তিয়ার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। মিনাজউদ্দীন জানাচ্ছেন বখ্‌তিয়ার বণিকের ছদ্মবেশে ঢুকে সহজেই নদীয়া জয় করেন। লক্ষ্মণ এই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পালিয়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও রমেশ মজুমদার মিনাজউদ্দীনের বর্ণনা স্বীকার করেন না। তাঁদের মত হল লক্ষ্মণ সেন এই আক্রমণ প্রতিহত করতে যথারীতি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কিন্তু বখ্‌তিয়ার আকস্মিকভাবে আক্রমণের গতিপথ পরিবর্তন করায় লক্ষ্মণ সেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। যাই হোক এরপর লক্ষ্মণ সেন কয়েক বৎসর পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করার পর ১২০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

পিতার ন্যায় লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেব, ধর্মশাস্ত্রবিদ হলায়ুধ তাঁর রাজসভায় বিরাজ করতেন। তিনি নিজে 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থটি সংকলিত করেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব এবং 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

॥ দাক্ষিণাত্য ॥

॥ বাতাপির চালুক্য বংশ ॥

বাতাপির চালুক্যগণ চালুক্যদেরই একটি শাখা, যারা পশ্চিমী চালুক্য নামে পরিচিত।

চালুক্যদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। স্মিথ তাদের বিদেশী বলে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ তাদের সম্পূর্ণ এদেশীয় বলেই গ্রহণ করেছেন।

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই চালুক্যগণ পাদপ্রদীপের আলোর সম্মুখে আসে। তখন তাদের নেতা ছিলেন জয়সিংহ। তিনি সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করে বাতাপির কর্তৃত্ব লাভ করেন।

কিন্তু প্রথম পুলকেশীর সময় থেকেই চালুক্যগণ স্বাধীনভাবে বাতাপিতে রাজত্ব

করতে থাকে। তিনি ছিলেন একজন পরাক্রমশালী নরপতি। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

পিতার ন্যায় সমরকুশল ছিলেন পরবর্তী চালুক্যরাজ প্রথম কীর্তিবর্মণ। তিনি কাদম্ব ও মৌর্যগণকে পরাজিত করে কংকন, বেলারি ও কুর্ণল জেলা জয় করেন। উত্তরে তিনি বিহার ও বাংলাদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। দক্ষিণে তিনি চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলি দখল করেন।

কীর্তিবর্মণের পর তাঁর ভ্রাতা মঙ্গলেশ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হলে ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

॥ দ্বিতীয় পুলকেশী ॥

বাতাপির চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। কিন্তু মংগলেশ ও তাঁর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে চালুক্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু পুলকেশী যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আভ্যন্তরীণ সংকট থেকে রাজ্যকে মুক্ত করেন।

রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণে কাদম্ব ও মহীশূরের গঙ্গাবংশীয় রাজাদের পরাজিত করেন। উত্তরে কংকনের মৌর্যদের পরাজিত করে তাদের রাজধানী পুর দখল করেন। তাছাড়া মালব্য ও গুজরাটের রাজাদের তাঁর আনুগত্য স্বীকারে তিনি বাধ্য করেন।

কিন্তু গুজরাট জয়ের ফলেই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ডঃ রমেশ মজুমদার মনে করেন মালব, গুজরাট প্রভৃতি হর্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পুলকেশীর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং পুলকেশী এই সাহায্য দিলে তাঁর সংগে হর্ষের বিরোধ সূচিত হয়। বিরোধে পুলকেশী জয়যুক্ত হন এবং পরমেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের ফলে দক্ষিণে হর্ষের উচ্চাভিলাষ অন্তর্হিত হল।

এরপর তিনি দক্ষিণের পূর্ব উপকূলে পিথাপুরম, কুণাল, ইলোরা প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন এবং এই অঞ্চলের শাসনভার তাঁর ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধনের উপর অর্পণ করেন।

তিনি পল্লব রাজ মহেন্দ্র বর্মণকে পরাজিত করেন। চোল, কেরল ও পাণ্ড্যগুলিও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে দক্ষিণ ভারতের এক বিশাল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি তা নিজ শাসনাধীনে আনেন।

কিন্তু পুলকেশীর প্রভাব-প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। যে পল্লবদের তিনি একদা পরাজিত করেন সেই পল্লবদের পরবর্তী আক্রমণে তিনি পর্যুদস্ত হন এবং তাদের হাতেই পরাজিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর চালুক্য বংশের পতন আরম্ভ হয়।

হিউয়েন সাং দ্বিতীয় পুলকেশী সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, পরাক্রমশালী ও প্রজাহিতৈষী। ভারতের বাইরেও পুলকেশীর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে তিনি দূত ও পত্র বিনিময় করেছিলেন।

॥ রাষ্ট্রকূটগণ ॥

চালুক্য শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর দাক্ষিণাত্যে যে নতুন রাজশক্তির অভ্যুদয় হয় তা হল রাষ্ট্রকূটশক্তি। কিন্ত রাষ্ট্রকূটদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত। তবে সাধারণ-
নেতৃত্বে ঔরঙ্গবাদ বা ইলিচপুরে এক শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেন।

সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটগণ ছিলেন চালুক্যদের সামন্ত। ক্রমে তারা ইন্দ্রের
ভাবে মনে করা হয় তারা সম্ভবতঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন।

পরবর্তী শাসক দন্তিদুর্গ আরব আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজ ক্ষমতা বিস্তারে উদ্যোগী হন এবং গুর্জর-প্রতিহারদের পরাজিত করেন। তাঁর এই ক্ষমতা বিস্তারে বিচলিত হয়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং পরাজিত হন। ফলে দন্তি-দুর্গ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

পরবর্তী রাজা প্রথম কৃষ্ণের শাসনকালেও রাষ্ট্রকূটদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু ধ্রুবর শাসনকাল থেকে রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কারণ তখন থেকে রাষ্ট্রকূটগণ উত্তর ভারতের রাজনীতির আবর্তে যুক্ত হয় এবং আরম্ভ হয় ঐতিহাসিক ত্রিমুখী সংঘর্ষ।

॥ তৃতীয় গোবিন্দ ॥

ভ্রাতা ধ্রুবর মতই তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারত সম্পর্কে অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর শাসনের সূচনায় যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি চিরতরে নির্মূল করে উত্তর ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

সেখানে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট এবং পাল-রাজ ধর্মপাল। তিনি নাগভট্টকে পরাজিত করেন। ধর্মপাল বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি উত্তর ভারতে সর্বাধিক পরাক্রমশালী শাসকে পরিণত হন।

কিন্তু যখন তিনি উত্তর ভারতে ব্যস্ত তখন ভেঙ্গীর চালুক্য রাজ বিজয়াদিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গোবিন্দ দ্রুত তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গো, পল্লব, পান্ড্য ও কেরল গোবিন্দের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিলেন। গোবিন্দ এই ঐক্য প্রয়াস বানচাল করে দেন এবং পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী দখল করেন।

গোবিন্দ নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তিনি কখনোই পরাজিত হন নি। কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রকূটগণ তৃতীয় গোবিন্দের সাফল্যকে অক্ষুন্ন রাখতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় কৃষ্ণের শাসনকালে রাষ্ট্রকূট শক্তির পুনরুত্থান ঘটে।

॥ তৃতীয় কৃষ্ণ ॥

তৃতীয় কৃষ্ণ যথেষ্ট সমরকুশল রাজা ছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণে তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন।

দক্ষিণে তিনি মহীশূরের গঙ্গোদের পরাজিত করেন। উত্তরে প্রতিহারদের পরাজিত করে কালাঞ্জর ও চিত্রকূট দখল করেন। ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুদূর দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে তিনি কাঞ্চী ও তাঞ্জোর জয় করেন। এর ফলে চোলদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম হয়। ৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তোক্কোলমের যুদ্ধে চোলদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং রামেশ্বরে আপন বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন।

তিনি ভেঙ্গীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে ঐ রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যে পরি-ণত করেন। কথিত আছে সিংহল রাজও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। উত্তর ভারতে দ্বিতীয় অভিযান চালিয়ে তিনি মালব, উজ্জয়িনী জয় করেন এবং বুন্দেলখন্ড পর্যন্ত অগ্রসর হন।

নিঃসন্দেহে তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক। আলতে-কারের মতে ,তাঁর মত অন্য কেউ দক্ষিণ ভারতে যথার্থই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে

পারেন নি।[৪] যদিও উত্তর ভারতে তাঁর সাফল্য ধ্রুব বা তৃতীয় গোবিন্দের সঙ্গে তুলনীয় নয় তথাপি সেখানে তিনি কখনো উপেক্ষণীয় ছিলেন না।

তৃতীয় কৃষ্ণের পর থেকেই রাষ্ট্রকূটদের গৌরবরবি অস্তমিত হতে থাকে। অবশেষে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে কল্যাণের চালুক্যদের দ্বারা রাষ্ট্রকূটদের অবসান ঘটে।

॥ কল্যাণের চালুক্যবংশ ॥

বাতাপির চালুক্যবংশের একটি শাখা হল কল্যাণের চালুক্যবংশ। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা কর্ককে পরাজিত করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ॥

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য। তাঁর সভাকবি বিহলন রচিত 'বিক্রমাংকদেব' নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে জানা যায়। তিনি চোলরাজ কুলোতুঙ্গকে পরাজিত করে চোল রাজধানী জয় করেন। তিনি হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনকেও পরাজিত করে মহীশূরের একাংশ দখল করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। বিহলন ব্যতীত 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বরও তাঁর সভাকবি ছিলেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পরই এই বংশের পতন ঘটে। শেষ পর্যন্ত এই রাজ্য হোয়সল ও যাদবগণের অধিকারে চলে যায়।

॥ সুদূর দক্ষিণ ॥

॥ কাঞ্চীর পল্লবগণ ॥

সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চী নগরকে কেন্দ্র করে পল্লব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

নীলকান্ত শাস্ত্রী বলেছেন পল্লবদের উৎপত্তি এখনো রহস্যাবৃত।[৫] তাঁরা যে ভাবে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন তাতে কেউ কেউ মনে করেন তাঁরা তামিল বংশোদ্ভূত ছিলেন না। আবার রাইস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁদের পারস্যের পহ্লব জাতির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। কারো মতে তাঁরা ছিলেন চোল-নাগ বংশজাত। কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মতে তাঁরা ছিলেন সাতবাহনদের সামন্ত। অন্যদিকে রোলিনসনের মতে তাঁরা দক্ষিণ ভারতীয়ই ছিলেন। স্মিথ এই মতের সমর্থক। ডঃ জয়শোয়াল মনে করেন তাঁরা ছিলেন উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ রাজবংশ বকাটকদের একটি শাখা। যাই হোক পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এখন পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।

পল্লব বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিবস্কন্দবর্মণ। কাঞ্চী ও অন্ধ্রপ্রদেশ নিয়ে তাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকাল থেকে পল্লব বংশের গৌরবময় যুগের সূচনা। তিনি কাবেরী নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। 'কিরাতার্জুনীয়' গ্রন্থের রচয়িতা ভারবি ছিলেন তাঁর সভা কবি।

পরবর্তী রাজা মহেন্দ্রবর্মণের সময় থেকেই দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্য নিয়ে চালুক্য ও পল্লব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা। এই সময় চালুক্যরাজ ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী।

৪ "No other ruler was the overlord of the entire Deccan in so complete sense of the term as Krishna III was."

— Dr. Altekar.

৫ "The origin of the Pallavas has remained till now a mystery."

— N. K. Sastri.

পরবর্তী রাজা প্রথম নরসিংহবর্মণ ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী নরপতি। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে রাজধানী বাতাপি দখল করেন। সিংহলে নৌ-অভিযানও তিনি প্রেরণ করেন।

তাঁর শাসনকালেই হিউয়েন সাং দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসেন। হিউয়েন সাং পল্লব রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। নরসিংহবর্মণ ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী। তিনি মহাবলীপুরমের বিখ্যাত রথ ও বহু মন্দির নির্মাণ করেন।

প্রথম পরমেশ্বরবর্মণের শাসনকালে পল্লব-চালুক্য বিবাদ পুনরায় আরম্ভ হয়। তখন চালুক্যরাজ ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য। তিনি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পল্লবদের আক্রমণ করেন এবং কাঞ্চী দখল করেন। কিন্তু পরে পরমেশ্বর বিক্রমাদিত্য নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হন। মনে হয় এই সময় বিরোধ অমীমাংসিতই থেকে যায়। কোন পক্ষই চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

কিন্তু দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের শাসনকালে চালুক্য-পল্লবদের বিরোধের গতিবেগ তুলনামূলকভাবে অনেক স্তিমিত ছিল।

দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মণের শাসনকালে এই বিরোধ আবার আরম্ভ হয়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী দখল করলেও সেই অধিকার তিনি ধরে রাখতে পারেন নি।

দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের রাজত্বকালে পল্লবদের সঙ্গে পাণ্ড্যদের বিবাদ দেখা যায়। নন্দীবর্মণ কেরল ও কঙ্গোর রাজার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাতেও তিনি পাণ্ড্য আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি।

তাঁর এই বিপদের সুযোগেই তাঁর পুরুষানুক্রমিক শত্রু চালুক্যগণ পুনরায় কাঞ্চী আক্রমণ করে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে ফিরে যান। এই সময়ই আবার পল্লবদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়।

তবে সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নন্দী বর্মণের কৃতিত্ব হল, তিনি তাঁর স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী রাজা দন্তিবর্মণের সময় পল্লবগণ পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু রাজা তৃতীয় নন্দীবর্মণ পাণ্ড্যদের পরাজিত করে হস্তচ্যুত রাজ্য বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন নি।

পল্লববংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিত। তিনি চোলদের সাহায্যে পাণ্ড্যদের পরাজিত করে সাময়িকভাবে পল্লবদের শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। চোলরাজ আদিত্য ৮৯১ খৃষ্টাব্দে অপরাজিতকে পরাজিত করে টোণ্ডামণ্ডলম দখল করেন। সেই সঙ্গে পল্লব বংশের অবসান হয় এবং দাক্ষিণাত্যে চোল প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

॥ তাঞ্জোরের চোল বংশ ॥

চোলগণ সুদূর দক্ষিণের এক অতি প্রাচীন জাতি। তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী ও পদুকোটাই নিয়ে ছিল তাদের রাজ্য। মহাভারত, মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও অশোকের শিলালিপিতে তাদের উল্লেখ আছে। কারিকলের নেতৃত্বে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠলেও পল্লব, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের দাপটে তারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি।

কিন্তু নবম শতাব্দীতে পল্লব বংশের পতন হলে চোলগণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। চোলরাজ বিজয়ালয় পাণ্ড্যদের কাছ থেকে তাঞ্জোর দখল করেন।

তখন থেকেই চোলদের রাজধানী হয় তাঞ্জোর।

বিজয়ালয়ের পুত্র প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিতকে পরাজিত করে চোলদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করেন।

॥ প্রথম রাজরাজ ॥

প্রথম রাজরাজের শাসনকাল থেকেই চোলদের গৌরবময় যুগের সূচনা। তাঁর সময়েই চোল রাজ্য একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাই তিনি চোল ইতিহাসে মহান নামে আখ্যাত। তাঁর 'তাঞ্জোর-লিপি' থেকে তাঁর সামরিক সাফল্যের বিবরণ জানা যায়।

তিনি প্রথমে ত্রিবান্দ্রামের এক নৌযুদ্ধে চেরগণকে পরাজিত করেন। রোমিলা থাপার মনে করেন এই অভিযান শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ছিল না।

এরপর তিনি পান্ড্যদের আক্রমণ করে মাদুরাই দখল করেন। কুর্গও তাঁর অধীনে আসে। উদগাই দুর্গ দখল করার ফলে পান্ড্য ও চেরগণের বিরুদ্ধে এক তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ পান তিনি।

রাজরাজের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল এক শক্তিশালী নৌবহর গঠন। এই নৌবহরের সাহায্যে তিনি আরব সাগরে অবস্থিত মালদ্বীপ এবং সিংহলের উত্তরাংশ জয় করেন। এই জায়গাগুলি আরবীয় বণিকদের বিরতি-স্থান। তাই তাঁর প্রয়োজন ছিল এই স্থানগুলির উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার।

উত্তরে রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করতে গিয়ে তিনি চোল ও চালুক্যদের সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন। কলিঙ্গ পর্যন্ত তাঁর বিজয়বাহিনী অগ্রসর হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি হলেন রাজরাজ। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে, সিংহল ও কয়েকটি দ্বীপে তিনি তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

॥ প্রথম রাজেন্দ্র চোল ॥

রাজরাজের যোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল। তিনি ছিলেন চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

তাঁর বিজয় অভিযানের সূচনা চের ও পান্ড্য রাজ্য আক্রমণের মধ্য দিয়ে। তিনি সিংহলও সম্পূর্ণভাবে জয় করেন। পশ্চিম চালুক্যদের সঙ্গেও তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

রাজেন্দ্র চোলের অন্যতম দুঃসাহসিক অভিযান হল পূর্ব ভারতে। চোল সেনাবাহিনী উড়িষ্যার মধ্য দিয়া পশ্চিম বাংলায় পৌঁছায়। তারা বাংলার ধর্মপাল, রণসুর ও গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করে। তিনি মহীপালকেও পরাজিত করে গঙ্গা নদী পর্যন্ত পৌঁছান। তাঁর এই সাফল্যের স্মারক স্বরূপ তিনি গঙ্গাইকোন্ড উপাধি ধারন করেন।

তিনি শৈলেন্দ্র রাজ্যজয়ে এক নৌবাহিনীও প্রেরণ করেন। এই রাজ্য মালব, জাভা, সুমাত্রা এবং সন্নিহিত অন্যান্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল। শৈলেন্দ্র রাজ্য তিনি জয় করেন। নির্মাতা হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম নামে সুদৃশ্য রাজধানী তিনি নির্মাণ করেন। পরবর্তী চোল রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বীর রাজেন্দ্র। শৈলেন্দ্র রাজ্যের উপরও চোল-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু পশ্চিম চালুক্যদের সঙ্গে তাঁকে বিবাদে লিপ্ত হতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁদের পরাজিত করেন।

কিন্তু চোল কুলোতুঙ্গের পর থেকেই চোল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, এবং পান্ড্য, কাকতীয় ও হোয়সলদের ক্রমাগত আক্রমণে চোল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

(a) Social, economic and cultural life from the 7th century to the 12th century A. D. under the Palas, the Senas, the Chalukyas, the Rashtrakutas, the Chandellas, the greater Gangas of Orissa and the Pallavas and the Cholas of the far South.

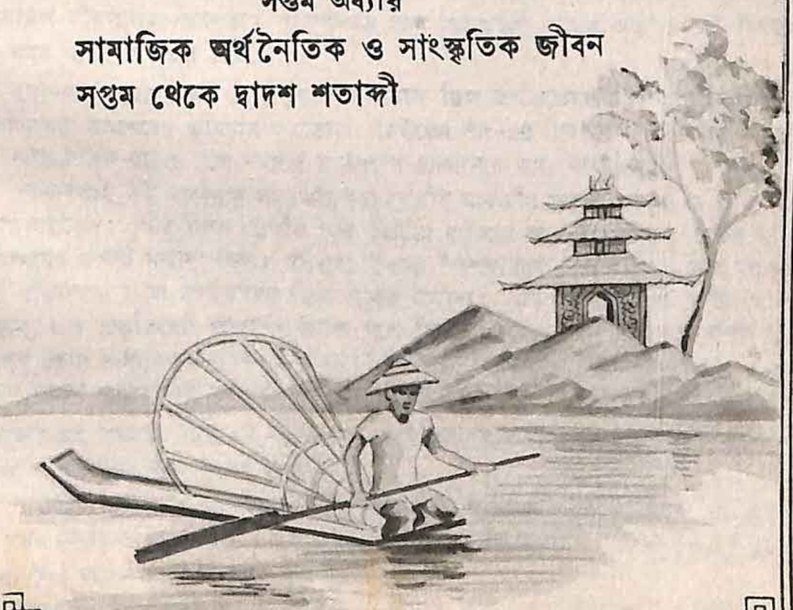
(b) Commercial and cultural contacts with outside world.

॥ বিষয় ক্রম ॥

হর্ষোত্তর যুগে ভারতের ইতিহাস—পাল যুগের সমাজ ব্যবস্থা—পাল যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—পাল যুগের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা—সেন যুগের সামাজিক অবস্থা—সেন যুগের সংস্কৃতি—চালুক্যদের সমাজ ও সংস্কৃতি—রাষ্ট্রকূটদের সমাজ ও সভ্যতা—চান্ডেলাদের সমাজ ও সংস্কৃতি—চোলদের সমাজ ও সভ্যতা—বহির্বিশ্বে ভারত—সুবর্ণ দ্বীপ—চম্পা রাজ্য—কম্বোজ রাজ্য—ব্রহ্মদেশ।

সপ্তম অধ্যায়

সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী



হর্ষোত্তর যুগে ভারতের ইতিহাস

হর্ষের মৃত্যু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। অনেকের মতে এই সময়ই প্রাচীন যুগের অবসান হয়ে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজপুত জাতির উদ্ভব। হর্ষোত্তর যুগে রাজপুত জাতি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তাই অনেকে এই সময়কে রাজপুত যুগ বলেও চিহ্নিত করতে চান। দ্বিতীয়তঃ এই সময় থেকে দীর্ঘকাল ভারত বিদেশী আক্রমণ মুক্ত থাকে। কিন্তু তখন ছিল না ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারতে তখন ছিল বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক কলহ। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় ঐক্য এ সময় বিঘ্নিত হলেও ভারত-সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ছিল তখনো নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান। সংস্কৃতি চর্চার আঞ্চলিক প্রয়াস নানাভাবেই তখন ভারত সংস্কৃতিকে করেছে অধিকতর সমৃদ্ধশালী। চতুর্থতঃ ধর্মীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই সময় উল্লেখযোগ্য। একদিকে বৌদ্ধধর্মের ক্রমহ্রাসমান প্রতিপত্তি, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান—তারই মাঝে সমন্বয়বাদী চেতনা সেই সময়ের ধর্মীয় বিবর্তনকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

সুতরাং সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হলে এই পটভূমিকা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

॥ পালযুগের সমাজ-ব্যবস্থা ॥

পালরাজাগণ একটি স্বাধীন শক্তিশালী বাঙ্গালী রাজ্য গড়ে তুলতে উৎসাহী ছিলেন। সেই উৎসাহেই ধর্মপাল উত্তরাপথ স্বামিণ বলে অভিহিত হতেন। এই অভিধা এক নতুন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করেছিল উত্তর-পূর্ব ভারতে। ডঃ নীহার রায় তাই পালযুগকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন।

পালযুগেই বাংলায় সামন্তপ্রথার উদ্ভব। সামন্তপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই এসেছিল বীরপূজার প্রবণতা। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জনই বীরের কর্তব্য—এই বিশ্বাস সে সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল।

বৌদ্ধধর্মানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও পাল-সমাজ ছিল জাতিভেদপ্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পালরাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। হিউয়েন সাং-এর বিবরণে তার উল্লেখ আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও পাল-সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের কথা বলেছেন।

স্বভাবতঃই এই অবস্থায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীই যাবতীয় সম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। আর নিম্ন শ্রেণীর দিন কাটতো দারিদ্র্যে আর উপেক্ষায়। ব্রাহ্মণ ছাড়া কায়স্থদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। বৈদ্যরা তখনো বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। আর সংখ্যাগত গরিষ্ঠতার ফলে কৈবর্তদের ছিল পৃথক মর্যাদা। ভবদেব দত্ত তাঁর আইন গ্রন্থে চন্ডাল, মেচ প্রভৃতিদের অস্পৃশ্য জাতি বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ডঃ নীহার রায় বলেছেন পালরাজারা ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজ ব্যবস্থাকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের ব্যাপকভাবে ভূমিদান করা হয়েছিল এই সময়। হিউয়েন সাং ভিক্ষু অপেক্ষা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সংখ্যা এ সময় অনেক বেশী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

পালযুগে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ছিল না। এই সময় বৈষ্ণব ও শাক্তমতের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটেছিল। অবশ্য শৈব মতের প্রাধান্যও খুব কম ছিল না।

পালযুগে মহাযান মতবাদের আরও পরিবর্তন হয়। এই মতবাদের দার্শনিক তত্ত্ব এড়িয়ে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ অধিকতর গুরুত্ব পায়। এই পরিবর্তিত মতবাদ বজ্রযান মতবাদ নামে পরিচিত হয়। এই মতবাদের পাশাপাশি আরেকটি মতবাদের বিকাশ হয়।

তার নাম সহজযান। এই মতবাদ দেবদেবী পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতো না। এই মতবাদ থেকেই সৃষ্টি হয় সহজিয়া মতের যার প্রভাব নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছিল অপরিসীম। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে বাংলার বাউল আসে সহজিয়া মত থেকেই। তাছাড়া এ সময় ছিল নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাব।

তখনকার দিনে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল ভাত, মাছ, মাংস, গম, চিনি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য। পান খাওয়ার প্রচলন ছিল। অবশ্য এসবই ছিল উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য। দরিদ্রশ্রেণীর পক্ষে দুবেলা অন্নের সংস্থান করাটাই ছিল কণ্টকর।

অবসর বিনোদনের জন্য অভিজাত শ্রেণী শিকার, পাশা খেলা, ঘোড়ার দৌড়, রথের দৌড় প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও শিকার করার প্রথা ছিল—কিন্তু তা ছিল জীবনধারণের তাগিদে।

সমাজে নারীর স্থান একই ছিল। বহুবিবাহ, পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। সংসার-ধর্ম পালনই ছিল নারীর আদর্শ।

॥ পালযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ॥

কৃষি ছিল পালযুগে প্রধান জীবিকা। ধান, ইক্ষু, আম, বাঁশ, নারকেল ইত্যাদি ছিল প্রধান উৎপন্ন ফসল। উচ্চমানের তুলাও উৎপন্ন হত। মার্কপোলোর বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদের মধ্যে লবণ উৎপাদিত হত মেদিনীপুরে, বাঁকুড়া ও বীরভূমে আকরিক লোহা, সুবর্ণরেখার উপত্যকায় তামা, পুণ্ড্রবর্ধনে হীরা এবং গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলে মুক্তা। সামগ্রিকভাবে বলা যায় কৃষিজ ও খনিজ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলা ছিল সম্পদশালী।

শিল্পের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বাংলার বস্ত্রবয়ন শিল্প। এই শিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন চৈনিক ও আরবীয় পরিব্রাজকগণ। তাছাড়া উৎপাদিত হত চিনি ও গুড়। বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার নির্মাণে বাংলার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠশিল্পেও তখন বাংলা ছিলো যথেষ্ট অগ্রসর। জাহাজ নির্মাণশিল্পও অপরিচিত ছিল না।

কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা আশানুরূপ ছিল না। তখনকার প্রচলিত মুদ্রা থেকে এ ধারণাই হয়। স্বর্ণমুদ্রার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং রৌপ্যমুদ্রার স্বল্পতাই এর প্রমাণ। এর কারণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আরবীয় বণিকদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। তাম্রলিপ্ত ছিল তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু অষ্টম শতাব্দী থেকে সরস্বতী নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে এই বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

তখন বাংলার অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। তাই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হ্রাস পায়, যেহেতু বাণিজ্য এই সময় খুব লাভজনক ছিল না। প্রভাব বেড়েছিল জমিদার শ্রেণীর। দরিদ্র কৃষকদের শোষণ করে তারা আড়ম্বরময় জীবনযাপন করতো।

স্বভাবতঃই দরিদ্রশ্রেণীর দুর্দশার অন্ত ছিল না। তারা ছিল করভারে নির্যাতিত। তাদের প্রয়োজন ছিল ন্যূনতম, তারও সংস্থান ছিল তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত।

॥ পালযুগের সাংস্কৃতিক অবস্থা ॥

চার শতাব্দীব্যাপী পাল-শাসিত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ীয় রীতি বিশেষ তাৎপর্যময়। এই রীতির উদ্ভব বাংলা ও মগধে। নাট্য রচনায় বাংলা ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। দেবপালের সম-

সাময়িক কেশব মোর ছান্দোগ্য উপনিষদের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর অমর রচনা রামচরিত এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থটির চমৎকারিত্ব হল, এর রচনা শৈলী দ্ব্যর্থবোধক। গ্রন্থটির প্রতিটি পংক্তিতে একদিকে যেমন রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত, তেমনি অন্যদিকে একই সঙ্গে পালরাজ রামপালের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ। শ্রীধর ভট্ট ন্যায়শাস্ত্রের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন এই সময়েই। অন্যান্য বিখ্যাত রচনাকারগণ হলেন অভিনন্দ, সর্বানন্দ, বাত্তোজী দীক্ষিত। চক্রপাণী দত্ত ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। এবিষয়ে অন্যান্য লেখকগণ হলেন শূর-পাল ও বঙ্গসেন। আরেক বিখ্যাত পণ্ডিত হলেন ভবদত্ত ভট্ট। আইনশাস্ত্রবিদ জীমূত-বাহন সম্ভবতঃ পালযুগের শেষভাগে জন্মেছিলেন।

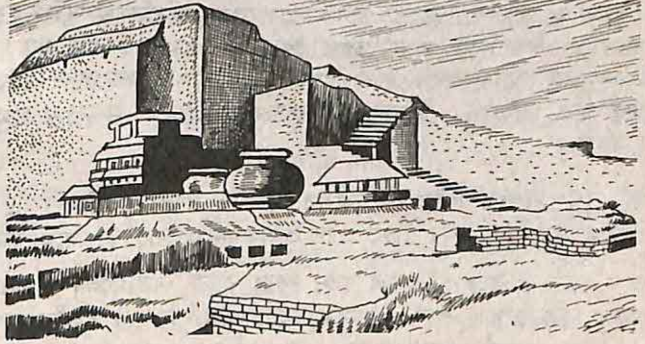
বৌদ্ধশাস্ত্রে অবিস্মরণীয় নাম অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। অপর জন হলেন পণ্ডিত ধর্মপাল। তাছাড়া ছিলেন কমলশীল, রাহুলভদ্র, কল্যাণরক্ষিত প্রভৃতি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অসাধারণ বিকাশও সম্ভব হয়েছিল এই যুগে। চর্যাপদ রচিত হয় এই সময়। চর্যাপদ থেকেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সৃষ্টি হয়।

ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি পালযুগেই। পালারাজারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাছাড়া সোমপুরী বিহার ছিল বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র। জগদ্দল, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকূট, দেবীকোট প্রভৃতি স্থানেও বৌদ্ধ-বিহার স্থাপিত হয়েছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেও পালযুগের অগ্রগতি বিস্ময়কর। পালযুগের স্থাপত্যের অনুকরণেই নির্মিত হয়েছিল নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন বৌদ্ধ-বিহার। পাহাড়পুরে যে বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীন বাংলার বিস্ময় বলে বর্ণনা করেছেন।[১]

ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞানে মন্দির নির্মাণ শৈলীর ক্ষেত্রে সর্বতোভদ্র নামে এক নির্মাণ-রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের মন্দিরটি হল এই নির্মাণ-রীতির একমাত্র ধ্বংসাবশেষ যার অস্তিত্ব আজও বর্তমান। ডঃ সরস্বতী এই মন্দির সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান করেছেন। সম্ভবতঃ মন্দিরটি ছিল পাঁচতলা এবং ষোলটি কোণ-



নালন্দা ধ্বংসাবশেষ

বিশিষ্ট। চারদিকে ছিল চারটি গর্ভগৃহ এবং চারটি তোরণ বা প্রবেশ পথ। মন্দিরটি পোড়া ইঁট ও মাটি দিয়ে নির্মিত হয়েছিল।

১ This temple was a wonder of Ancient Bengal." — Dr. N. R. Roy.

ভাস্কর্যে এই সময় বাংলার নিজস্ব শৈলীর জন্ম হয়। এর কৃতিত্ব হল দুই বিখ্যাত ভাস্কর ধীমান ও বীতপালের। পাল ভাস্কর্যের মূল উপাদান হল পোড়া মাটি ও কাল পাথর। মূর্তির অনিন্দ্য দেহভঙ্গে প্রকট হয়ে উঠতো অপার্থিব সৌন্দর্য। পাল-ভাস্কর্যের নিদর্শন হল বগুড়ার বিষ্ণুমূর্তি এবং সদাশিব মূর্তি। স্থানীয় ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটেছে পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে। এই ভাস্কর্যের উপাদান হল গ্রাম্য জীবন।

পাল চিত্রশিল্পের নিদর্শন কেমব্রিজ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে আজও সংরক্ষিত আছে। অধিকাংশ চিত্রশিল্প ছিল বজ্রযান ও তান্ত্রিক মতবাদ ভিত্তিক।

॥ সেন যুগের সামাজিক অবস্থা ॥

সেন বংশের শাসনকে বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার।[২]

সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। বল্লান সেন দানসাগর ও অদ্ভুত সাগর নামে দুটি হিন্দু আচার গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সময় বৈদিক শাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ আচার-আচরণ প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। ডঃ নীহার রায় অবশ্য এ চেষ্টাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি বলেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রবাদের প্রভাবে সনাতন হিন্দুধর্মে যেসব অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার সংস্কারে সেন রাজারা সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন।

সেন রাজারা নতুনভাবে জাতি-বিভাগ করেন। উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজকে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার আওতায় নিয়ে আসা। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কুলীন, ভঙ্গ কুলীন, অভঙ্গ কুলীন, রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র প্রভৃতি নানাভাগে ভাগ করা হয়। অব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও এরকম নানা-ভাগ করা হয়। ফলে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত হয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই নতুন জাতিবিন্যাস ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন। কারণ পালযুগে যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সামাজিক সংহতিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা হয়েছিল ঠিক তার উল্টো চেষ্টা হয় সেনযুগে। সমগ্র সামাজিক কাঠামোকে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভাগ করে সামাজিক ঐক্যকেই দুর্বল করে ফেলা হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতো ধর্মীয় অনুশাসন, ঠিক সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত হয় সেন-শাসনাধীন বাংলায়। সামাজিক এই ব্যবস্থার কুফল আজও অনুভূত হয়। সম্ভবতঃ এই সামাজিক বিন্যাসের জন্য সেন বংশের পতন দ্রুততর হয়েছিল এবং মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে জন-মানসে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয় নি।

সেন যুগে সামাজিক ও নীতিগত শৈথিল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। গোবর্ধনের সপ্তশতিতে বহু আদিরসাত্মক রচনা রয়েছে। এমন কি জয়দেবের গীত-গোবিন্দমের বিষয়বস্তু প্রায় অশ্লীল। জোলক, বসন্তোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান সামাজিক শিথিলতারই প্রমাণ।

॥ সেন যুগের সংস্কৃতি ॥

সেন যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব। তাঁর রচিত গীত-গোবিন্দম কাব্যের কাব্যগুণ আজও পাঠককে সমানভাবে মোহিত করে। বল্লাল সেন স্বয়ং রচনা করেছিলেন দয়া-সাগর ও দান-সাগর নামে দুটি গ্রন্থ। শরণ, হলায়ুধ, ধোয়ি, উমাপতি ধর প্রভৃতি বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতগণ সেন যুগেই জন্মেছিলেন। সংস্কৃত দূত কাব্যের অনুসরণে ধোয়ি রচনা করেন তাঁর পবনদূতম কাব্য। দেওপাড়া লিপির রচয়িতা ছিলেন শরণ।

---

২ The Sen rule constitutes an important landmark in the history of Bengal.

— R. C. Majumdar.

॥ চালুক্যদের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চালুক্যদের অবদান অবিস্মরণীয়।

চালুক্য রাজারা ছিলেন বৈদিক হিন্দুধর্মের অন্ধ পৃষ্ঠপোষক। এই সময় যাগযজ্ঞ পুনঃপ্রবর্তিত হয়। অশ্বমেধ সহ নানা যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন প্রথম পুলকেশী। ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ রচিত হয় এ সময়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মও তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রাজ্যের সর্বত্র শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়।

গোঁড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও চালুক্যরাজারা ছিলেন অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল। হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণকালে চালুক্য-রাজ্যে অনেক বৌদ্ধ-মঠ ও বিহার দেখেছেন। জৈনগণও যে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ভোগ করতেন তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় পুলকেশী রবিকীর্তি নামে এক বিখ্যাত জৈন-কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। চালুক্য-শাসনে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসারও ঘটেছিল। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারতেন।

চালুক্যগণ অনেক গুহামন্দির নির্মাণ করেন। বাতাপিতে নির্মিত হয় বিখ্যাত বিষ্ণুর গুহামন্দির। অজন্তা ও ইলোরা ছিল চালুক্য রাজ্যের অন্তর্গত এবং অনুমান করা হয় অজন্তার চৈত্য এ সময়ই নির্মিত হয়।

চালুক্য রাজারা সাধারণভাবে পাথর দ্বারা নির্মিত মন্দিরও নির্মাণ করে। মেগুটির শিব মন্দির ছিল এ ধরনেরই এক মন্দির। এই মন্দিরে রবিকীর্তি রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশস্তি আছে। বৌদ্ধ চৈত্যের অনুকরণে নির্মিত হয় আইহোলের বিষ্ণু মন্দির। এই মন্দির তার গঠন-শৈলী ও অনুপম ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত। চালুক্য স্থাপত্যশিল্পের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পাঁদাকলের বিরূপাক্ষ মন্দির। এই মন্দির নির্মাণ করেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পত্নী। প্রখ্যাত শিল্প রসিক হ্যাভেল এই মন্দিরের নির্মাণ শৈলীতে ইউরোপীয় ধ্রুপদী রীতির সঙ্গে গথিক-শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখতে পেয়েছেন।°

॥ রাষ্ট্রকূটদের সমাজ ও সভ্যতা ॥

রাষ্ট্রকূটদের সামাজিক গঠন ছিল সকল অর্থেই সামন্ততান্ত্রিক। এই ব্যবস্থার সর্বোপরি ছিলেন স্বভাবতঃই রাজা, যিনি ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস এবং যাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত বিলাসবহুল এবং জাঁক-জমকপূর্ণ। তাঁর অধীনস্থ সামন্তগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতো। এমন কি রাজাও হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। সামন্তরা আবার তাদের অধীনস্থ উপসামন্তদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায় করা হত। এই রাজস্বকে বলা হত ভোগ।

রাষ্ট্রকূটগণ ছিলেন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ নিজেই ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। তিনি কবিরাজ মার্গ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া জিনসেন, মহাবীরাচার্য ও শাক্ত্যায়ন নামে বিখ্যাত হিন্দু ও জৈন পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে ইলোরার গুহায় রাষ্ট্রকূট শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দিরের নির্মাতা ছিলেন প্রথম কৃষ্ণ। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক মন্দির

° The temple combines the stateliness of the classic design of Europe with fervid imagination of Gothic art."

— Havell.

তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রকূটগণ হিন্দু ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অমোঘবর্ষ জৈন ধর্মানুরাগী হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

॥ চান্ডেলাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

চান্ডেলাগণ হলেন রাজপুত জাতিরই এক শাখা। তাই এদের সামাজিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রাজপুত জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির সংগতি থাকাই স্বাভাবিক।

বর্ণভেদ প্রথা ছিল রাজপুত সমাজ জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার ভাগ ছাড়া আরও কতগুলি নিম্ন বর্ণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা ছিল একদিকে রাজার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা, অন্যদিকে ধর্মীয় বিষয়ে প্রধান। তাই সমাজে তাদের যেমন ছিল বিশেষ মর্যাদা তেমনি ছিল কতগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। যেমন, তারা প্রাণদণ্ড থেকে সর্বদাই অব্যাহতি পেতেন। শাসক ও সৈনিক শ্রেণী গঠিত ছিল ক্ষত্রিয় সমাজদ্বারা। বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। শূদ্রগণ করতো কৃষি ও শিল্পকার্য।

তাদের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথা ক্রমশঃ কঠোর হয়ে উঠলেও অসবর্ণ বিবাহ হত। তাদের সমাজে ভাট বা চারণগণ ছিলেন সম্মানীয়। তারা রাজপুত বীরত্বের কাহিনী গানের মধ্য দিয়ে প্রচার করে বেড়াতেন। এঁরা সমাজে জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখতেন, পারিবারিক বিবাদ মেটাতেন, সংবাদ আদান-প্রদানে সাহায্য করতেন। তাই সমাজে ছিল এদের আলাদা মর্যাদা।

সমাজ জীবনে মেয়েদের ছিল বিশেষ সম্মান। পর্দাপ্রথা ছিল না। ছিল মেয়েদের স্বাধীনতা। স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন ছিল। মেয়েরা ছিল শিক্ষিত, অশ্ব ও অসি চালনায় দক্ষ। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা ছিল সক্রিয় অংশীদার। তাদের দেশাত্মবোধের নানা ঘটনা বহুল প্রচারিত। তবে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। আবার বহু বিবাহ প্রথাও অজানা ছিল না।

বিত্তশালী লোকেরা ছিল বিলাসপ্রিয়। তাঁরা ক্রীতদাস রাখতেন। তাঁরা মদ্যপান ও অহিফেন সেবন করতেন। সংগীত, নৃত্য ও শিকার ছিল তাঁদের অবসর বিনোদনে উপায়।

চান্দেলা রাজাগণ ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। কীর্তিবর্মণের বিদ্যোৎসাহিতা সর্বজন বিদিত। তিনি বিখ্যাত কিরাত সাগরের নির্মাতা ছিলেন। চান্দেলাগণই নির্মাণ করেছিলেন খাজুরাহোর নয়নাভিরাম মন্দির।

॥ উড়িষ্যার সংস্কৃতি ॥

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সুবর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সময় উড়িষ্যা শাসন করতেন কর ও গঙ্গবংশ। এই দুই রাজবংশই ছিল শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক।

অসংখ্য মন্দিরের দেশ উড়িষ্যা। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরটি কর বংশীয় রাজাদের আমলে নির্মিত হয়। এ ছাড়াও ভুবনেশ্বরে অগণিত ছোট ছোট মন্দির। এদের মধ্যে রাজরানী মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির ও পরমেশ্বর মন্দির উড়িষ্যার মন্দির শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিশেষ করে রাজরানী মন্দিরটি হলুদ পাথরের নির্মিত, অনবদ্য এর নির্মাণ-শৈলী।

পুরীর জগন্নাথ মন্দির সারা ভারতের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য মন্দির। এই মন্দিরের

চারদিকে চারটি তোরণ। প্রধান তোরণটি অরুণ স্তম্ভ নামে পরিচিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

কোনারকের বিস্ময় জাগানো সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহ বর্মণ। মন্দিরের নাটমন্দিরটি আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনি সূক্ষ্ম কারুকার্যে বিস্ময়কর। নাটমন্দির থেকে বাহিত সোপান শ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুই বিশালাকার সিংহ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা সূর্যদেব। সূর্যদেবের রথের চাকার শিল্প-সুষমা সার্থকতার এক চমৎকার নিদর্শন।

॥ পল্লবদের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

পল্লব শাসনকালে হিউয়েন সাং দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় তখনকার দিনে কাঞ্চী ছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ এবং বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র। সাধারণভাবে তিনি পল্লব রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল। তারা ছিল সৎ, সত্যবাদী এবং শিক্ষানু-রাগী।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে পল্লব শাসনকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়।

পল্লবদের শিল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রাওসেট বলেছেন যে, পল্লবগণ তাদের নিজস্ব শিল্প-রীতি সৃষ্টি করে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পরীতির ভিত্তিস্থাপন করেছেন।[৪] পল্লব স্থাপত্য ছিল মন্দির-কেন্দ্রিক। মন্দির নির্মিত হত দুইভাবে—পাথর কেটে অথবা সৌধ আকারে। মন্দিরের গঠনশৈলী ছিল রথের আকারে। নির্মাণশৈলীর বিবর্তনও লক্ষণীয়। এই বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন রাজার নামে নামাংকিত। যেমন, মহেন্দ্র রীতি, নরসিংহবর্মণ রীতি, রাজসিংহ রীতি ও অপরাজিত রীতি। অপরাজিত রীতি হল পল্লব স্থাপত্য শিল্পের চরম রূপ যেখানে চোল শিল্প-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। দেবালয়ের সম্মুখে স্তম্ভের উপর মণ্ডপ নির্মাণের রীতি হল মহেন্দ্র রীতি। যেমন কাঞ্চীর একম্বর নাথ মন্দির। পাথর কেটে মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি হল নরসিংহবর্মণ রীতি। যেমন মহাবলীপুরমের মন্দির। এই রীতি দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের শাশ্বত প্রেরণার উৎস। পাহাড় কেটে রথের আকারে মন্দির নির্মাণ হল এই রীতির বৈশিষ্ট্য। এই রীতির ভাস্কর্য শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ হল গঙ্গা-বতরণ। এই ভাস্কর্য সম্পর্কে গ্রাওসেট মন্তব্য করেছেন, পাথর নির্মিত ধ্রুপদী রীতির এক বিশাল নিদর্শন।[৫] কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির হল রাজসিংহ রীতির নিদর্শন। এই মন্দির সৌধাকারে নির্মিত। পল্লব শিল্পরীতি সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য হল ভারতীয় শিল্পরীতির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষ-ণীয় নিদর্শন।[৬]

পল্লবগণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক। তাদের অধিকাংশ সরকারী কাজে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হত। ভারবী ও দণ্ডি ছিলেন এ যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ নিজেই সুসাহিত্যিক ছিলেন। 'ন্যায়ভাষ্য' রচয়িতা

---

৪ "They created an architecture of their own which was to be the basis of all styles of the South."

—Grousett.

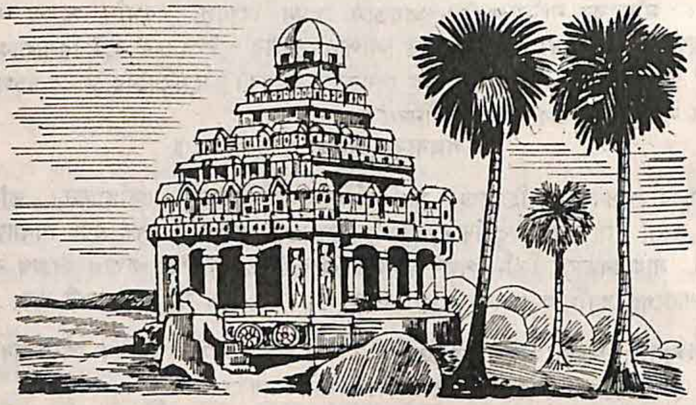
৬ The Pallava school of architecture and sculpture is one of the most important and interesting of the Indian schools.

—V. Smith.

৫ It is a vast picture, a regular fresco in stone a master piece of classic art.

—Grousett.

বাৎস্যায়ণ ছিলেন কাঞ্চীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। কালিদাস, ভারবী ও বরাহমিহিরের রচনাবলী ছিল দক্ষিণ ভারতে খুবই জনপ্রিয়। তাছাড়া তামিল সাহিত্যও ঐ সময় উৎসাহিত হয়েছিল।



মহাবালপুরম্

পল্লব-যুগে জ্ঞান চর্চার সুযোগ ছিল বিস্তৃত। কাঞ্চীর বিভিন্ন মন্দিরে নিয়মিত মহাভারত পাঠ করা হত। হিউয়েন সাং লিখেছেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন আচার্য ধর্মপাল ছিলেন পল্লব রাজ্যের অধিবাসী। কুরম নামক স্থানে এমন ১০৮টি পরিবার ছিল যারা সর্বদাই বেদ-পাঠে নিমগ্ন থাকতো। দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতির বিস্তারে কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই পানিক্কর মনে করেন, পল্লবদের সময়েই দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতির বিস্তার সম্পূর্ণ হয়।[৭]

অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনাও হয় পল্লব রাজ্যে। জৈন-ধর্ম অনেক আগেই দাক্ষিণাত্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। তিনি শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। তাছাড়া বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবও দক্ষিণে অব্যাহত ছিল।

কিন্তু পল্লব-শাসনকালে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকে অনেকে উত্তর ভারতীয় আর্য সভ্যতার জয় বলে মনে করেন। অথচ পল্লব রাজারা যে ধর্মীয় বিষয়ে পরমতসহিষ্ণু ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিউয়েন সাং-এর মন্তব্যে। একথা ঠিক, এ সময় বৈষ্ণব ও শৈব মতের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। রচিত হয় নানা সাহিত্য।

এর চেয়েও বড় কথা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণে এ সময় এক নতুন ভক্তিবাদের জন্ম হয়। এই ভক্তিবাদই ছিল এ সময়ে সৃষ্ট তামিল সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। লক্ষণীয় হল, এই সব সৃষ্টির যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নশ্রেণীর। বলা যেতে পারে, নতুন ভক্তিবাদ সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণীকেই আলোড়িত করেছিল বেশী। অবশ্য রোমিলা থাপার মনে করেন, দাক্ষিণাত্যে ভক্তিবাদের মূল লক্ষ্য ছিল আর্য-সংস্কৃতির অগ্রগতিকে প্রতিহত করা।[৮]

---

[৭] The Aryanisation of South India was completed during the period of the Pallavas. —K. M. Panikkar.

[৮] Although never so recognised by the Barhmins, the Tamil devotional cult was in part a resistance to the Aryanisation of the region. —Ramila Thapar.

॥ চোলদের সমাজ ও সভ্যতা ॥

চোল সমাজ জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সমাজ জীবন আবর্তিত হত মন্দিরকে কেন্দ্র করে। মন্দিরই তখন ছিল সমাজ জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র। মন্দিরে মন্দিরে থাকতো দেবদাসী।

সমাজ জীবনে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাদের কর প্রায় দিতেই হত না, জমি-জমা ছিল আর ছিল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও শূদ্রদের কথা বলা আছে। শূদ্রদের মধ্যে ছিল দুটি ভাগ—স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। সমাজে ক্রীতদাস প্রথা ছিল। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে বাধা-নিষেধের তীব্রতা ছিল না। সমাজ জীবনের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই গড়ে উঠেছিল চোলদের অর্থনৈতিক কাঠামো। গ্রামগুলি ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

জমির বন্টন হত দুইভাবে—সমবায় ভিত্তিক ও ব্যক্তিগত। সমবায় ব্যবস্থায় সমগ্র গ্রাম রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকতো। আবার মন্দিরের জমিও ভাগ-চাষের জন্য বন্টন করা হত। ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর জমি ভোগ করতেন।

সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ভাগ ছিল দু রকমের—যারা কর দিত এবং যারা ছিল কৃষি শ্রমিক। গ্রাম্য সংগঠনে কৃষি শ্রমিকদের কোন ভূমিকা ছিল না।

ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অব্যবহৃত জমিকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে উৎসাহিত করা হত। কৃষি প্রধান হলেও পশুপালন ছিল অন্য উল্লেখযোগ্য জীবিকা।

একাদশ শতাব্দী থেকে চোল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক পরিবর্তন আসে। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শহরের সৃষ্টি হয়। শহরের খাদ্যসংস্থানের দায়িত্ব নিতে হয় গ্রামকে। ফলে মুদ্রা-ভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়। পরিবর্তন আসে গ্রামীণ চরিত্রের। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল কাপড়, লবণ, মূল্যবান পাথর, চন্দন কাঠ, প্রভৃতি। এ সময়ের বিখ্যাত বন্দর ছিল কুইলন, মব্বলিপুরম, কাবেরীপট্টনম। বাণিজ্য চলতো প্রধানতঃ সামুদ্রিক পথে। বণিকদের সংঘ ছিল। সেই সংঘই বাণিজ্য তদারক করতো।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চোলদের অবদান উচ্ছ্বসিত উল্লেখ দাবী করে।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চোলগণ অসাধারণ সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছে। তাদের তৈরী শহরগুলি ছিল সুপরিকল্পিত। প্রতি শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকতো মন্দির। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল শিব মন্দির। এই মন্দিরগুলিই ছিল সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র। সেখানে শাস্ত্রালোচনা হত, নাটকাভিনয় হত, অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত। গোঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম প্রথম রাজেন্দ্র চোল দ্বারা নির্মিত এক বিখ্যাত শহর।

চোল রাজাদের তৈরী দুটি বিখ্যাত মন্দির হল তাঞ্জোর ও গোঙ্গাইকোণ্ড চাল-পুরমের মন্দির। এই দুই মন্দিরের মধ্য দিয়ে দ্রাবিড় মন্দির নির্মাণ শৈলীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাছাড়া তৈরী হয়েছিল আরও অনেক মন্দির। প্রতিটি মন্দিরের প্রবেশ পথ ছিল অত্যন্ত সুসজ্জিত।

জলসেচের বাঁধ, কৃত্রিম হ্রদ ও রাস্তা নির্মাণে চোলগণ যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রথম রাজেন্দ্রচোল নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত চোলগঙ্গম নামে একটি বিশাল জলাশয়। কাবেরী নদীতে বিরাট আকারের পাথর দিয়ে চমৎকার বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন চোলেরাই। যোগাযোগের উন্নতির জন্য তারা অনেক রাস্তাও তৈরী করেছিলেন।

চোল চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় তাঞ্জোরের মন্দিরে। এই সব চিত্র দেখে

অজন্তার গুহা চিত্রের কথাই মনে আসে।

ভাস্কর্যেও চোলগণ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ব্রোঞ্জ নির্মিত নটরাজ মূর্তি চোল ভাস্কর্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চোলদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের নেতৃত্বে শৈব সাহিত্যের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল ঘটেছিল বৈষ্ণব সাহিত্যেরও বিকাশ। সাধারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবকচিন্তামণি ও কলিঙ্গাস্তুপবানি উল্লেখযোগ্য। তামিল রামায়ণের রচয়িতা কম্বন ছিলেন চোল রাজসভাকবি।



নটরাজের মূর্তি (চোলশিল্প)

॥ বহির্বিশ্বে ভারত ॥

প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা সুরক্ষিত ভারতবর্ষ। তা সত্ত্বেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোক তাঁর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন দূর প্রাচ্যের সঙ্গে।

অন্যদিকে অশোকের প্রয়াসেই দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অবশ্য তার আগেই আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীক-প্রভাব আরম্ভ হয়, যার পরিপূর্ণ পরিণতি ঘটে গান্ধার শিল্পে। কুষাণরাজগণের শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। এই সময়েই ভারত-সংস্কৃতির উপর রোমের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সমাদৃত হয়। অপর দিকে ভারতীয় শিল্প, ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির উপর পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষ করে গ্রীসের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক। কিন্তু মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়গণ বাণিজ্যের সূত্র ধরে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করেছিল।

ভারতীয় বণিকগণ পণ্যসম্ভার নিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ব্যাকট্রিয়ার যেত। তখন ব্যাকট্রিয়া ছিল ভারত, চীন, ও পশ্চিমী দেশগুলির মিলন কেন্দ্র। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আরেলস্টাইনের গবেষণার ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার ও রাজনৈতিক প্রাধান্য সম্পর্কে বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এই অঞ্চল থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়। হিউয়েন সাং চীন থেকে ভারত আগমনের পথে সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতির প্রভাব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চৈনিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। চীন তথা মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ধর্মরত্ন, কাশ্যপমাতঙ্গ, অতীশ দীপংকর প্রভৃতি। আবার চীনের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ণের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। যেমন হিউয়েন সাং, ফা হিয়েন, ইৎ সিং প্রভৃতি।

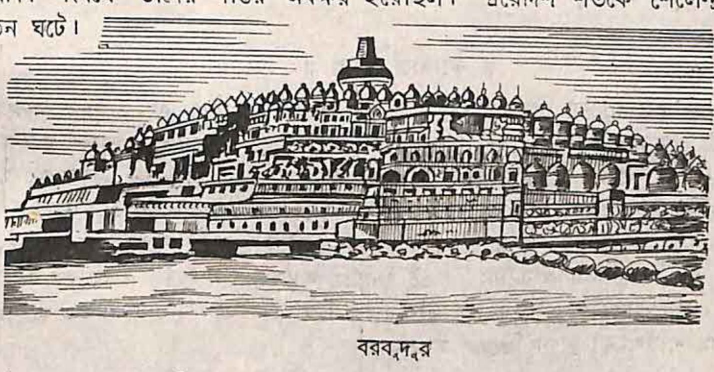
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাবের বিস্তার যেমন ছিল বাণিজ্যিক তেমনি

রাজনৈতিক। রামায়ণে জাভা ও সুমাত্রার উল্লেখ আছে। খৃষ্ট পূর্ব যুগেই দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলির সংগে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীনকালেই ভারতে সুবর্ণভূমি বলে পরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশগুলির সংগে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বহু ভারতীয় আবার এই সব অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেও গিয়েছিলেন। কালক্রমে বাণিজ্যের সূত্র ধরেই এই সব দেশগুলিতে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পথ সুগম হয়। জাতক, বৃহৎ কথা, কথাকোষ, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় বণিকদের তৎপরতার কাহিনী উল্লিখিত আছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগে দীর্ঘ যোগাযোগের ফলে এই অঞ্চলে কয়েকটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে চারটি রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথাঃ সুবর্ণ দ্বীপ, চম্পা, কম্বোজ ও ব্রহ্ম।

॥ সুবর্ণদ্বীপ ॥

অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও, বলিদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশগুলি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্যের নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। আরব বণিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় শৈলেন্দ্র সম্রাটরা মহারাজা উপাধি নিয়েছিলেন। তাঁদের শক্তিশালী নৌবহর প্রতিবেশী কম্বোজ ও চম্পা জয় করেছিল। কিন্তু ভারতের চোল রাজাদের সংগে তাঁদের বিরোধ চলেছিল প্রায় একশ বৎসর। শেষ পর্যন্ত শৈলেন্দ্রগণ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন। কিন্তু এই দীর্ঘমেয়াদী সংঘর্ষে তাঁদের শক্তির অবক্ষয় হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র বংশের পতন ঘটে।



বরবুদুর

শৈলেন্দ্র সম্রাটরা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী। জানা যায় বাঙালী ভিক্ষু কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র সম্রাটকে মহাযান তন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই রাজবংশের শাসনকালেই যবদ্বীপের বহুখ্যাত বরবুদরের বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরটি বহির্ভারতে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক গৌরবময় নিদর্শন। শুধু তাই নয়। এখানকার সমাজজীবনও গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সমাজজীবনের অনুকরণে। এখানকার জাতিভেদ প্রথা ছিল ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাই। অবশ্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ভারতীয় রীতিনীতির সঙ্গে কিছু পার্থক্যও আছে। ভারতীয় নারীদের তুলনায় এখানকার নারীগণ অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো, যদিও বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলে রামায়ণ ও মহাভারতের

প্রভাব আজও অম্লান। এখানকার বহু কাব্য ও গদ্যসাহিত্য রচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে। এমন কি জনসাধারণের নামকরণেও আছে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব।

॥ চম্পা রাজ্য ॥

আধুনিক ভিয়েৎনামের পূর্বপ্রান্তে তৃতীয় শতকে এক হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। এর নাম ছিল চম্পা রাজ্য।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে শ্রীমা নামে এক ভারতীয় এই রাজ্য স্থাপন করেন। চীন সম্রাটের সঙ্গে বিরোধে এক চম্পারাজ পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়েছিল প্রতিবেশী কম্বোজের সঙ্গে বিরোধ। এর কারণ হল দীর্ঘস্থায়ী বিরোধে চম্পা তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হলেও তার যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চীনের মঙ্গোলীয় সম্রাট কুবলাই খানের আক্রমণে চম্পার পতন হয়।

চম্পায় ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধিক প্রভাব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এদের মধ্যে আবার শৈবমতাবলম্বীদেরই ছিল প্রাধান্য। অবশ্য চম্পার রাজারা ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু।

চম্পার ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সেখানে প্রচলন করেন। ফলে চম্পার জনগণ যথারীতি চার বর্ণে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অর্থের দৌলতে ব্যবসায়ীরা সমাজে উচ্চস্থান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। চম্পার অধিবাসীগণ ভারতীয়দের মতই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতো। সতীদাহপ্রথাও প্রচলিত ছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। রাষ্ট্রীয় ভাষাও ছিল সংস্কৃত। স্বভাবতঃই চম্পার দেবমন্দিরগুলিতে ভারতীয় শিল্প-রীতির প্রভাব ছিল খুবই স্পষ্ট।

॥ কম্বোজ রাজ্য ॥

আধুনিক কাম্বোডিয়া ছিল প্রাচীন কম্বোজ রাজ্য। চীনারা এই রাজ্যকে বলতো ফু-নান। চৈনিক সূত্র থেকেই জানা যায়, কৌণ্ডিণ্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ কম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্থানীয় এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কম্বোজ রাজবংশের সূচনা করেন। এই বংশের এক শক্তিশালী রাজা হলেন দ্বিতীয় জয়বর্মণ। তিনি আংকোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আরেক রাজা যশোবর্মণ যশোধর-পুর নামে এক নগর নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ কার্যের জন্যই তিনি অমরত্ব অর্জন করেছেন। আংকোরভাটের বিশ্বখ্যাত মন্দিরটির নির্মাতা ছিলেন সূর্যবর্মণ। কম্বোজ রাজ্যের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন সপ্তম জয়বর্মণ।

চৈনিক সূত্রে উল্লিখিত আছে, কম্বোজে সহস্রাধিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বসবাস করে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচলন করেন। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। তবে ভারতীয়দের সঙ্গে কম্বোজের আদিম অধিবাসীদের সংমিশ্রণের ফলে সামাজিক রীতি নীতির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-গুলির স্বকীয়তা অবিকৃতই ছিল।

স্থাপত্য শিল্পে কম্বোজ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রাজধানী আংকোরধম ছিল একটি সুপরিকল্পিত এবং সুসজ্জিত নগর। সেই যুগে এই নগর বিশ্বের অন্যতম সেরা নগর বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। আংকোরভাটের বিষ্ণুমন্দির ও আংকোর ধামের মন্দিরগুলিতে ভারতীয় শিল্পরীতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আংকোরভাটের

বিষ্ণুমন্দির বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর বস্তু। পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। মূল মন্দির তিনটি মঞ্চের পর চতুর্থ মঞ্চের উপর স্থাপিত। প্রতি মঞ্চ থেকে পরবর্তী মঞ্চে ওঠার জন্য লাইন বাঁধা সিঁড়ি। প্রতিটি মঞ্চের গায়ে অসংখ্য খোদাই করা, যা উন্নত ভাস্কর্যের পরিচায়ক এবং ভারতীয় শিল্প-রীতির সুস্পষ্ট প্রভাবের উদাহরণ।

॥ ব্রহ্মদেশ ॥

প্রাচীন ব্রহ্মদেশেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়। এখানে স্থাপিত হয় ভারতীয় উপনিবেশ। এই ঔপনিবেশিকরা ছিলেন হীনযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী।

নিম্ন ব্রহ্মে তৃতীয় শতকে শ্রীক্ষেত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে এই রাজ্য খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু নবম শতাব্দীতে থাই আক্রমণে এই রাজ্যের পতন ঘটে।

আবার প্রায় এই সময়ই উত্তরাঞ্চল থেকে তিব্বতী-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর 'মাম্মা' নামে এক জাতি ব্রহ্মে প্রবেশ করে। এরাও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর প্রথম রাজা ছিলেন অনিরুদ্ধ। বলা হয় তাঁর সময় থেকেই ব্রহ্মদেশ এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। তিনি ধর্মদর্শী নামে এক ভিক্ষুর কাছে হীনযান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পরবর্তী রাজা ত্রিভুবনাদিত্যের শাসনকালে বহু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ব্রহ্মদেশে বসবাস করতে আসেন। তিনিই ছিলেন বিখ্যাত আনন্দ মন্দিরের নির্মাতা। ব্রহ্মদেশের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে এই মন্দিরকে গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি বিখ্যাত শোয়েদাগণ প্যাগোডার নির্মাণকার্য শেষ করেন। তাঁর পিতা এই প্যাগোডার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেছিলেন। এছাড়া তিনি বোধগয়ার মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন।

১২৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা নরসিংহপতি প্রজাদের হাতে নিহত হন। সেই সঙ্গেই ব্রহ্মে শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ভারতীয়দের এই রাজনৈতিক প্রাধান্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যখন মূল ভারত ভূমিতে হিন্দু শাসনের অবসান ঘটেছে তখনও ভারতের বাইরে এই সব অঞ্চলে হিন্দু শাসন অব্যাহত ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রাধান্য থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হল যে এই অঞ্চলের মানুষেরা যারা দীর্ঘকাল যাবৎ আদিম জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল সভ্য জীবনের আস্বাদন লাভ করে ভারতীয় ধর্ম, আইন ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই, আমূল পরিবর্তন হয়ে যায় তাদের জীবন-যাত্রার ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে। এখানেই হল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় সাফল্য। সিংহ ও বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির এই বিস্তার হিন্দুধর্মের অপরিসীম জীবনীশক্তির এবং সম্মেলক সামর্থ্যের পরিচায়ক।[১]

[১] The story of the spread of Indian culture in South East Asian countries is an edifying one, showing alike the vigour and assimilative power of Hinduism. — Sinha & Banerjee.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

1. Why should we cali it 'Medieval India' rather than Muslim India?
2. A brief note on the types of sources; the Sultanate period.

॥ বিষয়ক্রম ॥

মধ্যযুগ কেন ?—সুলতানী যুগের উপাদান—সাহিত্যগত উপাদান—বিদেশীদের বিবরণ—প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

প্রথম অধ্যায়
মধ্যযুগের সূচনা



মধ্যযুগ কেন

ঘটনার ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য রক্ষা করে অতীতের যথাযথ ও অবিকৃত পুনরুদ্ধারই হল ইতিহাস অনুসন্ধানের ও বিন্যাসের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়। তাই ইতিহাস নানা যুগে বিভক্ত। এই যুগ বিভাগগুলি হল, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ এই তিন শিরোনামে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেহেতু প্রাচীনকালে ভারতে হিন্দুরাই রাজত্ব করেছেন তাই তা হিন্দু যুগ। তেমনিভাবে মধ্য যুগে মুসলমান শাসনের জন্য মুসলমান যুগ, আধুনিক যুগে ইংরেজ শাসনের জন্য ব্রিটিশ যুগ।

ভারতের ইতিহাসের এই বিন্যাস ইতিহাসের মৌল সর্তকেই অগ্রাহ্য করে। কারণ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগের অবদানই হল তাদের তুলনামূলক গুরুত্বের পরিমাপক।[১] আর প্রকৃতপক্ষে যুগ বিভাগ করাই হয় এই উদ্দেশ্যে। সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করে সামগ্রিক ইতিহাসে প্রতিটি যুগের অবদানের মূল্যায়ণ করা হয়।

যুগ বিভাগের অন্যতম নির্ণায়ক হল ঐতিহাসিক উপাদানের লভ্যতা। যত বেশী বিভিন্ন ধরনের উপকরণ পাওয়া যাবে তত বেশী নিশ্চয়তার সঙ্গে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে। প্রাচীন যুগের উপাদানের বৈচিত্র্যও কম, সংখ্যাও কম। তাই অধিকাংশ সিদ্ধান্তই আনুমানিক। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী স্পষ্ট মধ্য যুগ এবং প্রায় সর্বাংশেই নিশ্চিত আধুনিক যুগ। সুতরাং এই দিক থেকেও ভারতের ইতিহাসকে জাতি ভিত্তিক বিভাজনের কোন যুক্তি নেই।

জাতি ভিত্তিক বিভাজন যে শুধু সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক তাই নয়, সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলনও বটে। কোন্ সম্প্রদায় দেশ শাসন করলো সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো সেই শাসন দেশের গতি-প্রকৃতি ও সমাজ-সংস্কৃতিকে কতটা প্রভাবিত করলো। কিন্তু যখনই সেই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে এড়িয়ে কোন সম্প্রদায়ের শাসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তখনই ইতিহাস পর্যালোচনার যে মূল লক্ষ্য —সত্যানুসন্ধান, তাকেই উপেক্ষা করা হয়। তাছাড়া বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেখানে সেই ঐক্যবোধ বিঘ্নিত হবার সামান্যতম সম্ভাবনা সম্পর্কেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং ইতিহাসের তত্ত্বগত দিকের বিচারে এবং বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ইতিহাসের মুসলমান শাসনকাল মধ্য যুগ বলে চিহ্নিত হওয়াই যথার্থ এবং সংগত। ইতিহাস কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পূজারী কখনো নয়।

॥ সুলতানী যুগের উপাদান ॥

তুর্কী আক্রমণকারীগণ ভারত-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এনেছিল ইতিহাস রচনা-রীতি। ফলে মুসলমান আক্রমণের আরম্ভ থেকে মুসলমান শাসনের শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নেই। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের বিবরণ এবং নানা সাহিত্যগত উপাদান। ফলে প্রাচীন যুগের তুলনায় অনেক নিশ্চয়তার সঙ্গে এ সময়ের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে।

॥ সাহিত্যগত উপাদান ॥

এ সময়ের সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আমীর খসরু। তিনি

১ The contribution of different ages to the evolution of national history and culture should be the main criterion of their relative importance.
— R. C. Majumder.

ছিলেন মূলতঃ কবি। কিন্তু ইতিহাস ভিত্তিক বহু রচনাও তাঁর আছে। সুলতান ও অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে বহু বিষয়ে সত্য ঘটনা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল।

এ সময়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন জিয়াউদ্দীন বারাণী। তাঁর রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে বলবন থেকে ফিরোজ তুঘলকের শাসনকালের ইতিহাস বিধৃত।

ফিরোজ তুঘলকের শাসনকালের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন সামস-ই-সিরাজ আফিফ। তাছাড়া ফিরোজ নিজেই তাঁর শাসনকালের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচনা করেন। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কিত আরেকটি গ্রন্থ সিরাট-ই-ফিরোজশাহী। কিন্তু এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম জানা যায় না।

এ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ইসামী রচিত। এই গ্রন্থে গজনীর প্রাধান্য থেকে মহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত বিধৃত।

তৈমুরের আত্মজীবনী থেকেও সে সময়ের অনেক কথা জানা যায়। এ সম্পর্কে আরেকটি গ্রন্থ হল 'জাফর-নামা'।

মহাম্মদ ঘুরী থেকে সুলতান মহাম্মদের রাজ্যারোহণ পর্যন্ত জানার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় ইয়া বিন আহম্মদ রচিত তারিখ-ই-মোবারক শাহী গ্রন্থের উপর।

তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসকগণও তাঁদের শাসনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। ঐ সব গ্রন্থও সুলতানী যুগের ইতিহাস জানার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

॥ বিদেশীদের বিবরণ ॥

বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ইবন বতুতার নাম। তাঁর বিবরণ থেকে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিচার বিভাগীয়— এক কথায় ভারতবর্ষের এক সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর কাল এদেশে কাটিয়েছিলেন।

বিজয়নগর রাজসভায় আগত পারসিক দূত আবদুর রজ্জাকের রচনাও এই প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের মধ্যে উল্লেখ্য মার্কপোলো ও কর্ভিলো। তাঁরা চীনে যাওয়ার ও ফেরার পথে ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের রচনায় ভারতের নানা প্রসঙ্গ উল্লিখিত। তাছাড়া ইতালীর পরিব্রাজক নিকোলা কন্টির বিজয়নগর সম্পর্কিত বিবরণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলবুকার্কের চিঠিপত্র থেকে তখনকার গুজরাট সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নিকিতিন নামে এক রাশিয়ার ব্যবসায়ী, ইতালীর বারথেমা, পর্তুগীজ বারবোজা এবং দোমিনিগো পায়াস।

॥ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ॥

প্রাচীন যুগের মত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান মধ্যযুগে তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এই-সব উপাদান রাজবংশ তালিকা প্রণয়নে এবং রাজ্যের সীমানা নির্ধারণে খুবই সহায়ক। বিশেষ করে উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদের শিলালিপি এইসব অঞ্চলের ইতি-হাস সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করে।

সুলতানী যুগের মুদ্রা এ সময়ের ইতিহাসের খুবই নির্ভরযোগ্য উপাদান। এ সম্পর্কে লেন পুল বলেছেন, মুদ্রা থেকে আমরা রাজবংশ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। কোন সুলতানের রাজ্যারোহন কাল, তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি, প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের সংগে তাঁর সম্পর্ক, ধর্মীয় প্রধানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা যায় মুদ্রা থেকে।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Advent of Islam in India—The Arab conquest of Sind—its inpact negligible.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

সিন্ধু অভিযানের কারণ—আরব অভিযান—আরব সাফল্যের ফলাফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবদের সিন্ধু জয়



সিন্ধু অভিযানের কারণ

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহাম্মদের মৃত্যুর সময় আরবদের আধিপত্য আরব-দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একশ' বছরের মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। সিন্ধু দেশ আক্রমণের প্রাক্কালে আরবদের সাম্রাজ্য আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর থেকে ভারতের সীমান্ত ও কাস্পিয়ান সাগর থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারস্য অধিকারের পর আরবদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েছিল ভারতের প্রতি।

ঐতিহাসিক আরনল্ড অবশ্য মনে করেন ধর্ম অপেক্ষা পররাজ্যের ধন সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল আরবদের রাজ্যজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে যখন তারা পর পর সামরিক সাফল্য পাচ্ছিল তখন তারা স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠে-ছিল। এই প্রবণতাই তাদের ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেছিল।

তবে কোন সন্দেহ নেই ভারতের সম্পদ ও প্রাচুর্য আরবদের বহুদিন আগে থেকেই আকৃষ্ট করেছে। তারা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতো। হিন্দু রাজাদের কাছ থেকে অনেক বাণিজ্যিক সুবিধাও তারা ভোগ করতো। কিন্তু কালক্রমে তারা শুধু বাণি-জ্যই নয়, রাজ্যবিস্তারেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। অনেকে বলেন ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই তারা ভারত আক্রমণ করে। এর সঙ্গে লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষাও তাদের নিশ্চয়ই ছিল।

কিন্তু অষ্টম শতকের প্রারম্ভে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিন্ধু দেশের সঙ্গে আরবদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঘটনা হল, সিংহলরাজ ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজের নিকট উপহার-পূর্ণ কয়েকটি জাহাজ পাঠান। কিন্তু সেই জাহাজগুলি সিন্ধু দেশের দেবলের জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। হজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। দাহির তা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়।

॥ আরব অভিযান ॥

প্রথম দুই অভিযান ব্যর্থ হলে ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হন। কাশিম মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন।

॥ আরব সাফল্যের ফলাফল ॥

ঐতিহাসিক লেন পুল আরবদের সিন্ধু জয়কে এক ফলাফলহীন ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।[১] একই কথার প্রতিধ্বনি করে উল্‌সলে হেগ বলেছেন যে এই আক্রমণ এই বিশাল দেশের এক প্রত্যন্ত সীমাকে স্পর্শ করেছিল মাত্র।[২] অধ্যাপক হবিবুল্লাও এই মত প্রকাশ করেছেন যে আরবদের এই সাফল্য ভারতে ইসলামকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।[৩]

প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুকে কেন্দ্র করে আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে

১ the conquest was only an episode in the history of India and of Islam, a triumph without result.

—Lane Poole.

২ It affected only a small portion of the fringe of that vast country.

—Sir Wolsely Haig.

৩ The Arab was not destined to raise Islam to be a political force in India.

—Prof. Habbibullah.

নি। রাজপুতনা, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, কুচ প্রভৃতি অঞ্চলের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে আরবগণ একাধিক অভিযান প্রেরণ করেছিল ঠিক। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তারা সাফল্য-লাভ করতে পারে নি। বরং আরবদের অধীনে সিন্ধুদেশ সাময়িকভাবে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দিক থেকে আরবদের অভিযান ভারতবর্ষের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই অভিযান একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। যদিও তারা কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিল তথাপি ভারতীয় সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি। বরং উন্নত ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তারা যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষতায় তারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষবিদ্যা, সংগীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তারা উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেছিল। বাগদাদের রাজসভার আনুকূল্যে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি আরবদেশে সম্প্রসারিত হয়েছিল। খলিফা মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রহ্মগুপ্ত রচিত 'ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত' ও 'খণ্ড-খাদ্যক' নামে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীভাষায় অনূদিত হয়। হ্যাভেল তাই মন্তব্য করেছেন, গ্রীস নয় ভারতবর্ষই আরবকে শিক্ষিত করে তুলেছিল। তার দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তা ভারতেরই অবদান। তার সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য ভারতীয়দের দ্বারাই প্রভাবিত।[৪]

[৪] **It was India and not Greece that tought Islam in the impressionable. years of its, youth, formed its philosophy and esoteric religious ideal and improved its most characteristic expression in literature, art and architecture.**

— Havell.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠ্যক্রম ॥

Beginning of Muslim rule—Condition of Northern and Western India on the eve of the Muslim invasion—Sul'tan Mahmud—Results of his invations —Al-Biruni on Indian culture and civilisation.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ—সুলতান মামুদের অভিযান—আক্রমণের ফলাফল—অলবিরুণীর বিবরণ।

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলমান শাসনের সূচনা



মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ

তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ কতগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এইসব রাজ্যগুলি ছিল পরস্পরের সম্পর্কে ঈর্ষাকাতর এবং পরস্পর বিবদমান। প্রয়োজন বোধে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতেও তারা পশ্চাদপদ ছিল না।

তখন উত্তর ভারতের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তিগুলি ছিল চেনাব নদী থেকে কাবুল সহ হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত ভূখণ্ডে হিন্দুশাহী রাজ্য, কাশ্মীর রাজ্য, কনৌজের প্রতিহার বংশ ও বাংলার পালবংশ। পশ্চিম ভারতে এই সময় চোল ও চালুক্যদের পারস্পরিক বিবাদের ফলে এক বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সব রাজ্যগুলির মধ্যে কোন সর্বভারতীয় চেতনা ছিল না। কেন্দ্রীয় কোন শক্তি না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছিল।

সামরিক দিক থেকে ভারতীয় রাজারা প্রাচীন গতানুগতিক সংগঠন নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সংগঠনকে সময়োপযোগী করে তুলতে তাঁরা কখনোই উদ্যোগ নেন নি। তাই তাঁরা যখন যুদ্ধে হাতির ব্যবহারের উপর জোর দিতেন তখন মধ্য ও পশিচম এশিয়ায় দ্রুতগতি সম্পন্ন বল্লমধারী অশ্বারোহী বাহিনীর ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সামাজিক দিক থেকে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও ধনবন্টনের বৈষম্য সমাজের গতিশীলতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সমাজজীবনে ছিল না কোন ঐক্য, কোন সংহতি। একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য অন্যদিকে অপরিমেয় ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। এর মধ্যে ছিল দেবালয়গুলিও। এই ধনসম্পদের কথাই বিদেশে ছিল বহুল প্রচারিত।

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তখন বিপর্যয়। অন্ধত্ব ও কুসংস্কার ধর্মের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। আবার বহির্জগৎ থেকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় ভারতের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নেমে এসেছিল এক স্থবিরতা। সামগ্রিকভাবে এই সময়কে এক অবক্ষয়ের সময় বলা যায়।

॥ সুলতান মামুদের অভিযান ॥

অষ্টম শতাব্দীতেই ইসলামের কর্তৃত্ব আরবদের হস্তচ্যুত হয়ে ধর্মান্ধ ও দুর্ধর্ষ তুর্কীদের অধীনে আসে। ইসলাম-সাম্রাজ্যের সর্বত্র তুর্কীগণ স্বাধীনভাবে ছোট ছোট রাজ্য গঠন করে।

এরকমই একটি রাজ্য আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীন। তাঁর পুত্র সবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করেন, কিঞ্চিৎ সাফল্যও লাভ করেন। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি। সেই কাজ সম্পন্ন করেন তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ।

সুলতান মামুদ মোট কতবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। হেনরী ইলিয়টের মতে তিনি সতেরো বার ভরত আক্রমণ করেন। এই মতই অধিকাংশ ঐতিহাসিক সমর্থন করেন। মামুদের রাজসভার ঐতিহাসিক উৎবীর মতে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের তাগিদেই মামুদের ভারত অভিযান। কিন্তু জাফর, হ্যাভেল প্রভৃতিদের মতে ধর্ম নয়, ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল তাঁর বারংবার ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য। কেননা তিনি কখনো ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন নি। তাঁর এইসব অভিযানকালেই বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করা হয়।

॥ আক্রমণের ফলাফল ॥

ঐতিহাসিক স্মিথ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে মামুদ ছিলেন একজন ক্ষমতা-শালী লুণ্ঠনকারী দস্যু।[১] সুতরাং লুণ্ঠনকারীর আক্রমণ থেকে কোন স্থায়ী প্রভাব প্রত্যাশিত নয়। তাছাড়া ঐতিহাসিক লেন পুল মনে করেন উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজন্যবর্গকে ধ্বংস করে ভারতবর্ষ জয় গজনীর সৈন্যবাহিনীর সামর্থ্যের বাইরে ছিল।[২] সুতরাং লুণ্ঠন ছাড়া মামুদের কিছুই করণীয় ছিল না।

তবে তাঁর আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের সামরিক দুর্বলতা যেমন প্রকট হয়ে ওঠে তেমনি অবাধ লুণ্ঠনে, ধ্বংসে এবং বারংবার আক্রমণের আশংকায় ও অনিশ্চয়তায় সৃষ্টি হয় এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়। তাই বলা যায় সুলতান মামুদের আক্রমণ ও পাঞ্জাব ও মুলতানের উপর তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে মহাম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

॥ অলবিরুণীর বিবরণ ॥

সুলতান মামুদের সঙ্গে এসেছিলেন একজন প্রকৃতই জ্ঞানপিপাসু। তিনি হলেন অলবিরুণী। তিনি এদেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বিশেষভাবে ভাগবৎ-গীতার দর্শন তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। তাঁর রচিত 'কিতাব-উল-হিন্দ' একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে আমরা তদানীন্তন ইতিহাস ও ভারতীয় আচার-আচরণ ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারি।

অলবিরুণী ভারতীয়দের ইতিহাস বিমুখীনতার তীক্ষ্ম সমালোচনা করেছেন। সময়ানুক্রমিক ইতিহাস রক্ষার কোন গুরুত্বই তাঁরা উপলব্ধি করেন নি। ফলে যত-টুকুওবা ইতিহাস রচিত হত, তা রূপকথায় পর্যবসিত হত।

অলবিরুণী হিন্দুদের দাম্ভিক মানসিকতারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে হিন্দুরা তাদের তুলনায় কোন ক্ষেত্রেই উন্নত কেউ থাকতে পারে তা ভাবতেই পারতো না। অথচ, অলবিরুণীর মতে, তাদের পূর্বপুরুষেরা এমন সংকীর্ণমনা ছিল না। এই মানসিকতার জন্যই তারা সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে।

অলবিরুণী হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই প্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোরভাবে আরোপিত এবং এত কঠোরতার ফলেই সামাজিক সংহতি বিঘ্নিত হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করতে তিনি নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

---

১ Mahmud was simply a bandit operating on a large scale. — Smith.

২ An occupation of India was beyond the means of the forces of Ghazni. — Lane Poole.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

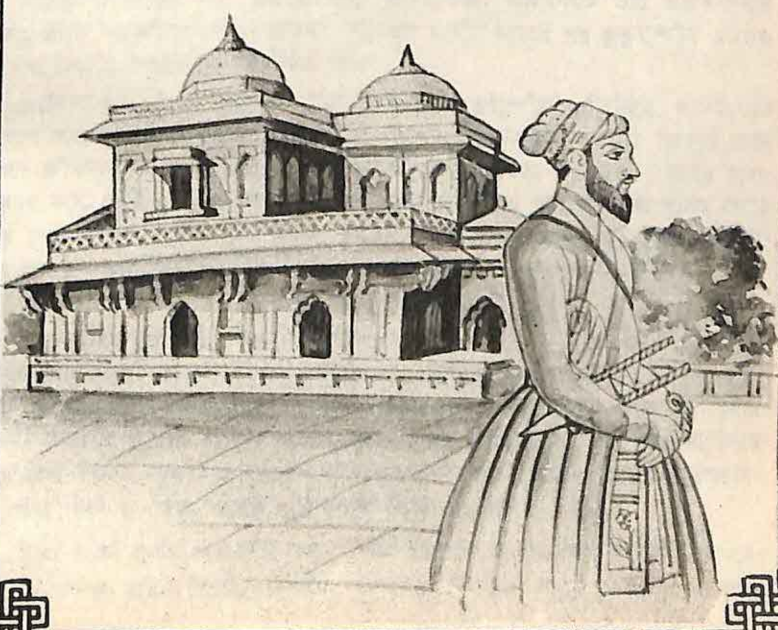
From invasion to empire-building—foundation of the Delhi Sultanate by Qutubudin—Iltutmish and Balban—nature of the external and internal threats—consolidation of the Sultanate.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

পূর্বকথা—দাসবংশ—কুতুবুদ্দীন আইবক—ইলতুৎমিস—গিয়াসুদ্দীন বলবন।

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্রাজ্য গঠন



পূর্বকথা

গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ঘুর রাজ্য। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর ঘুরের সুলতান গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ গজনী দখল করেন।

গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর ঘুরের সুলতান হন মুইজুদ্দীন, যিনি ইতিহাসে মহাম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত।

ঘুরী ছিলেন উচ্চাভিলাষী। ভারতজয় ছিল তাঁর লক্ষ্য। তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধুদেশে তুর্কীজাতির বিভিন্ন শাখা রাজত্ব করতো। ভারত জয়ের প্রস্তুতি হিসেবে ঘুরী প্রথমে মুলতান, পরে পাঞ্জাব জয় করেন।

এইবার ঘুরী দিল্লী ও আজমীঢ়ের চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র কনৌজরাজ জয়সিংহ ব্যতীত উত্তর ভারতের অন্য সব রাজন্যবর্গ ঐক্যবদ্ধ হন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের কাছে তরাইনে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ঘুরী পরাজিত হয়ে গজনীতে ফিরে যান। কিন্তু পর বৎসর এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে ঘুরী আবার তরাইনে পেঁছান। এইবারও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সত্ত্বেও পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

তরাইনের এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসের এক দিকনির্ণায়ক ঘটনা। কারণ এই যুদ্ধের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হল। এই যুদ্ধে পরা-জয় রাজপুতশক্তির উপর এক প্রচণ্ড আঘাত, যার ফলে ভবিষ্যতে ভারতে মুসলমানদের অধিকতর প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত হল।

॥ দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য ॥

॥ দাসবংশ ॥

মহাম্মদ ঘুরী তাঁর এক ক্রীতদাস, যিনি আপন যোগ্যতার বলে ঘুরী-সেনাবাহিনীর এক শাখার অধিনায়ক পদে উন্নীত হন, কুতুবুদ্দীন আইবককে তাঁর ভারত-স্থিত রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সুতরাং ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতুবুদ্দীন ১২০৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

এলফিনস্টোন, স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কুতুবুদ্দীন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে দাসবংশ বলে অভিহিত করেন। কারণ এই বংশের অধিকাংশ সুলতানই ছিলেন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস। কিন্তু সম্প্রতি এই নামকরণের বিরোধিতা করা হয়। কারণ সুল-তানদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রীতদাস হলেও সিংহাসনে বসার আগেই তাঁরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। বরং এই বংশকে মামেলুকবংশ বলা অনেক যুক্তিযুক্ত। মামে-লুক কথাটির অর্থ হল স্বাধীন পিতামাতার যে সন্তান কোন কারণে ক্রীতদাস।

॥ কুতুবুদ্দীন আইবক ॥

কুতুবুদ্দীনকে প্রথমেই কতগুলি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দীন ইলদুজ এবং মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন কুবাচা কুতুবুদ্দীনের রাজ্যারোহণকে মেনে নিলেন না। দ্বিতীয়তঃ বাংলার বক্তিয়ার খিলজী নিজেকে ঘুরীর অনুচর বলে ঘোষণা করায় পূর্বভারতে তাঁর অধিকার নিয়ে সংশয় দেখা দিল। তৃতীয়তঃ তখন পর্যন্ত রাজধানী দিল্লীর কোন মর্যাদা মুসলমান-দের কাছে ছিল না, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল লাহোর।

এইসব সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে তিনি প্রথমেই লাহোর যাত্রা করেন। সেখান-কার নাগরিকগণ তাঁকে দিল্লীর স্বাধীন শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেন। এর পরই

ঘুরীর বংশধর গিয়াসুদ্দীন তাঁকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতিদান করেন।

তারপর তিনি গজনী থেকে তাজউদ্দীনকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হলেও গজনীকে অধিকারে রাখতে পারেন নি। বরং তিনি পাঞ্জাব সীমান্তকে অধিকতর সুদৃঢ় করতে মনোযোগী হন। অন্যদিকে বাংলায় বক্তিয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় সেই সুযোগে কুতুবুদ্দীন তাঁর অনুগত আলিমর্দন খিলজীকে বাংলার শাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এইভাবে সেখানে দিল্লীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

কুতুবুদ্দীন রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা সংহতিকরণের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল, গজনীর তাজউদ্দীনের আগ্রাসী চেষ্টা থেকে দিল্লীর সুলতানীকে রক্ষা করা। তিনি মধ্য এশিয়ার রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল্লীর সুলতানীকে সম্পূর্ণ ভারতীয় চরিত্র দান করেন। দিল্লীকে রাজধানী করে এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ রোপণ করেন। তিনি প্রকৃতই স্বাধীন সার্বভৌম সুলতান ছিলেন কিনা এ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ হবিবুল্লাহ বলেছেন যে তাঁর মধ্যে তুর্কী সাহসিকতার সঙ্গে পারসিক ঔদার্যের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।[১]

॥ ইলতুৎমিস ॥

পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ আর. পি. ত্রিপাঠি বলেছেন যে তাঁর শাসনকাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়।[২]

তাঁর রাজত্বেরও সূচনা হয়েছিল নানা সংকটের মধ্য দিয়ে। প্রথমতঃ তাজউদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন কুবাচা তাঁকে স্বীকার করে নিতে রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ সুলতানের সঙ্গে তুর্কী আমীর ও মালিকদের সাংবিধানিক সম্পর্ক স্থির করা জরুরী ছিল। কেননা এরা নিজেদের সুলতানের সমকক্ষ মনে করতো, যার ফলে সুলতানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। তৃতীয়তঃ বাংলা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। চতুর্থতঃ চারিদিকে নানা সংকটের সুযোগ নিয়ে রাজপুতগণ নিজেদের লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হয়। সর্বোপরি ভয়ংকর রক্তলোলুপ চেঙ্গীজ খাঁর ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রথমেই ইলতুৎমিস গজনীর দিকে দৃষ্টি দেন। এইসময় খারজম শাহের আক্রমণে তাজউদ্দীন গজনী হারিয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন এবং লাহোর অধিকার করেন। তদুপরি তিনি ইলতুৎমিসের বশ্যতা দাবী করলে ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে তাজউদ্দীন পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লীর উপর গজনীর দাবী এই পরাজয়ের ফলে চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

এদিকে নাসিরুদ্দীন কুবাচা পাঞ্জাবে তাঁর প্রভাব সম্প্রসারিত করলে ১২১৭ খৃষ্টাব্দে ইলতুৎমিস তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পাঞ্জাব কুবাচার অধিকার মুক্ত হয়।

এ সময়েই পাঞ্জাব মোঙ্গল আক্রমণের আশংকায় তটস্থ হয়ে ওঠে। কারণ মোঙ্গলবীর চেঙ্গীজ খাঁ খারজম রাজ্য আক্রমণ করলে খারজম শাহ জালালুদ্দীন পাঞ্জাবে পালিয়ে আসেন এবং ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইলতুৎমিস যথেষ্ট

[১] He combined the intrepedity of the Turk with the refined taste and generosity of the Persian. — Dr. Habibullah.

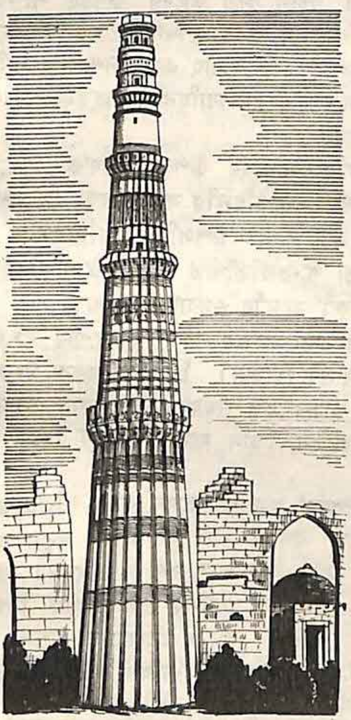
[২] The history of Muslim sovereignty in India properly speaking begins with Iltutmish. — Dr. R. P. Tripathi.

দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে এই বিরোধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলে জালালুদ্দীন পারস্যে পালিয়ে যান। ফলে চেঙ্গীজ খাঁও তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করেন। এইভাবে এক শিশুরাষ্ট্র এক প্রবলের প্রচন্ড হুংকার থেকে অব্যাহতি পেল।

এরপর ইলতুৎমিস কুবাচাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহও তিনি দমন করে সেখানে দিল্লীর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। তা ছাড়া তিনি রণথোমভোর, গোয়ালিয়র, কনৌজ ও কালিঞ্জর পুনর্দখল করে সুলতানী সাম্রাজ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

১২২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে যে স্বীকৃতি লাভ করেন তার ফলে রাজপদে তাঁর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ মুসলমান জগতে খলিফার স্বীকৃতিই ছিল প্রশ্নাতীত অধিকার।

শুধু সাম্রাজ্যের সংকট দূরীকরণের ক্ষেত্রেই নয়, সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তিনি এক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি যে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন তার শক্তি ও সমর্থনের উৎস ছিল মূলতঃ বিদেশীদের নিয়ে গঠিত সর্বভারতীয় সামরিক ও প্রশাসনিক সংগঠন। তিনি ইকতা বা প্রাদেশিক প্রশাসন, সামরিক বাহিনীর সংগঠন ও মুদ্রার প্রবর্তন করেন। রাজধানী হিসেবে দিল্লীকে মর্যাদামণ্ডিত করতে তিনি দিল্লীকে সুসজ্জিত করেন, কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন এবং দিল্লীকে এক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করেন।



কুতুবমিনার

এক চরম এবং সর্বগ্রাসী সংকটের মুহূর্তে ইলতুৎমিস এক শিশু সাম্রাজ্যের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সুগভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অন্তদৃষ্টি ও কূটনৈতিক জ্ঞান তাঁকে তাঁর দায়িত্বপালনে যথার্থই সাহায্য করেছে। তদুপরি এতকাল ভারতে তুর্কী শাসনের ভিত্তিই ছিল ঘুর শাসনের ঐতিহ্য। কিন্তু ইলতুৎমিস সম্পূর্ণই তাঁর একক ক্ষমতায় এই প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে দিল্লীকে মুক্ত করেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে ডঃ নিজামী যথার্থই বলেছেন, ইলতুৎমিস দেশকে দিয়েছেন একটি রাজধানী, একটি স্বাধীন রাজ্য, শক্তিশালী রাজতন্ত্র এবং এক শাসক সম্প্রদায়।°

॥ গিয়াসুদ্দীন বলবন ॥

রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুর্কী আমীর ওমরাহদের যে বিরোধ আরম্ভ হয়েছিল ইলতুৎ-

° It was he (Iltutmish) who gave the country a capital, an independent state, a monarchical form of government, and a governing class.
— Dr. K. A. Nizami.

মিসের রাজত্বকালে এবং যে বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা ব্যতীত দিল্লীর সিংহাসনে সুলতান কখনো নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হতে পারেন না, সেই বিরোধের শেষ পর্যায় হল গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসনকাল।

রাজপদের মহিমা, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে বলবন ছিলেন বদ্ধপরিকর। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে সব আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংকটের সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন তার প্রতিবিধানের সেটাই ছিল একমাত্র পথ। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে আইন-শৃংখলার প্রয়োজন যেমন ছিল তেমনি তখন প্রয়োজন ছিল সেই আইন-শৃংখলাকে অব্যাহত রাখার মত উপযোগী প্রশাসনিক সংস্কার। দেশের বাইরে নিয়মিত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার মত উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অপরিহার্যতা।

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃংখলা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রথমে তিনি মেওয়াটির দস্যুদের দমনের জন্য দিল্লীর চতুর্দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করেন, বহু দস্যু ধরে হত্যা করেন, সামরিক ছাউনী ও থানা স্থাপন করেন। এরপর তিনি সাম্রাজ্যের শস্যভান্ডার দোয়াব অঞ্চলের দস্যুতা ও বিদ্রোহ নির্মম হাতে দমন করেন। এই অঞ্চলের জমি অভিজ্ঞ রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করে তাদের উপরই শান্তি-শৃংখলার ভার অর্পণ করেন। সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপথ ও রাজপথগুলিকেও দস্যুমুক্ত করে নিরাপদ করেন তিনি। এই সময়ই রোহিলাখন্ডের বিদ্রোহ এমন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে যে সেখানে সুলতানী শাসনের প্রায় অবসান ঘটে। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে অত্যন্ত কঠোর হাতে বলবন স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করেন।

বলবন সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ অপেক্ষা সংহতি সাধনের উপরই সার্বিক গুরুত্ব-আরোপ করেন। কারণ রাজকোষের অনটন এবং সেনাবাহিনীর সীমাবদ্ধতা যে সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণের অনুকূল নয় এ সত্য বলবন উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রথমেই বলবন রাজপদের মর্যাদা ও ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে তুর্কী আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা সংকুচিত করতে না পারা পর্যন্ত সুলতানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের মতই বলবন রাজার দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলেই মনে করতেন। তাই তাঁর কাজকর্মের সমালোচনার কোন অধিকার কোন মানুষের নেই। অধ্যাপক নিজামী বলেছেন, তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁর স্বৈরশাসনকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।[৪]

এই বিশ্বাস অনুযায়ী এবং সুলতান সম্পর্কে জনগণ বিশেষ করে অভিজাতদের মধ্যে একটা ভীতি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে বলবন দরবারে অনেক নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি সরাসরি দর্শনার্থীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দেন। রাজসভায় কঠোরভাবে গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখতেন। দরবারে পারসিক প্রথা, যেমন 'সিজদা' অর্থাৎ সুলতানের সম্মুখে নতজানু হওয়া, 'পাইবস' অর্থাৎ সিংহাসন চুম্বন করা প্রভৃতি প্রবর্তন করেন। রাজসভায় নৃত্য-গীত, মদ্যপান প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয়। রাজসভার কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক প্রবর্তন করা হয়।

প্রজাদের প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা বলবন তাঁর মহান কর্তব্য বলে মনে করতেন। এটা ছিল তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের উপর কোন অবিচারের সংবাদ পেলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হতেন। কর্মচারীদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি একদল গুপ্তচর নিয়োগ করেন।

৪ This was a subtle religious device to sancitfy the exercise of his despotic authority. — Prof. K. A. Nizami.

অধ্যাপক নিজামীর ভাষায় যদিও তিনি নিম্নবংশোদ্ভূতদের ঘৃণা করতেন তথাপি সাধারণ মানুষের মঙ্গলসাধনে তাঁর মনোভাব ছিল পিতার মত।[৫]

তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে কতগুলি নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই ইলতুৎমিসের জীবিত পরিবারবর্গকে হত্যা করে নিজেকে নিষ্কণ্টক করেন। তাছাড়া অভিজাতদের যে চল্লিশ-চক্র অতিশয় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল তাদের তিনি একে একে হত্যা করেন। সর্বোপরি এক দক্ষ গুপ্তচরবাহিনী নিয়োগ করে অভিজাতদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেন।

জার্মানীর বিসমার্কের মত বলবনও বিশ্বাস করতেন রাজশক্তির প্রধান স্তম্ভ দক্ষ সেনাবাহিনী। তাই তিনি সেনাবাহিনীর সংস্কারে উদ্যোগী হন। অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ করে তিনি সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিয়মিত কুচ-কাওয়াজ করা হত। গোপনে যুদ্ধ পরিকল্পনা করা হত। যুদ্ধের সামান্য আগে ছাড়া সেনাবাহিনী তাদের গন্তব্যস্থল জানতে পারতো না। বলবন তাঁর বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীতে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন। ইলতুৎমিসের সময় থেকে সেনাবাহিনীর যারা জায়গীর ভোগ করতো তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ, অক্ষম হয়ে গিয়েছিল তাদের জায়গীরের পবিবর্তে বাৎসরিক ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। বলবন পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নতুনভাবে পুনর্গঠন করেন। সৈন্যদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন বৃদ্ধি করেন বলবন, তেমন সৈন্যবাহিনীর চলাচলের সময় যেন সাধারণ মানুষের কোন কষ্ট না হয় সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

তিনি শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিজে নিয়োগ করতেন। তুর্কী বংশোদ্ভূতদের সব সময়েই অগ্রাধিকার দেওয়া হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তাঁর কাছে নিয়মিত বিবরণী পাঠাতে হত। কোন কর্মচারীর হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকা তিনি বিপজ্জনক মনে করতেন। তাই তিনি উজীরের ক্ষমতা কমিয়ে দেন।

বলবনের শাসনকালে বাংলার তুঘিল খাঁর বিদ্রোহ ছিল একটা বড় ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা। কারণ তুঘিলের ন্যায় এক দাস কর্মচারীর বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য প্রদেশের দাস কর্মচারীদের একই পথ অনুসরণের সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া বাংলা ছিল এক সীমান্ত রাজ্য। বাংলা বিচ্ছিন্ন হলে পূর্ব ভারতে সুলতানি শাসন বিপর্যস্ত হয়। তদুপরি বাংলা থেকে প্রচুর রাজস্ব দিল্লী যেত। বাংলা স্বাধীন হলে সেই রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা।

তাই বলবন এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। বিদ্রোহ দমনে তিনি দুবার দুই বাহিনী পাঠান। কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার তিনি নিজে তুঘিলের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন এবং অতর্কিত আক্রমণে তুঘিলকে নিহত করেন। তিনি এইবার তাঁর পুত্র বুঘরা খানকে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন।

সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে সীমান্তের উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা বলবনের এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব।

এমনিতে প্রাকৃতিক সীমারেখার দ্বারা সুরক্ষিত ভারতবর্ষ। কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন গিরিপথই বারবার বিদেশীদের এদেশে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। এই পথেই ছিল মোঙ্গল আক্রমণের আশংকা। এই অঞ্চলে স্থায়ী

৫ Balban displayed paternal concern for the welfare of the people — in spite of his contempt for the low-born." — Prof. K. A. Nizami.

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বলবন সীমান্তে বহু দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেখানে অভিজ্ঞ রণকুশলী আফগান সেনা মোতায়েন করেন। সমগ্র অঞ্চলের দায়িত্ব দেন বিখ্যাত যোদ্ধা শেরখানের উপর। কিন্তু শেরখানের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মুলতান, সিন্ধু ও লাহোর নিয়ে এক ভাগ—যার দায়িত্বে থাকলেন বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাম্মদ। আর পাঞ্জাবের সুণাম ও সামানা নিয়ে আরেক ভাগ, তার দায়িত্বে থাকলেন সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁ। আর বলবন নিজে থাকতেন রাজধানীতে সীমান্তের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলরা একবার পাঞ্জাব দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে দুই শাহজাদা সে চেষ্টা ব্যর্থ করেন। ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলেরা পুনরায় চেষ্টা করলেও সফল হতে পারে নি। কিন্তু এবার মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে মহাম্মদ নিহত হন। যাই হোক, পর পর দুইবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে বলবন তাঁর অনুসৃত সীমান্ত নীতির সাফল্যই প্রমাণ করেছিলেন।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলবনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করে বলা যায় তিনি তুর্কী সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সাম্রাজ্যকে এক নতুন জীবন দিয়েছিলেন, তিনিই প্রথম রাজপদের গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে জনজীবনকে নিরাপদ করেছিলেন এবং সীমান্ত সুরক্ষার সুব্যবস্থা করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর শাসনকালের সূচনাতেই সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনের যে নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই নীতির সফল বাস্তবায়নে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

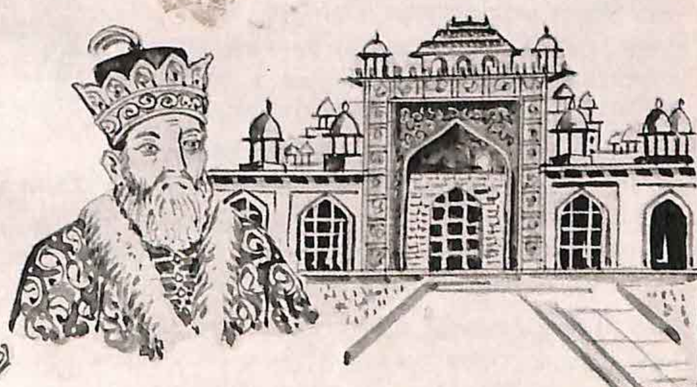
Khalji imperialism—growth of the empire under Alauddin (no detailed account of his campaigns) his attempts at consolidating the authority of the Central Government—his economic measures and its results.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

খলজী বিপ্লব—আলাউদ্দীন খলজী—শাসক আলাউদ্দীন—আলাউদ্দীনের শাসন ব্যবস্থা—আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

পঞ্চম অধ্যায়

খলজী সম্রাজ্যবাদ



খলজী-বিপ্লব

ইতিহাসের গতিপথ বড়ই বিচিত্র, নির্বিকার এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ। যে গিয়াসুদ্দীন বলবন সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যেন অভিজাতগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির খেলায় প্রমত্ত হয়ে উঠতে না পারে সে বিষয়ে এত সতর্ক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করেছিলেন সেই বলবনের মৃত্যুর পরই অভিজাতগণ সেই পুরানো খেলাতেই মত্ত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তুর্কী অভিজাতদের ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন এক শাসক গোষ্ঠী প্রাধান্য লাভ করে। এই গোষ্ঠী খলজী গোষ্ঠী নামে পরিচিত, যাদের নেতা ছিলেন জালালুদ্দীন খিলজী। ভারতের ইতিহাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ঘটনাকে খলজী বিপ্লব বলা হয়। বিপ্লব এই কারণে যে, প্রথমতঃ খলজীগণ কোন রাজপরিবারভুক্ত ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। তাদের ক্ষমতালাভে প্রমাণিত হল সার্বভৌম অধিকার কোন এক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীগণ এই পরিবর্তনকে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছিল, কারণ রাজবংশের পরিবর্তন তাদের কাছে অভিনব কোন অভিজ্ঞতা নয়। তৃতীয়তঃ খলজী ক্ষমতা লাভ করেছিলেন নেহাৎই শক্তির পরীক্ষায়। তাদের জন-সমর্থন, বা অভিজাত সমর্থন বা কোন ধর্মীয় সমর্থনের প্রত্যাশী হতে হয় নি। ফলে একদিক থেকে প্রমাণিত হল সেই মধ্যযুগেও ধর্মীয় সমর্থন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা যায়।

যাই হোক জালালুদ্দীন থেকে দিল্লীর সুলতানী শাসনের ইতিহাসে খলজী বংশের সূচনা। জালালুদ্দীনের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খলজী।

॥ আলাউদ্দীন খলজী ॥

আলাউদ্দীন ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ইলতুৎমিস থেকে আরম্ভ করে কেউই দিল্লীর সুলতানী শাসনকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু আলাউদ্দীন স্বপ্ন দেখতেন তিনি আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয়ী বীর হবেন।



আলাউদ্দীন খলজী

অবশ্য তাঁর উত্তর ভারত জয়ের চেষ্টার অন্য কারণও ছিল। রণথম্ভোর, চিতোর প্রভৃতি দুর্গগুলির উপর উত্তর ভারতের আধিপত্য ও নিরাপত্তা নির্ভর করতো। তাছাড়া দিল্লী থেকে গুজরাটের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার পথ ছিল রাজপুতনার মধ্য দিয়ে। সুতরাং সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণেও আলাউদ্দীনের যুদ্ধযাত্রা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। একে একে তিনি উত্তর ভারতের গুজরাট, চিতোর, মালব, মারওয়ার ও জলর জয় করে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন।

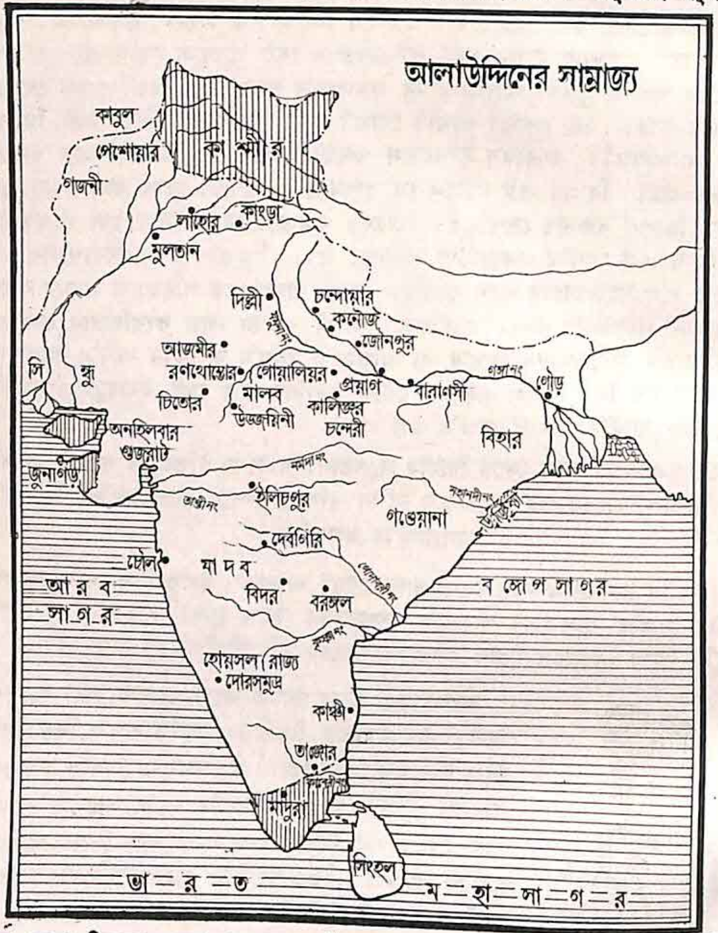
আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত অভিযানের পেছনে ছিল সেখানে সঞ্চিত অপরিমেয় ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা। ডঃ লাল আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত অভিযানকে সুলতান মামুদের উত্তর ভারত অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

যাই হোক দক্ষিণ ভারতেও তিনি চমকপ্রদ সামরিক সাফল্যলাভ করেন। তিনি দেবগিরি তেলেঙ্গানা, দ্বারসমুদ্র, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে তিনি পরাজিত করে প্রচুর কর আদায় করে তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দেন।

॥ শাসক আলাউদ্দীন ॥

রাজ্যজয়ে যেমন রাজ্য শাসনেও তেমনি আলাউদ্দীন অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

বলবনের মত আলাউদ্দীনও সীমাহীন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে তিনিই রাষ্ট্র। সুতরাং সুলতানের



শক্তিকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্যোগী হন আলাউদ্দীন। এই নিয়ন্ত্রক শক্তি ছিল দুটি—অভিজাত শ্রেণী এবং শরিয়ত ব্যাখ্যাকারী উলেমা শ্রেণী।

আলাউদ্দীন বিশ্বাস করতেন রাজার কোন আত্মীয় নেই। দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয় ভৃত্যের অথবা প্রজার। তাই রাজতন্ত্রের উপর বাইরের কোন প্রভাবকেই তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি ধর্মীয় প্রভাবও তিনি অগ্রাহ্য করেন। উলেমাদের প্রভাব খর্ব করতে তিনি বলেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তিনি যা দরকার তাই করবেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় সমর্থনের কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে মধ্যযুগেই আলাউদ্দীন ধর্মকে বর্জন করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

আলাউদ্দীন তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বুঝেছিলেন সুলতান যতক্ষণ শক্তিশালী ততক্ষণ অভিজাতগণ রাষ্ট্রশক্তির বলবর্ধক। কিন্তু দুর্বল সুলতানের সময়ে সেই

অভিজাত সম্প্রদায়ই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ স্বরূপ। তাছাড়া তাঁর শাসনের সূচনাতেই কয়েকটি বিদ্রোহ তাঁকে দমন করতে হয়। সুতরাং সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনি বিদ্রোহের চারটি মূল কারণ খুঁজে বের করেন। যথাঃ (১) গুপ্তচর বিভাগের অযোগ্যতা যার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতান ওয়াকিবহাল হতে পারেন না। (২) মদ্যপানের ব্যাপকতার ফলে মদ্যপগণ জোটবদ্ধ হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সুযোগ পায়। (৩) অভিজাতগণ অবাধে ও যথেচ্ছভাবে নিজেদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে সুলতানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। (৪) মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অতিরিক্ত ধনসম্পদ সঞ্চিত হওয়ার ফলে তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে।

সুতরাং আলাউদ্দীন প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমেই গুপ্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্রাজ্যের অতি তুচ্ছ বিষয়ও সুলতানকে অবহিত করা তাদের কর্তব্য বলে স্থিরীকৃত হল।

আলাউদ্দীন আরেকটি নির্দেশ জারী করে অভিজাতদের নানা কারণে প্রাপ্ত জায়গীর বাতিল করে দেন। যে কোন অজুহাতে অভিজাতদের অতিরিক্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া তাদের উপর অতিরিক্ত করভার আরোপ করা হয়। ডঃ নিজামী অবশ্য মনে করেন এই সব ব্যবস্থা নিয়ে অভিজাতদের জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত হতে বাধ্য করা হয়, অলসতায় তারা যেন বিদ্রোহের চিন্তা না করে—এই-ই সুলতানের লক্ষ্য।

এরপর আলাউদ্দীন দিল্লীতে মদ্য বিক্রয় ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। তিনি নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করেন। অবশ্য কিছুদিন পরে তিনি আদেশ সংশোধন করে গৃহের অভ্যন্তরে মদ্য প্রস্তুত ও পানে অনুমতি দেন।

আলাউদ্দীন তাঁর চতুর্থ নির্দেশের মাধ্যমে সুলতানের অনুমতি ছাড়া অভিজাতদের মেলামেশা, পান-ভোজন ও বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করেন। এই বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় গুপ্তচরদের।

ডঃ লাল মনে করেন বিভিন্ন ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে আলাউদ্দীন অভিজাতদের দাসে পরিণত করেন এবং সেই দাসত্বের সর্ত ছিল তিনটিঃ অভিজাতদের সম্পত্তি সুলতানের উপর বর্তাবে, তাদের পরিবারের বিবাহ সুলতানের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে এবং অভিজাতদের সন্তানেরাও দাসত্ব করবে।

॥ আলাউদ্দীনের শাসন ব্যবস্থা ॥

আলাউদ্দীন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি অনেক মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন ঠিক, কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন সকল শক্তির উৎস।

সুলতানের প্রধান সহকারীকে বলা হত উজীর। কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হত। তিনি আবার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও করতেন। আবার উজীরকে যুদ্ধেও যেতে হত।

উজীরের পর পদমর্যাদায় ছিলেন দেওয়ান-ই-আশরফ। ইনি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের এবং রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে বলা হত আরিজ-ই-মামালিক। কৃষি বিভাগের প্রধান ছিলেন আমীর-ই-কোহি। কিন্তু সুলতানী যুগে সামরিক ও

বেসামরিক বিভাগের বিশেষ ভেদাভেদ ছিল না। প্রয়োজনে যে কোন কর্মচারীকে যুদ্ধে যেতে হত। এছাড়া আলাউদ্দীন মূল্যনীতি প্রবর্তন করার পর দুটি উচ্চ পদের সৃষ্টি করেন। একজন হলেন শাহানা-ই-মন্ডী, যিনি মূল্যমান স্থির করতেন এবং ব্যবসায়ীদের নাম নথিভুক্ত করতেন। অপর জন হলেন দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ যিনি ওজন, দরদাম ইত্যাদি পরীক্ষা করতেন এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতেন।

সুশাসনের স্বার্থে আলাউদ্দীন তাঁর সাম্রাজ্যকে উনিশটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রতিটি প্রদেশে থাকতো প্রাদেশিক শাসনকর্তা। প্রাদেশিক শাসনে তারাই ছিল সর্বে-সর্বা। কিন্তু যতদিন তাঁরা সুলতানের আস্থাভাজন ছিলেন ততদিন তাঁরা ক্ষমতায় থাকতে পারতেন। তাঁদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতো গুপ্তচর বাহিনী।

॥ আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ॥

আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য-রাজস্ব সংস্কারের প্রসঙ্গ।

মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষার জন্য আলাউদ্দীনের প্রয়োজন ছিল বিশাল সেনাবাহিনীর। এই সেনাবাহিনীকে তিনি নগদে বেতনদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাছাডা জনগণের অতিরিক্ত অর্থ বের করে আনাও ছিল তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য। সুতরাং উভয় প্রয়োজনেই তাঁর পক্ষে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

প্রথমে তিনি দেবোত্তর জায়গীর ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জায়গীরসমূহ বাজেয়াপ্ত করেন। রাজস্ব প্রদানের বিষয়ে তিনি জমিদার ও রায়তদের ক্ষেত্রে একই আইন প্রয়োগ করেন। তিনি হিন্দুদের এমনভাবে শোষণ করেন যেন তাঁরা কোনমতেই বিলাসী জীবন যাপন করতে না পারেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়া চারণ কর, গৃহ কর, করাহি নামে খুব সম্ভবতঃ এক আমদানী-রপ্তানী শুল্ক এবং সেচের জন্য কর আদায় করতেন। ভূমি রাজস্ব স্থির করার জন্য তিনি জমি জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফসলের অর্ধাংশ ছিল ভূমি রাজস্ব।

আলাউদ্দীনের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ডঃ ইরফান হাবিব বলেছেন, আলাউদ্দীন তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার সাহায্যে দুইটি গ্রামীণ শ্রেণীর মধ্যে প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন।[৪] কিন্তু তখন সাধারণ কৃষককে সব ধরনের কর মিলিয়ে উৎপন্ন ফসলের ৭৫%-৮৫% কর হিসেবে দিতে হত। তাহলে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা হয়েছিল বলা যায় না। তাছাড়া আলাউদ্দীন রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের দুর্নীতির অবসান ঘটাতে পারেন নি। কৃষক-শোষণ অব্যাহত ছিল। তাই ডঃ লাল মন্তব্য করেছেন আলাউদ্দীনের লক্ষ্য ধনী জমিদারদের দমন করা হলেও তাঁর আইনগুলি দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে কম ক্ষতিকর ছিল না।[৫]

আলাউদ্দীনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম হল দ্রব্যমূল্যের মান নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এ কাজে যে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন তা নিয়ে নানা মত। একটি মত হল, সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার ছাড়াও এ সময় প্রশাসনিক ব্যয় দ্রুতগতিতে

[৪] Alauddin consciously utilised the conflict between the rural classes by standing forth as the protector of the weak against the strong.
— Dr. Irfan Habib.

[৫] The revenue regulations of Alauddin were meant to crush high land lords, they were in no way less prejudicial to the interests of the peasantry.
— Dr. K. S. Lal.

বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি। ফলে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য অভাবনীয়হারে বৃদ্ধি পায়। এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে অব্যাহতি পেতেই আলাউদ্দীন মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার মত এক দুঃসাহসিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন।

অন্য একটি মত হল জনকল্যাণের মহান কর্তব্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই আলাউদ্দীন মূল্যনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করতে উৎসাহিত হন।

বারাউনী এই নীতির একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তা হল পণ্যসামগ্রীর মূল্য-সূচকের স্থিতিশীলতা একটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই নীতি বিশেষ সহায়ক হয়। আমীর খসরু অবশ্য এই নীতিকে সুলতানের একটি জনকল্যাণকামী কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

পণ্যমূল্য নির্ধারণের জন্য পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ এবং শ্রমিকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি যোগ করে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয়। এই নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পণ্য চলাচলে রাস্তাঘাটে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, প্রয়োজনবোধে ব্যবসায়ীকে মূলধন যোগানের ব্যবস্থা করা হয়, সকল ব্যবসায়ীর নাম নথিভুক্ত করা হয়, একটি পৃথক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়, আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থাও করা হয়। তাছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি খামার ও বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যের যোগান নিশ্চিত করা। জেলার প্রশাসনকেও খাজনার পরিবর্তে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দিল্লীর উপকণ্ঠে কয়েকটি শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। সংকটকালে এই সব শস্যভাণ্ডার থেকে ব্যবসায়ীগণ দ্বারা খাদ্য কিনে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে জনসাধারণকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা হল আধুনিক রেশন ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র দিল্লীতে প্রয়োগ করা হয়। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয় নি। এই অভিমত দিয়েছেন মোরল্যাণ্ড। কিন্তু যতদূর মনে হয় আলাউদ্দীন সাম্রাজ্যের সর্বত্রই মূল্যমান স্থিতিশীল রাখতে সক্রিয় হয়েছিলেন। কারণ কেবল দিল্লীর জন্য ব্যবস্থা করলে তার প্রতিক্রিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে আদৌ হবার কথা নয়।

আলাউদ্দীনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের নীতির ফলাফল সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের নানা মত। অনেকে বলেন আলাউদ্দীন এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য নয়, সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে। লেন পুল আবার মনে করেন এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। ডঃ লাল মনে করেন এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর লভ্যাংশ সংকুচিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। একই সঙ্গে পণ্য উৎপাদনকারীর স্বার্থ রক্ষিত না হওয়ায় পণ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়।

তথাপি অধ্যাপক সাক্সেনা মনে করেন এই ব্যবস্থাই হল আলাউদ্দীনের সর্বাধিক প্রশাসনিক সাফল্য। ফরিস্তার মতে এই ব্যবস্থার ফলে দুর্ভিক্ষের সময়ও মূল্যমানের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয় নি। এটাই এই নীতির বিরাট সাফল্য। অস্বীকার করা যায় না মধ্যযুগের পরিস্থিতিতে আলাউদ্দীনের এই ব্যবস্থা ছিল অভিনব। এর ফলে তিনি অনায়াসে মুদ্রাস্ফীতির মত এক ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকটকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। লেন পুল যথার্থই বলেছেন যে এই নীতির সাহায্যে আলাউদ্দীন ধনীকে বঞ্চিত করে দরিদ্রকে পালন করেন।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

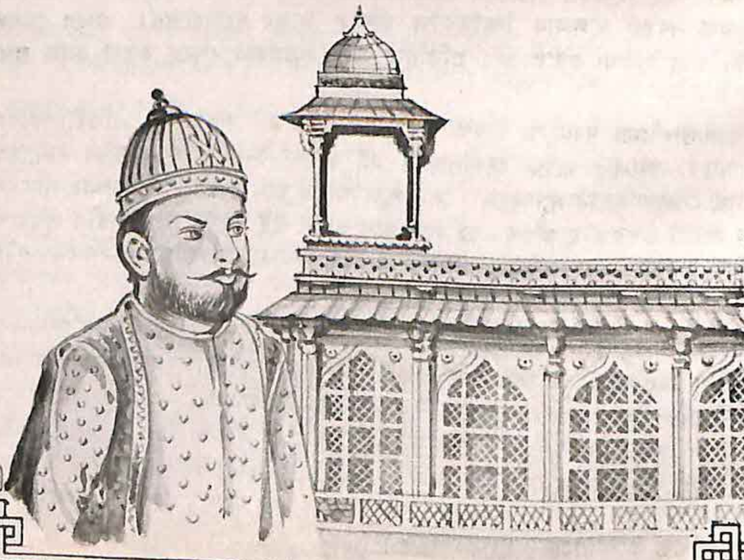
A short assessment of Muhammad Bin Tughluq's rule—Nature of the changes during Firuz Shah's rule—some of his beneficial measures.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

মহাম্মদ বিন তুঘলক—রাজস্ব সংস্কার—রাজধানী স্থানান্তর—মুদ্রা-সংস্কার—কৃষি-সংস্কার—বৈদেশিক সম্পর্ক—মূল্যায়ন—ফিরোজ তুঘলক—রাজস্ব সংস্কার—জায়গীর প্রথা—বাণিজ্য নীতির সংস্কার—কৃষির সংস্কার—বিচার সংস্কার—সামরিক বাহিনীর সংস্কার—শিক্ষার সংস্কার—শিল্পে উৎসাহ—পুরাকীর্তি সংরক্ষণ—অন্যান্য কাজ—মূল্যায়ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তুঘলক বংশের শাসনকাল



মহম্মদ বিন তুঘলক

আলাউদ্দীন খলজীর দিল্লীর সুলতানী শাসনের ইতিহাসে যিনি নানাবিধ প্রশাসনিক সংস্কার ও মৌলিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি হলেন খলজী বংশের পরবর্তী তুঘলক বংশের দ্বিতীয় সুলতান মহাম্মদ বিন তুঘলক।



মহাম্মদ বিন তুঘলক

মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় বিস্ময়কর নাম মহাম্মদ বিন তুঘলক। অসাধারণ প্রতিভাবান এই সুলতানের মধ্যে সমাবেশ হয়েছিল নানাবিধ গুণের। জ্ঞান-জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অবাধ ও অনায়াস পদচারণা। রাজতন্ত্র সম্পর্কে মহাম্মদ ছিলেন আলাউদ্দীনেরই মতানুসারী। পার্থক্য এই যা ছিল এক আদর্শমাত্র আলাউদ্দীনের কাছে, তাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন মহাম্মদ।

আলাউদ্দীনের মত মহাম্মদও উপলব্ধি করেছিলেন যে সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগের পথে অন্তরায় দুটি—অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চাভিলাষ এবং উলেমা শ্রেণীর ধর্মীয় ও নৈতিক প্রভাব। এই দুই অন্তরায় অতিক্রম করতে মহাম্মদ উদ্যোগী হলেন।

তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি অভিজাত বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। বংশানুক্রমিক অভিজাতদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন কর্মচারী নিয়োগ করতে আরম্ভ করেন।

উলেমাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে আলাউদ্দীনের মত মহাম্মদ প্রশাসনে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে আলাউদ্দীনের তুলনায় মহাম্মদ অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। আলাউদ্দীন ছিলেন ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু মহাম্মদ ছিলেন বহু শাস্ত্রজ্ঞ। তাই উলেমাগণ তাঁর কাছে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় সাহসী হতেন না। ফলে তিনি শরিয়তী অনুশাসনের পরিবর্তে যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দেন। তাঁর সময়ে মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে দুটি ভাগ ছিল। একটি হল মৌলবাদী উলেমা সম্প্রদায়, অন্যটি হল সুফী মতাবলম্বী ভাবদিয়া মরমিয়া সম্প্রদায়, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাম্মদ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে যুক্তিবাদের আশ্রয় নেন।

আদর্শগত এই স্থির সিদ্ধান্ত থেকে মহাম্মদ তাঁর প্রগতিশীল সংস্কারাবলীর সূচনা করেন।

॥ রাজস্ব সংস্কার ॥

সিংহাসন আরোহণের পরই মহাম্মদ কতগুলি রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারসাধন করেন। যেমন সরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। প্রাদেশিক সরকারকেও বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সকল প্রকার জমির উপর কর এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র সেই হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

তিনি দোয়াব অঞ্চলের ভূমি-রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন। কিন্তু তখন সেখানে দুর্ভিক্ষ চলছিল। কর্মচারীগণ সে কথা সুলতানকে না জানিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর আদায় করতে থাকে। ফলে লোকের দুর্দশা চরমে পেঁছায়। কিন্তু সুলতান যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন তখন সৎ কর্মচারী পাঠিয়ে ঋণ ও নানাপ্রকার সাহায্য দান করেন।

এই ব্যাপারে মহাম্মদকে সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ অভিযুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে জনগণের দুর্দশায় তাঁর ভূমিকা ছিল সামান্যই। বিশেষ করে প্রকৃত অবস্থা জানার পর দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের প্রতি তাঁর কিন্তু সহানুভূতির অভাব ছিল না।

॥ রাজধানী স্থানান্তর ॥

মহাম্মদের নানা সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত সিদ্ধান্ত হল রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত।

বরাণীর মতে দেবগিরি ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে। ফলে এখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত শাসন করার সুবিধা ছিল। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের মুখে অবস্থিত ছিল দিল্লী। সেই দিক থেকে দেবগিরি ছিল অনেক বেশী সুরক্ষিত।

দেবগিরির নতুন নামকরণ হয় দৌলতাবাদ। যাতায়াতের সুবিধার জন্য দিল্লী থেকে দেবগিরি পর্যন্ত রাস্তা নির্মিত হয়। রাস্তার পাশে সরাইখানা স্থাপন ও বৃক্ষ-রোপণ করা হয়। বরাণী লিখেছেন, সুলতান দিল্লীর সকল অধিবাসীকেই দেবগিরি যেতে বাধ্য করেন। দিল্লী জনশূন্য হয়ে যায়। কিছু দিন পর সুলতান তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। রাজধানী পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়ে আনেন।

বরাণীর এই বর্ণনার সঙ্গেও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা একমত নন। তাঁদের মত হল, রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও দিল্লী তার মর্যাদা হারায় নি। প্রকৃত পক্ষে দৌলতাবাদ দক্ষিণের শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। তা ছাড়া দিল্লীর সকল অধিবাসীকে স্থানান্তরিত করার বর্ণনাও ঠিক নয়। কেবল উলেমা ও শাসক শ্রেণীকেই সুলতান দেবগিরি যেতে বাধ্য করেন।

যাই হোক, সুলতানের রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত অভিনব কিছু নয়। প্রাচীন ও মধ্য যুগে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। কিন্তু সুলতানের স্থান নির্বাচন রাজনৈতিক দিক থেকে যথাযথ ছিল। অবশ্য পরোক্ষভাবে দক্ষিণে রাজধানী স্থাপনের ফলে ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের বসবাস আরম্ভ হয়। ভবিষ্যতে বাহমনী রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়।

॥ মুদ্রা সংস্কার ॥

মহাম্মদের সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক সংস্কার প্রয়াস হল দেশের মুদ্রানীতির সংস্কার। মূল্যবান ধাতুর পরিবর্তিত মূল্য অনুসারে তিনি নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন। যথা দোকানি নামে তাম্রমুদ্রা, দিনার নামে স্বর্ণমুদ্রা এবং টংকা নামে রৌপ্যমুদ্রা।

মুদ্রা সংস্কারের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত। বরাণীর মত সুলতানের অপরিমিত দানশীলতার জন্য অর্থাভাব দেখা দেয়। তা ছাড়া তাঁর বিশ্বজয়ের পরি-কল্পনার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। ফরিস্তার মতে, রাজ্যজয়ের জন্য প্রয়ো-জনীয় অর্থের সংস্থান করতে সুলতান তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। বদাউনির মতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনায় যে বিপুল অর্থের অপব্যয় হয় তার ক্ষতিপূরণ করতে তাম্রমুদ্রার প্রচলন করা হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন সমকালীন বিশ্বের বাজারে রৌপ্যের যোগানে যে ঘাটতি দেখা দেয় তা দূর করতে মহাম্মদ তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। অর্থাভাবের জন্য যে তিনি এ কাজে অগ্রসর হন নি তার প্রমাণ পরবর্তীকালে জনগণকে ক্ষতিপূরণ দানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

ডঃ মেহদী হাসানের মতে সামগ্রিকভাবে মুদ্রা সংস্কার পরিকল্পনা ছিল উৎকৃষ্ট এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। কিন্তু এ ধরনের একটি অভিনব পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে যে ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল তার অভাবেই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। নতুন মুদ্রা প্রচলনের বিষয়ে সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব না

থাকার ফলে দেশের অভ্যন্তরে এই মুদ্রা ব্যাপকভাবে জাল হতে থাকে। মুদ্রার মূল্য কমে যায়। বিদেশী বণিকগণ এই মুদ্রা নিতে অস্বীকার করলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হয়। নিরুপায় সুলতান পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন এবং জনসাধারণকে জাল মুদ্রার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করেন।

॥ কৃষি সংস্কার ॥

কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মহাম্মদ এক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। আমীর-ই-কোহী নামে তিনি পৃথক কৃষিদপ্তর স্থাপন করেন। উন্নত প্রথায় চাষ-আবাদের জন্যে তিনি একটি সরকারী খামার স্থাপন করেন। কিন্তু কর্মচারীদের দুর্নীতি, খামারের জমির অনুর্বরতা এবং সর্বোপরি সুলতানের ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়ার সময় না থাকার দরুন এমন একটি প্রগতিশীল কর্মসূচী ব্যর্থ হয়ে যায়।

॥ বৈদেশিক সম্পর্ক ॥

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস মহাম্মদের সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তির এক উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। পূর্ববর্তী সুলতানদের মত বহির্দেশের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছিন্নতার সমর্থক মহাম্মদ ছিলেন না বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপনায় তিনি বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। ডঃ নিজামী বলেছেন যে মহাম্মদের উত্থানের ফলে বহির্দেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মহাম্মদ মিশর, ইরাক, চীন প্রভৃতি দেশে যেমন দূত পাঠান তেমনি তাঁর দরবারে ইরাক, চীন খারজম, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে দূতরা এসেছিল।

॥ মূল্যায়ন ॥

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাম্মদ, লেন পূলের ভাষায়, সমস্ত সদিচ্ছা এবং পরিমিতিবোধের অভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেন।[৫] তাঁর সংগঠনী শক্তির অভাব, তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অনভিজ্ঞতা তাঁর সামগ্রিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী। অনেকেই বলেন তাঁর চিন্তাধারা ছিল তাঁর সময়ের তুলনায় অনেকটাই অগ্রসর। ফলে জনগণ তাঁর সঙ্গে সমান পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে নি। তিনিও পারেন নি জনগণকে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সামিল করতে, তাদের তাঁর কর্মযজ্ঞে সংযুক্ত হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে। বরং এই পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবে দুই পক্ষ দুই মেরুতে অবস্থান করে। এমন কি যে নতুন অভিজাত সম্প্রদায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাদেরও তিনি তাঁর চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে পারেন নি। রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসেবে এখানেই তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতা। আর তাঁর ব্যর্থতা বারংবার আমাদের আর এক ব্যর্থতার নায়ক অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোশেফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

॥ ফিরোজ তুঘলক ॥

মহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্লতাত পুত্র ফিরোজ তুঘলক উলেমাদের সমর্থনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উলেমাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা গ্রহণের ফলে ফিরোজের পক্ষে তাঁর পূর্বসূরীদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হল না। তিনি নিজেকে একজন খাঁটি মুসলমান সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। অবশ্য তাঁর এই ঘোষণার পেছনে কিছু তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির প্রভাবও ছিল।

মহাম্মদের অনুসৃত নীতির ফলে অভিজাত ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তেমনি উলেমা ও সুফী সম্প্রদায়ও ছিল বিক্ষুব্ধ। এই পরিস্থিতিতে

৫ With the best of intentions and no sense of proportion Mahammad Tughluq was a transcendent failure. — Lane Poole.

রাজ্যভার গ্রহণ করার পর ফিরোজের আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নমনীয় নীতির দ্বারা তিনি অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্য অর্জনে সচেষ্ট হলেন। রাজ্য-বিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করলেন। পরিবর্তে জনকল্যাণ ও প্রজাহিতৈষণাকে তাঁর শাসনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ইউরোপের ইতিহাসের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

॥ রাজস্ব-সংস্কার ॥

কোরাণের নির্দেশ অনুসারে ফিরোজ দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন করেন। তিনি চার রকমের রাজস্বের প্রবর্তন করেন। যথাঃ খিরজ বা ভূমি-রাজস্ব, সাম্রাজ্যের ফসলের উৎপাদনের ভিত্তিতে ভূমি-রাজস্ব স্থির করা হত এবং এই রাজস্বের হার ছিল ১/৫ থেকে ১/৬। জাকাৎ হল মুসলমানদের ধর্মকর, হার উপার্জনের ২½% এবং এই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হত। জিজিয়া, যা কেবল অ-মুসলমানদের উপরই আরোপ করা হত। এবং খামস বা যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সম্পদের ১/৫। এছাড়া তিনি সাব বা সেচকর আদায় করতেন, যার হার ছিল ১/১০ এবং যারা সেচের জল ব্যবহার করতো তারাই কেবল এই কর দিত।

॥ জায়গীর প্রথা ॥

অভিজাতদের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে ফিরোজ জায়গীরদান প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করেন। জায়গীর বংশানুক্রমিকও করা হয়। সেনাবাহিনীতে বেতনদানের পরিবর্তে জায়গীর দান আরম্ভ হয়। তবে জায়গীর থেকে লব্ধ আয়ের অর্ধাংশ সরকারের প্রাপ্য ছিল।

॥ বাণিজ্য-নীতির সংস্কার ॥

ফিরোজ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অন্তঃশুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করেন। ফলে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে।

॥ কৃষির সংস্কার ॥

কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফিরোজ একাধিক খাল খনন করেন। এর মধ্যে ৯৬ মাইল দীর্ঘ যমুনা খাল খুবই বিখ্যাত। সেচখাল ছাড়াও ফিরোজ দেড় শতাধিক কূপ খনন করেন। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে খরিফ ও রবি শস্যের উৎপাদন অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পায়।

॥ বিচার সংস্কার ॥

ইসলামী আইন অনুসারে ফিরোজ বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি প্রাণদণ্ড বাতিল করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন নিষ্ঠুর ও অমানবিক দণ্ডবিধি তিনি রদ করেন। দয়া ও মানবতার আদর্শের ভিত্তিতে ফিরোজ দণ্ডবিধির সংস্কার করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অপরাধ নিবারণের কোন ব্যবস্থা ফিরোজ গ্রহণ করেন নি।

॥ সামরিক-বাহিনীর সংস্কার ॥

ফিরোজ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেন। পরিবর্তে প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। সেনাবাহিনীতে বেতনদানের পরিবর্তে জায়গীরদান প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

॥ শিক্ষার সংস্কার ॥

ফিরোজ ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ তৎপরতা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। জ্ঞানী-গুণীদের তিনি সমাদর করতেন। ইতিহাস রচনার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তাঁরই উৎসাহে জিয়াউদ্দীন বরাণী ও আফিফের

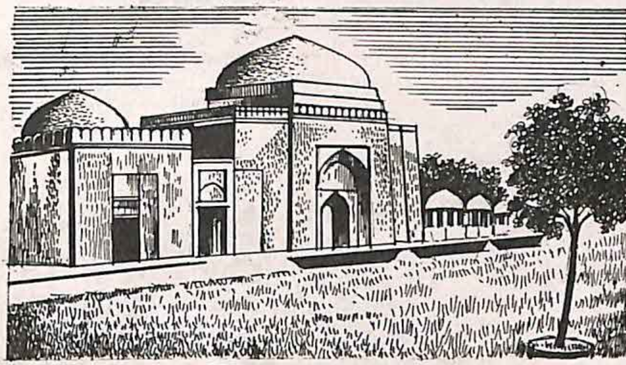
বিখ্যাত গ্রন্থ দুটি রচিত হয়।

॥ শিল্পে উৎসাহ ॥

দেশে শিল্পের বিকাশেও ফিরোজের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি যে ছত্রিশটি কারখানা স্থাপন করেন তাদের প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি 'রতিবি' যেখানে মানুষ ও পশুর খাদ্যসামগ্রী তৈরী হত। অন্যান্য সামগ্রী যে কারখানায় তৈরী হত সেগুলিকে বলা হয় 'গয়ের রতিবি'। এই কারখানাগুলি পরিচালনার জন্য তিনি একদল কর্মচারীও নিয়োগ করেন।

॥ পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ॥

পুরাকীর্তি সংরক্ষণে অপরিসীম আগ্রহ ছিল ফিরোজের। তিনি অশোকের দুটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। তা ছাড়া পূর্ববর্তী সুলতানদের নির্মিত স্মৃতি-চিহ্নগুলি সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।



ফিরোজ শাহের সমাধি

॥ মূল্যায়ন ॥

ঐতিহাসিক ত্রিপাঠী বলেছেন জনসাধারণের কাছে একজন শাসকের বিচারের মানদণ্ড হল তিনি তাদের জন্য কতটা বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করেছেন।[৬] এই মান-দণ্ডে বিচার করলে ফিরোজ তুঘলক নিঃসন্দেহে একজন সার্থক শাসক। এই সাফল্যে উৎফুল্ল হয়েই সমসাময়িক ঐতিহাসিক বরাণী ও আফিফ তাঁকে একজন প্রজাহিতৈষী নরপতি বলে অভিহিত করেছেন। এলিয়ট, এলফিনস্টোন প্রভৃতি তাঁকে আকবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের বৈষয়িক উন্নতির জন্য তিনি যা করে-ছেন দিল্লীর অন্য কোন সুলতান তা করেন নি।

কিন্তু তাঁর সামরিক নীতি, ক্রীতদাস প্রীতি এবং অভিজাতদের লুপ্ত ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয় নি। বরং বলা যেতে পারে তাঁর এই সব নীতির ফলেই সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল।

---

৬ The masses judge a ruler by the material prosperity that they can see and feel.

—R. P. Tripathi.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Invasion of Timur—effects—disintegration of the Sultanate—the Sayyids and Lodis (only a brief outline)

॥ বিষয়-ক্রম ॥

তৈমুরলঙ্গ—ভারত আক্রমণ—ফলাফল—সৈয়দবংশ—লোদীবংশ।

সপ্তম অধ্যায়

সুলতানী শাসনের অবসান



তৈমুর লঙ্গ

তুঘলক বংশের শেষ নরপতি নাসিরুদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে সমরখন্দের দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুর ছিলেন চাঘতাই তুর্কীদের নেতা। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী ও সমরকুশলী। পারস্য, মেসোপটেমিয়া ও আফগানিস্থান জয়ের পর তিনি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। যুদ্ধে এক পা হারালে তিনি লঙ্গ বা খঞ্জ নামে পরিচিত হন।

॥ ভারত আক্রমণ ॥

তখন ভারতে সুলতানি শাসনের অন্তিম লগ্ন। এই পরিস্থিতিই তৈমুরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করে। পৌত্তলিকতার বিনাশসাধনের যুক্তিতে তিনি তাঁর অনুচরদের ভারত-আক্রমণে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু এদেশের অপরিমেয় সম্পদের লুণ্ঠনই ছিল তৈমুরের প্রধান লক্ষ্য।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুর সিন্ধু, ঝিলাম ও রবি অতিক্রম করে দিল্লীর উপকণ্ঠে এসে পৌছান। দিল্লী প্রবেশের প্রাক্কালে প্রায় এক লক্ষ হিন্দু বন্দীকে তিনি হত্যা করেন।

দিল্লীর উপকণ্ঠে তৈমুর এসে পৌছালে নাসিরুদ্দীন তাঁকে বাঁধা দেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে তিনি গুজরাটে পলায়ন করেন। তৈমুর দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রথমে উলেমাদের অনুরোধে তিনি নরহত্যা না করতে রাজী হন। কিন্তু নাগরিকগণ তৈমুরের বাহিনীর ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ জানালে আরম্ভ হয় ব্যাপক গণহত্যা ও লুঠতরাজ। পনের দিন ধারে দিল্লীকে শ্মশানে পরিণত করে তৈমুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার পথে তাঁর অনুচর খিজির খাঁকে তিনি মুলতানের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন।

॥ ফলাফল ॥

মুমূর্ষু সুলতানী সাম্রাজ্যের কবরে শেষ পেরেকটি প্রোথিত করে তৈমুরের আক্রমণ। প্রায় জনশূন্য দিল্লীতে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, যার প্রকোপে অবশিষ্ট লোকের মৃত্যু হয়। সমগ্র উত্তর-ভারতব্যাপী সৃষ্টি হয় এক অনিশ্চয়তা, অরাজকতা ও বিশৃংখলা।

॥ সৈয়দ বংশ ॥

তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ ছিলেন সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। শেষ তুঘলকদের অযোগ্যতার সুযোগে তিনি দিল্লী জয় করেন এবং দোয়াব পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন।

খিজির নিজে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নি। তিনি তৈমুরের প্রতিনিধি হিসেবেই দেশশাসন করেন। নিজেকে তিনি হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবী করতেন। সেই অর্থে তিনি ছিলেন সৈয়দ। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খিজিরের পর তাঁর পুত্র মোবারক খাঁ শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দিল্লীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মোবারককে জায়গীরদার প্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালাতে হয়। কেননা তিনি জায়গীর ও জায়গীরদারদের উপর সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টাতেই তিনি তাঁর উজীর শারওয়ার-উল-মুলকের চক্রান্তে নিহত হন। তিনি ছিলেন সৈয়দ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান।

পরবর্তী সুলতান মহাম্মদ শাহ ছিলেন অক্ষম, অযোগ্য ও পানাসক্ত। তিনি মালবের শাহ কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুলতানের শাসনকর্তা বাহলুল লোদীর সাহায্যপ্রার্থী হন। বাহলুল মালব-আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেই দিল্লী অধিকারে তৎপর হন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে মুলতান ফিরে যান।

পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের সর্বাপেক্ষা অযোগ্য শাসক। তাঁর মন্ত্রী হামিদ খাঁ প্রকৃত শাসকে পরিণত হলে আলম দিল্লী ত্যাগ করে বাদাউন অঞ্চলে চলে যান। হামিদও নিজের বিপদ বুঝে আবার বাহলুলের সাহায্য চান। এইবার বাহলুল হামিদকে হত্যা করে দিল্লীর শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

সৈয়দ বংশের শাসনকাল সম্পর্কে ডঃ নিজামী লিখেছেন যে মুলতান থেকে এসে তারা বাদাউনের আঞ্চলিক শাসকে পরিণত হয়। রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক কোন দিক থেকেই মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসে তাদের কোন ভূমিকা নেই।

॥ লোদী বংশ ॥

সৈয়দ বংশের পর দিল্লীতে লোদী বংশের শাসন আরম্ভ হয়। লোদীরা ছিল জাতিতে আফগান। তারাও দিল্লীতে স্থায়ী ও মজবুত শাসন গড়ে তুলতে পারে নি। কারণ প্রথমতঃ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীন শাসকরা দিল্লীতে লোদী বংশের আধিপত্য মানতে রাজী হয় নি। দ্বিতীয়তঃ বংশানুক্রমিক জায়গীরদারগণ কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রায় স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ জায়গীর শাসন করতো। তৃতীয়তঃ লোদীদের সমর্থক যে সব আফগান অভিজাত ছিল তারাও লোদীদের ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণের নীতি কখনো সমর্থন করে নি।

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল রাজ্যজয় অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সংগঠনেই অধিকতর মনযোগী ছিলেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব জৌনপুর জয়।

বাহলুলের পর সিংহাসনে বসেন সিকান্দার লোদী। তিনি আফগান অভিজাতদের বশীভূত করে সুলতানের মর্যাদা বাড়াতে সক্ষম হন।

তাঁর সময় জৌনপুরের ভূতপূর্ব সুলতান হুসেন শাহ বিদ্রোহ করলে সিকান্দার তাঁকে বারাণসীর যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তিনি বিহার ও ত্রিহুত জয় করেন। বাংলার সুলতানের সঙ্গেও তাঁর সন্ধি স্থাপিত হয়।

আভ্যন্তরীণ শাসনে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেন সিকান্দার। তিনি রাজকীয় মর্যাদার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। গুপ্তচর ব্যবস্থা জোরদার করেন। অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ফলে সাম্রাজ্যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই ফিরে আসে। জ্ঞানী-গুণীর সমাদরও তিনি করতেন। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তিনি ছিলেন অন্ধ।

তাহলেও ডঃ কে. এস. লালের মতে সিকন্দারের ঊনত্রিশ বৎসরের শাসনকাল ছিল নানা গৌরবে গৌরবান্বিত। কোন সন্দেহ নেই লোদী শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম।

সিকান্দার লোদীর পর সিংহাসনে বসেন ইব্রাহিম লোদী। সুলতান হয়েই তিনি জৌনপুরের শাসক তাঁর ভ্রাতা জালান খাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলে আফগান অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়।

ইব্রাহিম গোয়ালিয়র দুর্গের অধিপতি রাজা বিক্রমজিৎকে বশীভূত করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাঁধে মেবারের রাণা সঙ্গের সঙ্গে। কিন্তু ইব্রাহিম সেই বিরোধে

শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। রাজপুতগণ দিল্লীর সুলতানি রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নেয়।

কিন্তু ইব্রাহিমের শাসনকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আফগান অভিজাতদের সঙ্গে বিরোধ। বিরোধের মূল কারণ হল রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। ইব্রাহিমের বক্তব্য ছিল সুলতানই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং সকল কর্মচারী তাঁর নির্দেশমত চলতে বাধ্য। অন্যদিকে আফগান অভিজাতগণ সুলতানের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতো। ইব্রাহিম তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই বয়স্ক ও সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন না। ফলে অভিজাতদের বিক্ষোভ বাড়তেই থাকে। এই পরিস্থিতিতে অগ্নি-শলাকার কাজ করে জালান খাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ঘটনা। অভিজাতগণ এইবার সিংহাসন থেকে ইব্রাহিমের অপসারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।

কারা থেকে কনৌজ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অভিজাতগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইব্রাহিম অবশ্য এই বিদ্রোহ দমনে সফল হন। বহু আফগান সর্দারকে তিনি বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন।

উপায়ান্তর না দেখে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে কাবুলের অধিপতি জহিরুদ্দীন বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা আলম খাঁও দৌলতের পক্ষে যোগদান করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সঙ্গে অবসান হল সুলতানী শাসনের।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Rise of some regional powers:

(a) Bengal under Ilias-Shahi rulers—Hussain Shah and Nasarat Shah—cultural developments.

(b) The Bahmani kingdom (no details)—Split up into five kingdoms.

(c) The nature of the Bahmani—Vijaynagar conflict (details of the wars to be omitted).

(d) Vijaynagar empire—Dev Rai and Krishna Rai-Special emphasis on administrative system—and the social, cultural and economic life.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনঃ ইলিয়াস শাহ—সিকান্দার শাহ—গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ—বাংলায় হুসেন শাহী শাসনঃ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ—নসরৎ শাহ—ইলিয়াস শাহী বংশের সাংস্কৃতিক অবদান—হুসেন শাহী আমলে বাংলার সংস্কৃতি—বাহমনী রাজ্যঃ বাহমনী ও বিজয়নগর বিরোধ—বিজয়নগর রাজ্যঃ সঙ্গম বংশ—সালুভ বংশ—তুলুভ বংশ—বিজয়নগর রাজ্যের পতন—বিজয়নগরের শাসন ব্যবস্থা—বিজয়নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা—বিজয়নগরের সামাজিক অবস্থা—বিজয়নগরের সংস্কৃতি।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান



বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন

॥ ইলিয়াস শাহ ॥

মহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলাকে তিনটি সুনির্দিষ্ট বিভাগে ভাগ করেন। এই তিনটি বিভাগ হল লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও।

১৩৪২ খৃষ্টাব্দে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদুনাথ সরকারের মতে তখন থেকেই বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সচনা হয়।[১]

এই সময় সমগ্র উত্তর ভারতে মহম্মদ বিন তুঘলকের নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একদিকে পূর্ব ভারতে দিল্লীর শাসনের অবসান অন্যদিকে পূর্ব ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে ঐক্যের অভাব ইলিয়াস শাহকে তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত করে।

ইলিয়াস শাহ প্রথমে ত্রিহুত জয় করেন। এরপর তিনি নেপাল আক্রমণ করেন এবং কাঠমাণ্ডু লুণ্ঠন করে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে আসেন। উড়িষ্যার হিন্দু রাজাকেও পরাজিত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে বাংলায় ফিরে আসেন। এরপর সোনারগাঁও দখল করে ইলিয়াস বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

ইলিয়াসের এই শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে ফিরোজ তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্যলাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি দিল্লী ফিরে এলে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

ইলিয়াস এরপর সমৃদ্ধ কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

ইলিয়াস শাহের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে তুলেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কথিত আছে তিনি হাজীপুর নামে একটি শহর এবং ফিরোজাবাদে একটি বিশাল জলাধার নির্মাণ করেছিলেন।

॥ সিকান্দার শাহ ॥

ইলিয়াসের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ। তিনি নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করার চেষ্টায় দিল্লীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে উদ্যোগী হন। একাধিকবার তিনি দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকনও প্রেরণ করেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন নি। ফিরোজ বাংলা অভিযানের প্রথম ব্যর্থতার ক্ষোভ ভুলতে না পেরে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। সিকান্দার পিতার মতই একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। সুলতানী বাহিনী দুর্গ অবরোধ করেও কোন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। ফিরোজ বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। এরপর থেকে প্রায় দুই শতাব্দীকাল দিল্লী কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রান্ত হয় নি।

সিকান্দার শুধু বীর যোদ্ধা ও সুশাসকই ছিলেন না, ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকও। তিনি তাঁর রাজধানীকে সুসজ্জিত করেছিলেন। আদিনার বিখ্যাত মসজিদ তাঁর উদ্যোগেই নির্মিত হয়।

॥ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ॥

সিকান্দারের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। তিনি

১ A new chapter was opened in the History of Bengal with the accession of Ilyas Shah to the throne of Lakhnawati.

—J. N. Sarker.

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এই অভিযান সফল হয় নি।

আজম শাহ জৌনপুরের সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। চীন সম্রাট ইয়ং লু-র সঙ্গে তিনি দূত বিনিময় করেছিলেন। এই সময় চীনা দূতের সঙ্গে মাহুয়ান নামে জনৈক দোভাষী বাংলাদেশে এসেছিলেন। মাহুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে বাংলা-দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়।

আজম শাহের পর তাঁর পুত্র হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে বাংলার আমীরগণ প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। ফলে সুলতানের সঙ্গে তাদের সংঘাত অনিবার্য হয়। সেই সময় গণেশ নামে এক পরাক্রান্ত জমিদার সাময়িকভাবে বাংলার কর্তৃত্ব দখল করেন।

ইলিয়াস শাহী শাসনের পুনরুজ্জীবন ঘটে নাসিরুদ্দীন মামুদের শাসনকালে। তাঁর সময়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করে।

পরবর্তী সুলতান রুকন্‌উদ্দীন বরবকের শাসনকাল ইলিয়াস বংশের এক উল্লেখ-যোগ্য অধ্যায়। তিনি উড়িষ্যায় ও কামরূপে অভিযান প্রেরণ করে সাফল্য লাভ করে-ছিলেন। রুকন্‌উদ্দীন বরবক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু ছিলেন তাঁর সভাকবি।

এরপর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনের ফলে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয়। বাংলা হাবসীদের করতলগত হয়।

॥ বাংলায় হুসেন শাহী শাসন ॥

॥ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ॥

বাংলার ইতিহাসে হাবসীদের শাসনকালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে। এদের অত্যাচারে ও কুশাসনে বাংলার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে রাজ্যের উজীর হুসেন শাহের নেতৃত্বে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ হাবসী সুলতান মুজাফ্‌রকে হত্যা করে। বাংলার আমীরগণের অনুরোধে হুসেন শাহ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। বাংলায় আরম্ভ হল হুসেন শাহী শাসনকাল।

হাবসী কুশাসনের ফলে বাংলাদেশে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল আলাউদ্দীন তার অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হাবসী আমীর ও সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। হাবসী আমলে বহিষ্কৃত আমীরদের নিজ নিজ পদে পুনর্বহাল করেন।

এই সময় দিল্লীর সুলতান সিকান্দার লোদী জৌনপুরের সুলতানকে আক্রমণ করলে জৌনপুরের সুলতান বাংলায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে সিকান্দার লোদী বাংলা আক্রমণ করেন। শেষে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। উত্তর বিহার বাংলার অধীনে আসে।

এরপর হুসেন শাহ কামতাপুর জয় করেন। কিন্তু তাঁর আসাম অভিযান সফল হয় নি। উড়িষ্যা অভিযানেও তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধে হুসেন জয়লাভ করেন এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

হুসেন শাহ ছিলেন মধ্য যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি শুধু বাংলার স্বাধীনতা রক্ষাতেই সমর্থ হয়েছিলেন তা নয়, বাংলার সীমানাও সম্প্রসারিত করেন। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও উদারনৈতিক শাসননীতির ফলে তিনি হিন্দুদের অকুণ্ঠ

আনুগত্য লাভ করেছিলেন। যদুনাথ সরকার যথার্থই বলেছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুসেন শাহকে কেবল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই মনে রাখবে না, মনে রাখবে তাঁর উদার নীতির জন্যও, যার তুলনা আকবরের আগে মুসলমান শাসনাধীন ভারতে পাওয়া যায় না।[২] হিন্দুদের উচ্চপদে এবং সামরিক বিভাগে নিয়োগে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না।

হুসেন ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক আন্তরিক পৃষ্ঠপোষক। বাংলা ভাষার উন্নয়নে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর শাসনে মুগ্ধ হিন্দুগণ তাঁকে 'নৃপতি তিলক' 'জগৎ-ভূষণ' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

॥ নসরৎ শাহ ॥

আলাউদ্দীনের পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার মত নানা গুণের অধিকারী ছিলেন।

এ সময় পূর্ব ভারতে মোগলগণ প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হচ্ছিল। এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে নসরৎ এক শক্তি সংঘ গড়ে তোলেন। উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত আফগানগণ এই শক্তি সংঘে যোগদান করেন। পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর এই শক্তি সংঘের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এর মধ্যে নেতৃবর্গের পারস্পরিক কলহ হেতু শক্তি-সংঘ ভেঙ্গে যায়। ফলে নসরতের পক্ষে বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। নসরৎ পরাজিত হন এবং বাবরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

এরপর নসৎ অহোম (আসাম) রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু পিতার মত তাঁর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

নসরৎও ছিলেন উদারনৈতিক ও প্রজাহিতৈষী নরপতি। মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা নসরতের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তিনিও ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়ই সর্বপ্রথম মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়।

নসরতের পর হুসেন শাহী শাসন স্থায়ী হয় নি। শেষ সুলতান মামুদকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে বাংলায় বিহারের বিখ্যাত আফগান নেতা শের খাঁর আধি-পত্য স্থাপিত হয়।

॥ ইলিয়াস শাহী বংশের সাংস্কৃতিক অবদান ॥

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইলিয়াস শাহী ও পরবর্তী হুসেন শাহী সুলতানগণ সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলার মনীষার উন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

এই যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মহা-কাব্য ও কিছু কিছু পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুবাদ। যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহী আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। এ সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখকগণ হলেন অমরকোষ টীকা রচয়িতা বৃহস্পতি মিশ্র, 'শরফনামা' সংকলক ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী প্রভৃতি।

যদুনাথ সরকার লিখেছেন, এই সময় দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলায় শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ণ থাকায় তা শিল্পকলার বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। বাংলায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন

[২] Posterity remembers him not only for the material advantages he conferred on the people but for his liberalism and catholicity of mind of which it is hard to find a parallel in Muslim India until the age of the Great Akbar. J. N. Sarker.

মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন হল হুগলী জেলার ত্রিবেনী গ্রামে জাফর খাঁর সমাধি। আদিনার মসজিদ বহুখ্যাত। অনেকেই এই মসজিদকে দামাস্কাসের বৃহৎ মসজিদের সমতুল্য বলে মনে করেন। এছাড়াও নির্মিত হয়েছিল বহু মসজিদ। হাজীপুর শহরও ইলিয়াসদের দ্বারা নির্মিত।

॥ হুসেন শাহী আমলে বাংলার সংস্কৃতি ॥

ঐতিহাসিক তরফদার এই অভিমত দিয়েছেন যে হুসেন শাহী বংশের বৈশিষ্ট্য হল বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা, রাজ্য বিস্তার, প্রশাসনের স্থিতিকরণ এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি।° রাজনৈতিক প্রয়োজনেই হুসেন শাহী সুলতানদের উদার নীতি অবলম্বন করতে হয়েছিল। আর এই নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল তদানীন্তন বাংলার বৃহত্তর সমাজ জীবনকে।

হুসেন শাহী বংশের অন্যতম কৃতিত্ব হল স্থানীয় মনীষার ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ। এই জাগরণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এর মূলে ছিল মহাকাব্য ও পৌরাণিক আখ্যানের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ, সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরুত্থান ও চৈতন্যবাদের বিকাশ। নবদ্বীপে নবন্যায় সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চৈতন্য শুধু যে ভক্তিবাদকে এক বিশিষ্ট ধর্মীয় রূপ দিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক জাগরণ সৃষ্টি করেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর সর্বপ্রথম মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। হুসেন শাহী আমলে যশরাজ খাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ সরাসরি রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজ-দরবারের বাইরে বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

হুসেন শাহী আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্ম ছাড়াও এই সময় বহু আঞ্চলিক ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা দেখা যায়। যেমন, নাথ, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি। শাক্ত মতবাদেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটে। যেমন মনসা ও চন্ডী। হিন্দুদের মত মুসলমানদের মধ্যেও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত হয়।

রাজদরবারের আনুকূল্যে এ সময় স্থাপত্য ও হস্তলিপিবিদ্যা যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করে। তখন উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও ব্যাপক প্রচলন ছিল।

হুসেন শাহী আমলের স্থাপত্যের নিদর্শন হল 'দাখিল দরওয়াজা', 'একলাখি সমাধি মন্দির', 'তাঁতিপাড়া মসজিদ' ইত্যাদি। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে হুসেন শাহীগণ ইলিয়াসীগণের ধারাই অনুসরণ করেছিল। ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত গৌড়ের বড়সোনা ও ছোটসোনা মসজিদ হুসেন শাহী স্থাপত্যের অপর নিদর্শন।

॥ বাহমনী রাজ্য ॥

মহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দাক্ষিণাত্যের অভিজাতগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহাম্মদ নিজে দাক্ষিণাত্যে এসে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহীদের কয়েকজন নেতাকে ব্রোচে যাবার আদেশ দেন। কিন্তু এই সব নেতারা সুলতানের আদেশ অমান্য করে দৌলতাবাদ দখল করে এবং ইসমাইল মুখ নামে তাদের এক নেতাকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে। ইসমাইল এই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন এবং হাসান নামে

° Husain Shahi rule in Bengal was characterised by the territorial expansion of the country, stabilization of administration and certain significant developments in respect of religion, literature, arts and economy. —Tarafder.

আরেক অভিজাতের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। হাসান আলাউদ্দীন বাহমন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং এর সঙ্গেই জন্ম হয় বাহমনী রাজ্যের।

বাহমন শাহ তাঁর রাজধানী গুলবর্গায় স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা। তিনি তাঁর রাজ্যসীমা উত্তরে ওয়াইন গঙ্গা, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী, পশ্চিমে দৌলতাবাদ এবং পূর্বে ভঙ্গীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

বাহমন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মহাম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই প্রতিবেশী বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ আরম্ভ হয়।



বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য

॥ বাহমনী ও বিজয়নগর বিরোধ ॥

উভয় রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক বিরোধ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উভয় রাজ্যই ছিল সামরিক শক্তি নির্ভর এবং স্বভাবতঃই সামরিক শক্তির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াসে উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকাই ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া তুঙ্গভদ্রা-দোয়াব অঞ্চল ও কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চল নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কারণ এই অঞ্চলের বন্দরগুলি ছিল খুবই উন্নত এবং কৃষিজমি ছিল খুবই উন্নতমানের। তাই দুই রাজ্যই আগ্রহী এবং উদ্যোগী ছিল এই সব অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনে। সর্বোপরি বিজয়নগরের রাজন্যবর্গ নিজেদের দক্ষিণ ভারতের হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক বলে মনে করতো। সুতরাং দাক্ষিণাত্যে কোন বিধর্মী রাজ্যের প্রাধান্য ছিল তাদের পক্ষে অসহ্য।

তবে প্রত্যক্ষভাবে তুঙ্গভদ্রা-দোয়াবের কর্তৃত্বের প্রশ্নেই উভয়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ বাঁধে। প্রথম মহাম্মদ এই বিরোধে সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তী সুলতান মুজাহিদ শাহ বিজয়নগরের রাজধানী অবরোধ করলেও তা দখল করতে ব্যর্থ হন।

ফিরোজ শাহের শাসনকালে দুই রাজ্যের বিরোধই একমাত্র ঘটনা। শেষ পর্যন্ত বিজয়নগর বাহমনীকে পরাজিত করে এবং ঐ রাজ্য বিধ্বস্ত করে দেয়।

আবার পরবর্তী সুলতান আহম্মদ শাহ অতর্কিত আক্রমণে বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয় দেবরায়কে পর্যুদস্ত করেন। দেবরায় প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও বাৎসরিক কর-দানের সর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

কিন্তু আহম্মদ শাহের পর দ্বিতীয় আলাউদ্দীনের শাসনকালে বাহমনী রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয় দেবরায় নতুনভাবে সামরিক বাহিনী সংগঠিত করে বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দীন পরাজিত হন এবং শান্তি স্থাপনে বাধ্য হন।

তৃতীয় মহাম্মদ শাহ যখন বাহমনী সুলতান তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান প্রশাসক মামুদ গাওয়ান। সমরাঙ্গনে এবং শাসনকার্যে—উভয় ক্ষেত্রেই মামুদ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি বিজয়নগরের কাছ থেকে গোয়া এবং রাজমন্দ্রি ও কোন্দাবির নামক দুটি বন্দর দখল করে নেন।

এছাড়াও তিনি বাহমনী রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু বাহমনী রাজ্যে তাঁর প্রতিপত্তি অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় একদল অভিজাত তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই চক্রান্তে লিপ্ত তৃতীয় মহাম্মদ শাহ স্বয়ং। সেই চক্রান্তের পরিণতি হল সুলতানের নির্দেশে মামুদকে হত্যা করা হয়। তাঁর এমন মর্মান্তিক মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মিডোজ টেইলার বলেছেন যে মামুদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের যাবতীয় সংহতি এবং শক্তিও ধ্বংস হয়ে যায়।[8]

তৃতীয় মহাম্মদের পরবর্তী সুলতানগণও ছিলেন অকর্মণ্য, অযোগ্য এবং শাসন-কার্যে অক্ষম। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্থানীয় ও বহিরাগত অভিজাতদের আত্মকলহ। ফলে বাহমনী রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বল তার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই রাজ্যের শেষ সুলতান ছিলেন কলিমুল্লাহ শাহ। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী বংশের অবসান হয়। এই রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। যথাঃ

(১) বিজাপুরের আদিল-শাহী বংশ—প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ,
(২) আহমদ্‌নগরের নিজাম-শাহী বংশ—প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদ নিজাম শাহ,
(৩) বেরারে ইমাদ্‌-শাহী বংশ—প্রতিষ্ঠাতা ফতুউল্লা ইমাদ্‌ শাহ,
(৪) গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী বংশ—প্রতিষ্ঠাতা কুতুব শাহ,
(৫) বিদরের বারিদ শাহী বংশ—প্রতিষ্ঠাতা আমীর বারিদ শাহ।

॥ বিজয়নগর রাজ্য ॥

বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা প্রকার মত প্রচলিত। একটি মত হল সঙ্গম নামে জনৈক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুক্কার নাম বিশেষ পরিচিত। অন্য একটি মত হল ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গল রাজ্য মুসলমানগণ জয় করলে ঐ পাঁচ-

৪ With his death departed all the cohesion and power of the Bahmani Kingdom.
—Taylor.

ভাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে হেরাস মনে করেন মহীশূরের হয়শলরাজ তৃতীয় বল্লাল তুঙ্গভদ্রার তীরে থানেগুণ্ডি নামে যে নগরটির পত্তন করেন তাই পরবর্তীকালে বিজয়নগর নামে পরিচিত হয়।

উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতপার্থক্যই থাকুক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতেই বিজয়নগর রাজ্যের জন্ম। তাই দেখি বিজয়নগর রাজ্যের নেতৃত্বেই দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির অসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল।

বিজয়নগর রাজ্যে মোট চারটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। যথাঃ সঙ্গম বংশ, সালুভ বংশ, তুলুভ বংশ ও আরবিড়ু বংশ।

॥ সঙ্গম বংশ ॥

সঙ্গম বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায়। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগর সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর পিতার কাছে বাহমনীর সুলতান ফিরোজ শাহ পরাজিত হয়েছিলেন। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বাহমনী সুলতান আহম্মদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করেন এবং রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেন।

এই পরাজয়ের সতর্ক হয়ে দেবরায় তাঁর সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করেন এবং সেনাবাহিনীতে তুর্কী অশ্বারোহী নিয়োগ আরম্ভ করেন। তাছাড়া তিনি আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারেও সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে পারস্যের রাষ্ট্রদূত আবদুর রজ্জাক এবং ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। তাঁদের বিবরণী থেকে এ সময়ের এই রাজ্য সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

॥ সালুভ বংশ ॥

সালুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ সালুভই ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি রাজ্যের শাসনভারও গ্রহণ করেছিলেন এক সংকটময় মুহূর্তে। কেননা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বিদেশী আক্রমণের ফলে তখন রাজ্যের সংহতি প্রায় ধ্বংস হবার মুখে। নরসিংহ তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার সাহায্যে রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

তিনি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। তামিল অঞ্চলের এক বিশাল অংশ তিনি বিজয়নগরের সঙ্গে যুক্ত করেন। কিন্তু বাহমনীর কাছ থেকে তুঙ্গভদ্রা-দোয়াব অঞ্চল এবং উড়িষ্যার অধিকার থেকে উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করতে তিনি ব্যর্থ হন।

॥ তুলুভ বংশ ॥

শুধু তুলুভ বংশের নয়, সমগ্র বিজয়নগর রাজ্যেরই শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তাঁর সময়েই বিজয়নগর রাজ্য ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়।

আরব থেকে পর্তুগীজদের মাধ্যমে আমদানী করা ঘোড়ায় এবং তুর্কী তীরন্দাজদের নিয়োগে এই সময় বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে বাহমনী রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে। কৃষ্ণদেব রায় অসাধারণ দক্ষতায় সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। সুলতান মামুদ শাহকে বিধ্বস্ত করে কৃষ্ণদেব তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেন। বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি রায়-

চুর-দোয়াব ও বিদরের দুর্গ দখল করেন। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কূটনীতি প্রয়োগ করে কৃষ্ণদেব বিদর রাজ্য মহাম্মদ শাহকে ছেড়ে দেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের যুক্ত আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেন। বিজাপুরের বিখ্যাত দুর্গ গুল-বর্গা বিজয়নগরের অধিকারে আসে। তা ছাড়া তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে উদয়গিরি জয় করেন।

শুধু রাজ্য জয়ে নয়, রাজ্য শাসনেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। সু-বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি সামন্তগণের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। প্রধানমন্ত্রী বা মহাপ্রধান ছিলেন রাজার বিশেষ আস্থা-ভাজন। মহাপ্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন।

কৃষ্ণদেব রায় শিল্প ও সাহিত্যেও যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিজয়নগরে বহু মন্দির নির্মাণ করেন। নেগল্লপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তেলেগু সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। এ সময় বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় পেঁছে ছিল। কৃষ্ণ-দেব রায় নিজে বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন সহিষ্ণু। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ তাঁর নীতি ও চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

॥ বিজয়নগর রাজ্যের পতন ॥

কৃষ্ণদেব রায়ের পর অচ্যুতরায় বিজয়নগর শাসন করেন। তাঁর সময়ে রায়পুর-দোয়াব অঞ্চল বিজয়নগরের হাত ছাড়া হয়। পরবর্তী রাজা হলেন সদাশিব রায়। কিন্তু সদাশিব রায়ের দুর্বলতার সুযোগে মন্ত্রী রাম রায় সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন। রাম রায় একজন যোগ্য প্রশাসক হলেও কূটনৈতিক দক্ষতা তাঁর ছিল না। তাঁর আগ্রাসী নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও আহম্মদনগর ঐক্য-বদ্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়নগর বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। বিজয়নগরের রাজধানী বিজয়ী মুসলমান বাহিনী ব্যাপকভাবে লুটপাট করে। তালিকোটার যুদ্ধ বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত করে।

রাম রায়ের পর তাঁর ভ্রাতা তিরুমল মন্ত্রী হন। কিন্তু তিরুমল সদাশিব রায়কে বিতাড়িত করে নিজেই বিজয়নগরের রাজা হন। আরম্ভ হয় আরবিডু বংশের শাসন। এই বংশের দ্বিতীয় বেঙ্কটের সময় থেকেই দ্রুত বিজয়নগরের পতন হতে থাকে। সামন্ত শাসকেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই বংশের শেষ রাজা তৃতীয় রঙ্গ। এই সময় বিজয়নগরের পতন সম্পূর্ণ হয়। মহীশূর, বেদনূর, মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ বিজয়নগরের শাসন ব্যবস্থা ॥

হিন্দুধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষম-তার অধিকারী। তাঁর উপাধি ছিল মহারাজ। তিনি ছিলেন বিচার, আইন, দণ্ড সকল কিছুর রক্ষাকর্তা। কিন্তু তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন না। ছিলেন প্রজাহিতৈষী। ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী রাজা তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। কৃষ্ণদেব রায় বলতেন, রাজা সর্বদা ধর্মরক্ষা করে চলবেন। তাঁর কর্তব্য হল শাসনকার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করা। তিনি মৃদুহারে জনসাধারণের উপর করভার আরোপ করবেন এবং শত্রুর বিনাশসাধন করবেন।

শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য করতে থাকতো একটি পরিষদ। এই পরিষদ রাজার সভাসদরা ছাড়াও থাকতো প্রধান সামন্তশ্রেণী ও বণিকদের প্রতিনিধি। মন্ত্রীপদে

ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মন্ত্রী বা অন্যান্য উচ্চপদে নিয়োগ করা হত। মহাপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তিনিই নিয়োগ করতেন। মন্ত্রীপদ কখনো কখনো বংশানুমিক হলেও কায়েমী স্বার্থ যেন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদে পরিবর্তন করা হত। শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক কর্মচারী নিয়োগ করা হত। রাজসভা ছিল খুবই আড়ম্বরপূর্ণ।

শাসনের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্য প্রদেশে এবং প্রদেশগুলিকে কতগুলি অঞ্চলে ভাগ করা হত। কৃষ্ণশাস্ত্রীর মতে বিজয়নগর ছয়টি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হত নায়েক। নায়েকরা রাষ্ট্রীয় তালুক বা নাড়ুগুলি থেকে এবং সামন্তপ্রভু বা অমর নায়েকদের কাছ থেকে খজনা আদায় করে রাজকোষে জমা দিত। সামন্ত প্রভুদের বলা হত অমর নায়েক। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা নায়েকরা দেশরক্ষা, আইন-শৃংখলা রক্ষা ও জনহিতকর দায়িত্বও পালন করতো।

বিজয়নগর শাসন ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভু বা অমর নায়েকদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তারা যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য যোগাত। বিনিময়ে তারা ভূমি ভোগ করতো। তারা যে রাজস্ব আদায় করতো তা থেকে তাদের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর খরচ বাদ দিয়ে বাকী রাজস্ব রাজকোষে জমা দিত। সাধারণতঃ তারা আদায়ী রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ জমা দিত। মন্দিরগুলিও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ ভোগ করতো। মন্দিরের জমি ক্ষুদ্র সামন্তদের বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এ সময় সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা এত বেড়ে যায় যে শহর, সমুদ্রবন্দর ও বাজারগুলির প্রশাসন তারাই চালাতো। এই সব স্থানের কর ও শুল্ক তারাই আদায় করতো। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই স্বচ্ছল।

গ্রামের প্রশাসন চালনা করতো পঞ্চায়েৎ বা গ্রামসভাগুলি। গ্রামের আবাদযোগ্য জমি গ্রামবাসীদের মধ্যেই বণ্টিত হত। আর পতিত জমি ছিল গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। গ্রামে গ্রামরক্ষী ও শ্রমিকদের দলপতি নিয়োগ করা হত।

বিজয়নগরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল ভূমি রাজস্বের বিভিন্ন হার। জমির উৎপাদন অনুসারে রাজস্ব স্থির করা হত। সামন্তপ্রভুরা ইচ্ছেমত কর ধার্য করতো। রাজকীয় জমিতেও করের হার বেশী ছিল। ভূমিকর ছাড়া গোচারণ কর, বিবাহ কর প্রভৃতি দিতে হত।

বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ছিল বিচারক। প্রশাসনিক কর্মচারীরাও কখনো কখনো বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করতো। অপরাধীকে জরিমানা, কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি শাস্তি দেওয়া হত। ব্রাহ্মণেরা আইনের ব্যাখ্যা দিতেন।

সেনাপতিকে বলা হত দণ্ডনায়েক। রাজার সামন্ত সেনা ছাড়াও নিজস্ব সেনাদল ছিল। সেনাবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই থাকতো। আরবদেশ থেকে ঘোড়া আনা হত এবং তুর্কী তীরন্দাজ নিয়োগ করা হত।

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তপ্রভুদের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। রাজা দুর্বল হলেই এরা স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। তা ছাড়া বিজয়নগরের রাজারা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না করে কেবল ভূমি রাজস্বের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করতে পারেন নি। সর্বোপরি স্বৈরাচারী শাসনের কর্মদক্ষতাই নির্ভর করে রাজার কর্মনৈপুণ্যের উপর। ফলে দুর্বল রাজার শাসনে বিজয়নগর শাসন ব্যবস্থার গোটা কাঠামোই বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

॥ বিজয়নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় জানতে পারা যায়। আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন যে রাজকোষে প্রচুর সোনা জমা থাকতো। ধনী-দরিদ্র সকলেই গায়ে গহনা পরতো। ডোমিনিগো পায়াস বলেছেন বিজয়নগরে সকল জাতির লোক দেখা যেত। এরা আসতো দামী পাথর আর হীরার লোভে। শহরের বাজারে চাল, গম, যব, কলাই, ডাল মজুত থাকতো, খাদ্যদ্রব্যের দামও ছিল সস্তা।

বিজয়নগরের অর্থনীতির ভিত্তিই ছিল কৃষি। জমির মালিকানা ক্রমশঃ কৃষকদের হাত থেকে জমিদার শ্রেণীর হাতে চলে যায়। কৃষকেরা পরিণত হয় পায়কারি বা ভাড়াটে প্রজায়। এদের ঋণ কখনো পরিশোধ হত না। এই অবস্থার জন্যই মাঝে মাঝে বিজয়নগরে কৃষক বিদ্রোহ হত। নুনিজ লিখেছেন সাধারণ কৃষকেরা তাদের উৎপন্ন ফসলের $^{9}/_{10}$ অমর নায়েকদের হাতে তুলে দিত।

বিজয়নগর খনি, ধাতুশিল্প ও গন্ধদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার বস্ত্রশিল্পও বিখ্যাত ছিল। বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য চলতো। গরুর গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হত পরিবহণের জন্য। আবদুর রাজ্জাক বিজয়নগরের প্রায় তিনশ' বন্দর ছিল লিখেছেন। কাপড়, চাল, লোহা, গন্ধক, চিনি, মশলা প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হত। ঘোড়া, প্রবাল, মুক্তা, চীনা রেশম, ভেলভেট প্রভৃতি আমদানী করা হত। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বিজয়নগরের প্রচুর লাভ হত। জাহাজ আনা হত মালদ্বীপ থেকে। পর্তুগীজরা আসার পর বিজয়নগরের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানতঃ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বিজয়নগরের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল চীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ, আরবদেশ, পারস্য, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে। শিল্পী ও বণিকদের আলাদা সংঘ ছিল। বণিক সংঘগুলি ছিল খুবই প্রভাবশালী।

বিজয়নগরে সোনা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। বিজয়নগরে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও শাসকশ্রেণী যথেষ্ট স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকলেও সাধারণ মানুষ ছিল করভারে প্রপীড়িত।

॥ বিজয়নগরের সামাজিক অবস্থা ॥

যে কোন দেশের সমাজ ব্যবস্থা সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিজয়নগরের সমাজব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। যেহেতু বিজয়নগরের অর্থনীতি ছিল কৃষি ও বাণিজ্য নির্ভর তাই সমাজে বণিক ও সামন্তশ্রেণীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

সমাজে মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতো। তারা চারু-কারু শিল্প, সংগীত ও সাহিত্য চর্চা করতো। মল্লবিদ্যা, অসিক্রীড়াতেও তারা পারদর্শী ছিল। রাজপ্রাসাদে অনেক নারী কর্মচারীও ছিল। তবে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল।

সমাজে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও রাজনৈতিক বিষয়ে তারা তাদের প্রভাব প্রয়োগ করতেন।

ব্রাহ্মণেরা ছিলেন নিরামিষাশী। সাধারণ লোক গোমাংস ব্যতীত অন্যান্য মাংস, ফল, চাল ও গম খেত।

॥ বিজয়নগরের সংস্কৃতি ॥

সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিজয়নগর খুবই উন্নত ছিল। এই সাম্রাজ্য হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণভারতে সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল এবং তামিল, তেলেগু, কানাড়ি প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তিথি 'অমুক্তমালদ্য' নামে তেলেগু ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত তেলেগু কবি পোদ্দন ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি। কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকাল দক্ষিণ-ভারতীয় সাহিত্যের নবজাগরণের যুগ বলা যেতে পারে। বিজয়-নগরের আরবিড়ু রাজাগণও শিক্ষা, সাহিত্য ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পর্যটকগণ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন হল 'হাজার মন্দির' ও 'বিঠলস্বামী মন্দির'। অসংখ্য কারুকার্যময় বিঠলস্বামী মন্দিরটি আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিজয়নগরের রাজন্যবর্গ বহু সুরম্য প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। চিত্রশিল্পেও তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহ কম ছিল না।

impact of Islam on India during this period—with particular stress on the impact on the cultural life—the initial orthodox reaction—gradual synthesis of cultures—the Bhakticult—Sufiism—religion reference—their message—Art and architecture—development of vernacular literature and regional art and culture—partronage of literature etc. by the ruling groups—growth of urdu.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

ভারতে ইসলামের আগমন—ভক্তি মতবাদ—রামানুজ—রামানন্দ—কবীর—নামদেব—শ্রীচৈতন্য—নানক—সুফীবাদ—ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল—সাহিত্য—শিল্প-সংস্কৃতি—দিল্লীর সুলতানী স্থাপত্য—প্রাদেশিক স্থাপত্য—হিন্দু স্থাপত্য।

নবম অধ্যায়
ভারতে ইসলামের প্রভাব



ভারতে ইসলামের আগমন

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এসেছে নানা বিদেশী জাতি। গ্রীক, স্কাইথিয়ান পার্থিয়ান এবং হূণগণ এদেশে রাজত্বও করেছে দীর্ঘকাল। কিন্তু তারা বিদেশী শাসক হিসেবে এলেও কালক্রমে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। অবশ্য একথা ঠিক তারা ভারতের যে অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই অঞ্চল অন্ধ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবিত অঞ্চল ছিল না। ফলে একীভূত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ছিল অনেক সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তদুপরি তারা কোন পৃথক প্রবল ধর্মমত ও সংস্কৃতি নিয়েও এদেশে আসে নি। তাই তাদের একীভূত হয়ে যাওয়ার পথে কোন প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নি।

কিন্তু ভারতে ইসলামের আগমন ও তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নানা কারণেই ছিল প্রতিবাদ মুখর। একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মমত ছাড়াও ইসলাম সঙ্গে এনেছিল এক স্বতন্ত্র জীবনধারা। পূর্ববর্তী বিদেশীদের প্রভাবে ভারতীয় ধর্মে যে পরিবর্তন এসেছিল তা ভারতীয় ধর্মান্ধরাও সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে ছিলেন প্রস্তুত। কারণ সেক্ষেত্রে সমন্বয় ছিল অনেক গভীরে, বাহ্যিক নয়। অন্য দিকে ইসলামের ছিল পৃথক রাষ্ট্রীয় ধারণা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার মিল ছিল না। তদুপরি ইসলাম ভারত বিজেতা, বিজিত ভারতের প্রতি ছিল তার কৃপাদৃষ্টি। এই দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বয়বাদী মনোভাবের বিরোধী। একই সঙ্গে ইসলামকে সংখ্যাগত শক্তিবৃদ্ধির জন্য ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের উপরই নির্ভর করতে হত। ফলে প্রথম দিকে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির পাশাপাশি ইসলাম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করে।

কিন্তু দীর্ঘকাল প্রতিবেশীর মত একই সঙ্গে বসবাসের ফলে উভয়ের মধ্যে প্রাথমিক যে অসহিষ্ণু মনোভাব ছিল তা লোপ পেতে থাকে এবং ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। মুসলমান বিজেতাগণ তাদের প্রথমদিকের উন্নাসিকতা ও অহংকারকে অতিক্রম করে বুঝতে পারে যে ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ অ-মুসলমানদের সঙ্গেই তাদের বসবাস করতে হবে। সুতরাং উগ্রতার পথ পরিহার না করলে প্রাত্যহিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। অমুসলমানও ক্রমশঃ উপলব্ধি করেন যে মুসলমানগণই যেহেতু এখন শাসক শক্তি সেই হেতু তাদের বিরোধীতা করে কোন লাভ হবে না। বরং কিছুটা সমঝোতার মনোভাব থাকলে অন্য সুবিধে হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এইভাবে বাস্তব পরিস্থিতির অনিবার্যতাকে মেনে নেবার প্রয়াস শুরু হল। সেই সঙ্গে শুরু হল উভয় সভ্যতার পারস্পরিক সমন্বয় ও সংযোজন। এই সমন্বয় প্রকাশের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটলো সামাজিক জীবনে।

এই সমন্বয় ও সহযোগী প্রয়াসের প্রথম প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে। এক শ্রেণী উগ্র উলেমা অ-মুসলমানদের কাফের বলে অভিহিত করলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাদের অসহিষ্ণু মনোভাব বিশেষ কার্যকরী হয় নি। যেমন, জিজিয়া কর হিন্দুদের উপর চাপানো হলেও ঐ কর ছিল মূলতঃ অ-কৃষি কর। ব্রাহ্মণ, বিধবা, শিশুদের এ কর থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হত। শাসন-তান্ত্রিক প্রয়োজনেই সুলতানেরা সাধারণ হিন্দু, কৃষক, বণিক প্রভৃতির প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করতো না। কারণ অধিকাংশ করভার তারাই বহন করতো। তাছাড়া সুলতানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধ ছিল হিন্দু রাজাদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়। বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সুলতানেরা সচেষ্ট ছিল সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে। ইরফান হাবিব এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে হিন্দু কৃষকরাই ছিল খাদ্য ও সম্পদের প্রধান উৎপাদক। সুতরাং কৃষি প্রধান রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে বিরোধ করে রাজ্য শাসন সম্ভব নয়। তাই কিছু কিছু সুলতান যেমন আলাউদ্দীন খলজী, মহাম্মদ বিন তুঘলক—দেশশাসনে ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বাংলার

সুলতান হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সমদৃষ্টিতে দেখতেন। এই দুই সুলতানের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন হিন্দু। হুসেন শাহ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরই সময়ে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়ই বাংলায় মহাভারত রচিত হয়। সত্যপীর পূজার দ্বারা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পথ প্রস্তুত করা হয়। অন্যদিকে কাশ্মীরের সুলতান জৈল-উল-আবেদিন তাঁর উদার নীতির জন্য কাশ্মীরের আকবর বলে অভিনন্দিত হন পরবর্তীকালে। তাঁর পরধর্মসহিষ্ণু নীতি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে নৈকট্যে নিয়ে আসে। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয় এবং বহু মূল্যবান ফারসী গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর রাজ্যে জিজিয়া করও রহিত করেন।

আরও লক্ষ্যনীয় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সুলতানদের প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের রাজপদ সম্পর্কে যে আদর্শ ছিল তা তুর্কী সুলতানগণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। কিন্তু কোরাণে ঈশ্বরত্ব ও নরপতিত্বের আদর্শের মধ্যে সমন্বয়ের কোন উল্লেখ নেই। সুলতানী প্রশাসনও পূর্ববর্তী প্রশাসনের অনুকরণেই গড়ে উঠেছিল যদিও রাজকর্মচারীদের আগেকার পদবীর পরিবর্তে পারসীক পদবী দেওয়া হয়েছিল। আর এই গ্রহণ ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কেননা ক্রমশঃ মুসলমান শাসকগণ অনুভব করেন, কেবলমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতের মত বিশাল দেশ শাসন করা অসম্ভব। সুতরাং হিন্দুদের রীতিনীতি, পদ্ধতি ও সহযোগিতা গ্রহণ ছিল অপরিহার্য।

॥ ভক্তি মতবাদ ॥

শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমান পদ্ধতির যে সমন্বয় প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল তা আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে যায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায়। এই পটভূমিকার ক্ষেত্র উর্বর করে তোলে ভক্তি মতবাদ ও ভক্তি আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর ভক্তি আন্দোলনের মত এত ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ ধর্মীয় আন্দোলন আর ভারতে হয় নি।

অনেকে মনে করেন, রামানন্দ, কবীর, নানক, মীরাবাঈ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির সময় থেকেই ভক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়। যদিও এঁরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তথাপি এই আন্দোলনের সূচনা হয় বহু আগেই দক্ষিণ ভারতে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৈষ্ণব আড়্বার ও শৈব নায়নার সাধু-সন্তরা ভক্তিমূলক সংগীত রচনা করেন। ভক্তি আন্দোলনের এই হল সূচনা।

গুপ্ত শাসনকালে শংকরাচার্যের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও প্রচলিত ধর্ম বিরোধী মতবাদকে প্রতিহত করা। শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদী। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ও শৈবগণ ভক্তিবাদের সূচনা করেন। এই মতবাদের উদ্গাতা ছিলেন রামানুজ, নিম্বাদিত্য, বল্লভাচার্য, মাধবাচার্য প্রভৃতি। রামানুজের শিষ্য রামানন্দ প্রথম ভক্তিবাদের আদর্শ দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে নিয়ে আসেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিবাদের আদর্শ অতি প্রাচীন। হিন্দুশাস্ত্রে জীবাত্মার মুক্তির জন্য তিনটি পথের বিধান আছে। যথাঃ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। বৌদ্ধধর্মের প্রসারকে প্রতিহত করতে শংকরাচার্য প্রভৃতি ধর্মীয় প্রবক্তাগণ জ্ঞানমার্গ বা দার্শনিক তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু ইসলামধর্মকে প্রতিহত করতে এবং হিন্দুধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলতে ভক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের প্রবক্তাগণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও জাতিভেদ প্রথাকে অগ্রাহ্য করতেন। তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার মধ্য দিয়েই মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করতেন। এই চিন্তাধারা ছিল শংকরাচার্যের তত্ত্বপ্রধান চিন্তাধারার বিরোধী। নতুন এই চিন্তাধারার প্রথম প্রচারক ছিলেন রামানুজ।

উত্তরভারতে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের আগমন এবং ব্যাপক ধর্মান্তরিত করণের প্রয়াসকে প্রতিহত করে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাই সেই সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রয়োজন মেটাতেই বৈষ্ণব ধর্মাচার্য রামানন্দ সর্বপ্রথম ভক্তিবাদের মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রণী হন। তার পরে তাঁর শিষ্য কবীর এই মতবাদকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলেন। এই মতবাদের মূল কথাই ছিল একেশ্বরবাদ। ঈশ্বরের কাছে সামগ্রিক আত্মসমর্পন। ভক্তির মাধ্যমেই ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা। তাই ভক্তিবাদের ভিত্তি হল বাহ্যিক নয়, অন্তরের পবিত্রতা, ঈশ্বরে ভক্তি সৎ কর্ম সৎ আচরণ এবং ঈশ্বরের এককত্বে বিশ্বাস। এখানে জাতিভেদ প্রথার কোন স্থান নেই।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও উদার দৃষ্টিভংগী থেকে ভক্তিবাদের প্রবক্তারা এই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যে জাতিভেদ প্রথায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন, বহু দেবতার পূজায় বিশ্বাসী হিন্দু ধর্মকে বলীয়ান করতে হলে ভক্তি ধর্মই অপরিহার্য। তাই পানিক্কর বলেছেন যে এইদিক থেকে ভক্তিবাদ হল ইসলামীয় একেশ্বরবাদের এক নতুন হিন্দু ধর্মীয় ব্যাখ্যা।[১] এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে একেশ্বরবাদের চিন্তাধারার জন্য হিন্দুদের ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কারণ উপনিষদই একেশ্বরবাদের প্রবক্তা। ভক্তিবাদের উৎস।

ভক্তিবাদের জনপ্রিয়তা লাভের পেছনে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিল সামন্ত শ্রেণীর। মুসলমান শাসকশ্রেণীও ছিল একই গোষ্ঠীভুক্ত। আর সমাজের নিপীড়িত, শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ছিল দরিদ্র কৃষক, নিম্নবর্ণের মানুষ, এবং শহরের কারিগর শ্রেণী। এই নিপীড়িত শ্রেণী ভক্তিবাদের মধ্যে যেন খুঁজে পেয়েছিল নিরাপদ ধর্মীয় আশ্রয়। তাই ভক্তিবাদ অনায়াসেই এই শ্রেণীর মানুষকে প্লাবিত করতে পেরেছিল, তাদের প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

ভক্তিবাদের ক্রমিক বিবর্তনেও সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদের আদর্শ ছিল জাগতিক ভোগ-বিলাসকে তুচ্ছ করে, সংসারকে অসার জ্ঞান করে ঈশ্বরের আশ্রয় লাভে যত্নশীল হওয়া। কিন্তু তুলসীদাস রামচন্দ্রের মহিমা প্রচার করে মানুষকে সংসার ধর্ম পালনে অনুপ্রাণিত করেন এবং সেই সুযোগে ভক্তিবাদকে একটি গতিশীল মতবাদে পরিণত করেন। একইভাবে শিখগুরু অর্জুন থেকে গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত ভক্তিবাদকে আশ্রয় করেই শিখজাতিকে এক সুসংহত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন।

॥ রামানুজ ॥

ভক্তিবাদের আদি প্রচারক ছিলেন দ্বাদশ শতকের সাধক রামানুজ। তিনি বলতেন, কর্মের দ্বারাই মায়া বা আসক্তির জন্ম হয়। কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই প্রকৃত মুক্তি লাভ সম্ভব। তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার নিন্দা করতেন।

১ Essentially, therefore, the Bhakti movement was a new interpretation of Hinduism in terms of Islam's monotheism. —K. M. Panikkar.

॥ রামানন্দ ॥

রামানুজের শিষ্য ছিলেন রামানন্দ। তাঁর ভাবধারাই গ্রহণ করেন রামানন্দ। উত্তর ভারতে ভক্তিধর্মের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন রামানন্দ। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন নাপিত, মুচি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করতেন। রামের প্রতি ভক্তিই মুক্তির একমাত্র পথ— এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। হিন্দী ভাষাকে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। কবীর ছিলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য।

॥ কবীর ॥



কবীর

কবীর ছিলেন তন্তুবায় শ্রেণীর। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের উদ্ভব হয়। পূজা, উপাসনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে তিনি ভক্তি ধর্মকেই গ্রহণ করেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তাই ঈশ্বর ও আল্লার মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি করতেন না। জাতিভেদ প্রথা, মূর্তি পূজা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতিকে তিনি ঘৃণা করতেন। কবীর তাঁর বাণীগুলি গীতিকবিতা বা দোঁহার আকারে রচনা করতেন। আর এই সব দোঁহার জনপ্রিয়তাও ছিল অপরিসীম।

॥ নামদেব ॥

ভক্তি ধর্মের অন্যতম এক প্রচারক ছিলেন মহারাষ্ট্রের নামদেব। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। কিন্তু একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। মূর্তিপূজা ও ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাঁর মূল কথা ছিল অন্তরের পবিত্রতা, ভক্তি ও হরির গুণগান। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তিনিও ছিলেন ক্লান্তিহীন উদ্যোগী।

॥ শ্রীচৈতন্য ॥



শ্রীচৈতন্য

ভক্তি আন্দোলনে যিনি প্রকৃত অর্থেই এক প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং দার্শনিক চৈতন্য তাঁর তত্ত্বজ্ঞানকে সরিয়ে রেখে ভক্তিবাদকেই আশ্রয় করেছিলেন। তিনি ধর্ম বলতে যা শেখাতেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। জনসাধারণের চৈতন্যের জাগরণে চৈতন্যদেব যে শিক্ষা দেন তা ছিল সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শেরই শিক্ষা। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি এবং এই ভক্তিভাব জাগরণের জন্য নাম সংকীর্তন—এই ছিল চৈতন্যদেবের ধর্মীয় মত ও পথ। জাতি বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে—এই ছিল চৈতন্যদেবের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে ভর করেই তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে ভক্তি-ভাবের এক প্লাবন এনেছিলেন। আর সেই প্লাবনকেই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ বলে

সুকুমার সেন বর্ণনা করেছেন। তাই জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি শিষ্যত্ব প্রদান করেন বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই তিনি এক নতুন ধর্মীয় চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে ছিলেন। আজও তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে পূজিত হন।



॥ নানক ॥

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ছিলেন মধ্য যুগের ভক্তি-আন্দোলনের প্রবক্তা। তাঁর শিষ্যদের বলা হয় শিখ। শিখ কথাটির অর্থ হল পবিত্র। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও মানুষের সমানাধিকারকে স্বীকার করতেন। তাই স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অস্পৃশ্যতারও নিন্দা করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মুসলমানেরাও ছিল। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার প্রথম কথা হল ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব। তাঁর কাছে ঈশ্বর সত্য, স্রষ্টা নির্ভীক, অজর, অমর এবং স্বয়ং প্রকাশিত। এই ঈশ্বর লাভের জন্য প্রয়োজন গুরুর। শিষ্যেরা যদি হয় নদী তবে গুরু হলেন মহাসাগর, যেখানে সব নদী বিলীন হয়ে চরম সাফল্য লাভ করে। আর প্রয়োজন নামজপের অর্থাৎ নিয়মিত ঈশ্বর স্মরণ। যারা নিয়মিত নামজপ করেন পরলোকে তাদের মুক্তিলাভ হয়। নানক পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে মানুষ তাঁর পার্থিব জীবনে কৃত পাপ-পুণ্যের ভিত্তিতেই মরণোত্তর জীবনে অর্থাৎ পরলোকে শান্তি অথবা স্বস্তি লাভ করে থাকে।

এ ছাড়াও বল্লভাচার্য, জ্ঞানেশ্বর, রবিদাস, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি আরও অনেক ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন।

॥ সুফীবাদ ॥

ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন হিন্দু ধর্মে উদারনৈতিক সংস্কারের প্রয়াস প্রবলভাবে সক্রিয় তখন ইসলাম ধর্মও নিজেকে এই প্রবণতা থেকে পৃথক করে রাখতে পারে নি। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ এই সময় ইসলাম ধর্মেও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইসলামে এই উদারনৈতিক সংস্কারের প্রয়াস প্রতিফলিত সুফী মতবাদে।

দশম শতাব্দী নানা কারণেই ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দিক থেকে এই সময়ই তুর্কী শক্তির উত্থান ঘটে। চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে এই সময় ইসলামীয় জগতে এসেছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কারণ তখন যুক্তিবাদী চিন্তাধারার অবসান ঘটে এবং আরম্ভ হয় গোঁড়া সনাতনপন্থীদের প্রাধান্য এবং সেই সঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদের সূচনা। যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা ধর্মীয় আচার-আচরণের বিরোধী এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। বিশেষ করে

স্রস্টা ও সৃষ্টিকে অভিন্ন বিচার করায় তারা মূল ধর্মীয় বিশ্বাসকেই আঘাত করেছিল। এই ভাবধারার বিরুদ্ধেই সনাতনপন্থীগণ সরব হয়ে ওঠেন। যে সব তুর্কীরা ভারতে এসেছিলেন তারা ছিলেন এই সনাতনপন্থীদেরই অনুগামী।

অতীন্দ্রিয়বাদীদেরই পরবর্তীকালে বলা হয় সুফী। বহু আগে থেকেই ইসলামীয় জগতে এদের উত্থান ঘটে। এদের অধিকাংশই ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বর প্রেমী। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের ফলে সনাতনপন্থীগণ যেভাবে বিলাস ও বৈভবে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন এবং যেভাবে তাদের নৈতিকমানের অবনমন ঘটেছিল তার ঘোর বিরোধী ছিলেন সুফীগণ। তাই তারা সযত্নে এবং সতর্কভাবেই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাব থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু তাদের এই মানসিকতার ফলে সনাতনপন্থীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ অনিবার্য করে তোলে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় অল গজলী চেষ্টা করেছিলেন উভয় মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে একটা আপোষ মীমাংসার।

সুফী মতবাদ হল প্রকৃতপক্ষে একটি মিশ্র মতবাদ। বিভিন্ন ধর্মের আদর্শের সমন্বয় প্রয়াস থেকেই সুফী মতবাদের জন্ম। এই মতের প্রধান উৎস হল কোরাণ ও হজরত মহম্মদ। হজরত মহম্মদ যে অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন কোরাণেই তার পরিষ্কার ইংগিত পাওয়া যায়। কোরাণে বৈরাগ্য ও ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের উল্লেখ আছে। ঈশ্বরকে স্বর্গ ও মর্তের আলো হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হজরত মহম্মদ ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোর সংযম পালনেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদে ভারতীয় প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ পারস্য উপসাগর ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে ইসলামীয়গণ পরিচিত হবার সুযোগ পায়। তাছাড়া এক সময় খোরাসান, আফগানিস্থান প্রভৃতি বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। এই সব অঞ্চল মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হলে যারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন তাদের প্রভাবে ইসলাম ধর্মের উপর অনিবার্যভাবে ভারতীয় প্রভাব এসে যায়। সুতরাং মুসলমানদের অতীন্দ্রিয়বাদের পেছনে ভারতীয় প্রভাব অনস্বীকার্য। আর এই অতীন্দ্রিয়বাদের সংগঠিত রূপ হল সুফী মতবাদ।

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ বিজিত হবার পর থেকেই ভারতে সুফী ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। ইসলাম ধর্মের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই সুফী মতবাদের উৎপত্তি। হিন্দু বা অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের মত সুফী ধর্মেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুফী ধর্মে গুরুকে বলা হয় পীর আর শিষ্যকে বলা হয় দরবেশ। গুরুকে কেন্দ্র করেই সুফী সন্ন্যাসের জীবন আবর্তিত হয়। গুরুর প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য, সকল জীবের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য —এই হল সুফীবাদের মূল আদর্শ।

সাধারণভাবে সুফী মতবাদের দুটি ভাগ। একটি হল যারা কঠোর ভাবে ইসলামীয় অনুশাসন মেনে চলার পক্ষপাতী। দ্বিতীয়টি হল যারা ঐ অনুশাসন দ্বারা আবদ্ধ হতে প্রস্তুত নন। এঁরা সাধারণতঃ পরিব্রাজকের মত বিভিন্ন স্থানে ঘুড়ে বেড়াতেন। এঁদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই গভীর শ্রদ্ধার পাত্র।

ভারতে সুফী ধর্মগুরুদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত নাম খাজামৈনুদ্দীন চিস্তি। তিনি পৃথ্বীরাজ চৌহানের পতনের পর ১১৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন। কিছুদিন লাহোরে থাকার পর তিনি আজমীঢ়ে আসেন। তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না। তিনি গ্রন্থও রচনা করেন। তবে তাঁর শিষ্যদের খ্যাতি

ও প্রভাবের স্বাদে তিনিও বিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন বাক্তিয়ার কাকি এবং ফরিদউদ্দীন। ফরিদউদ্দীন পাঞ্জাব অঞ্চলকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। দিল্লীতে তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিল এত উদার ও মানবিক যে তাঁর কিছু কিছু রচনা শিখধর্মগ্রন্থ 'আদি গ্রন্থে'ও স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু সুফী সন্ন্যাসীদের সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া এবং নাসিরুদ্দীন চিরাগ। এ'রা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে খুব সহজে ও অবাধে মিশতে পারতেন। এ'দের জীবনধারা ছিল খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর এবং লোকজনের সঙ্গে কথাও বলতেন সহজবোধ্য কথ্য ভাষা হিন্দীতে। এ'রা কখনো কাউকে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত করণের চেষ্টা করেন নি। সুন্দর সংগীতের মাধ্যমে এ'রা তাঁদের মতবাদ প্রচার করতেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়া যোগ সাধনায় এতটাই সাফল্য লাভ করেছিলেন যে তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলা হত।

॥ ভক্তি অন্দোলনের ফলাফল ॥

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভক্তি আন্দোলন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মানুষকে একইভাবে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান-প্রধান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদী ঈশ্বরের প্রতি কায়-মন-বাক্যে নিবেদিত ভক্তিভাব অবশ্যই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। বলা যেতে পারে ভক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। একটি হল আচার-অনুষ্ঠান প্রধান হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা বর্জন। দ্বিতীয়টি হল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। প্রথম লক্ষ্য পূরণে ভক্তি আন্দোলন যথেষ্টই সাফল্য লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কারণ ভক্তি-বাদীরা নিজেরাই কালক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং অন্যান্য গোষ্ঠী অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিযুক্ত হয়। এই সব গোষ্ঠী হল শিখ, নিম্বার্ক, গৌড়ীয়, কবীর প্রভৃতি। ফলে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা যতটা সাফল্য লাভ করেছিল শেষ পর্যন্ত তাও ধরে রাখতে পারে নি।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ভক্তি আন্দোলন নিশ্চয়ই উভয় সম্প্রদায়ের কিছু বিবেকবান ও যুক্তিবাদী মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু রক্ষণশীল মহলে এই প্রয়াস বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল-গণ রাম ও রহিম এক—ভক্তিবাদীদের এই তত্ত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে উভয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতির বিরোধীতা করে।

কোন কোন পণ্ডিত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভক্তি আন্দোলন হিন্দু ধর্মে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। কারণ নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ, যারা সামন্ত প্রথা ও জাতি-ভেদ প্রথায় অত্যাচারিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত বোধ করছিল, ভক্তি আন্দোলনের ফলে সেই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। ফলে হিন্দু সমাজে এক নতুন গতিবেগের সৃষ্টি হয়।

ভক্তি আন্দোলনের অপর একটি অবদান হল এই আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন কথ্য ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। ভক্তিগীতি ও ভক্তিবাদের সাধকদের বাণী ও জীবনীগুলি কথ্য ভাষায় রচিত হয়। সাধকেরাও সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় তাঁদের ধর্ম প্রচার করতেন। ফলে কথ্য ভাষার সমাদর বৃদ্ধি পায়।

॥ সাহিত্য ॥

এতকাল পর্যন্ত ধারনা ছিল যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে সুলতানী

শাসনকাল ছিল ভারতের পক্ষে এক অনুর্বর সময়। কিন্তু সম্প্রতি গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে সুলতানগণ মূলতঃ যুদ্ধপ্রিয় হলেও তাঁরা ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির আন্তরিক পৃষ্ঠপোষক।

স্বভাবতঃই দিল্লীর সুলতানেরা ফরাসী ভাষার সমাদর করতেন। তখন ফারসী ভাষাই ছিল রাষ্ট্রভাষা। সুলতানী শাসনের সূচনায় অল বিরুনী তাঁর বিখ্যাত তহকিক্-ই-হিন্দ গ্রন্থটি রচনা করেন। একাদশ শতকের ভারতের অবস্থা জানতে এই গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইলতুৎমিস বহু ফারসী লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে বহু জ্ঞানী-গুণী গিয়াসউদ্দীন বলবনের আশ্রয় লাভ করেন। বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্রও ছিলেন ফারসী পণ্ডিতদের গুণমুগ্ধ। আমীর খসরু ও হাসান দেলভী সুলতানদের আশ্রয় ও সহযোগিতাতেই সাহিত্য রচনা করেন। আমীর খসরু শেষ জীবনে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর গদ্য রচনা—খাজাইল-উল-ফতুহ, তুঘলক নামা, তারিখ-ই-আলাই প্রভৃতি বহু পরিচিত গ্রন্থ। তা ছাড়া তিনিই প্রথম তাঁর কবিতায় হিন্দি শব্দের ব্যবহার করেন। বলা যেতে পারে তিনি ফারসী সাহিত্যের ভারতীয়করণ আরম্ভ করেন। হাসান দেলভী ছিলেন এ সময়ের এক জনপ্রিয় কবি। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার জীবন কাহিনী তিনিই রচনা করেন। তাছাড়া আরেক কবি ছিলেন বদরুদ্দীন। তবে তাঁর কবিতা যেমন প্রতীকে, উপমায় উজ্জ্বল তেমনি দুর্বোধ্য। তিনি ছিলেন মহাম্মদ বিন তুঘলকের সভাকবি। এই সময়ই ইসামি তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী রচনা করেন।

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতায় জিয়াউদ্দীন বরাণী ও সাম্‌স-ই-ফিরোজ আফিক তাঁদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রচনাগুলি লিপিবদ্ধ করেন। বরাণীর রচনা তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী ও ফতোয়া-ই-জাহান্দারী বিখ্যাত গ্রন্থ। ফিরোজ তুঘলুকও রচনা করেন তাঁর আত্মজীবনী। সুলতান সিকান্দার লোদীও জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের সমাদর করতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য হলেন রফিউদ্দীন নিরাজী। তাছাড়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও বহু ফরাসী পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাহমনী সুলতান তাজউদ্দীন ফিরোজ শাহ ও বাহমনী মন্ত্রী গাওয়ান নিজেরাই ছিলেন ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলমান শাসনের সূচনা থেকেই ব্যাপকভাবে ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে আরম্ভ হয় ভারতের ইতিহাস রক্ষার সুপরিকল্পিত প্রয়াস। প্রাচীনকালের হিন্দু রাজারা যে বিষয়ে তাদের অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সুলতানেরা পরিকল্পিতভাবে সেই ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে ভারতের অতীতকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ফারসী ভাষার প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে এসময় সংস্কৃত ভাষার চর্চা কিন্তু একেবারে উপেক্ষিত ও অনাদৃত ছিল না। সুলতানী যুগের হিন্দু রাজারা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দেন। ফলে এ সময় সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্টি হয় অনেক গদ্য-সাহিত্য, কাব্য ও নাটক। বরঙ্গল রাজের আগ্রহে অগস্ত্য প্রতাপরুদ্রদেব যশো ভূষণ কাব্য রচনা করেন। তৃতীয় বীর বল্লালের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাচক্রবর্তী রুক্মিনী কল্যাণম রচনা করেন। বিজয়নগরে বিরুপাক্ষ নরকাসুর বিজয় কাব্য রচনা করেন। বামনভট্ট রচনা করেন পার্বতী পরিণয়। বিদ্যাপতি রচনা করেন দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী। জৈন পণ্ডিত ন্যায়চন্দ্র হাম্মির বিজয় কাব্য রচনা করেন। রামানুজ রচনা করেন ব্রহ্মসূত্রের টীকা। কাশ্মীরের কলহন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। বিজ্ঞানেশ্বর হিন্দু আইনের বিখ্যাত গ্রন্থ মিতাক্ষরা রচনা করেন।

সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সুলতানী যুগে হিন্দি ভাষার যথেষ্ট বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। তখন কথ্য হিন্দি ভাষা ছিল দু' রকমের—খাড়ি-বোলী ও ব্রজভাষা। দুই ভাষাতেই হিন্দি সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কবি চাঁদ বরদাই তাঁর বিখ্যাত পৃথিবরাজ রাসো কাব্য রচনা করেন। শাঙ্গধর তাঁর হাম্মির রাসো ও হাম্মির কাব্য রচনা করেন। জগনায়ক রচনা করেন অলখনন্দা। কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি বা মৈথিলী ভাষায় তাঁর ভক্তিগীতি বা পদাবলী রচনা করেন। বাঙ্গালী স্মৃতিশাস্ত্রের পন্ডিত রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

এই সময়ই উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলেছেন আরবি ও ফরাসী ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণের ফল হল উর্দু ভাষা।[২] দ্রুত এই ভাষা সুলতানী যুগে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষায় পরিণত হয়। রাজসভাতেও এই ভাষার যথেষ্ট কদর ছিল যারা হিন্দী জানতো স্বভাবতঃই তাদের কাছে উর্দু ভাষাও সহজবোধ্য ভাষা ছিল।

এ সময় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। মারাঠি ভাষার নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, একনাথ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তিগীতি রচনা করেন। রাজস্থানী ভাষার ভক্তিগীতি ও বাংলার পদাবলী সাহিত্য এই যুগেরই সৃষ্টি। কানাড়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাতেও সৃষ্টি হয় স্থানীয় সাহিত্য। বাংলায় করীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলাভাধায় মহাভারত অনুবাদ করেন। কবি শ্রীধর নন্দীও অপর একখানি বাংলা মহাভারত রচনা করেন। কবি বিজয়গুপ্ত রচনা করেন মনসামঙ্গল কাব্য।

॥ শিল্প-সংস্কৃতি ॥

ফাগুর্সন বলেছেন যে তুর্কীগণ মূলতঃ যোদ্ধার জাত হলেও এবং ভারত আগমনকালে তারা সঙ্গে কোন শিল্পী বা স্থপতি না নিয়ে এলেও তাদের ছিল স্থাপত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং যেহেতু স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাদের একটি নিজস্ব নীতিও ছিল সেইহেতু তারা এদেশে সাফল্যও পেয়েছিল।[৩] জন মার্শালও একই অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন মুসলমানেরা এদেশে স্থায়ীভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে তখন তারা এদেশ থেকে স্থাপত্য-রীতি শিক্ষ লাভ করে নি, কারণ এক্ষেত্রে তাদের ছিল নিজস্ব রীতি যার সঙ্গে সমসাময়িক ইউরোপীয় রীতির তুলনা করা যেতে পারে এবং তদুপরি আফগান, পারসিক ও তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলমানদের ছিল সুরুচি এবং স্থাপত্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা।[৪]

কিন্তু ফাগুর্সন সুলতানী যুগের যে স্থাপত্যকে 'ইন্দো-সার্সেনিক' শিল্প বলে

২ It had evolved through a combination of Hindi Syntax and Persian — Arabic vocubulary.

—Romila Thapar.

৩ A nation of soldiers equipped for conquest and that only they of course brought with them neither artists or architects but like all nations of Turanian origin, they had strong architectural instincts and having a style of their own they could hardly go wrong in any architectural project they might attempt. —Ferguseon.

৪ By the close of the twelfth century, then. when the Muuslims established their power permanently in India, it was no longer a case of their having to be tutored by their new subjects in the art of building , they themselves were already possessed of a highly-developed architecture of their own. as varied and magnificient as the cntemporary architecture of Christian Europe and the Muslims, moreover, who conquered India — men of Afgan, Persian and Turki blood — were endowed with remarkably good taste and a natural talent for building.

—John Marshall.

ব্যাখ্যা করেছেন কিংবা হ্যাভেল সে স্থাপত্যকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলে বর্ণনা করেছেন তার কোনটাই যথাযথ নয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থাপত্য ছিল ইসলামীর রীতির সঙ্গে ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণ। জন মার্শাল যথার্থই বলেছেন যে সুলতানী যুগের স্থাপত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় রীতির সংমিশ্রণ, হয়তো সেই প্রভাবে সমতা ছিল না।[৫] মুসলমানগণ ভারতে আসার আগেই ছিল ভারতের নিজস্ব স্থাপত্য রীতি। মুসলমানগণ এদেশে নিয়ে এসেছিল পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ থেকে এক পৃথক স্থাপত্য রীতি। এই সব বিবিধ রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল ভারতে সুলতানী শাসনকালে। লক্ষ্যণীয় হল শিল্পকলার চর্চার ক্ষেত্রে সুলতানী যুগে গুরুত্ব পেয়েছে স্থাপত্য শিল্পই। সম্ভবত' ধর্মীয় কারণে মুসলমানেরা চিত্রকলা, সংগীত ও নৃত্যকলার চর্চা উপেক্ষা করেছে।

কিন্তু ইসলামীরা স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতির এই যে সংমিশ্রণতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কারণ ইরাণের সঙ্গে ভারতের শিল্প-ভাবনার যোগাযোগ বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতে তুর্কীগণ এসে এই ইন্দো-ইরাণীয় শিল্পরীতিকেই গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ তুর্কী শাসকগণ এদেশে নির্মাণকার্যে ভারতীয় স্থপতিদেরই নিয়োগ করে। ফলে ভারতীয় শিল্পীগণ তাদের অজ্ঞতসারেই ভারতীয় শিল্পরীতিকে ইসলামীয়রীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। তৃতীয়ঃ বহু ক্ষেত্রেই মুসলমান শাসকগণ লুণ্ঠিত হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপের ভগ্নাংশ তাদের প্রাসাদ তৈরীর কাজে ব্যবহার করে। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্যাপত্য ইসলামীয় স্থাপত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। চতুর্থতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলির ছাদ ভেঙ্গে ফেলে সেখানে গম্বুজ তৈরী করে সেগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। পঞ্চমতঃ ভারতীয় ও ইসলামীয় উভয় শিল্পীরীতির বৈশিষ্ট্য হল অলংকার ব্যবহারের বাহুল্য। ফলে উভয় রীতির সংমিশ্রণের পথ প্রশস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে উভয় রীতির মধ্যে মিল নির্দেশ করে জন মার্শাল বলেছেন যে হিন্দু মন্দির ও মুসলমান মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উন্মুক্ত আঙ্গিণার চারপাশে থাকে সারি সারি স্তম্ভ। সুতরাং যে সব মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলিকে স্বভাবত'ই মসজিদে পরিণত করা হয়। আবার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির তাগিদে অলংকরণ বাহুল্যের প্রবণতাও উভয় রীতিকে নৈকট্যে এনেছিল।[৬] হেনরী শার্প বলেছেন যে মুসলমান বিজয়ীগণ ভরতের শিল্প-সম্পদ দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছিল। হিন্দুরীতির অলংকরণ সাধাসিধে ইসলামীয়রীতিকে অবশ্যই আকৃষ্ট করে। তাছাড়া মুসলমানগণ হিন্দু-স্থাপত্য-নির্মাণের অনুপাত রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে।[৭]

৫ Broadly Speaking Indo — Islamic architecture derives its character from both sources, though not always in an equal degree.

—John Marshall.

৬ One feature common to Hindu temples and Muslim mosques was the open court encompassed by chambers of colonnades and such temples as were built on this plan naturally lent themselves to conversion into mosques and would be the first to be adapted for that purpose by the conquerors. Again, a fundamental characteristic that supplied a common link between the styles was the fact that both Islamic and Hindu arts were inherently decorative.

—John Marshall.

৭ The conquerors could not fail to be influenced by the arts which had flourished around them. Hindu ornament began to invade the simple Islamic forms. Moreover Muhammedans lernt from the Hindu lessons in the proportionate massing of buildings and the disposition of their parts.

—Henry Sharpe.

সুলতানী আমলের স্থাপত্যকে কয়েকটি আঞ্চলিক ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়।

॥ দিল্লীর সুলতানী স্থাপত্য ॥

দিল্লী ও তার সন্নিকটে যে সব স্থাপত্য নির্মিত হয় সুলতানী শাসকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সেগুলিকে দিল্লীর সুলতানী স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই স্থাপত্য-শৈলীতে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা প্রাদেশিক স্থাপত্যে অনুপস্থিত। এই শৈলীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল দিল্লীর কোয়াৎ-উল-ইসলাম নামে মসজিদ এবং কুতুব মিনার। কোয়াৎ-উল-ইসলাম মসজিদটি নির্মাণ করেন কুতুব-উদ্দীন। হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে এইটি আকৃতি ও প্রকৃতিতে হিন্দুরীতির সাক্ষ্য বহনকারী। পরবর্তীকালে ইলতুৎমিস অবশ্য মসজিদের সংস্কারসাধন করে ইসলামীয় প্রভাব বৃদ্ধি করেন।

অন্যদিকে মার্শাল মনে করেন পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে নির্মাণ পদ্ধতি পর্যন্ত কুতুবমিনার হল ইসলামীয় শিল্পরীতির এক চমৎকার উদাহরণ। কারণ এ ধরনের স্তম্ভ নির্মাণ হিন্দুরীতির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না। একই মত প্রকাশ করেছেন ফার্গুসন।

এ সময়ের অপর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন হল আলাউদ্দীন খলজী নির্মিত আলাই দরওয়াজা। এর নির্মাণ কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন মার্শাল। তাছাড়া কুতুবউদ্দীন নির্মিত আজমীঢ়ের আড়াই-দিন-কা-চোপড়া, ইলতুৎমিসের সমাধি ও বলবনের সমাধি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে নির্মিত শহর হল তুঘলকাবাদ ও ফিরোজবাদ।

॥ প্রাদেশিক স্থাপত্য ॥

সুলতানী শাসনকালে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নানা স্থাপত্য কীর্তি স্থাপন করেন। এই সব স্থাপত্যে স্বভাবতঃই স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক সুস্পষ্ট। তাই আঞ্চলিক বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাদেশিক স্থাপত্যকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া যায়।

ভারতের যে সব শহরে মুসলমানগণ সর্বাগ্রে তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল মুলতান। তাই স্বাভাবিক কারণেই মুলতানে মুসলমানদের প্রাথমিক স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আছে। এখানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন মহাম্মদ বিন কাশিম। বিখ্যাত আদিত্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল আরেকটি মসজিদ। তবে সয়িদের সমাধি হল এ সময়ের স্থাপত্যরীতির এক চমৎকার উদাহরণ। কিন্তু মুলতান-স্থাপত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল রুকুন আলমের সমাধি মন্দির। এটির নির্মাতা হলেন গিয়াসুদ্দীন বলবন। এর নির্মাণ কৌশলে পারসিক প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই সমাধি-মন্দিরকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাধি মন্দির বলে বিবেচনা করা হয়।

এ সময়ের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের একটি নিজস্ব ধরণ ছিল। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঁটের ব্যবহার করা হয়। পাথরের ব্যবহার ছিল খুবই কম। বাংলার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হল ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভের উপর চালার আকৃতির খিলান। তাছাড়া হিন্দু-স্থাপত্যের অন্যতম প্রতীক পদ্মফুলের যথেচ্ছ ব্যবহারও এ সময় দেখা যায়। সুলতানী আমলে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেখা যায় গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, ত্রিবেণী এবং পাণ্ডুয়ায়। জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ ও সমাধি রয়েছে পাণ্ডুয়ায়। পাণ্ডুয়াতে সিকান্দার শাহ নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত আদিনা মসজিদ। দামাস্কাসের বিখ্যাত

মসজিদের মতই এই মসজিদ ছিল বিশালাকার। অবশ্য মার্শাল বলেছেন অন্য কোন ধর্মস্থান এত বিশাল আকারের নয়, এবং অন্য ধর্মস্থানের সৌন্দর্যও এত কম নয় যা দেখা যায় আদিনায়।[৮] একই মত প্রকাশ করেছেন ক্যানিংহাম। পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধি এই সময়ের বাংলার এক চমৎকার স্থাপত্য-নিদর্শন। এই সমাধি মন্দিরটি ছিল জালালুদ্দীন মহাম্মদ শায়ের। ইঁট ও টেরাকোটা শিল্পের এক দৃষ্টিনন্দন নিদর্শন হল বরবক শাহ নির্মিত দাখিল দরওয়াজা। ক্যানিংহামের মতে গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হল দাখিল দরওয়াজা। একলাখি সমাধি মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হয় লোটন মসজিদ। বাংলার জনপ্রিয় সুলতান হুসেন শাহ নির্মাণ করেন বড় সোনা মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদ।

গুজরাটের স্থাপত্য শিল্প ছিল প্রাদেশিক শিল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ডঃ বার্জে-সের মতে স্থানীয় শিল্পের যা কিছু চমৎকারীত্ব ও সৌন্দর্য তার সমন্বয় ঘটেছিল গুজরাট স্থাপত্যে।[৯] মাউন্ট আবুর বিখ্যাত জৈন মন্দির যেন ছিল যাবতীয় গুজরাট স্থাপত্যের আদর্শ। আহ্‌মদ শাহ আমেদাবাদ শাহর নির্মাণ করেন। আমেদাবাদের তিন দরওয়াজার নির্মাণশৈলী সমালোচনার ঊর্দ্ধে। দরিয়া খাঁর সমাধি পারসিক রীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত। রানী সিপারীর মসজিদও বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই মসজিদ সম্পর্কে মার্শাল মনে করেন অন্য কোথাও এমন চমৎকার সমন্বয় ঘটে নি যা ঘটেছিল এই মসজিদের ক্ষেত্রে।

মালবেরও ছিল এক নিজস্ব শিল্পরীতি। দিলওয়ার খানের মসজিদ বিখ্যাত তার স্তম্ভ এবং কারুকার্যময় ছাদের জন্য। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হিন্দোলা মহল। ইংরেজী 'টি'-এর আকারে নির্মিত এই প্রাসাদের আড়ম্বর নয়নমুগ্ধকর। তুলনায় জামি মসজিদ অনেক সাধারণ এবং ম্রিয়মান।

জৈনপুর স্থাপত্যের অধিকাংশ নিদর্শনই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; তবু অটলা দেবীর মন্দির ধ্বংস করে নির্মিত অটলা মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক লেন পুল এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। এই মসজিদের অনুকরণেই নির্মিত হয় ঝাঁঝরি মসজিদ ও লাল দরওয়াজা। বাদাউনের জমি মসজিদ নির্মাণ করেন ইলতুৎমিস। এটি হল ভারতের অন্যতম বৃহৎ আকারের মসজিদ।

কাশ্মীরে অধিকাংশ হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন মুসলমান শাসক-গণ। তথাপি জয়নুল আবেদিনের শাসনকালে নির্মিত সমাধি-সৌধ কাশ্মীরের স্থাপত্যের উদাহরণরূপে পরিগণিত হয়। শ্রীনগরের জামা মসজিদ নির্মাণ করেন সিকান্দার। পরবর্তীকালে জয়নুল আবেদিন এই মসজিদের সংস্কারসাধন করেন।

॥ হিন্দু স্থাপত্য ॥

বিজয়নগর রাজ্যের বহু স্থাপত্য কীর্তি এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন রূপে পরিগণিত হয়। এই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল রাজা কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক নির্মিত বিঠ্ঠল নাথের মন্দির। তাছাড়া বিজয়নগর রাজাদের তৈরী গোপুরম, মণ্ডপ প্রভৃতি হিন্দু স্থাপত্য শৈলীর পরিচয় বহন করে। ভেলোরের কল্যাণ মণ্ডপ, কাঞ্চির একাম্বরনাথ ও বরদারাজ স্বামী মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অতিশয় সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে রাজস্থানের মেবারের রাণা কুম্ভের স্তম্ভ ও দুর্গ এবং বিভিন্ন রাজপুত রাজাদের তৈরী প্রাসাদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

৮ No place oi worship was ever derived of such magnitude and with so litte sense for the beautiful as the Adina Maszid.
—Marshall.

৯ The Gujarat style combined all the beauty and finish of the native art.
—Burgess.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

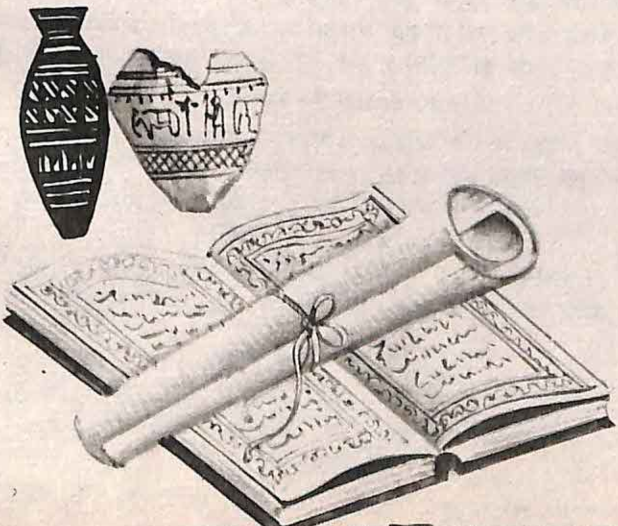
A brief note on the types of sources.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

মোগল যুগের ঐতিহাসিক-রচনা—প্রাদেশিক সাহিত্য—বিদেশীদের বিবরণ—প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান—সরকারী দলিলপত্র।

দশম অধ্যায়

মোগল যুগের সূচনা : উপাদান



মোগল যুগের ঐতিহাসিক রচনা

ভারতের ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায় মোগল রাজবংশের শাসনকাল। এই সময়ের ইতিহাস জানার জন্য উপকরণের অভাব নেই। বিশেষ করে মোগল সম্রাটগণ ইসলামীয় রীতি অনুসারে ইতিহাস রক্ষার প্রতি ছিলেন বিশেষ যত্নবান।

॥ বাবর নামা ॥

এটি হল বাবরের আত্মজীবনী। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাবরের জীবনের আঠারো বছরের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ প্রায় নিরপেক্ষভাবে বাবর আত্মসমালোচনা করেছেন এই গ্রন্থে।

॥ তাজকিরৎ-উল-ওয়াকৎ ॥

গ্রন্থটি হুমায়ুনের ভৃত্য জহর রচিত। জহর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু তিনি তো ঐতিহাসিক ছিলেন না। তাই তাঁর বর্ণনার মধ্যে থেকে গিয়েছে নানা ফাঁক-ফোঁকর।

॥ হুমায়ুন নামা ॥

এই গ্রন্থের লেখিকা হুমায়ুণের ভগিনী গুলবদন বেগম। আকবরের নির্দেশেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বাবরের মৃত্যুকালে গুলবদনের বয়স ছিল অল্প। তাই গ্রন্থে অনেক বেশী বিস্তৃতভাবে হুমায়ুণের শাসনকাল আলোচিত। সেই সময়ের জীবনধারার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থ থেকে।

॥ তারিখ-ই-রসিদ ॥

এই গ্রন্থের লেখক মীর্জা হায়দার এবং আলোচ্য বিষয় মোগল ও মধ্য এশিয়ার তুর্কীগণ। তখনকার দিনে মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। বাবর ও হুমায়ুনের শাসনকালও এই গ্রন্থে বর্ণিত। বিশেষ করে কনৌজের যুদ্ধের যে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আমরা এ গ্রন্থ থেকে পাই এমন বিবরণ সচরাচর অন্যত্র পাওয়া যায় না।

॥ আকবর নামা ॥

এই গ্রন্থের লেখক আবুল ফজল। ঐতিহাসিক হিসেবে আবুল ফজল মর্যাদার এক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আকবর নামা আকবরের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা নির্ভর-যোগ্য উপকরণ। আবুল ফজলের সাহিত্য সৃষ্টির সামর্থ, তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তি এবং তাঁর কঠোর পরিশ্রম আকবর নামাকে এক অনবদ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঐতিহাসিক এলিয়ট তাঁর রচনাশৈলীর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

॥ আইন-ই-আকবরী ॥

এই গ্রন্থের রচয়িতাও আবুল ফজল। এই গ্রন্থে আকবরের শাসন ব্যবস্থার পুংখানুপুংখ বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া আকবরের সময়ের দেশের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা জানার জন্যও এই গ্রন্থ এক নির্ভরযোগ্য দলিল।

॥ মুন্তাখিব-উৎ-তারিখ ॥

এই গ্রন্থ রচনা করেছেন বাদাউনের মোল্লা আবদুল কাদির। ইনি ছিলেন আকবরের ঘোর বিরোধী। তাই তাঁর রচনায় আকবর সম্পর্কে তীক্ষ্ম সমালোচনা রয়েছে।

॥তাবাকৎ-ই-নাসিরি ॥

নিজামুদ্দীন বক্সি রচিত এই গ্রন্থ থেকে সমসাময়িক কালের অনেক তথ্য জানতে পারি। গজনীর উত্থান থেকে আকবরের শাসনকাল এই গ্রন্থের আলোচ্য সময় সীমা।

॥ তুজক-ই-জাহাঙ্গীর ॥

এই গ্রন্থ হল জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। তাঁর সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

পরিচয় বিধৃত এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির রচনার মাধুর্য অনায়াসে পাঠককে আকৃষ্ট করে। জাহাঙ্গীরের সময় রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হল মুতামদ খাঁ রচিত ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীর এবং সাথির-ই-জাহাঙ্গীরি।

॥ পাদশাহ-নামা ॥

আবদুল হামিদ লাহোরী শাহ-জাহানের শাসনকালে রচনা করেছিলেন পাদশাহ-নামা। আবদুল হামিদ আবুল ফজলের রচনা ভংগীকেই অনুসরণ করেছিলেন। শাহ জাহানের শাসনকালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এই গ্রন্থের উপজীব্য।

॥ মাসির-ই-আলমগিরি ॥

এই গ্রন্থটি হল ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল সম্পর্কীত। লেখক মহম্মদ সকি মুস্তাদ খাঁ। গ্রন্থটির প্রথমার্ধে মহম্মদ কাজিম রচিত আলমগীর-নামার সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশিত হয়েছে। বাকী অংশ লেখকের নিজস্ব রচনা।

॥ আলমগীর-নামা ॥

লেখক মীর্জা মহাম্মদ খাঁ। ঔরঙ্গজেবের শাসনের বত্রিশতম বর্ষে সম্রাটের প্রতি এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত।

তা ছাড়া কাফী খাঁ রচিত মুস্তাখাব-উল-লুবাব থেকে ঔরঙ্গজেবের শাসন নীতি ও মারাঠা নীতির কথা জানা যায়। বক্তওয়ার রচিত মিরাদ-ই-আলমকে ঐতিহাসিক বার্নহার্ড ডর্ম পারসিক ভাষায় শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলে অভিহিত করেছেন।

॥ প্রাদেশিক সাহিত্য ॥

মোগল যুগে রচিত বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য থেকেও সেই সময়ের নানা কথা জানা যায়। উল্লেখযোগ্য প্রাদেশিক সাহিত্য হল মারাঠা রচনা সভাসদ বাখর, শিখ গ্রন্থসাহিব, রাজপুত পৃথ্বীরাজ রাসো ও পদ্মাবৎ প্রভৃতি।

॥ বিদেশীদের বিবরণ ॥

মোগল শাসনকালে বহু ভ্রমণকারী, বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণ ভারতে এসেছিলেন। তারা তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবন্ধ করে গিয়েছেন। তারা সবাই মোগল আড়ম্বর ও ঐশ্চর্যের যেমন প্রশংসা করেছেন তেমনি প্রদীপের নীচেই যে থাকে অন্ধকার সেকথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

॥ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ॥

মোগল যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অভাব নেই। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পে মোগল যুগে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটেছিল। এই সব শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে সে সময়ের নানা তথ্য সংগৃহীত হয়। মোগল সম্রাটদের মুদ্রাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা মুদ্রা সব সময়েই ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

॥ সরকারী দলিলপত্র ॥

মোগল সম্রাটগণ বিভিন্ন সময়ে যে সব ফরমান বা ঘোষণাপত্র জারী করতেন সেগুলিও ইতিহাসের খুবই নির্ভরযোগ্য উপাদান। এই সব দলিল-পত্র থেকে সরকারী শাসননীতি সম্পর্কে যেমন অবহিত হওয়া যায় তেমনি ঐ নির্দেশনামার প্রয়োজন থেকে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Origin of the Mughals—foundation of the Padshahi by Babur—Panipath—Khanua and Ghogra—(details of wars to be omitted)—Babar's memoirs.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

একাদশ অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা



মোগল জাতির পরিচয়

'মোগল' কথাটি এসেছে 'মোঙ্গল' শব্দ থেকে। 'মোঙ্গল' শব্দের অর্থ হল সাহসী বা নির্ভীক। বর্তমান কালের মোঙ্গোলিয়া ছিল মোঙ্গল জাতির আদি বাসস্থান। এক সময় মোঙ্গালিয়া থেকে চলে এসে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে মোঙ্গলেরা। তখন থেকেই তারা মোগল নামে পরিচিত হয়। এরা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির।

তাদের নেতা চিঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলেরা এশিয়ার এক শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি চীনদেশ, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

কিন্তু চিঙ্গিজের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য কতগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। চিঙ্গিজের দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই এবং তাঁর বংশধরেরা মধ্য এশিয়ায় রাজত্ব করতে থাকে। চতুর্দশ শতাব্দীতে চাঘতাই রাজ্যও আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই রাজ্যেরই পশ্চিম অঞ্চলে আবির্ভূত হন তৈমুরলঙ্গ।

দিল্লীর সুলতানী শাসনকালে মোঙ্গলেরা বারবার ভারত আক্রমণ করে। এক সময় তারা দিল্লীর উপকণ্ঠে উপনীত হয় কিন্তু ভারতের কোন অঞ্চলে তারা স্থায়ী-ভাবে বসবাস করে নি। চিঙ্গিজ খাঁ সিন্ধুদেশ পর্যন্ত এসে স্বদেশে ফিরে যান। কিন্তু তৈমুর দিল্লী জয় করেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরবর্তীকালে চিঙ্গিজ ও তৈমুরের বংশধর বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তৈমুরের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করেন।

॥ বাবর ॥

বাবর শব্দটি তুর্কী শব্দ, যার অর্থ ব্যাঘ্র। মাতার দিক থেকে তিনি ছিলেন চিঙ্গিজ খাঁ এবং পিতার দিক থেকে তৈমুরের বংশধর। সুতরাং প্রকৃত অর্থে তিনি মোগল জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, ছিলেন তুর্কী। বাবর নিজেও তুর্কীদের মোগল- দের থেকে পৃথক এক জাতি বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে তিনি মোগলদের সম্পর্কে প্রকারান্তরে ঘৃণার ভাবই প্রকাশ করে ছেন।


বাবর

বাবরের পিতা ছিলেন ফরগণার অধিপতি। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি ফরগণার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তিনি তৈমুরের রাজধানী সমর-খন্দ জয়ের স্বপ্ন দেখতেন ছোটবেলা থেকেই। এই সময় অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে বাবর সমরখন্দ জয় করে নেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাবর পিতৃরাজ্য ফরগণা হারান, সেই সঙ্গে সমরখন্দও তাঁর হস্তচ্যুত হয়।

নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি সুযোগ পেয়ে কাবুল জয় করেন। কাবুল জয়ের পর তিনি ভারত জয়ের পরিকল্পনা করতে থাকেন।

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে বাবর ঝিলাম ও চিনাব নদী অতিক্রম করে পাঞ্জাবের দীপাল-পুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। পর বৎসর তিনি কান্দাহার জয় করেন। ভারতের সম্পদ ও ঐশ্চর্য বার বার তাঁকে এদেশ জয়ে প্রলুব্ধ করেছিল।

এই সময় ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল গভীর সংকটময়। দিল্লীর সুলতানী শাসনের তখন অন্তিম লগ্ন। দিল্লীর সিংহাসনে তখন লোদী বংশের শাসন। সুলতান

ইব্রাহিম লোদীর অপদার্থতায় ও অযোগ্যতায় পণ্য সামগ্রীর মূল্যমান ঊর্ধগামী, ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত। তদুপরি অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ পরিস্থিতিকে অধিকতর জটিল করে তোলে। তাই পাঞ্জাবের পরাক্রান্ত অভিজাত দৌলত খাঁ ইব্রাহিমকে সমুচিত শিক্ষা দিতে বাবরকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানান।

বাবর এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে বাবর সসৈন্যে পাঞ্জাবে আসেন এবং লাহোর দখল করেন। কিন্তু বাবরের আগ্রাসী নীতিতে আতংকিত হয়ে দৌলত খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং বাবর কাবুল ফিরে যেতে বাধ্য হন।

॥ প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ ॥

১৫২৫ খৃষ্টাব্দে বাবর পুণরায় সসৈন্যে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। দৌলত খাঁ পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর বাবর দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হলে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী তাঁকে পাণিপথের প্রান্তরে বাধা প্রদান করেন। যুদ্ধে বাবরের ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে ইব্রাহিমের বিশাল বাহিনী পরাজিত হয় এবং ইব্রাহিম নিহত হন। যুদ্ধের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ফল হল দিল্লী ও আগ্রা বাবরের হস্তগত হয়, আফগান সাম্রাজ্যের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবেই স্থাপিত হয়।

কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের পরই বাবরকে কতগুলি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন পূর্ব ভারতে আফগান ও মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাছাড়া বাবরের অনুচরগণ কাবুল প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্রথমে বাবর অনুচরদের বহু কষ্টে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সমর্থ হন। এরপর তিনি আফগানদের দমনে অগ্রসর হন।

বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুণকে আফগাণদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হুমায়ুণ অল্প সময়ের মধ্যে কাল্‌পি, বায়না দখল করেন। জৌনপুর ও বিহারের আফগাণদেরও তিনি বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

॥ খানুয়ার যুদ্ধ ॥

মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। কারণ রাণার বিরুদ্ধে বাবরের অভিযোগ ছিল যে রাণা বাবরকে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করবেন, কিন্তু রাণা তা করেন নি। অন্যদিকে রাণার বক্তব্য ছিল বাবর কাল্‌পি, বায়না প্রভৃতি দখল করে তাঁর রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছেন। আসলে সংগ্রাম সিংহ ভেবেছিলেন একরকম, আর ঘটনা ঘটেছিল অন্যরকম। তাঁর ধারনা ছিল বাবর ইব্রাহিমকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হলে তিনি নিজেই দিল্লী দখল করবেন। কিন্তু তা যখন হলই না, বরং বাবর স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের পরিকল্পনা করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা ভিন্ন সংগ্রাম সিংহের গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ ছিল উত্তর ভারতে কোন শক্তি প্রাধান্যলাভ করবে তা স্থিরীকৃত হবার লড়াই।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খানুয়ার প্রান্তরে বাবরের সঙ্গে সংগ্রাম সিংহের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাত্র দশ ঘন্টার যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী প্রবল বিক্রমের পরিচয় দিয়েও বাবরের উন্নত রণ-কৌশলের কাছে পরাজিত হয়।

কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর ফলাফল সুদূর প্রসারী। এই যুদ্ধের ফলে যে রাজপুত ঐক্য সংগ্রাম সিংহ গড়ে তুলেছিলেন তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রাজপুত শক্তির পরাজয় আফগাণদেরও দুর্বল করে ফেলে। কেননা তাদের সাহায্য পাবার আর কোন উৎসই রইলো না। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে মোগল শক্তি অধিকতর

স্বীকৃতি লাভ করে। তাই বাবর এবার তাঁর রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। এই সব কারণেই ঐতিহাসিক কে কে দত্ত এই যুদ্ধকে এক নির্ণায়ক যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। রাশব্রুক উইলিয়ম্‌স বলেছেন, এতকাল পর্যন্ত ভারত জয় ছিল বাবরের দুঃসাহসিক জীবনের এক উপাখ্যান মাত্র। খানুয়ার যুদ্ধ থেকে এই লক্ষ্য হল তাঁর বাকী জীবনের একান্ত বাস্তব ও প্রধান ঘটনা।[১]

॥ ঘর্ঘরার যুদ্ধ ॥

রাজশক্তিকে ধ্বংস করার পর বাবরকে আফগানদের সঙ্গে মোকাবিলায় অগ্রসর হতে হল। সেই সময় পূর্ব ভারতে জৌনপুরের শাসনকর্তা মামুদ লোদী, বিহারের আফগান নেতা শের খাঁ এবং বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ জোট বেঁধেছিলেন বাবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

বাবর দ্রুত কনৌজ, বারাণসী ও এলাহাবাদ জয় করে বিহারের সীমান্ত ঘর্ঘরা নদীর তীরে উপনীত হলেন। এইখানেই মামুদ লোদী ও শের খাঁ তাঁকে বাঁধা দেন। কিন্তু তারা বাবরের কাছে পরাজিত হলেন। এ অবস্থায় নিজ সীমান্তের নিরাপত্তা, অক্ষুণ্ণ রাখতে নসরৎ শাহও সসৈন্যে বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত বাবরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্তানুসারে মোগল-আফগান যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। বিনিময়ে বাবর নসরৎ শাহের রাজ্যসীমা মেনে নেন এবং বাংলার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে স্বীকৃতি দেন। কোশী-গন্ডক নদী উভয়ের সীমা হিসেবে চিহ্নিত হল। এই-ভাবে বাবর তাঁর বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন।

॥ বাবরের আত্ম-জীবনী ॥

তুজুক-ই-বাবরী বা বাবর নামা নামে এক গ্রন্থে বাবর তাঁর নিজের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যান। স্বভাবতঃই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। মূল গ্রন্থটি তুর্কী ভাষায় রচিত।

বাবর এই গ্রন্থে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনালী, পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারে বিফলতা, আফগানিস্থান ও ভারত জয় সম্পর্কে সকল কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। বাবর ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমী। তিনি বিভিন্ন গাছ-পালা, পশু-পাখীর বর্ণনা দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বাবরের কৃতিত্ব হল তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী। আত্মসমালোচনা করে তিনি তাঁর দোষত্রুটির কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন এই গ্রন্থে।

॥ বাবরের মূল্যায়ণ ॥

বাবর ছিলেন প্রকৃত অর্থেই পুরুষ সিংহ। তিনি ছিলেন সাহসী, দৃঢ়চেতা এবং উচ্চাকাংখী। নানা ভাগ্য বিপর্যয়েও তাঁর নিজের উপর বিশ্বাসে কখনো ফাটল ধরে নি। তাই সকল ব্যর্থতাকে তিনি সহজভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর পরবর্তী বৃহত্তর ঐতিহাসিক সাফল্যের চাবিকাঠি।

একথা অনস্বীকার্য যে অদম্য সাহস, অপরিসীম উদ্যম ও সামরিক শক্তির সাহায্যে বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। এই সাম্রাজ্য নির্মাণে তিনি যে কূট-

১ Hitherts the occupation of Hindustan might have been looked upon as a mere episode in Babur's career of adventure ; but from henceforth it became the keynote of his activities for the remainder of his life.

—Rushbrook Williams.

নৈতিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর।

কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি রাজ্য জয় ছাড়া আর কিছু করে যেতে পারেন নি। তিনি যা অসম্পূর্ণ রেখে যান তার গুরুত্বই বরং অনেক বেশী।[২] প্রকৃত-পক্ষে বিজিত সাম্রাজ্যে একটা সুসংহত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন কাজই তিনি করে যেতে পারেন নি। অথচ সেটাই ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক আর্সকীন বলেছেন যে তখন ভারত ছিল যথা-যথভাবে সুশাসিত রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক রাজার অধীনে কয়েকটি রাষ্ট্রের সমষ্টিমাত্র।[৩] বাবরের সাফল্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাই রাশব্রুক উইলিয়স্ বলেছেন যে বাবর তাঁর পুত্রকে এমন এক রাজতন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন যার অস্তিত্ব নির্ভর করতো অবিরাম যুদ্ধের উপর এবং শান্তির সময় যা ছিল একান্তই দুর্বল ও অক্ষম।[৪]

অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে ভারতে বাবরের অবস্থানকাল মাত্র চার বৎসর। এই চার বৎসরের মধ্যে তাঁকে আফগান ও রাজপুতদের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। তাছাড়া তখন মোগলগণ ছিল ভারতে বিদেশী। সুতরাং ভারতীয় প্রথা ও পদ্ধতিকে রাতারাতি অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ বিজাতীয় এক শাসন-ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করা বাস্তব দিক থেকে খুব রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক হত না। তদুপরি ভারতবাসী সম্পর্কে বাবরের অভিজ্ঞতাও ছিল খুবই সীমিত। সুতরাং এই সব প্রতিকূলতার জন্যই বাবরের পক্ষে রাজ্যজয়ের বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নি।

২ Babur could effect nothing more than conquest. What he had left undone was of greater importance.

৩ India was still rather a congeries of little states under one Prince than one regular and uniformly governed Kingdom.

—Erskine.

৪ Babur bequeathed to his son a monarchy which could be held together only by the continuance of war conditions which in times of peace was weak, structureless and invertibrate.

—Rushbrook Williams.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

Mughal-Afgan contest—its nature—a brief narrative of the building up of an empire by Sher Shah—Special Stress on the administrative and revenue systems—Sher Shah's contributions—a brief reference to the re-establishment of the Mughal power.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

মোগল—আফগাণ দ্বন্দ্ব—হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহ—হুমায়ুন ও শেরশাহ—শেরশাহের রাজ্যজয়—শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা—শেরশাহের মূল্যায়ণ—মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়

মোগল আফগান দ্বন্দ্ব



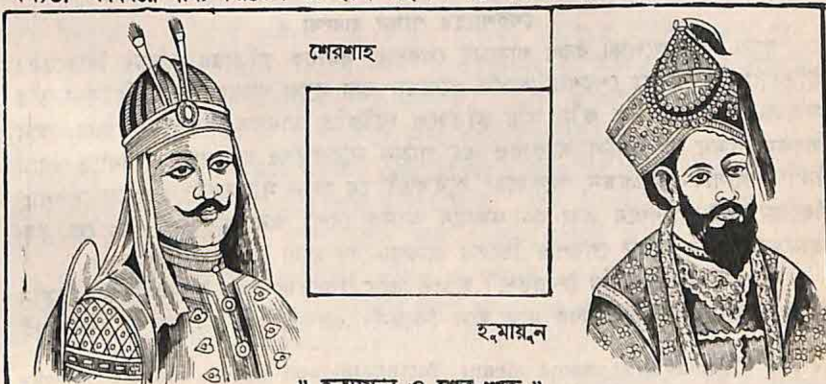
১৫২৬ থেকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ভারতের ইতিহাসকে মূলতঃ ভারতে প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে মোগল—আফগান দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা যায়। পূর্ববর্তী মোঙ্গল আক্রমণ কেবল নব মুসলমানদের বসতি স্থাপন ছাড়া অন্য কোন স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারে নি। তৈমুরের আক্রমণে ভারতে সুলতানী শাসনের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। তৈমুরেরই বংশধর বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের প্রথম অধ্যায় ১৫২৬ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ের মধ্যে বাবর রাজপুত ও আফগাণদের সাময়িকভাবে পদানত করেন।

এই দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫৩০ থেকে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ। এই অধ্যায়ের সূচনায় দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুন। এই অধ্যায়েই আফগান শক্তির পুনরভ্যুদয় ঘটে শের শাহের নেতৃত্বে।

প্রথম দিকে হুমায়ুণ কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা লাভ করেছিলেন। তিনি চুণা-রের আফগান নেতা শের খাঁ এবং জৌনপুরের সুলতান মামুদ লোদীকে পরাজিত করেন। কিন্তু হুমায়ুন ছিলেন নিজেরই সবচেয়ে বড় শত্রু। অলসতা ও তৎপরতার অভাবে তিনি যে প্রাথমিক সাফল্য পেয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ সুফল তিনি ভোগ করতে পারেন নি।

॥ হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহ ॥

হুমায়ুনকে প্রথমেই গুজরাটের আফগান শাসক বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করতে হয়। কারণ তিনি মালব অধিকার করে রাজস্থানের উপর আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হচ্ছিলেন। তাছাড়া তিনি হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য আফ-গান নেতাদের সাহায্য ও আশ্রয় দিচ্ছিলেন। তিনি এক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গোলন্দাজ বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের আক্রমণের ভয়ে বাহাদুর শাহ মাণ্ডু নগরী থেকে পালিয়ে যান। হুমায়ুন অনায়াসে মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। তিনি হৃষ্ট চিত্তে আগ্রায় ফিরে আসেন। আর তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাহাদুর শাহ মালব ও গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন। হুমায়ুন যদি বাহাদুর শাহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতেন তা হলে এই বিপত্তি ঘটতো না।



॥ হুমায়ুন ও শের শাহ ॥

বাবর পানিপথ ও ঘর্ঘরা যুদ্ধে জয়লাভ করে আফগানদের বিধ্বস্ত করতে পারেন নি। বরং আফগাণদের প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার যিনি আফগান শক্তিকে সংহত করে বিদেশী শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে পারেন। শের খাঁ

শূরের মধ্যে তারা পেয়েছিলেন সেই নেতৃত্ব।

যে লোহানী আফগানদের অধীনে শের খাঁ চাকুরী করতেন তাদেরই পরাভূত করে শের খাঁ বিহারে আধিপত্য বিস্তার করেন। যখন গুজরাটে হুমায়ুন ব্যস্ত তখন ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শের খাঁ গৌড় জয় করেন। হুমায়ুন পূর্ব ভারতে অগ্রসর হয়ে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘ ছয়মাস অবরোধ করেও সাফল্য পেলেন না। এর মধ্যে শের খাঁ রোটাক দুর্গ দখল করেন। তখন হুমায়ুন বিহারে সুবিধা করতে না পেরে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। শের খাঁ চাতুর্যের সঙ্গে হুমায়ুনকে প্রতিহত করার চেষ্টা না করে বিহারে মোগল অধিকৃত অঞ্চল, জৌনপুর এবং কনৌজ পর্যন্ত জয় করেন। ফলে হুমায়ুনকে আবার আগ্রার দিকে অগ্রসর হতে হয়। পথিমধ্যে চৌসার যুদ্ধে তিনি শের খাঁর হাতে পর্যুদস্ত হন।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হন। শের খাঁ সহজেই দিল্লী জয় করেন। তিনি শেরশাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। রাজ্যহারা হুমায়ুন তখন আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত। লেনপুল ঠিকই লিখেছেন যে হুমায়ুন শব্দটির অর্থ ভাগ্যবান হলেও অন্য কোন নরপতি এমন অসার্থকনামা ছিলেন না।[১]

॥ শেরশাহের রাজ্য জয় ॥

সিংহাসনে বসার পর শেরশাহ সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গক্কার উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন। এই উপজাতিরা ছিল মোগলদের সমর্থক। এরপর বাংলার শাসনকর্তা খিজির খাঁ বিদ্রোহ করায় শেরশাহ তাকে পদচ্যুত করেন।

তারপর তিনি সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাব জয় করেন। রাজপুত জাতিদের পদানত করতে তিনি মালব আক্রমণ করে মান্ডু, উজ্জয়িনী, রণথমভোর ও গোয়ালিয়র দখল করেন। কিন্তু মারওয়াড়ের অধিপতি মালদের বশ্যতা স্বীকার করলে সমগ্র রাজস্থান শের শাহের অধিকারে আসে।

রাজপুতনা জয়ের পর বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে বারুদের আঘাতে শেরশাহের মৃত্যু হয়।

॥ শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা ॥

রাজ্য জয় অপেক্ষা রাজ্য শাসনেই শেরশাহ সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসে যে অমরত্ব শেরশাহ অর্জন করেছেন তার মূলে রয়েছে শাসক হিসেবে তাঁর সাফল্য। ঐতিহাসিক কীন তাঁর কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানাতে লিখেছেন, অন্য কোন সরকার এমন কি ব্রিটিশ সরকারও এই পাঠান সুলতানের মত দক্ষতা দেখাতে পারে নি।[২] আসকিন বলেছেন, আকবরের পূর্ববর্তী যে কোন সুলতানের তুলনায় শেরশাহ ছিলেন আইন প্রণয়নে এবং জন-কল্যাণে অনেক বেশী অনুপ্রাণিত।[৩] ডঃ কে. কে. কানুনগো মনে করেন শেরশাহ ছিলেন আফগানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসক।

শাসক হিসেবে তিনি স্বৈরতন্ত্রী হলেও তাঁর স্বৈরতন্ত্র ছিল উদারনৈতিক। তিনি নিজেকে জনগণের অভিভাবক বলে মনে করতেন। এজন্যই কুক বলেছেন যে শেরশাহই

১ His (Humayun's) name means 'fortunate' and never was an unlucky soveriegn more miscalled.
—Lane Poole.

২ No government — not even the British has shown so much wisdom as this Pathan.
—Keen.

৩ Sher shah had more the sprit of the legislator and guardian of his people than any prince before Akbar.
—Erskine.

হলেন প্রথম যিনি গণ-সমর্থনের ভিত্তিতেই তাঁর সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[8]

এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে শেরশাহ তাঁর প্রশাসনকে নীতিভিত্তিক করে তুলেছিলেন। সেই নীতি হল ধর্ম নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শাসনকার্যে তিনি কখনো তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেন নি। তিনি জানতেন তাঁর অধিকাংশ প্রজাই হল অ-মুসলমান এবং অ-আফগান। সুতরাং বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে শেরশাহ তাঁর শাসন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেন।

॥ কেন্দ্রিয় শাসন ॥

শাসনের সর্বোচ্চে স্বভাবতঃই ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিল চারজন মন্ত্রী। যেমনঃ অর্থবিভাগ পরিচালনার জন্য দেওয়ান-ই-উজিরাত, সেনাবিভাগ পরিচালনার জন্য দেওয়ান-ই-আরজ, সরকারী নির্দেশাবলী রচনার জন্য দেওয়ান-ই-ইন্‌স এবং চতুর্থজন হলেন দেওয়ান-ই-রিসালাৎ তাছাড়া বিচার বিভাগের জন্য ছিল দেওয়ান-ই-কাজী এবং সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দেওয়ান-ই-বারিদ।

॥ প্রাদেশিক শাসন ॥

শাসনের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার বা ভাগে বিভক্ত করেন। সরকার পরিচালনা করতেন শিকদার-ই-শিকদারোন ও মুন্সিফ-ই-মুন্সিফান নামে দুই কর্মচারী। প্রথম জন শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কাজে আর দ্বিতীয় জন ছিলেন বিচার বিভাগের কাজে নিযুক্ত।

প্রত্যেকটি সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল পরগণার কর্মচারীদের মধ্যে শিকদার, আমিন, মুনসিফ উল্লেখযোগ্য। পরগণার শাসন-বিষয়ে শেরশাহ হস্তক্ষেপ করতেন না। পরগণা গঠিত ছিল কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। গ্রামের শাসনভার স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল।

॥ রাজস্ব সংস্কার ॥

রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রেই শেরশাহ সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সংস্কারের ক্ষেত্রে শেরশাহের লক্ষ্য ছিল একদিকে রাজস্বের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ এবং তার আদায় সুনিশ্চিত করা, অন্যদিকে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা।

এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে শেরশাহ প্রথমে সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করেন। এরই ভিত্তিতে রায়তকে তার স্বত্ব রক্ষার জন্য পাট্টা দেওয়া হত। রায়ত বিনিময়ে কবুলিয়ত বা অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকতো। জমি জরিপের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ধরণের জমির মাপ প্রথা চালু করা হয়।

জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে জমিকে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ অধিক ফসলী জমি, মাঝারি ফসলী জমি, কম ফসলী জমি। ভূমি রাজস্বের হার ছিল এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ। রাজস্ব নগদ অর্থে বা শস্যে দেওয়া যেত।

ভূমি রাজস্ব বিভাগের প্রশাসনিক খরচও রায়তদেরই বহন করতে হত। এজন্য তাদের ফসলের ২½-৫ ভাগ অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হত। তা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে ফসলের ২½% আদায় করা হত।

শেরশাহ ভূমি রাজস্বের নিয়মিত আদায়ের উপর গুরুত্ব দিতেন। এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়কারীদের কমিশন দেওয়া হত। কৃষকদের উপর যেন কোন অন্যায় জুলুম

[8] Sher Shah was the first who attempted to found an empire broadly based upon the people's will.

—Crooke.

না হয় সে বিষয়ে শেরশাহ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা ছিল।

ভূমি রাজস্ব ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শেরশাহ শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নানা অবৈধ শুল্ক তিনি বাতিল করেন। একমাত্র সীমান্ত ও বিক্রয় স্থানেই শুল্ক ধার্য করার রীতি প্রচলিত হয়।

মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারে শেরশাহ দাম নামে এক প্রকার নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি প্রাচীন ও মিশ্রিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেন। স্বর্ণমুদ্রাও প্রচলিত হয়।

॥ বিচার ব্যবস্থা ॥

শেরশাহ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ করা হত না। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল কাজী ও মীর-ই আদল নামক কর্মচারীদের উপর। পঞ্চায়েত হিন্দুদের দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করতো, কিন্তু ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাধারণ বিচারালয়ে যেতে হত। এ সময় দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

॥ পুলিশী ব্যবস্থা ॥

শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য দেশে পুলিশী ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়। স্থানীয় অপরাধের জন্য স্থানীয় মুকাদ্দম দায়ী থাকতেন। পুলিস বিভাগকে সাহায্য করার জন্য ছিল মহতাসিব নামে একদল কর্মচারী।

॥ সেনাবাহিনী ॥

সামরিক বিভাগের সংস্কার করার জন্য শেরশাহ সামন্ত প্রথা বাতিল করে সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন। নানা জাতির সংমিশ্রণে তিনি এক স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সেনাদের আংশিক বেতন, আংশিক জায়গিরদানের রীতি প্রবর্তন করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধানতঃ অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল। বাহিনীর প্রধান এবং অন্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষ-ভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকতো। তিনি আলাউদ্দীন খলজীর অনুকরণে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সামরিক বাহিনীতে বেতনদান ও বদলীর ব্যবস্থা চালু করা হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপন করে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থাও করা হয়।

॥ যোগাযোগ ব্যবস্থা ॥

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শেরশাহ অনেক দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেন। এর মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড সর্বাধিক পরিচিত। পথিকের সুবিধার জন্য রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করা হয়। ডাক চলাচলকে দ্রুত করতে তিনি ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। সাম্রাজ্যের সর্বপ্রকার সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি গুপ্তচর বিভাগ স্থাপন করেন এবং বহু গুপ্তচর নিয়োগ করেন।

তাছাড়া দরিদ্র জনগণের কল্যাণে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। অন্ধ, অশক্ত, বৃদ্ধ ও বিধবাদের জন্য তিনি সরকারী খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের জন্য ছিল সরকারী লঙ্গরখানা।

॥ শেরশাহের মূল্যায়ণ ॥

মধ্য যুগে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন শেরশাহ। ধূমকেতুর মত আকস্মিক তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু সেই আবির্ভাবের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত দিক্‌বিদিক।

যে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন তার সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞান-দীপ্ত স্বৈরাচারের অবশ্যই তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর শাসন-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই ছিল প্রজার কল্যাণ। যে সাধারণ অবস্থা থেকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে তিনি আরোহণ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে ছিলেন শেরশাহ।

অসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন শেরশাহ। যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তিনি তাঁর সেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বার বার। শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর কেন্দ্রীয়করণের নীতি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি তাঁর ধর্ম নিরপেক্ষতা অবশ্যই সাম্রাজ্যকে সংহত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তিনিই তৈরী করে দিয়ে যান।[৫] স্মিথ মনে করেন শেরশাহ আর কিছুকাল জীবিত থাকলে ভারতে মোগল বংশের পুনরাবির্ভাব সম্ভব হত না।[৬]

॥ মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ॥

শেরশাহের মৃত্যুর পরই আফগাণ শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। আরম্ভ হয়ে যায় তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ।

অন্যদিকে হুমায়ুণ পারসিক বাহিনীর সহায়তায় কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। এইবার শেরশাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে হুমায়ুণ লাহোর অবধি অগ্রসর হন। এরপর তিনি সিকন্দর শূরকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। হুমায়ুণ উদ্ধার করেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া সিংহাসন। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল মোগল সাম্রাজ্য।

---

৫ Some scholars have gone sofar as to claim Sher Shah as the virtual founder of the ruture Mughal empire on the ground that he provided the essential administration frame work.

— Percival Spear.

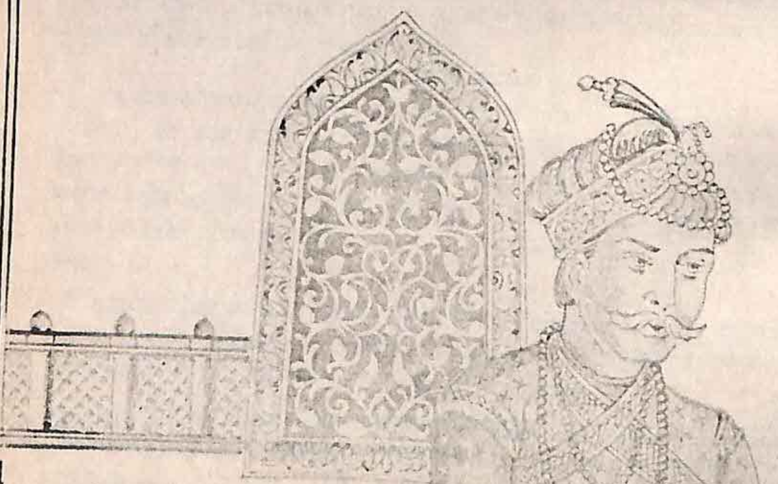
৬ If Sher Shah had been spared, he would have established his dynasty and the Great Mughals would not have appeared on the stage of history. —V. Smith.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Widening of the empire and its consolidation by Akbar—Stress on the methods by which Akbar achieved it—(details of the wars to be omitted)—foundation of a new administrative System—Jagirdari System—revenue System—cultural life: Din-Ilahi—Akbar's court—His building activities.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মোগল সম্রাট আকবর



আকবরের রাজ্যলাভ

ভারতে মোগল শাসনকালের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এই রাজবংশে এমন সব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যে তাঁদের দুর্নিবার আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করা যায় না। ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ার বড় চমৎকার বলেছেন যে এই আকর্ষণ এমনি যে মনে হয় যেন মোগল যুগ হল কেবল অসাধারণ ব্যক্তির জীবন-কাহিনী।[১] এমনি এক ব্যক্তিত্ব হলেন সম্রাট আকবর যিনি পিতা হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর পর একান্তই অপরিণত বয়সে রাজ্যারোহণ করেছিলেন।



আকবর

এটা আকবরের পক্ষে নিতান্তই সৌভাগ্যের যে ত্রয়োদশ বৎসরের অপরিণত বয়সে এবং রাজ্যলাভের সংকটময় মুহূর্তে বৈরাম খাঁর মত একজন যোগ্য ব্যক্তির অভিভাবকত্ব লাভ করেছিলেন। বৈরাম খাঁ মোগল ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন মোগল রাজ পরিবারের প্রতি একান্তই অনুগত। তিনি ছিলেন সুদক্ষ সেনানী এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। চার বৎসর ব্যাপী তাঁরই অভিভাবকত্বে আকবর তাৎক্ষণিক যাবতীয় বাঁধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন এবং তিনি যখন বৈরাম খাঁকে তাঁর অভিভাবকত্ব থেকে বিতাড়িত করেন তখন উত্তর ভারতে তাঁর রাজ্য অনেক সংহত এবং স্থিতিশীল। বৈরাম খাঁই পাণি- পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর নেতৃত্বে আফগান শক্তির পুনরুত্থানের সর্বশেষ প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দেন। তিনিই গোয়ালিয়র ও জৌনপুর পুনরুদ্ধার করেন। কিন্ত জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম যে ভাবে বিসমার্ককে বিতাড়িত করেন ঠিক সেই ভাবে আকবরও বিতাড়িত করেন বৈরাম খাঁকে। তারপরের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের যে ইতিহাস সে ইতিহাস একান্তই আকবরের—এবং তা বড়ই বর্ণাঢ্য।

॥ আকবরের রাজ্যজয়ের নীতি ও পদ্ধতি ॥

আকবরের নেতৃত্বেই অর্ধেকেরও বেশী ভারতের ভৌগোলিক পরিসীমার উপর মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্য জয় কর্তব্য বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর লর্ড ডালহৌসীর মত আকবরও বিশ্বাস করতেন সারা ভারত-বর্ষকে তাঁর অধীনে নিয়ে আসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাধারণ মানুষের মংগল। তবে অন্যদের সঙ্গে আকবরের পার্থক্য হল এই যে অন্যরা যেখানে সামগ্রিক সাফল্য পান নি আকবর তা পেয়েছিলেন। যেমন রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে ডালহৌসী সিপাহী-বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করেছিলেন আকবরের ক্ষেত্রে তা হয় নি। কারণ পার্সিভাল স্পীয়ারের মতে আকবরের ছিল ব্যক্তিত্বের চমক, পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অসীম দক্ষতা এবং নেপোলিয়নের মত দ্রুত গতিবেগ।[২]

রাজ্য জয়ের পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আকবর যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং বাস্তব-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। বলপ্রয়োগ এবং বন্ধুত্ব স্থাপন উভয় পদ্ধতিকে তিনি একই সংগে ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো রাজ্য জয় করেও বিজিতকে তার স্বাতন্ত্র্য

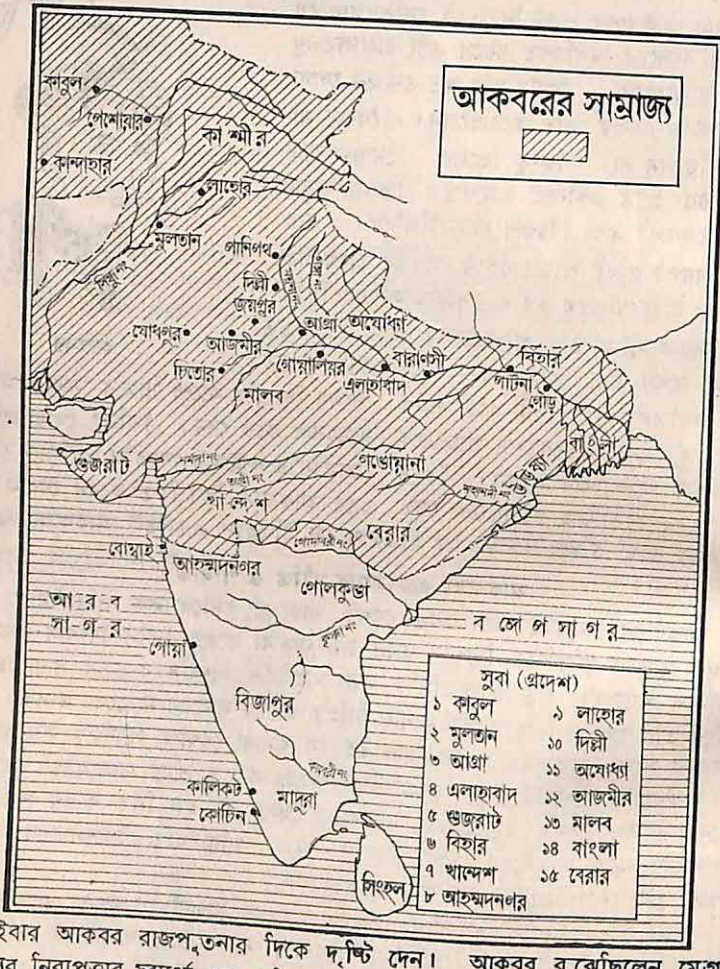
[১] So great is the attraction that one has to beware of treating the the period as a pageant of personalities, as a series of biographies of great men.
—Percival Spear.

[২] He possessed both personal magnetism, the ability to manocuver and to judge situations and the Napoleonic gift of rapid movement.
—Percival Spear.

বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাজপুতজাতি সম্পর্কে অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

॥ আকবরের রাজ্য জয় ॥

আকবরের প্রথম সামরিক অভিযান মালবের বিরুদ্ধে। মালব মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর তিনি গণ্ডোয়ানা জয় করেন। গণ্ডোয়ানার রানী দুর্গাবতী অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেন মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু পরাজয় অনিবার্য জেনে তিনি আত্মহত্যা করেন।



এইবার আকবর রাজপুতনার দিকে দৃষ্টি দেন। আকবর বুঝেছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মোগল আধিপত্য স্থাপনে রাজপুত সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল খুবই জরুরী। তাই তিনি প্রথমে রাজপুতদের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ আনুগত্যলাভের চেষ্টা করেন। তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে জয়পুর, বিকানীর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যের বশ্যতা আদায় করেন।

কিন্তু মেবার ছিল মোগল বিরোধী। অথচ রাজপুত জগতে যেমন মেবারের ছিল পৃথক মর্যাদা, তেমনি গুজরাটের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার প্রয়োজনে মেবারের

ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত আকবরের গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বার বার সামরিক অভিযান প্রেরণ করেও আকবর মেবারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। বিশেষ করে মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ আজীবন আকবরের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে ভারতের ইতিহাসে একজন অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছেন।

এরপর আকবর গুজরাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুজরাট জয় ছিল আকবরের পক্ষে অপরিহার্য। গুজরাটের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আকবর এই রাজ্য জয় করেন। এই জয়ের ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির উপর মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মোগল রাজকোষের আয় বৃদ্ধি ঘটে। এখানকার পর্তুগীজদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মোগল নৌ-শক্তি গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া গুজরাট জয়ের ফলে দাক্ষিণাত্য জয়ের পথ উন্মুক্ত হয়।

এরপর আকবর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা জয় করেন। বাংলার বার ভুঁইঞাদের দমন করতে অবশ্য আকবরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

আকবরের কাবুল জয়ও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কাবুল জয়ের ফলে আকবরের বিরুদ্ধে গোড়া মুসলমানদের বিরোধীতার অবসান ঘটে। আফগানিস্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হয়। এরপর আকবর কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার, বেলুচিস্থান জয় করে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত করেন।

এইবার আকবর দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। তখন ঐ অঞ্চলে চারটি মুসলমান রাজ্য ছিল। যথাঃ আহম্মদনগর, বিজাপুর গোলকুণ্ডা ও খান্দেশ। রাজ্যগুলি ছিল অবিরত পরস্পরের বিরুদ্ধে কলহে লিপ্ত। আকবর প্রথমে এই রাজ্যগুলিকে বশ্যতা স্বীকারে আহবান জানান। আহবানে প্রথম সাড়া দেয় খান্দেশ। আহম্মদ নগরের বিরুদ্ধে বহু কষ্টে আকবর আংশিক সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তীকালে খান্দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং খান্দেশের তথা দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শক্তিশালী দুর্গ অসীরগড় অবরোধ করেন। দুই বৎসর পর ১৬০১ খৃষ্টাব্দে দুর্গটি অধিকৃত হয়। অনেকে বলেন এই দুর্গ দখলে আকবরকে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য এটাই ছিল আকবরের জীবনে শেষ সামরিক অভিযান। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে আকবর কোন সামরিক সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

॥ আকবরের শাসন-ব্যবস্থা ॥

শুধু একজন সাম[illegible] বিদেশী আক্রমণকারী হিসেবে আকবর তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে ভারতীয় জনগণের নেতার পদমর্যাদায় উন্নীত করতে। তিনি জানতেন নেতৃত্বকে কেবল উদ্দীপক হলেই চলে না, নেতৃত্বকে হতে হয় এমনভাবে সৃজনশীল যেন তা ভয়ে নয় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারে।° তাই আকবর সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের নেতার ভূমিকা থেকে সমগ্র হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদিত নেতায় রূপান্তরিত হতে চেয়েছিলেন এক সুবিন্যস্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

শাসক হিসেবে আকবর ছিলেন স্বৈরাচারী। তিনি রাজপদের দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বৈরতন্ত্রী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর স্বৈরতন্ত্র ছিল

উদারনৈতিক, যার মূল লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ।

॥ কেন্দ্রীয় শাসন ॥

সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তিনি ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বি-শেষে জনকল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। শাসনকার্য পরিচালনায় আকবর নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

সম্রাটকে সাহায্য করতে চারটি প্রধান দপ্তরে ছিল চার জন মন্ত্রী। সম্রাটের পরই যার স্থান তিনি হলেন ভকিল বা প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী যেন সর্বশক্তিমান না হতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা হত। তারপর সাম্রাজ্যের রাজস্বের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় থাকতো দেওয়ান বা উজীরের হাতে। সামরিক বিভাগের ভার-প্রাপ্ত সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন মীর বক্সী। রাজপ্রাসাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ তদারক করতেন মীর সামান। আর সদর-উস্-সুদুর ছিলেন ইসলাম ধর্মীয় ব্যাপারাদি ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারোগা-ই-গুসলখানা, যিনি সম্রাটের সচিবের কাজ কর-তেন এবং আরিজ-ই-মুকাবর, যিনি সম্রাটের নির্দেশাবলীর বয়ান প্রস্তুত করতেন।

॥ প্রাদেশিক শাসন ॥

প্রাদেশিক শাসনের সুবিধার জন্য আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবা বা প্রদেশ বিভক্ত করেন। এছাড়া ছিল কিছু স্ব-শাসিত সামন্ত রাজ্য, যেগুলির আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা হত না।

প্রতিটি সুবার শাসনের দায়িত্ব থাকতো সিপাহ-সালার বা সুবাদারের উপর। তিনি সুবার আইন-শৃংখলা, শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতেন। তিনি ফৌজদারী মাম-লার বিচারও করতেন। সম্রাটের নির্দেশাবলী তিনিই প্রয়োগ করতেন। কৃষির উন্নতির দিকে এবং সেনাবাহিনীর শৃংখলার প্রতি তাকে নজর দিতে হত। প্রতি সুবায় রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে থাকতেন দেওয়ান। তিনি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং সুবা-দারের অধীন ছিলেন না। আকবর সুবায় সুবাদার ও দেওয়ানকে সুস্পষ্ট ভাবে ক্ষমতা বন্টন করে সুবার উপর কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখতেন। এই দুই জন ছাড়া সুবায় থাকতেন মীর বক্সী যিনি সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। অন্যান্য কর্মচারীগণ হলেন ওয়াকিয়া নবিশ, ফৌজদার, কাজী দারোগা, কেতোয়াল, মীর বহর ইত্যাদি।

প্রতিটি সুবাকে আবার সরকার বা জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। সরকারের প্রধান ছিলেন ফৌজদার। ফৌজদার ছিলেন একজন সামরিক বিভাগের কর্মচারী। তার দক্ষতার উপরই সরকারের শাসন নির্ভর করতো। সরকারের রাজস্ব বিভাগের ভার-প্রাপ্ত ছিলেন আমাল গুজার। খাজনাদার ছিলেন কোষাধ্যক্ষ।

প্রতিটি সরকার আবার বিভক্ত ছিল পরগণায়। পরগণার প্রধান প্রশাসক ছিলেন শিকদার, যিনি আইন-শৃংখলা, শান্তিরক্ষা, বিচার ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা করতেন। পরগণার রাজস্ব বিভাগ দেখতেন আমিল। আর ফোতেদার ছিলেন পর-গণার কোষাধ্যক্ষ।

॥ রাজস্ব ব্যবস্থা ॥

আকবর রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারের যাবতীয় কৃতিত্ব রাজা টোডরমলের। টোডরমল নির্ধারিত নীতির লক্ষ্য ছিল তিনটি। প্রথমতঃ আবাদী জমির নির্ভুল জরিপ। দ্বিতীয়তঃ বিঘা প্রতি উৎপন্ন শস্যের গড় নির্ণয়। তৃতীয়তঃ সেই অনুসারে বিঘা প্রতি রাজস্বের হার নির্ধারণ।

রাজস্ব সংগ্রহের তিনটি পদ্ধতি চালু করা হয়। প্রথমটি গল্লাবক্স। এই পদ্ধতি অনুসারে শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হত। এই ব্যবস্থা সিন্ধু দেশ, কাশ্মীর ও কাবুলের একাংশে প্রচলিত ছিল।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল জাবৎ। এই পদ্ধতিতে শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা রাজস্ব হিসেবে ধার্য হত। জমির উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন অনুসারে সকল চাষের জমি চার ভাগে বিভক্ত ছিল। যথাঃ পোলজ বা যে জমিতে সারা বৎসর চাষ হত, পরৌটি বা যে জমিতে বছরের কিছু সময় চাষ হত না, চাচর বা যে জমি তিন-চার বছর অনাবাদী থাকতো এবং বানজার যে জমি চার বা পাঁচ বৎসরের অধিক অনাবাদী থাকতো। এইবার প্রতি শ্রেণীর জমির উৎপাদনের গড় হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব স্থির করা হত। জমির উন্নতি হলে রাজস্বেরও পরিবর্তন হত। কৃষক রাজস্ব শস্যে বা নগদে দিতে পারতো। এই ব্যবস্থাকে বলা হত রায়তওয়ারী অর্থাৎ রাজস্বের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই পদ্ধতি মুলতান, গুজরাট, বিহার মালব এবং রাজপুতনার একাংশের প্রচলিত হয়। এই পদ্ধতি প্রচলিত হবার ফলে কৃষকের বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। কারণ কৃষকেরা রাজ-কর্মচারীদের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। রাজস্বের পরিমাণ তাদের অতিরিক্ত মনে হলে পুনরায় জমি জরিপ ও রাজস্ব পুনর্বিবেচনার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করতে পারতো। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বভাবতঃই তাদের রাজস্ব মকুব করা হত।

তৃতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় নস্‌ক। এই ব্যবস্থা জমিদারী প্রথার মত। এক্ষেত্রে জমির মোটামুটি উৎপাদন অনুমান করে রাজস্ব স্থির করা হত। এই ব্যবস্থা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত ছিল।

প্রায় সকল ঐতিহাসিকই আকবরের রাজস্বনীতির প্রশংসা করেছেন। স্মিথ বলেছেন এই নীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।[৪] যদুনাথ সরকার বলেছেন যে এই নীতি সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেছিল।[৫] দু ভাবেই এই নীতি বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। রাজস্বের হার সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়ায় রাষ্ট্র তার বাৎসরিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিল। অন্যদিকে কৃষকের উপর নির্যাতনের সুযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

॥ মনসবদারী প্রথা ॥

আকবরের শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মনসবদারী প্রথা। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথা ছিল আকবরের সামরিক ও বেসামরিক শাসন-কাঠামোর মূল ভিত্তি। পারস্যে এই প্রথা বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, আকবর ঐ প্রথারই অনুকরণ করেছিলেন।

মনসব কথাটির অর্থ হল পদমর্যাদা। ঐতিহাসিক আরভিনের মতে, এই প্রথার লক্ষ্য হল মোগল শাসনে বেতন অনুযায়ী কর্মচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা।[৬] কিন্তু লক্ষ্যণীয় হল এই প্রথার অন্তর্গত সকল পদাধিকারীকেই মনসবদার বলা হত না। কারণ ঐতিহাসিক কুরেশীর মতে সামরিক অর্থেই মনসব কথাটি ব্যবহৃত হলেও এই ব্যবহার ছিল নেহাৎই অলীক।[৭] অলীক এই অর্থে যে এই প্রথার অন্তর্গত সকল কর্মচারীর পক্ষে সামরিক দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক ছিল না।

৪ In short the system was an admirable one. —V. Smith.

৫ The revenue system of Akbar worked well and it took sufficient care of the interests of the people. —J. N. Sarker.

৬ Mansabdar was that measure of status under the Mughal Government which determined a Mansabdar's rank, his salary and his office in the Royal Court. —Irvine.

৭ The mansab was defined in military terms, though the military definition was only a myth or at best a symbol. —Qureshy.

মনসবদারগণ সরাসরি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। পদপ্রার্থীদের সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করতেন মীর বক্‌সী। আবার প্রভাবশালী অভিজাত প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা রাজকুমারদের সুপারিশেও মনসবদার নিয়োগ করা হত। কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্তা ছিলেন স্বয়ং সম্রাট।

মনসবদারদের মধ্যে যারা নগদে বেতন পেতেন তাদের বলা হত মনসবদার-ই-নগদি। যাঁরা জায়গির পেতেন তাঁদের জায়গিরকে বলা হত তনখা জায়গির। এইসব জায়গিরের উপর মনসবদারদের কোন ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। আর যে সব সামন্ত-নৃপতি মনসবদার বংশানুক্রমিক জায়গির ভোগ করতেন তাদের জায়গিরকে বলা হত ওয়াতন জায়গির। মনসবদারদের পক্ষে জামিন দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। সাধারণতঃ মহাজনরাই জামিনদার হতেন। মনসবদার যেন তার জন্য নির্ধারিত অশ্ব ও অশ্বারোহী মোতায়েন রাখেন তার জন্য আকবর দাগ ও বিবরণাত্মক তালিকা রাখার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দাগ বলতে বোঝায় প্রতি অশ্বকে চিহ্নিতকরণ। আর বিবরণাত্মক তালিকা হল প্রতি অশ্বারোহীর পরিচয় বর্ণনা।

মনসবদারদের যুদ্ধে যোগ দিতে হত। তাদের অন্য বে-সামরিক দায়িত্বও পালন করতে হত। উল্লেখযোগ্য হল মনসবদারী বংশানুক্রমিক ছিল না।

আকবরের সুযোগ্য নেতৃত্বে মনসবদারী প্রথা মোগল রাজতন্ত্র তথা রাষ্ট্রশক্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। মোগল শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে মনসবদারী প্রথা কখনো ইউরোপের মধ্য যুগের সামন্ততন্ত্রে পরিণত হতে পারে নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মনসবদারী প্রথাই, যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়েছিল।[৮]

॥ সামরিক বিভাগ ॥

আকবর তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌ-বাহিনী এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন।

বন্দুকধারী, তরবারি যোদ্ধা এবং যুদ্ধের উপকরণ বাহকদের নিয়ে গঠিত ছিল পদাতিক বাহিনী। অশ্বারোহী বাহিনীই ছিল মোগল সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড-স্বরূপ। মোগল গোলন্দাজ বাহিনী বিশেষ দক্ষ ছিল না। এই বাহিনীর অধিকাংশই ছিল বিদেশী। আকবরই প্রথম নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। এছাড়া ছিল হস্তি বাহিনী।

আকবরের সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা কিন্তু ছিল ত্রুটিপূর্ণ। একই যুদ্ধে একাধিক সেনাপতি থাকায় সমন্বয়ের অভাব ঘটতো, তাছাড়া পারস্পরিক ঈর্ষা তো ছিল। নৌ-বাহিনীকেও তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারেন নি। রাজপুত এবং মুসলমান সেনাদের মধ্যে রণকৌশলের পার্থক্যও নানা সংকটের সৃষ্টি করেছিল। আর মোগল বাহিনীতে এত বিলাসের উপকরণ ছিল যে তা ক্ষতিকারক হয়েছিল।

॥ বিচারব্যবস্থা ॥

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তিনিই সকল আইনের উৎস। তিনিই সর্বোচ্চ আদালত।

বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন কাজী। তিনি ইসলামীয় বিধান অনুসারে বিচার করতেন। তাকে সাহায্য করেতেন মুফতি ও মীর-ই-আদল। মুফতি আইন ব্যাখ্যা করতেন। কাজী রায় দিতেন। আর মীর-ই-আদল আইন ঘোষণা করতেন।

৮ Among the causes of the downfall of the Mughal Empire the inefficiency of the Mansabdars was the most important one.

—J. N. Sarker.

ধর্মীয় ও দেওয়ানী বিচার করতেন সদর-উস-সুদুর। রাজনৈতিক ও ফৌজদারী বিচার করতেন সুবাদার। রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করতেন দেওয়ান। সুবা-দার ও দেওয়ানে বিরোধ হলে তার মীমাংসা করতেন সম্রাট স্বয়ং।

দণ্ডবিধি ছিল কঠোর। মৃত্যুদণ্ড দানের ক্ষমতা ছিল একমাত্র সম্রাটের।

॥ মুদ্রা সংস্কার ॥

বিভিন্ন প্রাদেশিক টাকশালে আকবর কেন্দ্রিয় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রৌপ্যের সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন করেন।

॥ আকবরের শাসনের স্বরূপ ॥

আকবরের শাসন ব্যবস্থাকে যদুনাথ সরকার ভারতীয় পরিস্থিতিতে পারসিক ও আরবীয় পদ্ধতির মিশ্রণ বলে অভিহিত করেছেন।[৯] অর্থাৎ ভারতীয় কাঠামোয় তিনি পারসিক ও আরবীয় শাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ করেছিলেন।

আকবরের শাসন ব্যবস্থার মূল চরিত্র ছিল সামরিক। প্রধানতঃ সামরিক কর্ম-চারীদের বেসামরিক দায়িত্বও পালন করতে হত। অবশ্য ইরফান হাবিব এই মতের বিরোধিতা করেন।

আকবর স্বৈরতন্ত্রী হলেও তাঁর স্বৈরতন্ত্র ছিল উদার। জনকল্যাণই তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্য। এজন্যই তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমদর্শিতার নীতি অনুসরণ করতেন। অধ্যাপক শর্মার মতে, শাসক হিসেবে আকবরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে নৈকট্যে আনতে পেরেছিলেন।[১০]

॥ আকবরের ধর্মীয় নীতি ॥

ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে আকবরই ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উদার। ষোড়শ শতাব্দী ছিল অনুসন্ধিৎসার যুগ। আকবর যেন ছিলেন সেই যুগের মূর্ত প্রতীক। এই সময় বিভিন্ন সাধু-সন্তগণ ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে যে ধর্মীয় সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন আকবর যেন ছিলেন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সেই বাণীরই উদ্গাতা। প্রশাসন ব্যবস্থাকে একান্ত আন্তরিকভাবে সর্বপ্রকার ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে আকবর ছিলেন সযত্ন প্রয়াসী। তাঁর এই মানসিকতার মধ্যে অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এবং অনুসন্ধিৎসাও যে ছিল অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পিতা-মাতার সূত্রে আকবরের ধমনীতে বহমান ছিল উদার সুফী মতবাদের শোণিত প্রবাহ। তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক আবদুল লতিফ এবং পরবর্তীকালে তাঁর অভি-ভাবক বৈরাম খাঁও তাঁকে উদার মতবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সমসাময়িক উদার ধর্মীয় আন্দোলনও নিশ্চয়ই আকবরকে প্রভাবিত করেছিল। সম্রাট আকবরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আবুল ফজল ও ফৈজী যারা উভয়েই ছিলেন উদার মতাবলম্বী। রাজপুত পরিবারের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কও আকবরকে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া তাঁর সীমাহীন জ্ঞান তৃষ্ণাও তাঁকে অজানাকে জানতে আগ্রহী করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে উলেমাদের ধর্মীয় অন্ধত্ব তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করেছিল। সর্বোপরি রাজনীতিবিদ আকবর ভারতবর্ষের মত দেশের সম্রাট হতে গিয়ে উদারনীতি গ্রহণের রাজনৈতিক

৯ It was Perso-Arabic system in Indian setting. —J. N. Sarkar.

১০ Amongst the greatest rulers of India Akbar occupies the unique position, because apart from other things he did, he tried very successfully in bringing together the Hindus and the Muhammedans in this country. —Prof. S. R. Sarma.

অপরিহার্যতাকে কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। সেই অপরিহার্যতা হল হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে মুসলমান আকবরকে জাতীয় সম্রাটের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে হলে ধর্মীয় বিষয়ে উদার নীতি গ্রহণ ব্যাতীত গত্যন্তর ছিল না।

আকবরের ধর্মীয় চিন্তাধারা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিঃসন্দেহে গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি ইসলামীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। এমন কি তিনি আজমীঢ়ে তীর্থ যাত্রাও করেছিলেন। কিন্তু এরপর থেকেই তাঁর পরিবর্তন আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ তিনি উলেমাদের ধর্মীয় মতান্ধতায় বিরক্ত বোধ করতে থাকেন। কিন্তু তাহলেও তিনি মানসিক সংশয় ও সংকটকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। ধর্ম সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন তাঁর মনকে পীড়িত করছিল।

এই সংশয় থেকে অব্যাহতি পেতেই তিনি ফতেপুরসিক্রির ইবাদখানায় নিয়মিত ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করেন। এই আলোচনায় সকল ধর্মের প্রবক্তাদেরই অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হত। আর সকল আলোচনায় আকবর একজন আন্তরিক জ্ঞান-ভিক্ষুর মত অংশ নিতেন। এই সব আলোচনা থেকে ধর্মীয় বিষয়ে অসহিষ্ণু মনোভাব সম্পর্কে একেবারেই বিরূপ হয়ে যান আকবর। সুতরাং ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি আকবরের সম্পূর্ণ হয়।

এই প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া গেল ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে। আবুল ফজল ও ফৈজীর পিতা শেখ মোবারকের পরামর্শক্রমে তিনি এক ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণাপত্রকে ভিনসেন্ট স্মিথ Infallibility Decree বা অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা বলে অভিহিত করেছেন। এই ঘোষণাপত্রকে আকবরের সমসাময়িক ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের Act of Supremacy-র সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ফতেপুরসিক্রি মসজিদের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন আকবর স্বয়ং। তিনি নিজেকে ধর্মীয় ব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন করেন। ফৈজী রচিত স্তোত্র ধর্মীয় উপাসনাকালে পঠিত হত। এই স্তোত্রের শেষ কথা হল আল্লাহু আকবর অর্থাৎ ঈশ্বর মহান আর আকবরই ঈশ্বর। সম্পূর্ণ মুসলমান প্রথা ও ঐতিহ্য বিরোধী এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন আকবর ধর্মীয় ক্ষেত্রে।

॥ দীন-ই-ইলাহী ॥

আকবরের ধর্মীয় মতবাদের বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ হল দীন-ই-ইলাহী নামে এক নতুন ধর্মমত। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আকবর এই ধর্মমতের প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে দীন-ই-ইলাহী নতুন কোন ধর্মমত নয়। বলা যেতে পারে সকল ধর্মের সার সংকলন। উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ধর্মীয় কারণে ভেদাভেদ দূরীকরণ। আকবর চেয়েছিলেন এমন এক জাতীয় ধর্মের সৃষ্টি করতে যার আচ্ছাদনতলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থান হতে পারে অনায়াসে এবং সাবলীলভাবে। এই ধর্মের মূলকথা হল নিরামিষ ভোজন, দান-ধর্ম পালন, পরস্পরকে 'আল্লাহু আকবর' সম্বোধন দ্বারা সম্ভাষণ এবং সম্রাটের জন্য ধন-মান-প্রাণ বিসর্জন।

এই ধর্মমত নিয়ে ঐতিহাসিকদের নানা বিতর্ক। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন দীন-ই-ইলাহী হল আকবরের প্রচন্ড অহংবোধ এবং সীমাহীন স্বৈরাচারের বহিঃপ্রকাশ।[১১] অধ্যাপক শর্মা বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এক ধর্মীয় সমন্বয়সাধনের প্রয়াস হল দীন-ই-ইলাহী।[১২] লেন পুল ও হলভেন এই অভিমতেরই সমর্থক। ডঃ মাখনলাল

১১ The whole scheme was the outcome of ridiculous vanity, a monstrous growth of unrestrained autocracy. —V. Smith.

১২ Din-i-Ilahi was an experiment of religious synthesis with political aim. —Prof. S. R. Sarma.

রায়চৌধুরীর মতে দীন-ই-ইলাহী পৃথক কোন ধর্মমত নয়, সুফী মতবাদেরই একটি রূপ।[১৩] ম্যালসন বলেন, আকবর জাতীয় সম্রাট হিসেবে জাতীয় ধর্ম চেয়েছিলেন আর তাই তিনি প্রবর্তন করেন দীন-ই-ইলাহী মতবাদ।[১৪] ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, ভারতের দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যই আকবর দীন-ই-ইলাহী মতবাদ প্রচলন করেন।[১৫]

ভিনসেন্ট স্মিথ দীন-ই-ইলাহীকে আকবরের মূর্খামির পরিচায়ক বলে মনে করলেও মনে রাখতে হবে আকবর ধর্ম প্রচারক ছিলেন না, কিংবা তিনি কাউকে এই ধর্ম গ্রহণে বাধ্যও করেন নি। আসলে আকবরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য-সাধন। এই ঐক্য কেবল রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে আসতে পারে না, চেতনাগত ঐক্যের জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় বন্ধন। তাই আকবরের দীন-ই-ইলাহী মতবাদের প্রচার। এই মতবাদের প্রাণশক্তিই হল পরমত সহিষ্ণুতা। সুতরাং জার্মান ঐতিহাসিক ভনেনোরের ভাষাতেই আমাদের বলতে হয় দীন-ই-ইলাহী আকবরকে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী হিসেবে চিরকাল নিশ্চিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।[১৬]

॥ আকবরের রাজসভা ॥

ইতিহাসে আকবরের যে অমরত্বের আসন তা তাঁর একক কৃতিত্বের ফলশ্রুতি নয়। বরং আকবর পেয়েছিলেন এমন একদল সুদক্ষ প্রশাসক যারা তাঁর সকল কর্মপ্রয়াসকে সাফল্যের পথে উত্তীর্ণ করেছিল। তবে এক্ষেত্রেও আকবরের কৃতিত্ব হল এই প্রশাসক-মন্ডলীর স্রষ্টাও ছিলেন তিনি।

আকবর চিরাচরিত আমীর-ওমরাহ বা অভিজাত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বরং তিনি নিজে এক পৃথক অভিজাত শ্রেণী তৈরী করে নিয়েছিলেন, যারা তাঁর অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমলাতন্ত্রে পরিণতি লাভ করেছিল।

যে অভিজাত শ্রেণী আকবর গঠন করেন সেখানে বংশানুগতির দাবী সর্বাগ্রে বিবেচিত হত। এদের মধ্যে ছিল মনসবদারদের পুত্র ও বংশধরগণ, জমিদার, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি। জন্মগত কৌলিন্য না থাকলেও যোগ্যতা বলে কেউ কেউ মোগল অভিজাতের মর্যাদাও লাভ করেছেন। যেমন টোডর-মল।

আকবরের আগে অভিজাতদের কোন সুনির্দিষ্ট সংগঠন ছিল না। আবার সেখানে হিন্দুদের কোন স্থান ছিল না। আকবর মনসবদারী প্রথার সাহায্যে অভিজাত শ্রেণীকে সুসংগঠিত করেন। শুধু তাই নয়। তিনি এদের রাজশক্তির বেতনভোগী ভৃত্যে পরিণত করেন। সুতরাং বলা যায় এই অভিজাত শ্রেণী হল আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ। তাছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত অভিজাত শ্রেণীকে সংহত করে সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তিকেই সুদৃঢ় করতে পেরেছিলেন। আকবরের মানবতাবোধ ও মহানুভবতা, তাঁর আদর্শবোধ ও ব্যক্তিত্বের মহিমা এবং সর্বোপরি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর

১৩ Din-i-Ilahi was not a proselytising creed, but was only a Sufi order.
—Dr. M. L. Roy Choudhury.

১৪ The primary object of Akbar in founding Din-i-Ilahi was to set up a national religion under a national king. —Col. Malleson.

১৫ Akbar did not set up Din-i-Ilali for the purposes of starting a new religion, but with a view to bringing about a new synthesis of warring religious sects in the country. —Dr. Ishwari Prasad.

১৬ One of his creations will assure to him for all time a pre-eminent place among the benefactors of humanity — Greatness and universal tolerance in matter of religion. —Von Noer.

ধারাবাহিক অসাধারণ সাফল্য ক্রমশঃ অভিজাতদের আনুগত্য অর্জন করেছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল এক সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যের। তাঁর অভিজাত সম্প্রদায়ে বিভিন্ন জাতিকে সমবেত করার উদ্দেশ্যই ছিল প্রমাণ করা যে তিনি বিশেষ কোন জাতি বা গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল নহেন। এই জন্যই রাজপুত বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। আবার সেই সঙ্গে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বকীয়তা আকবর অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

এক নতুন শাসক গোষ্ঠী সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আকবর যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এই অভিজাত শ্রেণীর গঠনই যেন হয়ে উঠেছিল সারা ভারতের প্রতিচ্ছবি। আর এদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ও সমর্থনে আকবর যে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তার আয়ুষ্কাল ছিল সার্ধশত বর্ষাধিক কাল। এই বাস্তব ঘটনা আকবরের সাফল্যের যথেষ্ট পরিমাপক।

॥ আকবরের স্থাপত্য ॥

স্থাপত্য শিল্পকলা কৌশলের নান্দনিক উৎকর্ষে যে মোগল যুগের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী তারও প্রধান পুরুষ সম্রাট আকবর। সমন্বয়বাদী আকবর স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির অনবদ্য সমন্বয়সাধন করে এক অভিনব শিল্পরীতির জন্মদান করেন।

স্থাপত্য শিল্পে আকবর ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। আবুল ফজল জানাচ্ছেন যে আকবর বিশালাকার প্রাসাদের পরিকল্পনা করতেন, মাটি আর পাথরে সেই পরিকল্পনাকে তিনি বাস্তব করে তুলতেন।[১৭] তিনি হুমায়ুনের যে সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন তা মর্মর প্রস্তরে প্রস্তুত। এই সৌধে পারসিক রীতির সঙ্গে ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। আকবর ফতেপুরসিক্রিতে যে রাজধানী নির্মাণ করেন তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেন পুল বলেছেন এই পরিত্যক্ত শহর ছাড়া ভারতে আর কোন দুঃখজনক অথচ সুন্দর শহর আর নেই, ফতেপুরসিক্রি যেন এক উধাও স্বপ্নের নীরব সাক্ষী।[১৮] ফারগুসন বলেছেন ফতেপুরসিক্রি যেন এক মহৎ প্রাণের প্রতিবিম্ব। সম্পূর্ণ লাল পাথরে নির্মিত এই শহর এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে। ফতেপুরে গুজরাট জয়ের স্মারক হিসেবে নির্মিত বুলন্দ দরওয়াজা ভারতের সর্বোচ্চ তোরণ। এখানেই আছে আকবরের প্রিয় সন্ত সেলিম চিস্তির মার্বেল পাথর নির্মিত সমাধি। এখানকার অন্যান্য বিখ্যাত সৌধগুলি হল পঞ্চ মহল, ইবাদৎখানা, দেওয়ান-ই-খাস, বীরবলের গৃহ, জামা মসজিদ প্রভৃতি। ভিনসেন্ট স্মিথ ফতেপুরসিক্রিকে এক পাথরে নির্মিত স্বপ্ন বলে বর্ণনা করেছেন। আগ্রা দুর্গে আবার আকবর যে জাহাঙ্গীর মহল নির্মাণ করেন সেখানে হিন্দু রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সেকেন্দ্রাতে আকবর নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। অনেকে এই সৌধে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ রীতি খুঁজে পেয়েছেন। ফার্গুসন আবার এই সৌধের সঙ্গে মহাবলীপুরমের রথের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

---

১৭ His Majesty plans splendid edifices and dressess the work of his mind in the garment of stone and clay. —Abul Fazl

১৮ Nothing sadder or more beautigul exist in Indi[illegible] tnan deserted city—the silent witness of a vanished dream. —Lane Poole.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Jahangir and Shahjahan—an assessment as rulers—particular stress on their patronage to art and architecture—their policy towards European traders.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

জাহাঙ্গীরের শাসনকাল—ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ও জাহাঙ্গীর—পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্পর্ক—ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক—শিল্পরসিক জাহাঙ্গীর—শাহজাহানের রাজত্বকাল—ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ও শাহজাহান—শিল্প স্রষ্টা শাহজাহান।

চর্তুদশ অধ্যায়

জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের শাসনকাল



জাহাঙ্গীরের শাসনকাল

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে মোগল সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে ডঃ শ্রীবাস্তব লিখেছেন জাহাঙ্গীর সামগ্রিকভাবে একজন সফল শাসক ছিলেন। তিনি পরিস্থিতি ও তার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই তিনি পিতার উদারনীতিকেই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি একজন সৃজনশীল রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন না। তাই ব্যাপক কোন প্রশাসনিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পৈত্রিক উত্তরাধিকারসূত্রে জাহাঙ্গীর যে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন কেবল কান্দহার বাদ দিয়ে তিনি তা অক্ষুণ্ণ রাখেন। কান্দাহার মোগল হস্তচ্যুত হয়ে পারসিকগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে জাহাঙ্গীর মোগল প্রাধান্যকে আকবরের তুলনায় দৃঢ়তর করতে পেয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের চেষ্টাকে তিনি ব্যর্থ করে দেন। রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর অধিকতর সাফল্য না পেলেও ব্যর্থতার পরিচয় দেন নি।

শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীর আকবরের উদার নীতিকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই রাজপুত জাতির সহযোগিতা থেকে তিনি কখনো বঞ্চিত হন নি। বিভিন্ন রাজকীয় সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই গ্রহণ করতেন। এতটাই ছিলেন তিনি আত্মবিশ্বাসী। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার সাধনের কাজও তিনি করেছিলেন। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্তঃশুল্ক বাতিল, মদ্যপান রোধ ইত্যাদি। সুবিচার এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস প্রবাদতুল্য। যে কোন অবিচার, অন্যায়ের অভিযোগ পেলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজে হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁর দীর্ঘ বাইশ বৎসরের শাসনকাল ছিল শান্তি ও শৃংখলাপূর্ণ। এমন কি সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাকে কখনো বিঘ্নিত করে নি।

ডঃ স্মিথ তাঁর শাসনকালকে অগৌরবের কাল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা যুক্তিযুক্ত নয়। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই জাহাঙ্গীর ব্যর্থতার পরিচয় দেন নি। ধর্মীয় বিষয়েও তিনি ছিলেন যথেষ্ট উদার মনোভাবাপন্ন। তাঁর চারিত্রিক দোষাবলীর মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যধিক পানাসক্ত, আরামপ্রিয় এবং পত্নী নূরজাহানের প্রতি অতিরিক্ত দুর্বল। অস্বীকার করা যায় না তাঁর এই ব্যক্তিগত বিচ্যুতি তাঁর শাসকসত্তার উপর প্রতিফলন ফেলেছিল। তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে অযৌক্তিক ও অসংগত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

॥ ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ও জাহাঙ্গীর ॥



ইউরোপের বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সম্পর্কই ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসকে এক ভিন্ন গতিপথে আবর্তিত করেছে।

তখন ভারতে ইউরোপ থেকে এসে পৌঁছেছে পর্তুগীজ ও ইংরেজগণ। বাণিজ্যিক অধিকার নিয়ে তাদের পারস্পরিক কলহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

॥ পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্পর্ক ॥

প্রথমদিকে পর্তুগীজদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের যথেষ্ট

সুসম্পর্ক ছিল। তাদেরই প্ররোচনায় জাহাঙ্গীর হকিন্সের দৌত্যের ফলে ইংরেজদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে- ছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু এই সম্পর্ক দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল না ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ চারটি পণ্য বোঝাই মোগল জাহাজ লুঠ করলে জাহাঙ্গীর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের কুঠি দমন আক্রমণ করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র পর্তুগীজদের আটক করা হয়। তাদের ধর্মপ্রচার বন্ধ করা হয়। গীর্জাগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। র্তুগীজদের এই দুর্গতির সময়েই আরেক ইংরাজ উইলিয়ম এডওয়ার্ডস ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন। পর্তুগীজদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ইংরেজদের দাঁড় করাতে জাহাঙ্গীর বিশেষ সমাদরের সঙ্গে এডওয়ার্ডসকে গ্রহণ করেন।

॥ ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক ॥

ভারতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তখন ইংরেজদের সম্মুখে দুটি প্রবল বাধা ছিল। প্রথমটি ভারতের রাজন্যবর্গের উপর পর্তুগীজদের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় ভারতে ইংরেজ-বাণিজ্য নিরাপত্তার অভাবে ভুগছিল। দ্বিতীয়টি ভারতীয় আইন ও শুল্ক মেনে নিলে ইংরেজ-দের বাণিজ্যিক লাভ হত খুবই কম। সুতরাং জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার ক্ষেত্রে ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল পর্তুগীজ প্রাধান্য খর্ব করা এবং ভারতীয় আইন ও শুল্ক থেকে অব্যাহতি লাভ।

বিশেষ করে এই সময়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ছিল খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। কেননা ভারতের সুতী কাপড়, রেশম, গন্ধক নীল প্রভৃতি দ্রব্যের চাহিদা ছিল ইউরোপের বাজারে যথেষ্ট।

তাই ইংরেজরা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করে। হকিন্স ও এডওয়ার্ডসের দৌত্য ছিল বেসরকারী। তাদের দৌত্যের ফলে অন্ততঃ ভবিষ্যতের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়। ফলে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম জেমসের সরকারী দূত হিসেবে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন স্যার টমাস রো। রো ছিলেন শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান এবং দক্ষ কূটনীতিবিদ। তিনি মোগল দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু পর্তুগীজ ও অন্যান্যদের প্রবল বিরোধীতার ফলে টমাস রো তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সুবিধাগুলি সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন নি। না পারলেও মোগল সম্রাট ইংরেজদের সুরাট কুঠি স্থাপন করতে এবং অবাধে বাণিজ্য করতে অধিকার দেন, সেখানে ইংরেজদের মালের উপর আমদানী শুল্ক রদ করা হয়। তারা অন্যত্র কুঠি স্থাপন করার অধিকারও পায়। এমন কি তাদের ইংলন্ডের আইন অনুসারে বিচার করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। সুতরাং এই সব সুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে টমাস রোর দৌত্য থেকেই ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা।

॥ শিল্পরসিক জাহাঙ্গীর ॥

জাহাঙ্গীর ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতমনা। সুতরাং তাঁর পক্ষে শিল্পকলার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হওয়াই স্বাভাবিক। স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা চিত্রশিল্পেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী।

তাঁর শাসনকালেই সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধ নির্মাণ সমাপ্ত হয়। তাঁর সময়েই আগ্রার সন্নিকটে নির্মিত হয় ইতিমদদৌল্লার সমাধি-মন্দির। তাছাড়া লাহোরে তিনি যে মসজিদ নির্মাণ করেন তাঁর চমৎকারীত্ব দিল্লীতে নির্মিত শাহজাহানের মসজিদ অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়।

প্রকৃতি প্রেমিক জাহাঙ্গীর উদ্যান চর্চাতেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। লাহোরের দিলখুসা উদ্যান, কাশ্মীরের নিশাত ও শালিমার উদ্যান, উদয়পুরের উদ্যান জাহাঙ্গীরের উদ্যান প্রীতি ও উদ্যান চর্চার উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রতিকৃতি অংকনে জাহাঙ্গীর এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। এই সময়ের বিখ্যাত প্রতিকৃতি শিল্পীরা হলেন ওস্তাদ মনসুর, আবুল হাসান ও বিষেণ দাস। জাহাঙ্গীর নিজে ছিলেন উচ্চমানের চিত্রশিল্পী। আকবর কর্তৃক স্থাপিত কলাশিল্প বিদ্যালয়কে জাহাঙ্গীর বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এ সময়ের চিত্রশিল্প সম্পর্কে ক্যাট্রন বলেছেন যে এ সময়ের ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপীয় ছবি এমন সুন্দর অনুকরণ করতে পারতেন আসল ছবিই তার পাশে ম্লান হয়ে যায়।[২]

জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন যথার্থ সংগীতপ্রেমী। তাঁর দরবারে জাহাঙ্গীর দাদ, চতর খাঁ, পরভীন দাদ, খুররম দাদ প্রভৃতি গুণী সংগীত শিল্পীগণ অলংকৃত করতেন। এছাড়া জাহাঙ্গীর অলংকার শিল্প, মৃৎ শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতি শিল্পচর্চাতেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

॥ শাহজাহানের রাজত্বকাল ॥

জাহাঙ্গীরের পর তাঁর পুত্র শাহজাহান মোগল সিংহাসনে বসেন। কোন কোন ঐতিহাসিক শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল শাসনাধীন ভারতের সুবর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের চরম অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।[৩]

সাম্রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে আকবর ও জাহাঙ্গীর যে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি শাহজাহান তা পেরে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রাধান্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগলশক্তির কাছে পদানত হয়। আহমদনগর প্রত্যক্ষভাবে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পর্তুগীজদের ঔদ্ধত্য দমন করতে তিনি তাদের হুগলী থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। আসামের অহোমদের পরাজিত করে কামরূপের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। সুতরাং সাম্রাজ্য বিজেতা হিসেবে শাহজাহান যে মোগল শক্তিকে অধিকতর বিস্তৃত করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।


শাহজাহান

শাসক হিসেবেও শাহজাহান যথেষ্ট সফল। প্রজাদের প্রতি তাঁর মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ট্যাভার নিয়ে লিখেছেন পিতাসুলভ দৃষ্টিভংগী নিয়ে তিনি দেশ শাসন করতেন।[৪] যদুনাথ সরকার লিখেছেন শাসক হিসেবে শাহজাহান ছিলেন খুবই পরিশ্রমী এবং প্রজার মঙ্গলসাধনে তৎপর।[৫] লেন পুলের মতে শাহজাহানের দয়া-

২ There were found in India native painters who copied the finest of our European pictures with a fidelity that might vie with the originals. —Caton.

৩ Shah Jahan's reign marks the climax of the Mughal dynasty and empire. —V. Smith.

৪ Shah Jahan reigned not so much as a King over his subjects, but rather as a father over his family and children. —Tavernier.

৫ He was hard worked ruler, always ready to do what he could for the welfare of his subjects. —J. N. Sarker.

দাক্ষিণ্য ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। কাফী খাঁও শাহাজাহানের শাসন দক্ষতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। ইটালীয় পর্যটক মানুচি শাহজাহানের নিরপেক্ষ বিচারের কথা বলেছেন।

কোন সন্দেহ নেই শাহজাহান তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন। প্রদেশ থেকে অনেক বেশী পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হওয়ায় সাম্রাজ্যের সামগ্রিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তৎপর। জনগণের অভিযোগ দূরীকরণে তিনি ছিলেন সদাসতর্ক। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে একদিকে রাজকোষ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছিল তেমনি অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্প ও স্থাপত্যে শাহজাহানের রাজত্বকাল তো প্রবাদে পরিণত। জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। বিখ্যাত যমুনা খাল ছাড়াও কৃষির উন্নতির জন্য তিনি অনেক খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এ সময় জনকল্যাণমূলক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা উচ্চহারে মজুরী পেতেন, তাদের যথেষ্ট আর্থিক স্বাচ্ছন্দ এসেছিল।

কিন্তু প্রধানতঃ স্মিথ মনে করেন শাহজাহানের শাসন-পদ্ধতিই মোগল-বিপর্যয়ের সূচনা করে। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে শাহাজাহান যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন তা তিনি বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বর প্রকাশে ব্যয় করে ফেলেন। ফলে তাঁকে ভূমি রাজস্ব বাড়াতে হয়। এই বৃদ্ধির চাপ পড়ে কৃষকদের উপর। তাঁর রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগণ ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। তাই কৃষকদের উপর চাপ আরও বাড়ে। বার্ণিয়ে কৃষকদের দূরবস্থার কথা লিখেছেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তখনকার পরিস্থিতির পরিচায়ক। নিরুপায় শাহজাহানকে পুনরায় জায়গীরদান প্রথায় ফিরে যেতে হয়।

শাহজাহানের সামরিক সাফল্যও খুব চমকপ্রদ নয়। তিনি কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বার বার করেও ব্যর্থ হন। ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। বৈদেশিক আক্রমণের আশংকা আবার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তাঁর মধ্য এশিয়া নীতি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। সামরিক অসাফল্যের এই নীতি যেমন আর্থিক অপচয় ঘটিয়েছিল তেমনি তা ছিল মোগল মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকারক।

শাহজাহান আকবরের উদার ও সমন্বয়বাদী ধর্মীয় নীতি থেকেও বিচ্যুত হন। ফলে পরবর্তীকালের জন্য এক বিপজ্জনক পটভূমিকা তিনিই সৃষ্টি করে যান। তাঁর শাসননীতির ফলে দক্ষিণে মারাঠা জাতির উদ্ভবের পথ প্রশস্ত হয়। সুতরাং সন্দেহ নেই শাহজাহানের শাসনকালেই মোগল সাম্রাজ্যে ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের বীজ রোপিত হয়।

॥ ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ও শাহজাহান ॥

জাহাঙ্গীরের সময় পর্তুগীজগণ অনেক সুযোগসুবিধা ভোগ করতো ক্রমশঃ তারা সেই সব সুবিধার অপব্যবহার আরম্ভ করে। বাংলায় হুগলীতে তারা বেআইনীভাবে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে। স্থানীয় লোকদের উপর উৎপীড়ন করে তারা অর্থ আদায় করতো। গঙ্গায় মালচলাচলের উপর তারা শুল্ক আদায় করতো। ফলে মোগল-রাজস্বের ক্ষতি হত। তারা মোগল-আইনকেও গ্রাহ্য করতো না। গুজরাটেও তারা অত্যাচার করছিল। জোর করে ধর্মান্তরিত করা ছাড়া তাদের জলদস্যুতা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। তাদের ঔদ্ধত্য এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা মমতাজ মহলের দুই ক্রীতদাসীকে আটক করে।

শাহজাহান এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে বাংলার সুবেদার কাসেম খাঁকে পর্তুগীজদের

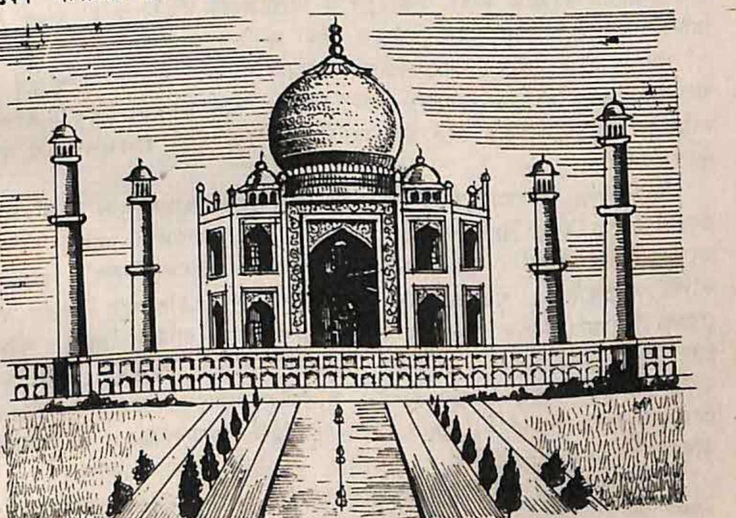
বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে নির্দেশ দেন। কাসেম খাঁ ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে একই সঙ্গে হুগলী ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের আক্রমণ করেন। সাড়ে তিন মাস অবরোধের পর হুগলীর পতন ঘটে। যুদ্ধে বহু পর্তুগীজদের মৃত্যু হয়। প্রচুর পর্তুগীজ যুদ্ধবন্দী আগ্রায় প্রেরিত হয়।

তুলনামূলকভাবে ইংরেজদের সঙ্গে শাহজাহানের সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাদের হুগলীতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। ঐ একই বৎসরে বাংলার সুবাদার সুজা ইংরেজদের বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে অন্তঃশুল্ক আদায়ের অধিকার দেন।

॥ শিল্প স্রষ্টা শাহজাহান ॥

প্রাসাদ নির্মাণে শাহজাহান অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেন। মোগল রাজসভার যা কিছু জাঁক-জমক, আড়ম্বর, স্থাপত্যশিল্পে মোগল যুগে সৃষ্ট যা কিছু বিস্ময় সবই শাহজাহানের অবদান। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান। তিনি তাঁর পূর্ব সূরীদের অনুসৃত রীতি থেকে সরে এসে পৃথক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আকবর ও জাহাঙ্গীর যেখানে হিন্দু ও মুসলমান রীতির মিশ্রিত স্থাপত্য শিল্পে আগ্রহী ছিলেন শাহজাহান সে রীতি পরিত্যাগ করেন। পূর্ববর্তী স্থাপত্য যেখানে ছিল বিশালকার সেখানে শাহজাহান স্থাপত্য শিল্পে সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই শাহজাহান নির্মিত প্রাসাদে দেখা যায় নানা রঙ্গের সমাহার এবং নানা মূল্যবান পাথরের যথেচ্ছ ব্যবহার।
রঙ্গের সমাহার এবং নানা মূল্যবান পাথরের যথেচ্ছ ব্যবহার। পূর্ববর্তীরা যেখানে মর্মর প্রস্তরকেই তাঁর স্থাপত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।

শাহজাহান নির্মিত প্রাসাদগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হল তাজমহল। তাজমহল যেন আমাদের রোমান্টিক মনের শাশ্বত প্রতিমূর্তি। পত্নী মমতাজ মহলের



তাজমহল

স্মৃতিকে আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে নির্মিত এই প্রাসাদ সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরে নির্মিত। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য হিসেবে এই স্মৃতি-সৌধ পরিগণিত।

আগ্রা দুর্গে শাহজাহান নির্মিত মোতি মসজিদ মুক্তা ও শ্বেত পাথরের যেন আরেক কবিতা। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট উপাসনাগৃহ হিসেবে এই মসজিদ পরিচিত। আগ্রা দুর্গেই তিনি নির্মাণ করেন মুসম্মান বুর্জ, ঝারোখা দর্শন, দৌলত খানা-ই-খাস। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাহজাহান তাঁর অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন। মুসম্মান বুর্জেই শাহজাহান তাঁর শেষ জীবন পুত্র ঔরংগজেবের হাতে বন্দী হিসেবে অতিবাহিত করেন।

শাহজাহান আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই জন্য তিনি দিল্লীতে শাহজানাবাদ নামে এক নগর গড়ে তোলেন। দিল্লীতে তাঁর রাজপ্রাসাদ লাল-কেল্লা নামে পরিচিত। লালকেল্লার অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রাসাদ দুটি হল দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস। অপরিমেয় অলংকরণে সমৃদ্ধ দেওয়ান-ই-খাসকে শাহজাহান পৃথিবীর স্বর্গ বলে মনে করতেন। দিল্লীতেই তিনি নির্মাণ করেন জামা মসজিদ। আকারে এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ।

শাহজাহানের আরেকটি বিস্ময়কর সৃষ্টি হল ময়ূর সিংহাসন। অপর্যাপ্ত অর্থে সোনা ও বহু মূল্যবান পাথরের নির্মিত হয়েছিল এই সিংহাসন। এত অর্থব্যয়ে এই সিংহাসন নির্মাণের পিছনে শাহজাহানের সম্ভবতঃ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। একটি হল মোগল ভান্ডারে সঞ্চিত মূল্যবান পাথরের এক প্রকাশ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়টি সম্রাট ও সাম্রাজ্যকে আরও বেশী আভিজাত্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলা। এই সিংহাসনই মোগল সম্রাটরা ব্যবহার করেছেন ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ বৎসর নাদির শাহ ভারত আক্রমণকালে এই সিংহাসনটি নিয়ে যান। বর্তমানে এই সিংহাসনের পরিবর্তিত রূপ তেহরান রাজপ্রাসাদের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি-সৌধকেও এক নতুন রূপদান করেন শাহজাহান। তাঁর অন্যান্য কীর্তির মধ্যে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি-সৌধ, খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির সমাধি-সৌধের পাশে নির্মিত জামা মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

উদ্যান চর্চার ক্ষেত্রেও শাহজাহানের অবদান অবিস্মরণীয়। লাহোরের শালিমার উদ্যান ও কাশ্মীরের চশমাশাহী উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কাশ্মীরের নিশাত বাগ ও শালিমার বাগকে সংস্কৃত করে উদ্যানদুটিকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও মনমুগ্ধকর করে তোলেন।

চিত্রশিল্পেও শাহজাহানের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিল। শাহ-জাহান নিজে ভাল চিত্রশিল্পী ছিলেন। সুতরাং চিত্রকলার সমাদর তিনি করবেন তা খুবই স্বাভাবিক। তখনকার দিনে সবচেয়ে খ্যাতিমান শিল্পী ছিলেন মহাম্মদ কাদির সমরকান্দি। শাহজাহানের মন্ত্রী আসফ খাঁ চিত্রশিল্পের একজন বড় পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তাঁর বাসভবন নানা চিত্রশিল্পে সুশোভিত ছিল। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোও চিত্রকলার একজন সমঝদার ছিলেন। তাঁর চিত্রশিল্পের একটি চমৎকার সংগ্রহ এখনো ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। শাহ-জাহানের সময়ে শিল্পীদের প্রধান পরিচালক ছিলেন ফকীরউল্লা। এ সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পীগণ হলেন মীর হাসির, অনুপ চিত্র এবং চিত্রমণি।

সংগীতেরও অনুরাগী ছিলেন শাহজাহান। কণ্ঠ ও যন্ত্র—উভয় সংগীতই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি নিজে হিন্দিতে অনেক সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর রাজসভার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞগণ হলেন রামাদাস মহাপাত্র, জগন্নাথ, জনার্দনভট্ট প্রভৃতি। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন শাহজাহান প্রত্যহ কিছু সময় রাজসভায় সুনির্বাচিত গায়িকা-দের গান শুনতেন।

Aurangzeb—a short note on the wars of succession —Stress on two developments in the political sphere—further widening of the empire on the one hand— the emergence on the other certain conditions which tended to weaken the imperial authority—Roots and nature of his troubles in Northern and North-Western India—the Deccan policy—Shivaffii and the first phase of the Mughal-Maxatha conflict—Organisation of the civil and military —administration by Shivaji—assessment of Shivaji as a ruler—the far-reaching consequences of Aurangzeb's Deccan Wars—Organisation by Aurangzeb of the civil and military administration —His religious policy—his character and personality—a brief estimate as a ruler.

Activities of the European Trading companies (a brief outline).

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল



॥ বিষয়-ক্রম ॥

মোগল-রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব—ঔরংগজেবের শাসনকাল—উত্তর ভারত—দক্ষিণ ভারত—ঔরংগজেব ও মারাঠা—শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা—শিবাজীর সামরিক শাসন—শাসক শিবাজীর মূল্যায়ণ—ঔরংগজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল—ঔরংগজেবের শাসন-ব্যবস্থা—ঔরংগজেবের ধর্মীয় নীতি—ঔরংগজেবের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র—ঔরংগজেবের মূল্যায়ণ।

ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাসমূহের কার্যকলাপ—পর্তুগীজ—ওলন্দাজ—দিনেমার—ইংরেজ—ফরাসী।

মোগল রাজপরিবারের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এই অসুস্থতাই তাঁর চারপুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধের সূচনা করে। কারণ মোগল রাজ-পরিবারের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না।

শাহজাহান চেয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক। তাই তাঁকে আগ্রাতে রেখে কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন শাহজাহান। দারাশিকো ছিলেন খোলামেলা মনের, ধর্মীয় বিষয়ে উদার, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান এবং নানা গুণের অধিকারী। কিন্তু তিনি ছিলেন একগুঁয়ে এবং ধর্মান্ধ মুসলমানদের কাছে একেবারেই অবাঞ্ছিত। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বাংলার সুবাদার। সুজা ভাল যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু ছিলেন বড় আমোদপ্রিয়। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্যতম। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদও ছিলেন যুদ্ধকুশলী, কিন্তু বুদ্ধিহীন এবং পানাসক্ত। চার যুবরাজই শাহজাহানের পর সিংহাসন লাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

সুজা প্রথম নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি দারার সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এর মধ্যে মুরাদ ও নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে সুরাট লুণ্ঠন করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় নিজ অভীষ্টসাধনে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তিনি মুরাদের সমর্থন লাভ করেন। দুই ভাই যুগ্মভাবে যশবন্ত সিংহের নেতৃত্বে সম্রাটের বাহিনীকে উজ্জয়িনীর নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। এরপর দারা তাঁদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। আগ্রার নিকট সমুগড়ের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের পরিণতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

এরপর ঔরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করে পিতা শাহজাহানকে বন্দী করেন। ওদিকে মুরাদ তখন দিল্লীর অভিমুখে দারার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে মুরাদের সৈন্যবাহিনীকে উৎকোচ দিয়ে ঔরঙ্গজেব বশীভূত করেন এবং মুরাদকেও বন্দী করেন। এইবার ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

কিন্তু তখনও সকল প্রতিপক্ষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি। সুজা পুনরায় বিদ্রোহী হলে এলাহাবাদের কাছে এক যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব তাঁকে পরাজিত করেন। সুজা আরাকান অঞ্চলে পালিয়ে যান। এরপর তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায় না। দারা আরেকবার শক্তি সঞ্চয় করে আজমীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু এবারও পরাজিত হয়ে পারস্যে পালিয়ে যাবার পথে তিনি ধৃত হন। চূড়ান্ত অমানবিক লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়। দুই বৎসর পর মুরাদকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দারার পুত্র সুলেমান শিকোকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

এইভাবে ভ্রাতৃ-রক্তে স্নাত ঔরঙ্গজেব নিজেকে মোগল সিংহাসনে নিষ্কণ্টক করেন। তাঁর সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভংগী। এই দৃষ্টিভংগীই ধর্মান্ধ অভিজাতদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন সংগ্রহে সফল হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরেই এই অভিজাতগণ মোগল সম্রাটদের অনুসৃত উদারধর্মীয় নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে তারা তাদের পুঞ্জীভূত আক্রোশকে প্রশমিত করার সুযোগ পেয়েছিল।

॥ ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল ॥

ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ শাসনকালের লক্ষ্যণীয় দিক হলো তিনি এমনিতেই উত্তরাধি-

কার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তদুপরি সেই সাম্রাজ্যকে আরও সম্প্রসারিত করেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নেতৃত্বেই মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল সর্বাধিক। কিন্তু এই বিস্তারসাধন ঘটাতে গিয়ে তিনি এক নির্মম বাস্তবকে অস্বীকার করেছিলেন। তা হল তদানীন্তন যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় সারা দেশব্যাপী কেন্দ্রিয় শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা অব্যাহত রাখা সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং তত্ত্বগত ভাবে ঔরংগজেবের লক্ষ্য সম্পর্কে কোন বিরোধ না থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণভাবে এই লক্ষ্যের পরিপন্থী। তাই সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সংগে তার অবক্ষয়ও ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিলো।

॥ উত্তর ভারত ॥

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বাংলার সুবাদার মীরজুমলা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার এবং ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে আসাম জয় করেন। কিন্তু মীরজুমলার মৃত্যুর পর আসাম ও কোচবিহার মোগল হস্তচ্যুত হয়। বাংলার পরবর্তী সুবাদার শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে এই অঞ্চলকে পর্তুগীজ-নির্যাতন থেকে মুক্ত করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে ঔরংগজেবকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বাধ্য হয়ে তিনি এই অঞ্চলে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন। এই অঞ্চল ছিল দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতিদের বাসস্থান। এদের মধ্যে প্রধান ছিল আফ্রিদি, ইউসুফজাই এবং খতক উপজাতি। সীমান্তের নিরাপত্তার স্বার্থে মোগল সম্রাটগণ এদের স্বাতন্ত্র স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এই সব উপজাতি প্রায়ই ভারতের অভ্যন্তরে লুটতরাজ চালাতো। ফলে দীর্ঘকাল এদের সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব হল না।

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ইউসুফজাইগণ বিদ্রোহী হলে মোগল সেনাবাহিনী সেই বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে আফ্রিদিগণ বিদ্রোহী হয়ে অন্যান্য আফগান উপজাতিদের সংঘবদ্ধ করে মোগলদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানায়। খতক উপজাতিও এদের সংগে যুক্ত হয়। নিরুপায় ঔরংগজেব স্বয়ং এদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কূটনীতির সাহায্যে ঔরংগজেব সংঘবদ্ধ জাতিদের মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি করেন এবং বহু আফগাণ উপজাতিকে স্বপক্ষে নিয়ে আসেন। কিন্তু খতকগণ তখনো সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খতক-নেতা কুশ-হল পরাজিত হয়ে ঔরংগজেবের হাতে বন্দী হয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে আনীত হন। এভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

যদুনাথ সরকার ঔরংগজেবের সীমান্ত নীতি সম্পর্কে বলেছেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল।[১] উপজাতিদের দমন করতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। উপজাতিরাই এক সময় মোগল সেনাবাহিনীকে শক্তি যুগিয়েছে। সৈন্য সংগ্রহের এই সদাপ্রস্তুত উৎস থেকে ঔরঙ্গজেব বঞ্চিত হলেন। সর্বোপরি উপজাতিদের দমনে দাক্ষিণাত্য থেকে বিপুল পরিমাণ সৈন্য সীমান্ত অঞ্চলে নিয়ে আসার ফলে শিবাজীর অভ্যুদয়ের পথ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং মনে হয় যদুনাথ সরকার যথাযথ মন্তব্যই করেছেন।

রাজপুত জাতি সম্পর্কে ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতি কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। তাঁর

১ Ruinous as the Afgan war was to the imperial economy its political effect was even more harmful. —J. N. Sarktr.

শাসনকালের প্রথম কুড়ি বৎসর তিনি মোটামুটি তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসৃত রাজপুত নীতিকেই আস্থাশীল ছিলেন। এই সময় রাজপুত জাতির সমর্থনও তিনি পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শিবাজীর বিরুদ্ধে জয়সিংহের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনিময়ে তিনি অনেক রাজপুত কর্মচারীর পদোন্নতিও ঘটিয়েছেন। কিন্তু জয়-সিংহের মৃত্যুর পর থেকেই পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

অম্বরের রাণা জয়সিংহকে ঔরঙ্গজেব বিষপ্রয়োগে হত্যা করার পর তিনি মারওয়াড় রাজ যশোবন্ত সিংহের প্রতি দৃষ্টি দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের অভিযোগ ছিল তিনি দারা সিকোকে সাহায্য করেছিলেন। আসলে সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেবার দখল ছিল ঔরঙ্গজেবের পক্ষে অপরিহার্য। তাছাড়া জয় সিংহের পর যশোবন্ত সিংহই ছিলেন হিন্দু অভিজাতের একমাত্র নেতা। সুতরাং যশোবন্তের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ ছিল ঔরঙ্গজেবের পক্ষে খুবই জরুরী।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষায় যশোবন্তের মৃত্যু হলে ঔরঙ্গজেব সসৈন্যে বিনা বাধায় মারওয়াড় প্রবেশ করেন এবং ইন্দ্রসিংহ নামে যশোবন্তের এক আত্মীয়কে মারওয়াড়ের রাজা বলে ঘোষণা করেন। এদিকে যশোবন্তের বিধবা পত্নী যমজ সন্তান প্রসব করেন। এক পুত্রের মৃত্যু হয়। অপর পুত্র অজিত সিংহকে মোগল অন্তঃপুরে রেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রস্তাব ঔরঙ্গজেব করেন। এতে রাঠোর নেতা এবং যশোবন্তের মন্ত্রী দুর্গাদাস বলপ্রয়োগে অজিত সিংহ ও তাঁর মাতাকে মোগল অন্তঃপুর থেকে মুক্ত করে যোধপুরে নিয়ে আসেন।

এ অবস্থায় ঔরঙ্গজেব এক বিশাল বাহিনী পাঠান রাজপুতদের বিরুদ্ধে। মারওয়াড় অধিকৃত হয়। এদিকে মেবারের রাণা রাজসিংহ ছিলেন অজিত সিংহের মাতুল। রাজ সিংহও মোগল বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হন। কিন্তু মেবারও মোগল অধিকৃত হয়। রাজ সিংহ আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। ঔরঙ্গজেব পুত্র আকবরকে চিতোর রক্ষার ভার দিয়ে আজমীঢ় আক্রমণ করেন। এদিকে রাজ সিংহ পুণরায় শক্তি সঞ্চয় করে মোগল বাহিনীকে বিতাড়িত করেন। ঔরঙ্গজেব বাধ্য হয়ে আকবরের পরিবর্তে মোগল সেনাবাহিনীর দায়িত্ব আজমের উপর অর্পণ করেন।

আকবর পিতার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করেন এবং রাজপুতদের সঙ্গে সামিল হন। ঔরঙ্গজেব তখন কূটবুদ্ধির সাহায্যে রাজপুতদের কাছে আকবরকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু দুর্গাদাস ঔরঙ্গজেবের এই চাতুরী বুঝে ফেলে আকবরকে আশ্রয় দেন। রাজপুতদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে রাজ সিংহের পুত্র জয় সিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সন্ধি সত্ত্বেও দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাঠোরদের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন সম্রাট বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে মারওয়াড়ের রাজা বলে মেনে নেন তখনই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়।

ঔরঙ্গজেবের রাজপুতনীতিও সামগ্রিক বিবেচনায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কারণ দীর্ঘস্থায়ী রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রচুর লোক ক্ষয় হয়, অর্থের অপব্যয় হয়। বিনিময়ে মোগল সম্রাটের রাজনৈতিক মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়। যে রাজপুত-জাতি বংশানুক্রমিকভাবে মোগল রাজবংশকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে এবং মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম শক্তিস্তম্ভে পরিণত হয়েছে ঔরঙ্গজেবের নীতির ফলে মোগল সাম্রাজ্য সেই সমর্থন থেকে বঞ্চিত হল, ধ্বংস হয়ে গেল সাম্রাজ্যের অন্যতম শক্তিস্তম্ভ। রাজপুতদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহী মনোভাবকে উৎসাহিত করে-ছিল। সর্বোপরি দীর্ঘকাল রাজপুতদের নিয়ে বিব্রত থাকায় দক্ষিণ ভারতে মোগল

শাসন দুর্বল হয়ে যায়, যার ফলে শিবাজীর উত্থান সহজ হয়ে যায়।

॥ দক্ষিণ ভারত ॥

দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই নীতি ছিল পূর্ববর্তী সম্রাটদের নীতিরই অনুসরণ মাত্র। যখন ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন তখনই তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ড রাজ্যদুটিকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু শাহাজাহানের হস্তক্ষেপে তাঁর সেই উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

স্বভাবতঃই সম্রাট হবার পর ঔরঙ্গজেব তাঁর পূর্ব উদ্দেশ্য সফল করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতের সমস্যা নিয়ে তিনি এতই বিব্রত ছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকাবার অবকাশও তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর শাসনকালের দ্বিতীয়ার্ধ সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে। এখানেই তাঁর সমাধি হয় এবং সেই সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যেরও।

এই সময় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এক ক্ষীয়মান শক্তিতে পরিণত। আর সেই শূণ্যতার সুযোগে শিবাজীর নেতৃত্বে তখন মারাঠা জাতি এক নবজাগ্রত শক্তি, যা মোগল সাম্রাজ্যের একান্তই দুঃসহ। তার উপর তাঁর বিদ্রোহী পুত্র আকবর তখন মারাঠা আশ্রয়ে। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের এই জটিল পরিস্থিতিতে ঔরঙ্গজেবের নিজের এই অঞ্চলে চলে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাঁর লক্ষ্য তখন, দাক্ষিণাত্যের যে ত্রিশক্তি—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মারাঠা, তাকে ধ্বংস করে মোগল সাম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত করা।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পর্কে ঔরঙ্গজেবের অভিযোগ ছিল অনেক। দুটি রাজ্যই ছিল শিয়া মতাবলম্বী। অথচ ঔরঙ্গজেব ছিলেন সুন্নী। দ্বিতীয়তঃ চুক্তি অনুযায়ী উভয় রাজ্যের কাছেই বহু কর অনাদায়ী ছিল। তৃতীয়তঃ উভয় রাজ্যই বিভিন্ন সময় মারাঠাদের যুদ্ধের উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিল। চতুর্থতঃ উভয় রাজ্যই মোগল সম্রাটকে উপেক্ষা করে পারস্যের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিল। পঞ্চমতঃ উভয় রাজ্যের অপর্যাপ্ত সম্পদ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল দ্রুত হ্রাসমান মোগল রাজকোষের ঘাটতি মেটাতে। সুতরাং এমন অনিবার্য পরিস্থিতিতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের অস্ত্রধারণই ছিল অপরিহার্য।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেব যে দুই অভিযান প্রেরণ করেন তা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তাই তৃতীয়বার ঔরঙ্গজেব স্বয়ং অগ্রসর হন। বিজাপুর আত্মরক্ষার্থে গোলকুণ্ডার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং মারাঠাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিজাপুর মোগল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

বিজাপুরকে সাহায্যদানই আপাততঃ গোলকুণ্ডার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাছাড়া গোলকুণ্ডার হিন্দু মন্ত্রীগণ সেখানকার মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন এবং মারাঠাদের সাহায্য করতেন এই অভিযোগ তুলে ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন। গোলকুণ্ডার সুলতানও বীরদর্পে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। সহজ পথে জয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঔরঙ্গজেব প্রতারণার আশ্রয়ে গোলকুণ্ডা অধিকার করেন। গোলকুণ্ডা সর্বাংশে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

॥ ঔরঙ্গজেব ও মারাঠা ॥

উত্তর ভারতে যেমন রাজপুত জাতি দক্ষিণ ভারতে তেমনি মারাঠা জাতি মোগল সম্রাটের পক্ষে এক প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা এবং হিন্দু বিদ্বেষী নীতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতিকে উগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বভাবতঃই দক্ষিণ ভারতে হিন্দু শক্তির এই প্রগল্‌ভ উত্থান মোগল সম্রাটের পক্ষে ছিল মহা আশংকার। দাক্ষিণাত্যে যখন সুবাদার তখনই ঔরঙ্গজেব সচেষ্ট হয়েছিলেন এই উত্থানকে স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করে উত্তর ভারতে যেতে হয় আর সেই সুযোগে শিবাজী দ্রুত নিজ ক্ষমতা বিস্তৃত করতে থাকেন। সম্রাট হবার পরও ঔরঙ্গজেবকে উত্তর ভারতের বিষয়ে এতটাই জড়িয়ে যেতে হয় যে তিনি শিবাজীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নি।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব প্রথম তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ অধিকার করে যখন পুণায় অবস্থান করেছিলেন তখন একদিন শিবাজী অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করেন। শায়েস্তা খাঁ কোন মতে আপন প্রাণ নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে পালিয়ে আসেন। এরপর ঔরঙ্গজেব যুবরাজ মোয়াজ্জেম এবং জয় সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জয় সিংহ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীকে পুরন্দরের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। জয় সিংহের আমন্ত্রণে শিবাজী আগ্রার মোগল দরবারে আসেন। কিন্তু সেখানে ঔরঙ্গজেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসৌজন্য ও অপমানসূচক ব্যবহার করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে শিবাজী ও তাঁর পুত্রকে আগ্রায় নজর বন্দী করে রাখেন। কিন্তু শিবাজী কৌশলে আগ্রা থেকে পালিয়ে আসেন। এই সময় ঔরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান বিদ্রোহ নিয়ে বিব্রত থাকায় শিবাজীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিতে পারেন নি। আর সেই সুযোগে দাক্ষিণাত্যে শিবাজী আপন প্রভাব বিস্তার করে যেতেই থাকেন।


শিবাজী

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন রায়গড় দুর্গে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শিবাজী ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে এই অনুষ্ঠান শিবাজীকে রাজকীয় মর্যাদা দান করলো অন্যদিকে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল এই সময় তার এক বাস্তব রূপ পরিস্ফুট হল এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ঔরঙ্গজেব স্বয়ং শিবাজীকে রাজা উপাধি এবং বেরারে একটি জায়গীর দান করেন।

কিছুদিন শান্ত থাকার পর শিবাজী পুনরায় মোগল বিরোধীতা আরম্ভ করেন। এর মধ্যে বহু কর্মচ্যুত মোগল সৈন্য শিবাজীর সেনাবাহিনীতে যোগদান করায় তাঁর যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। তিনি একে একে তাঁর দুর্গগুলি মোগল অধিকার থেকে পুনরুদ্ধার করেন। এরপর তিনি জিঞ্জি, ভেলোর, মহীশূরের একাংশ জয় করেন। যখন এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করে চলেছিলেন সেই সময়ই অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর রাজ্য উত্তরে সুরাটের কাছে ধরমপুর

থেকে দক্ষিণে কানাড়া জেলা, পূর্বে বাগ্‌লানা থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

॥ শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা ॥

কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলেছেন শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থার লক্ষ্যই ছিল লুঠতরাজ এবং যুদ্ধ, এর কোন জনকল্যাণকামী আদর্শ ছিল না। কিন্তু রোলিনসন খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন নেপোলিয়ন বা অন্যান্য যোদ্ধাদের মত শিবাজী ছিলেন একজন মহান প্রশাসক। একজন সফল সংগঠক ও রাষ্ট্রনায়কের যে সব গুণাবলী থাকা দরকার শিবাজীর তা ছিল।[২]

শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিল 'অষ্ট প্রধান' বা আটজন মন্ত্রী নিয়ে এক পরিষদ। এই মন্ত্রীরা হলেনঃ (১) পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী যিনি সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা করতেন, (২) অমাত্য বা রাজস্বমন্ত্রী যিনি রাজস্ব সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রের আয়ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করতেন, (৩) মন্ত্রী যিনি রাষ্ট্রের সকল উল্লেখযোগ্য বিষয় নথিভুক্ত করে রাখতেন, (৪) সামন্ত যিনি পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দিতেন, (৫) সচিব যিনি সরকারী নির্দেশাবলী প্রচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, (৬) ন্যায়াধীশ যিনি সামরিক ও বেসামরিক সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমার সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন, (৭) সেনাপতি যিনি সামরিক বিভাগে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, (৮) পণ্ডিতরাও যিনি রাজপুরোহিত কাজ করতেন।

শিবাজী তাঁর রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্তে বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেকে প্রান্তে থাকতো একজন করে শাসনকর্তা। তিনি রাজস্ব আদায় ছাড়াও বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। তাকে সাহায্য করার জন্য থাকতো আট জন কর্মচারীর একটি সভা। প্রতিটি প্রান্ত আবার কতগুলি তরফ বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত এক একটি তরফ। গ্রামের শাসন পরিচালনা করতো গ্রামের পঞ্চায়েত। কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্য পরিদর্শনের জন্য থাকতো দেশপাণ্ডে ও দেশমুখ নামে দুই ধরনের কর্মচারী।

শিবাজীর অধীনে দুই ধরণের অঞ্চল ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ অধীনে অঞ্চলগুলিকে বলা হত স্বরাজ্য। কতগুলি ছিল যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, কিন্তু নিয়মিত কর দিত।

রাজস্ব সংগ্রহের জন্য শিবাজী একটি পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে প্রান্ত পরিচালনা করতেন মুখ্য দেশাধিকারী নামক কর্মচারী, তরফ পরিচালনা করতেন কারকুন নামক কর্মচারী। শিবাজী কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি কত আদায়ের বিষয়ে কর্মচারীদের নির্যাতন থেকে কৃষকদের মুক্ত রাখতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। তারপর উৎপন্ন শস্যের ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ রাজস্ব নির্ধারণ করেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থাও ছিল। ঐতিহাসিক ফ্রায়ার অবশ্য শিবাজী ভূমি-রাজস্বকে উচ্চহার বলে মনে করেন। কিন্তু শিবাজী রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে যেমন কোন শিথিলতা সহ্য করতে পারতেন না, তেমনি কৃষকের প্রতি কোন অত্যাচারও তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

ভূমি রাজস্ব ছাড়া শিবাজীর আয়ের অন্য উৎস হল চৌথ ও সরদেশমুখী। এই

[২] Like nearly all great warriors — Napoleon is a conspicuous example — Shivaji was also great administrator, for the qualities which go to make a eapable general are those which are required by the successful organiser and statesman.
— Rolinson.

দুই কর আদায়ের জন্য শিবাজীকে তীব্র সমালোচনা করা হয়। রাণাডের মতে চৌথ কোন নীতিহীন সামরিক কর ছিল না। চৌথ আদায়ভুক্ত অঞ্চলগুলিকে বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার শর্তে এই কর আদায় করা হত। এই করের হার ছিল রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে এই চৌথের আদর্শের ভিত্তিতে লর্ড ওয়েলেসলী তাঁর অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি প্রনয়ণ করেন। যদুনাথ সরকার মনে করেন লুণ্ঠনকারীর অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি চৌথ দিত। সুতরাং অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। সরদেশাইর মতে শত্রু ভাবাপন্ন বা বিজিত রাজ্য থেকে এই কর আদায় করা হত। সুরেন্দ্রনাথ সেন মনে করেন চৌথ ছিল মূলতঃ সামরিক কর। অন্যদিকে সরদেশমুখী ছিল একটি আইনানুগ কর। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি এই কর দিত। কিন্তু এই কর দিলে রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হত না। এই করের হার ছিল রাজস্বের এক দশমাংশ।

অন্যান্য করের মধ্যে ছিল মহাতরফ ও জাকাৎ। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করা হত মহাতরফ। আর বাজারে প্রতিটি সামগ্রীর ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর আদায় করা হত জাকাৎ।

শিবাজীর বিচার-ব্যবস্থা খুব সুষ্ঠু ছিল না। না ছিল স্থায়ী বিচারালয়, না ছিল সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন। গ্রামে পঞ্চায়েৎগুলি বিচার করতো। গুরুতর অপরাধের বিচার করতেন গ্রামের প্রধান। হাজির মজলিস নামে এক সভা ছিল চূড়ান্ত আপীল আদালত।

॥ শিবাজীর সামরিক শাসন ॥

সামরিক বিভাগের সংগঠনে শিবাজী অসাধারণ সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন। প্রথমে তিনি পার্বত্য মাওয়ালী জাতিদের নিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী গঠন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমর বিভাগের সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন করতে হয়। এতকাল মারাঠা সেনাবাহিনী মূলতঃ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু এরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। ফলে মারাঠাদের কোন স্থায়ী সেনাবিভাগ ছিল না। শিবাজীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি স্থায়ী সেনাবিভাগ গড়ে তোলেন।

তাঁর সেনাবিভাগের দুটি ভাগ—অশ্বারোহী ও পদাতিক। অশ্বারোহীর আবার দুই ভাগ—বর্গী ও শিলাদার। বর্গীগণ সরকার থেকে বেতন ও অস্ত্র-শস্ত্র পেত। শিলাদার যুদ্ধকালে সরকার থেকে বেতন পেত, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র তাদের নিজেদের সংগ্রহ করতে হত। পঁচিশজন অশ্বারোহী থাকতো একজন হাবিলদারের অধীনে। পাঁচজন হাবিলদার একজন জুমলাদারের অধীনে থাকতো। দশজন জুমলাদার একজন হাজারীর অধীনে, পাঁচজন হাজারী একজন পাঁচ হাজারীর অধীনে এবং সকল পাঁচ হাজারী একজন সর্নোবৎ-এর অধীনে থাকতো। এই ছিল শিবাজীর সামরিক বিভাগের সাংগঠনিক রূপ। শিবাজী নৌবাহিনীও গঠন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এই বাহিনী বিশেষ কোন সাফল্যের পরিচয় দিতে পারে নি।

শিবাজীর সামরিক কলাকৌশলে দুর্গগুলি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনজন সামরিক কর্মচারীর উপর প্রতিটি দুর্গ পরিচালনার দায়িত্ব থাকতো। দুর্গের ভেতরে যেন কোন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা না ঘটে সেজন্য নানা জাতের লোক রাখা হত।

শিবাজীর সামরিক সাফল্যের মূলে ছিল সামরিক বিভাগের কঠোর শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা। শৃংখলাভঙ্গে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। সৈন্য শিবিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজকোষে জমা দিতে হত।

শিবাজীর সামরিব কৌশল ছিল গেরিলা নীতি, যা মহারাষ্ট্রের মত পর্বতসংকুল এলাকার পক্ষে ছিল খুবই উপযোগী।

সামগ্রিকভাবে শিবাজীর শাসন ব্যবস্থাকে আচার্য যদুনাথ সরকার মধ্য যুগের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক বিস্ময় বলে বর্ণনা করেছেন। মন্ত্রীদের মধ্যে ক্ষমতার সুষম বন্টন করে, জায়গীর প্রথার বিলোপসাধন করে, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে শাসন ব্যবস্থায় সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে নিয়ে শিবাজী এক গতিশীল এবং কর্মঠ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানেই শিবাজীর সবচেয়ে বড় সাফল্য ও কৃতিত্ব।

॥ শাসক শিবাজীর মূল্যায়ন ॥

যেন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন শিবাজী। খুব সাধারণ অবস্থা থেকে কেবল আপন ক্ষমতা ও প্রতিভা বলে ভাগ্যের সকল প্রকার প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে তিনি ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তিনি সাধরণ মাওয়ালি জাতিকে সংগঠিত করে তাদের নিয়েই এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তাঁর সম্মুখে ছিল চার প্রবল প্রতিপক্ষ—মোগল সাম্রাজ্য, বিজাপুর, গোলকুন্ডা ও জাঞ্জিবারের হাবসীগণ। অসাধারণ কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে এই চার প্রবল প্রতিপক্ষকেই তিনি পর্যুদস্ত করেন।

রাষ্ট্রশাসনের বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সৃজনী শক্তির পরিচয় দেন। ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা ভিত্তিতে তিনি যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তার লক্ষ্যই ছিল প্রজা-সাধারণের কল্যাণসাধন। মানব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন পদে রাজকর্মচারী নির্বাচনে ও নিয়োগে। দেশশাসনের ক্ষেত্রে তিনি কখনো ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বরং শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন পরমতসহিষ্ণু এবং মানবতাবাদী।

ঐতিহাসিক সরদেশাই মনে করেন শিবাজী এক সর্বভারতীয় হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু যদুনাথ সরকার এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে শিবাজী সারাজীবন আত্মরক্ষার কাজে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করার সুযোগ তিনি পান নি। তাছাড়া উত্তর ভারতের কোন হিন্দু রাজার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন এমন কোন প্রমাণও নেই। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদও একই ধরণের অভিমত পোষণ করেন। তবে একথা ঠিক শতধা বিচ্ছিন্ন মারাঠা জাতিকে ঐক্যবন্ধ করতে তিনি হিন্দু ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। কারণ মধ্য যুগে জাতীয়তাবাদের জাগরণে ধর্মের প্রভাবকে কখনো অস্বীকার করা যায় না।

॥ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল ॥

দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে ঐতিহাসিকগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন দাক্ষিণাত্য শুধু ঔরংগজেবের সমাধিস্থল নয়, মোগল সাম্রাজ্যেরও।[৩] যদুনাথ সরকার বলেছেন নেপোলিয়ন যেমন বলেছেন যে স্পেনীয় ক্ষতই তাঁকে ধ্বংস করেছে তেমনি দাক্ষিণাত্য ক্ষতই ঔরঙ্গজেবকে ধ্বংস করেছে।[৪]

স্মিথ, এলফিনস্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিক মনে করেন ঔরঙ্গজেব গোলকুন্ডা ও বিজপুর জয় করে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ঐ দুই

৩ "The Deccan proved to be the grave yard not only of Aurangzeb's body but also of his empire." —V. Smith.

৪ Napoleon used to say. "It was the Spanish ulcer that ruined me. The Deccan ulcer ruined Auraingzeb. —J. N. Sarker.

পরাজিত রাজ্যের সৈন্যরা কর্মচ্যুত হয়ে মারাঠা বাহিনীতে যোগদান করে শিবাজীকে শক্তিশালী করেছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ দুই রাজ্য স্বাধীন থাকলে তারা তাদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে শিবাজীকে প্রতিহত করতে উদ্যোগী হত। তৃতীয়তঃ, ঔরঙ্গজেবের উচিত ছিল ঐ দুই রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদেরই মারাঠাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা।

কিন্তু যদুনাথ সরকার এই মত সমর্থন করেন না। কারণ দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি ঔরঙ্গজেবের পূর্বসূরীদেরই, তাঁর নিজের নয়। সুতরাং এর জন্য ঔরঙ্গজেবকে অভিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। মোগলদের সঙ্গে দক্ষিণের সুলতানদের সামঞ্জস্য সাধন কখনোই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের ক্রমশঃ ক্ষীয়মান দুই রাজ্যের পক্ষে উদীয়মান মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তাই আচার্য সরকারের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, আজ হোক কাল হোক জাগ্রত মারাঠা শক্তির সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ অনিবার্যই ছিল, তা সে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করুন বা না করুন।[৫]

তবে ঔরঙ্গজেব অনুসৃত দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে সুদূর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত ব্যাপক হয়েছিল যে কোন এক কেন্দ্র থেকে একজনের পক্ষে তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব রাখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই বিস্তৃতিই সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করার ফলে মোগল রাজকোষ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর বেতনদানের ক্ষমতাও আর ছিল না। অতিরিক্ত করভার আরোপ করেও আর ব্যয় সংকুলান সম্ভব হচ্ছিল না। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতের শাসনে এসেছিল শিথিলতা। আর সেই শিথিলতার সুযোগে চতুর্দিকে দেখা দেয় অশান্তি আর বিশৃংখলতা। প্রাদেশিক সুবাদারগণ কেন্দ্রীয় শাসনকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতাও দেখাতে থাকে। তাদের সংযত করার ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না।

চতুর্থতঃ দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী পরিণতিহীন যুদ্ধ মোগল রাজকীয় মর্যাদার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত। মোগল সম্রাটের যে মহিমা তিল তিল করে বহুদিন ধরে গড়ে উঠেছিল দাক্ষিণাত্যের ব্যর্থতা সেই মহিমাকে ভূলুণ্ঠিত করে।

পঞ্চমতঃ মোগল বাহিনী অপরাজেয় বলে যে খ্যাতি সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত ছিল তার সামান্যই অবশিষ্ট থাকে দাক্ষিণাত্যে ব্যর্থতার পর। তাছাড়া দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত সেনাবাহিনীতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল ক্ষোভ আর অসন্তোষ।

ষষ্ঠতঃ সেনাবাহিনীর চলাচলে বহু শস্যক্ষেত্র হয়েছিল বিনষ্ট। ক্ষেতের শস্যেরও ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। আবার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের কৃষক শ্রমিক ও সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ফলে হতাশা ক্রমশঃ ব্যাপক অসন্তোষের রূপ নিতে থাকে।

সর্বশেষে ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের সঙ্গে সমঝোতার পথে না গিয়ে এক বিরাট রাজ-

---

৫ Their (Marathas) rising power must have inevitably come into conflict with that of the Mughal Empire sooner or later no matter Awrangzeb had destroyed the Deccan States or not. —J. N. Sarker.

নৈতিক ভুল করেছিলেন। আকবর রাজপুত জাতির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের ক্ষেত্রে সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় না দিয়ে শুধু নিজের নয় সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

॥ ঔরঙ্গজেবের শাসন ব্যবস্থা ॥

শাসক ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে পার্সিভাল স্পীয়ার মন্তব্য করেছেন যে, পিতা বা প্রপিতামহের ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য ঔরঙ্গজেবের ছিল না, কিন্তু এক ভীতির সঞ্চার করে তিনি দেশশাসন করতে চেয়েছিলেন।[৬] কে এম. পাণিক্কর বলেছেন যে ঔরংগজেব রাষ্ট্রের ইসলামীয় চরিত্র পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প ছিলেন। ভিনসেন্ট স্মিথও বলেছেন যে, ঔরঙ্গজেবের লক্ষ্যই ছিল ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।[৭] তাই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র ইসলামীয় অনুশাসনগুলি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন। আকবরের হিন্দু-মুসলমান সমদর্শিতা এবং সম অধিকারের নীতি ঔরঙ্গজেব পরিত্যাগ করেন।

ঔরঙ্গজেব ইসলামীর রীতি অনুসারে দরবারে নওরোজ রদ করেন। সম্রাটের জন্মদিনে সম্রাটের দেহের ওজনের সমান সোনা রূপা দান করার প্রথা বাতিল করা হয়। ঝরোখা দর্শনও তিনি বন্ধ করে দেন। দরবারে নৃত্য ও গীত নিষিদ্ধ করা হয়। কুসংস্কার বলে জ্যোতিষীদের দিল্লী থেকে বিতাড়িত করা হয়। মদ্য, ভাঙ্, ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

মুদ্রায় কলিমা খোদাই নিষিদ্ধ হয়। কারণ ঔরঙ্গজেবের মুদ্রা ব্যবহার কালে বিধর্মীরা ঐ কলিমা স্পর্শ করতো। তিনি হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী, ধর্মমেলা, যাত্রা প্রভৃতি বন্ধ করেন। এই আদেশ কার্যকরী হচ্ছে কিনা দেখার জন্য মুহতাশিব নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সিংহাসনে বসার সতেরো বছর পর ঔরঙ্গজেব অমুসলমানদের জিজিয়া কর ধার্য করেন। অপর এক নির্দেশ দ্বারা হিন্দু কর্মচারী অবসর নিলে শূন্য স্থানে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগের নির্দেশ দেন। রাজপুত ছাড়া অন্যান্য হিন্দুদের ঘোড়া বা পাল্কী চড়া নিষিদ্ধ হয়। হিন্দু ব্যবসায়ী-দের মালের উপর পাঁচ শতাংশ শুল্ক দিতে হত। কিন্তু মুসলমান ব্যবসায়ীগণকে পরবর্তীকালে এই শুল্ক সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়।

ঔরঙ্গজেবের শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ হল অত্যধিক কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা। ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের মত তিনি ছিলেন নিজেই নিজের প্রধানমন্ত্রী। তিনি শাসন-কার্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং প্রতিটি বিষয়ে নিজে সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। সকল মন্ত্রী ও কর্মচারীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই সহ্য করতে পারতেন না। সম্রাটের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন।

শাসন ব্যবস্থার এই অত্যাধিক কেন্দ্রীয়করণের ফলে মন্ত্রীগণ সাধারণ বেতনভুক্ত কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিল। শাসন-ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের আগ্রহ ও উদ্যোগের অবসান ঘটেছিল। তবে একথা ঠিক ঔরঙ্গজেব তাঁর পূর্বসূরীদের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবর্তিতই রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যাপক পরি-বর্তন করেছিলেন সেই কাঠামোর কর্মপদ্ধতির।

অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনে ঔরঙ্গজেব অবশ্যই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সম্প্র-

৬ He lacked the magnetism of his father and great grand father but inspired and awe and even terror of his own. —Percival Spear.

৭ The ideal of Awrangzeb was the creation of Muslim theocracy. —V. Smith.

সারিত করেছিলেন। এই সম্প্রসারণের ফলে সামরিক খাতে ব্যয়ভারও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও এবং নিজে যথেষ্ট যোগ্যতা-সম্পন্ন সমরকুশলী হয়েও সেনাবাহিনীর অধঃপতনকে তিনি রোধ করতে পারেন নি। যে মনসবদারী প্রথার কর্মদক্ষতার উপর মোগল সেনাবাহিনীর সাফল্য নির্ভর করতো সেই মনসবদারী প্রথা ঔরঙ্গজেবের সময়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জীর্ণ হয়ে শীর্ণ হয়ে যেতে থাকে। সেনাবাহিনীর নৈতিক শক্তিরও অবক্ষয় আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই।

শাসক হিসেবে ঔরঙ্গজেবের ব্যর্থতা হল তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসকে মিলিয়ে ফেলেছিলেন।[৮] তিনি এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে চান নি যে নানা জাতি-ধর্মের নরনারী অধ্যুষিত ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ইসলামীয় রীতি অনুসারে দেশ শাসন করা যায় না। এইখানেই আকবর অনুসৃত নীতির সাফল্য আর ঔরঙ্গজেব অবলম্বিত নীতির ব্যর্থতা। তাই স্মিথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, এই কারণেই ইতিহাসে ঔরঙ্গজেব একজন মহান শাসক হিসেবে স্থানলাভের অধিকারী নন।[৯]

॥ ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ॥

ঔরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। সুন্নী মুসলমানেরা তাঁকে জিন্দাপীর বলে মনে করতেন। ভারতকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করাই ছিল তাঁর ধর্মনীতির মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামীয় অনুশাসন অনুসারেই তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। তিনি সুন্নী ইমাম আবু হানিফার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর পূর্ব পুরুষদের ধর্মনিরপেক্ষ না হলেও ধর্মীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ক্ষতিকারক। তাই তিনি ভারতে মহাম্মদ ও কোরাণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকেই তাঁর ধর্মীয় নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নেন।

এই বিশ্বাস থেকে তিনি যে কেবল হিন্দুবিরোধী পথ গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণও তাঁর আক্রোশ থেকে অব্যাহতি পায় নি।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তার কতটা প্রতিফলন ঘটে ছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের নানা মতবিরোধ আছে। যদুনাথ সরকার মনে করেন ধর্মীয় বিশ্বাসে ঔরঙ্গজেব এতটাই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে তিনি সিংহাসন হারাতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর মত ও পথের পরিবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না। ডঃ সতীশচন্দ্র এই অভিমতের বিরোধীতা করে বলেছেন, ঔরঙ্গজেব জানতেন তিনি হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষের সম্রাট। তাই তিনি তাঁর শাসক সত্ত্বাকে তাঁর ধর্মীয় সত্ত্বার কাছে বিসর্জন দেন নি আর দেন নি বলেই নিরবচ্ছিন্নভাবে হিন্দু-বিরোধী নীতি তিনি অনুসরণ করে চলেন নি। আর্থার আলি ঔরঙ্গজেবের সময়ে মনসবদার মধ্যে হিন্দু-দের সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তিনি হিন্দু বিরোধী নীতি অনুসরণ করেন নি। পার্সিভাল স্পীয়ারও মনে করেন ঔরঙ্গজেবের অসহিষ্ণু মনোভাবের সিদ্ধান্ত কতগুলি বিরোধী ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে গৃহীত। প্রকৃতপক্ষে তিনি

---

৮ Awrangzeb certainly made a mistake in identifying the interests of the state with those of his faith.

J. N. Sarker.

৯ This explains why nothing in the history of Awrangzeb justifies posterity in classing him as a great king. —V. Smith.

ছিলেন একজন যোগ্য শাসক এবং এক জটিল চরিত্রের মানুষ[১০] ঐতিহাসিক লেন পুল যদুনাথ সরকারের মত একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করা সম্পর্কে 'মুন্তকাব-উল-লুবাব' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একমাত্র সেই সব হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল যা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের ঘাঁটিরূপে বিবেচনা করা হত কিংবা যে সব মন্দির সরকারী অনুমোদন ছাড়াই নির্মিত হয়েছিল। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর সম্পর্কে বলা হয় এই কর কোন নিন্দনীয় কর ছিল না। মুসলমান শাসনে অমুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে এই কর দানের প্রথা দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। তাছাড়া ঔরঙ্গজেব তাঁর শাসনের সূচনাতেই আশীটি নানা ধরণের কর রেহাই দেন। এতে রাজস্বের যে ঘাটতি হয় এবং পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সমতা রক্ষার প্রয়োজনে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তনে কোন অন্যায় ছিল না। ধর্মীয় কারণে এই কর প্রযুক্ত হলে ঔরঙ্গজেব রাজ্যভার গ্রহণের পর সতের বছর অপেক্ষা করতেন না। এই করের হারও ছিল খুব কম। সর্বোপরি ঈশ্বর দাস মনে করেন এই কর আরোপ করার জন্য ইসলাম শাস্ত্রজ্ঞদের চাপ ঔরঙ্গজেব এড়াতে পারেন নি। কারণ এস. এম. জাফর মনে করেন যিনি ইসলামের রক্ষক হিসাবে সিংহাসন লাভ করেন তাঁর পক্ষে উলেমাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।[১১]

ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির সমর্থনে যে যুক্তিই দেখানো হোক না কেন তিনি যে আকবরের সমদর্শিতার নীতি থেকে সরে এসেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে তিনি ভারতে মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপন করতেই চেয়েছিলেন। তার ফলে হিন্দুদের মনে যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিদ্রোহে। আকবরের সময় যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতেন 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' তারাই মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধীতে পরিণত হয়। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে আকবরের আকবরের সাফল্য ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মোগল-প্রাণশক্তির অবক্ষয় আরম্ভ হয়। মথুরার জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রতিশোধ নিয়ে মোগলেরা কেশবরায় মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে। কিন্তু তাতে বিদ্রোহের আগুন নেভানো গেল না। তাই রাজারাম, চূড়ামণির নেতৃত্বে বিদ্রোহ অব্যাহত থাকলো। এর বেশী আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ হয়েছিল সৎনামীদের বিদ্রোহ। এরা ছিল প্রায় সকলেই চাষী। হিন্দু-মুসলমানদের ভেদাভেদ এরা মানতো না। এদের বিদ্রোহ দমনে মোগল সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। মধ্য ভারতের বুন্দেলাগণও বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ দমিত হলেও এই অঞ্চলে মোগল আধিপত্য কখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অবশ্য এই সব বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে রাজস্ব সংগ্রহে স্থানীয় মোগল কর্মচারীদের অত্যাচারে এইসব অঞ্চলের কৃষক সমাজের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাদের অসন্তোষকে বিদ্রোহের রূপ দিতে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতিকে যে ব্যবহার করা হয়েছিল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

১০ His supposed intolerance is little more than a hostile legend based on isolated acts such as the erection of a mosque on a temple site in Benaras ..... The Mughal ogre of popular historians was in fact both a most able statesman and a subtle and highly complex character.
—Percival Spear.

১১ One who ascended the throne as a saviour of his religion and one who was hailed a champion of Islam. could not dare drop down the proposal of the learned ulema. —S. M. Jafar.

সুতরাং বলতেই হয় ঔরঙ্গজেরের ধর্মনীতি কোনভাবেই মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর হয় নি। ধর্মের দ্বারা তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন।

॥ ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ॥

ইউরোপীয় পর্যটক ও ঐতিহাসিকগণ ঔরংগজেবের চারিত্রিক গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বার্ণিয়ে ঔরঙ্গজেবকে প্রতিভাবান, সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ বলে বর্ণনা করেছেন। হ্যামিলটনের মতে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ বিচারক, রাজোচিত গুণাবলীর অধিকারী এবং ধর্মভীরু। ঐতিহাসিক কীনের ভাষায় ঔরংগজেব ছিলেন বিখ্যাত পরিবারের বিখ্যাত সদস্য।[১২]

তিনি ছিলেন আদর্শবাদী পুরুষ। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। সমসাময়িক যুগের বিলাস-ব্যসন তিনি পরিহার করে চলেছিলেন। তাঁর নৈতিক-বোধও ছিল খুবই উন্নত। তিনি নিজে ছিলেন নিরামিষাশী। সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য তিনি বর্জন করে চলতেন। নিজেকে তিনি রাষ্ট্রের সেবক মনে করতেন। শাসনকার্য পরিচালনায় অসাধারণ পরিশ্রম করতেন তিনি। ইসলামীয় শিক্ষায় তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত। ইসলাম শাস্ত্রপাঠে তাঁর কখনো ক্লান্তি ছিল না।

চরিত্রগত ভাবে তিনি যেমন ছিলেন উচ্চাকাংখী, তেমনি ধর্মান্ধ। বরং বলা যেতে পারে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাঁর উচ্চাকাংখাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। পারেন নি বলেই শেষ জীবনে তাঁর পরিতাপের সীমা ছিল না। তাঁর পুত্রের কাছে চিঠিতে তাঁর মর্মস্পর্শী অসহায় স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, আমি জানি না আমি কে, কেনই বা পৃথিবীতে এসেছি। আমি দেশ বা দেশবাসীর জন্য ভাল কিছুই করতে পারি নি। অযথাই আমার দিন চলে গেল।[১৩]

॥ ঔরঙ্গজেবের মূল্যায়ণ ॥

শাসক হিসেবে ঔরঙ্গজেবের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে স্মিথ খুব স্পষ্টভাবে ব্যর্থ বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৪] পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন এটা ভুলে যাই যে ঔরঙ্গজেব আকবরের মতই দীর্ঘকাল দেশ শাসন করেছেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যে সাম্রাজ্য তিনি পেয়েছিলেন তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্য তিনি রেখে যান।[১৫]

পরমত-অসহিষ্ণুতাই তাঁর ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ। ধর্মান্ধতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি প্রবল শত্রু-বেষ্টনীর সৃষ্টি করেছিলেন। রাজপুত জাতির সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়া মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

তাঁর সন্দিগ্ধচিত্ততাও শাসক হিসেবে ব্যর্থতার জন্য দায়ী। এই মানসিকতার জন্যই তিনি কারো সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন নি। বার বার কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কূটনীতি যদি নিয়মিত ব্যবহৃত হয় তা হলে তার ফাঁকটুকু বুঝতে কারো বাকী থাকে না।

ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজেবের বিজ্ঞতার পরিচয়

১২ The abilities of Shah Jahan's Son and succesor, Alamgir rendered him the most famous member of his famous house.

—Keene.

১৩ I Know not who I am or why I came into the world. I have not done well for the country or its people. My years have gone by profitless.

১৪ When Aurangzeb is judged as a sovereign he must be pronounced a failure. —V. Smith.

১৫ It is forgotten that he governed India for nearly as long as Akbar and that he left the empire larger than he found it. —Percival Spear.

বহন করে না। বিশেষ করে সেইসব যুদ্ধ যদি একেবারে অপরিহার্যই না হয়। বরং এইসব যুদ্ধের সৈন্যবাহিনী দক্ষতা যেমন হ্রাস পেয়েছিল তেমনি রাজকোষ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক নয়।

শাসক হিসেবে তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি কিভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষতি করছিল তা তিনি যথাযথ অনুধাবন করতে পারেন নি। দক্ষিণ ভারতে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালিয়ে তিনি অর্জন করেন নি কিছুই, কিন্তু হারিয়েছিলেন সবকিছু। হয়তো দাক্ষিণাত্যে বসেই জীবনের অন্তিমলগ্নে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়ে তাঁর ব্যর্থতার গভীরতা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি আকণ্ঠ হতাশায় স্বীকার করেছিলেন তাঁর পুত্র আজমের কাছে লেখা এক চিঠিতে যে তিনি এই পৃথিবীকে দিতে পারেন নি কিছুই। কিন্তু যাবার সঙ্গে নিয়ে যাবেন তাঁরই পাপের বোঝা।

॥ ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের কার্যকলাপ ॥

॥ পর্তুগীজ ॥

প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ। ইউরোপ ভারত থেকে সংগ্রহ করতো মশলা সুতীবস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় দ্রব্যাদি। রোম সাম্রাজ্যের পতন ও মুসলমান আরবের উত্থানের ফলে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মধ্য যুগে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে এই যোগাযোগ রক্ষিত হত। কিন্তু মোগল ও তুর্কী আক্রমণের ফলে এই যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়। তাছাড়া ভেনিসের সঙ্গে মিশরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশের পক্ষে প্রাচ্যে বাণিজ্য করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মূলতঃ বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এবং মুসলমান প্রাধান্য খর্ব করতে কলম্বাস আমেরিকা গিয়ে পৌঁছান ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের কোচিন বন্দরে এসে পৌঁছান ভাস্কো দা গামা।

এই ঘটনা থেকেই ভারতে পর্তুগীজদের আগমনের সূচনা। তারা এদেশে দেখলো মালাবার উপকূল হল এমন জায়গা যেখান থেকে তাদের পক্ষে ইন্দোনেশিয়ার মশলা সংগ্রহ যেমন সম্ভব তেমনি তাদের পণ্যসম্ভার এদেশে বিক্রির সুযোগও রয়েছে। আবার মিশরের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে আরবীয়গণ যে বাণিজ্য করতো তা-ও প্রতিহত করতে হলে মালাবার উপকূলের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যসাধনে তারা সহজেই সাফল্য পেয়েছিল। কারণ তাদের জাহাজগুলি অনেক উন্নতমানের যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দেশীয় নৌকার পক্ষে সম্ভব ছিল না।


ভাস্কো-ডা-গামা

অবশ্য পর্তুগীজ সাফল্যের পেছনে সর্বাধিক অবদান হল আল বুকার্কের। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়া দখল করেন এবং গোয়া ভারতে পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানীতে পরিণত হয়। গোয়া থেকেই মালাবার অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা হত।

ভারতে পর্তুগীজরা ব্যাপক রাজ্যজয়ের চেষ্টা করেনি। কিন্তু ভারতীয়দের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করতো। এদেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতি তারাই প্রচার করতো। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক প্রভাব দক্ষিণ ভারতের সুলতান ও মোগল

সম্রাটদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সুরাট বন্দরের যাতায়াত বাণিজ্যের উপর ও তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তারা শুল্ক আদায় করতো। তাছাড়া তাদের নিষ্ঠুরতাও বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু ভারতে পর্তুগীজরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিকশক্তিগুলি এক ত্রিকোণী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রথম দ্বন্দ্ব হল পর্তুগীজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের তারপর পর্তুগীজদের সঙ্গে ইংরেজদের এবং সবশেষে ওলন্দাজ আর ইংরেজদের দ্বন্দ্ব। বিদেশী বণিকদের দ্বন্দ্বের শেষ অধ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে। ভারতে পর্তুগীজদের ব্যর্থতার নানা কারণ। যেমন বিজয়নগর রাজ্যের পতনে তারা তাদের রাজনৈতিক সমর্থন হারায়, ব্রাজিল আবিষ্কৃত হওয়ায় তারা পশ্চিম গোলার্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ধর্ম বিষয়ে তাদের অসহিষ্ণুতা কেবল শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল, বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাদের সুনাম ছিল না। তাছাড়া একই সঙ্গে বিজাপুর, মোগল ও মারাঠা এই তিন শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

॥ ওলন্দাজ ॥

ইউরোপের বাইরে বাণিজ্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় পর্তুগীজরা সবচেয়ে বেশী বাধা পেয়েছিল ওলন্দাজদের কাছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ওলন্দাজগণ বাণিজ্য বিস্তারে অগ্রসর হয়। ১৫৯৫ সালে ওলন্দাজরা উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে যবদ্বীপে এসে পেঁছোয়। ১৬০২ সালে গঠিত হয় তাদের বাণিজ্যিক সংস্থা। মালাক্কার কাছে এক যুদ্ধে তারা পর্তুগীজদের পরাজিত করে। কিন্তু ভারত সম্পর্কে তারা বিশেষ আগ্রহী ছিল না। কেননা যবদ্বীপ অঞ্চলে বাণিজ্যই ছিল তাদের কাছে যথেষ্ট লাভজনক। আর তাদের এই অনাগ্রহ ইংরেজদের বিশেষ সুবিধে করে দেয়। কারই পর্তুগীজদের ব্যর্থতার পর ভারতে বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্প্রসারণে তাদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। ফরাসীরা আসে অনেক পরে। ততদিনে ভারতে ইংরেজ স্বার্থ অনেকটাই সুরক্ষিত।

অবশ্য ভারতের কালিকট, কোচিন, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ওলন্দাজদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। তারা কেবল এদেশে বাণিজ্যই করতো। পর্তুগীজদের মত তাদের কোন ধর্মীয় উন্মত্ততা ছিল না কিংবা এদেশে মিশ্র বিবাহ প্রথা প্রচলনের কোন চেষ্টাই তারা করে নি।

॥ দিনেমার ॥

দিনেমাররাও এদেশে বাণিজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তারা এক বাণিজ্যিক সংস্থাও গঠন করে। ট্রাঙ্কেবার ও শ্রীরামপুরে তারা কারখানাও স্থাপন করে। কিন্তু তাদের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নি। পরবর্তীকালে এই কারখানাগুলি ইংরেজরা কিনে নেয়।

॥ ইংরেজ ॥

১৬০০ সালের শেষ দিন স্থাপিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। আকবরের দরবারে জন মিড্‌নল্‌ নামে এক ইংরেজ আছেন। ১৬০৮ সালে আসেন হকিন্স। পর্তুগীজ বিরোধীতা সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর তাঁকে সুরাটে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। ১৬১৫ সালে ইংলন্ডের রাজার দূত হিসেবে আসেন স্যার টমাস রো। জাহাঙ্গীর তাঁকে সর্তসাপেক্ষে ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার দেন।

এরপর থেকেই ধীরে ধীরে ইংরেজ প্রাধান্য সম্প্রসারিত হতে থাকে। পূর্ব উপকূলে মসলিপত্তন ও মাদ্রাজ, বাংলায় সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা গ্রাম

পেয়ে ভারতে ইংরেজ প্রাধান্যের সম্ভাবনা সূচিত হয়। পর্তুগালের কাছ থেকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে ইংলণ্ডের রাজা পেয়েছিলেন বোম্বাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজার কাছ থেকে এই বন্দর লাভ করে ১৬৬৮ সালে। চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে ইজারা পায় মাদ্রাজের। বাংলার নবাবকে বার্ষিক ১২০০ টাকা দেওয়ার সর্তে ইংরেজরা সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার ইজারা পায়। ১৬৮৮ সালে ইংলণ্ডের রাজা হন উইলিয়ম। তাঁরই নামে কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম। বাংলা-দেশে ইংরেজ কর্তৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে প্রেসিডেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৮১ সালে। কাল-ক্রমে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভারতে ইংরেজদের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়।

॥ ফরাসী ॥

ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। এর আগেই তারা সুরাটে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করেছিল। গোলকুণ্ডার সুলতানের ফরমান নিয়ে তারা মসলিপত্তনেও কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। তখন ভারতে ওলন্দাজদের সঙ্গে ফরাসীদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সৌভাগ্যক্রমে তখন ফরাসীগণ পেয়েছিল ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ নামে এক বলিষ্ঠ নেতাকে। তিনি ওলন্দাজদের কাছ থেকে পণ্ডিচেরী দখল করে নেন। মার্তাঁর কৃতিত্বেই ফরাসীগণ ভারতের সুরাট, মসলিপত্তন, চন্দননগর, ঢাকা, কাশিমবাজার, বালেশ্বর, পাটনা, কালিকট প্রভৃতি স্থানে ফরাসী কারখানা স্থাপিত করে। পরে পশ্চিম উপকূলে মাহে ও কারিকলও ফরাসীদের অধিকারে আসে। কিন্তু ১৭১৪ সালে সুরাটে ফরাসী কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ভারতে ফরাসী মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের কৃতিত্ব দুমা ও ডুপ্লের। সে অন্য ইতিহাস।

ভারতে ইউরোপীয় দেশগুলি বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্বও লাভ করেছিল। তাদের এই প্রাধান্য লাভের মূলে ছিল ভারতীয় চরিত্রের দুর্বলতা এবং ভারতের শাসক শক্তির দুর্বলতা।

অন্যদিকে ইংরেজরা বোম্বাইকে কেন্দ্র করে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেষ্টা করে। এর মধ্যে বাংলায় বাণিজ্যিক শুল্ক নিয়ে বিরোধ বাঁধলে ঔরঙ্গজেব কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৬৯১ সালে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে অন্য কোন শুল্ক ছাড়াই বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পায় ইংরেজরা। বাণিজ্য ছাড়া ইংরেজরা জলদস্যুতাও করতো। তাদের অত্যাচারে তীর্থযাত্রীদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল দুঃসহ। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের কাছে তারা জলদস্যুতা বৃত্তি পরি-ত্যাগের অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই অঙ্গীকারও তারা রক্ষা করে নি। প্রকৃত পক্ষে সেই সময় পশ্চিম উপকূলে মোগল শাসন অব্যাহত রাখাই ছিল এক কঠিন কাজ। তাছাড়া মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তখন ঔরঙ্গজেব এতই বিব্রত যে অন্যদিকে মনো-যোগ দেবার সময়ও তাঁর ছিল না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই পেয়েছিল সরাসরি ইংলণ্ডের রাজার কাছ থেকে। তাই সেখানে তাদের ছিল নিজস্ব শাসন। ভারতীয় রাজার কোন অধিকার সেখানে ছিল না। মাদ্রাজেও ছিল ইংরেজ- দের দ্বৈত চরিত্র। ভারতীয় রাজার অনুগ্রহে এবং ইংলণ্ডের চার্টার বা নির্দেশ নামার জোরে সেখানকার শাসন কাজ চলছিল। অন্যদিকে মোগল সম্রাট ফারুক শিয়রের কাছ থেকে কোম্পানী যে ফরমান বা আদেশনামা লাভ করে তার ফলে বাংলায় ইংরেজ প্রাধান্য অনেক বেশী শক্তিশালী হয়। ভারতের ইতিহাস তখন তার গতিপথ পরিবর্তনের দ্বার প্রান্তে। সেই গতিপথ হল ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

India under the Mughals—Political unification of a large part of India—measures in connection with the assertion of the central authority—the Mughal rulers and Jagirdars—land revenue System—the rural society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—Special emphasis on the cultural life—art, architecture, paintings, literature—history-writing—music—some reference to distinctive regional cultures.



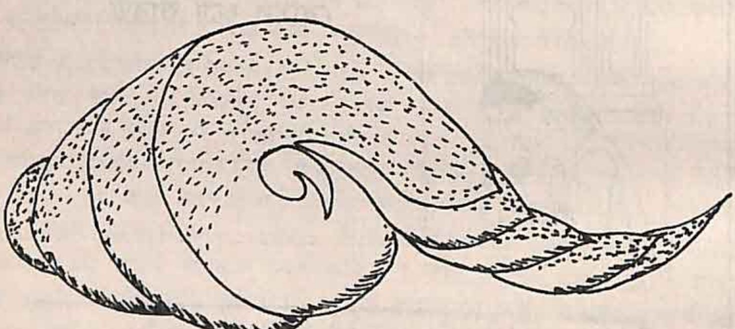
ষোড়শ অধ্যায়

মোগল যুগে ভারত



॥ বিষয়-ক্রম ॥

মোগল শাসনে ভারত—ভারতের বৃহত্তর অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য-স্থাপন—কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার প্রয়াস—মোগল শাসকগণ ও জাগীরদারগণ—রাজস্ব ব্যবস্থা—বিদেশীদের চোখে ভারতের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা—ব্যবসায়, শিল্প ও বাণিজ্য—ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ—সাংস্কৃতিক জীবন—শিল্পকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, ইতিহাস রচনা—সঙ্গীত—আঞ্চলিক সংস্কৃতির কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ।



মোগল শাসনের স্বরূপ

ভারতে মোগল শাসনের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে পার্সিভাল স্পীয়ার লিখে-ছেন যে ভ্রমণকারীদের বিবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক ইউরোপে মোগল সাম্রাজ্য তার আড়ম্বরময় ঔজ্জ্বল্যে এক রূপকথায় পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে এই সাম্রাজ্য এখনো যেন এক রূপ কথা, কারণ ভারতীয় জীবনযাত্রার চলমানতার সংগে স্বাংগীকৃত হয়ে এই সাম্রাজ্য অতি দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল, কারণ হিন্দু না হয়েও এই সাম্রাজ্য, ভারতীয় সাম্রাজ্য হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল।[১] প্রকৃতপক্ষে এখানেই মোগল সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয়ত্ব। দীর্ঘ ভারতের ইতিহাসে অন্য কোন রাজবংশ এত দীর্ঘকাল ব্যাপী তাদের নিরংকুশ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি।

এই দীর্ঘ শাসনের সবচেয়ে বড় সুফল হল তারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু স্থিতিশীলতা নয়, ঐক্যও প্রতিষ্ঠা করেছিল। সুদূর দাক্ষিণাত্য ব্যতীত আসমুদ্র হিমাচল ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতের গুপ্তবংশ ছাড়া অপর কোন রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে এমন রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। সারা ভারতব্যাপী একই প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করে, সম্রাটের মহামহিমান্বিত প্রতাপকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে সম্প্রসারিত করে, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করে মোগল রাজবংশ তাদের রণক্ষেত্রের ক্রমাগত সাফল্যকে স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু আকবরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলে অভিনন্দিত করেছেন। কোন সন্দেহ নেই আকবরের উচ্চকাংক্ষী দৃষ্টি পথে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল। যদুনাথ সরকার যথার্থই বলেছেন, দুশ' বৎসরের মোগল শাসন সমগ্র উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অঞ্চলকে দিয়েছিল একই সরকারী ভাষা, একই প্রশাসনিক ব্যবস্থা, একই মুদ্রা এবং একই যোগাযোগের সূত্র।[২] যে ভারত ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন, যে বিচ্ছিন্নতার খেসারৎ চিরকালই ভারতকে দিতে হয়েছে নানাভাবে সেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সাফল্যলাভ কম কৃতিত্বের কাহিনী নয়। ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে জয়েন্ট কমিটির (১৯৩৩-৩৪) রিপোর্টে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে ভারতের মোগল শাসন সমসাময়িক ইউরোপের রাজতন্ত্রের তুলনায় কোন কম তো ছিলই না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউরোপকেও অতিক্রম করে যায়।[৩]

॥ কেন্দ্রীয় শাসন ॥

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মোগল সম্রাটগণ যে অসাধারণ এবং অভূত-পূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন তার মূলে ছিল কর্মক্ষম যোগ্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন। বিজিত রাজ্যকে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজন যে সুংগঠিত শাসন ব্যবস্থার সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন মোগল সম্রাটেরা। তাই সেই শাসন ব্যবস্থাকে মূল লক্ষ্যের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করতে মোগল সম্রাটেরা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারতের মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের দেশে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুব সহজসাধ্য ছিল না। অথচ এই দুঃসাধ্য কাজেই

১ It has remained a legend in India because it lasted long enough to be part of the accepted order of things and because, though not Hindu, it was generally felt to be Indian. —Percival Spear.

২ The two hundred years af Mughal rule..geve to the whele of Northern Nndia and to much of the Deccan also, oneness of official language, official system and coinage and a popular lingua franca. —J. N. Sarker.

৩ The Mughal Emperors maintained a state which did not suffer by comparison with, if it did not surpass in splendour, the contemporary monarchy of Europe. —Report of the Joint Committee (1933-34).

মোগল সম্রাটদের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে তুলতে তাদের প্রথম পদক্ষেপ হল এক শক্তিশালী আমলাতন্ত্র গঠন। এই আমলাতন্ত্রই মনসবদারী প্রথা নামে পরিচিত। আমলাতন্ত্র সৎ, কর্তব্য পরায়ণ এবং উদ্যোগী করতে না পারলে একটি বিশাল দেশের শাসন পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই মোগল সম্রাটেরা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি বা ধর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে যোগ্যতাকেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার নিযুক্ত রাজ কর্মচারীদের মধ্যে যেন কোন কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য কতগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন কর্মচারীদের নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলির ব্যবস্থা করা। তাছাড়া রাজপদকে কখনোই বংশানুক্রমিক হতে দেওয়া হয় নি। বরং নিয়ম ছিল কোন মনসবদারের মৃত্যু হলে তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। এ অবস্থায় কর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠ না হয়ে উপায় ছিল না। কেননা তাদের সঞ্চয়ের উপর কখনো তাদের উত্তর পুরুষের অধিকার থাকতো না। অস্বীকার করার উপায় নেই মোগল আমলাতন্ত্রের সাফল্যের উপরই অর্জিত হয়েছিল মোগল সম্রাটদের যাবতীয় সাফল্য। পার্সিভাল স্পীয়ার বড় চমৎকার বলেছেন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মত সারা দেশব্যাপী আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারী প্রশাসন বিস্তৃত ছিল।[১]

ভারতের মত বহুধর্মাবলম্বীর দেশে কেন্দ্রীয় শাসনকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে মোগল সম্রাটগণ কতগুলি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

প্রথমটি হল মোগল সম্রাটগণ রাজপদের নিরংকুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের এই বিশ্বাসকে রাজপদের দৈবস্বত্ব মতবাদের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। ঐ মতবাদের মত তাঁরা নিজেদের ভগবানের প্রেরিত প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। তাই তাঁরাই ছিলেন সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস।

দ্বিতীয়টি হল মোগল সম্রাটরা স্বৈরতান্ত্রিক হলেও তারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। সম্রাটরা সর্বদাই তিনটি অবশ্য করণীয় কর্তব্যের কথা মনে রাখতেন। কর্তব্য তিনটি হল, আইনশৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের আয়তনকে সম্প্রসারিত করা এবং সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা। এই তিন কর্তব্য তাঁদের কর্মপথ নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে তাঁদের স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ ছিল না। সুতরাং তাঁদের স্বৈরতন্ত্রকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়।

তৃতীয়টি হল, নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মোগল সম্রাটগণ কতগুলি প্রথাকে মেনে চলতেন। যেমন প্রজাদের মিলিত আবেদন সাধারণতঃ সম্রাটরা অগ্রাহ্য করতেন না, দরবারে অভিজাতদের যৌথ পরামর্শ তাঁরা গ্রহণ করতেন, চলমান প্রথাকে তাঁরা মূল্য দিতেন, বিশেষ করে কৃষকদের ক্ষতি হতে পারে এমন সিদ্ধান্ত অনিবার্য না হলে তাঁরা গ্রহণ করতেন না। শাহজাহান পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। সম্রাটদের এই মনোভাব তাদের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

অনেকে মোগল শাসনকে সামরিক শাসন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু সম্প্রতি ইরফান হাবিব এই মতের বিরোধিতা করেছেন। একথা ঠিক মোগল শাসনে

---

[১] The government thus had a net work of authority spread, as it were, over the surface of Indo-Muslim society, a wiring system of political electricity.

—Percival Spear.

নিযুক্ত অধিকাংশ কর্মচারীই ছিলেন সামরিক কর্মচারী। ভারতীয় আফগানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেই তাঁদের এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। কিন্তু অসামরিক দায়-দায়িত্বও এই সব কর্মচারীদের পালন করতে হত। জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীকে যেভাবে মোগল শাসনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়।

॥ মোগল সম্রাট ও জায়গীরদার ॥

সুলতানী যুগে জায়গীরদারী প্রথা বলতে যা বোঝাতো তার সঙ্গে মোগলযুগের জায়গীর দান প্রথার মৌলিক পার্থক্য আছে। সুলতানী জায়গীর প্রথা বলতে বোঝতো কোন রাজকর্মচারীকে তাঁর রাজকর্তব্যের বিনিময়ে জমিদারী দান করা। সেই জমিদারীর উপর সুলতানের কোন নিয়ন্ত্রণই থাকতো না। ফলে কালক্রমে ও অনুকূল পরিস্থিতিতে সেই সব জায়গীরদারদের পক্ষে স্বপ্রধান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল। মোগল যুগে এই প্রথার চরিত্রগত ও প্রয়োগগত পরিবর্তন করা হয়।

মোগল শাসন-ব্যবস্থায় যে সব রাজকর্মচারী, যারা মনসবদারের পদমর্যাদা লাভ করতো, কখনো কখনো নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি জায়গীর হিসেবে পেত। এই জমির উপর ঐসব কর্মচারীদের কোন ব্যক্তিগত স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত না। এমন কি তারা ঐ জমির রাজস্বও স্থির করতে পারতো না। রাষ্ট্র রাজস্বের হার স্থির করে দিত এবং কর্মচারীদের ঐ নির্দিষ্ট হারে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হত। এই ধরনের জায়গীরকে বলা হত তনখা-জায়গীর। এই জায়গীর স্বভাবতঃই বংশানুক্রমিক ছিল না।

এ ছাড়া ছিল আরেক ধরনের জায়গীর—একে বলা হত ওয়াতন-জায়গীর। এই সব জায়গীর মনসবদার পদে নিযুক্ত সামন্ত-রাজাগণ বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করতো। এইসব জায়গীরের রাজস্ব সামন্ত রাজাগণই নির্ধারণ করতেন। মোগল-প্রশাসন বিশেষ হস্তক্ষেপ করতো না।

সকল প্রকার জায়গীর ভোগীদেরই মোগল আমলে বলা হত জমিদার, যদিও তাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ ছিল। মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় এদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সামন্ত-রাজাদের বলা হত পেশকশী জমিদার অর্থাৎ যাঁরা নির্দিষ্ট হারে করদানের প্রতিশ্রুতিতেই বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারী ভোগ করতেন। মোগল জমিদারী ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিল এঁদের স্থান। আর সর্বনিম্নে ছিল মালগুজারি জমিদার। জমির উপর এদের একটি স্বতন্ত্র স্বত্ব স্বীকৃত ছিল। এরাই চাষীদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতেন। বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পেতেন তাকে বলা হত নানকর অর্থাৎ সংগৃহীত ভূমিরাজস্বের একটি অংশ।

এই দুই স্তর জমিদারের মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন খিদমৎগুজারি জমিদার। এঁরা নিম্নতম জমিদারের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করতেন। তাছাড়া রাজস্ব সংগ্রহে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষায়ও তাঁরা সাহায্য করতেন। এতদ্‌ ভিন্ন আরেক ধরনের জমিদারও ছিল, তাদের বলা হত তালুকদার।

আইন যাই থাকুক জমিদাররা বা নিজ নিজ এলাকায় ছিলেন যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী। কৃষকদের তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতই ব্যবহার করতেন। নানা সময়েই রাজশক্তির সঙ্গে তাঁদের বিরোধ বাঁধতো। কারণ তাঁরা স্বভাবতঃই রাজস্ব বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারতেন না।

নানা নিয়ন্ত্রণ সত্বেও মোগল যুগে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ প্রত্যেক জমিদারই ছিল নিজ নিজ জাতি বা গোষ্ঠীর নেতা। তাই নিজ নিজ এলাকায় ছিল তাদের স্বাভাবিক প্রভাব। নিজ গোষ্ঠীর লোকদের নিয়েই গঠিত হত তাদের সেনাবাহিনী। তাই এই বাহিনীও ছিল তাদের কর্তৃত্বে।

তাছাড়া প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুবাদে কৃষকদের উপরও ছিল তাদের অখণ্ড প্রতাপ। অন্যদিকে মোগল সম্রাটরা যেহেতু রাজস্ব আদায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে শান্তিশৃংখলা রক্ষায় এদের উপরই বেশী নির্ভর করতেন সেহেতু এদের সঙ্গে তাঁরা বিরোধ এড়িয়ে চলতেন। এ কারণেই আকবর উদ্যোগী হয়েছিলেন এদের আধা-সরকারী কর্ম-চারীতে রূপান্তরিত করতে।

॥ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ॥

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মোগলগণ উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিলেন। সুলতানী আমলে ভূমি রাজস্বের না ছিল কোন সুনির্দিষ্ট নীতি, না ছিল কোন পদ্ধতি। তত্ত্বগতভাবে তাঁরা ইসলামীয় অনুশাসন অনুযায়ী চলতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের উপর উৎপীড়নই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।

শেরশাহই প্রথম সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় তাতে সেই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

আকবরই শেষ পর্যন্ত মূলতঃ শেরশাহ প্রবর্তিত পদ্ধতির ভিত্তিতে এক দীর্ঘ-স্থায়ী ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

আকবর প্রথমে প্রস্তুতি হিসেবে ভূমি-রাজস্ব নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু সেগুলি ব্যর্থ হলে তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডরমলকে দেওয়ান-ই-আসরফ পদে নিয়োগ করেন। এতকাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর উৎপাদন ও বাজারদরের ভিত্তিতে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হত। ফলে ভূমি-রাজস্ব থেকে কত আয় হতে পারে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই অসুবিধা দূর করতেই টোডরমল কতকগুলি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। টোডরমল তিন ধরনের ভূমি-রাজস্ব নির্ধাধণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। যথা ঃ জাবতি, গালাবক্স ও নাসক।

জাবতি পদ্ধতিতে একই ধরণের পরিমাপের ভিত্তিতে প্রথমে সমস্ত জমি জরিপের ব্যবস্থা করা হয়। উৎপাদনের ভিত্তিতে জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন পোলাজ, পরোটি, চাচর এবং বানজার। তারপর প্রতি শ্রেণীর গত দশ বৎসরের উৎপাদনের গড়কেই গড় উৎপাদন ধরা হয়। আর গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে নির্ধারিত হয়। রাজস্ব নগদে বা শস্যে দেওয়া যেত।

গালাবক্স প্রথায় বৎসরের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন রাজস্ব হিসেবে নেওয়া হত। আর নাসক প্রথায় অনুমানের ভিত্তিতে রাজস্ব স্থির করে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত।

রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দেওয়ানের অধীনে নানা কর্মচারী ছিল। আমিন ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী । জমি জরিপ, কর আদায়, দুর্নীতি রোধ, কর ফাঁকি—সবই ছিল আমিনের দায়িত্ব। বিটিকচি জেলা স্তরে জরিপ ও রাজস্ব আদায় করতো। জোতদার কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব নিয়ে রসিদ দিত। পাটোয়ারী রায়ত পিছু জমির ও দেয় খাজনার হিসাব রাখতো। কানুনগো ছিল জরিপ বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। আর আমিন নিজে জমি জরিপ করতো।

মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুফল হল এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব নির্ধারণ। রাজস্বের হার নির্দিষ্ট হওয়ায় কৃষকের উপর অত্যাচারের সুযোগ হ্রাস পেয়েছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের সাহায্যদানের ব্যবস্থাও ছিল। স্মিথ এই ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন, ভূমি রাজস্বের নীতিগুলি ছিল নির্ভুল এবং কর্মচারীদের প্রত্যাশিত নির্দেশই দেওয়া হত।[৫]

আকবরের সময়ের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার শৃংখলা জাহাংগীরের সময় রক্ষিত হয়

নি। কারণ তাঁর সময়ে জায়গীরদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে রায়তের সঙ্গে সরকারের সংযোগ কমে যায়। শাহজাহানের সময় ভূমি রাজস্বের হার বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তিনি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব ইজারাদারের উপর অর্পণ করেন। ঔরঙ্গজেবের সময় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটাতে ভূমি রাজস্বের হার আরও বাড়ানো হয়। জায়গীরদার ব্যবস্থায়ও সংকট ঘণীভূত হয়। ফলে কৃষকের উপর উৎপীড়ন বৃদ্ধি পায়।

॥ বিদেশীদের চোখে গ্রাম্যজীবন ॥

মোগল শাসনকালে বহু ইউরোপীয় ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন দুঃসাহসিক পর্যটক যেমন ফিচ্, মানুচি। কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী যেমন ট্যাভার্ণিয়ে। কেউ ছিলেন চিকিৎসক যেমন বার্ণিয়ে। আবার কেউ ছিলেন রাষ্ট্রদূত যেমন হকিন্স ও স্যার টমাস রো। এঁদের লিখিত বিবরণ থেকে মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সেই সব তথ্য থেকেই মোগল যুগের গ্রাম্য সমাজজীবনের একটা চিত্র উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে।

বার্ণিয়ে বলেছেন তখন ভারতীয় সমাজজীবনের ছিল দুটি ভাগ। হয় মানুষ উচ্চ পদাধিকারী হবে, নতুবা দুঃসহ জীবনযাপন করবে। অবশ্য ডঃ আর. কে. মুখার্জী, বার্ণিয়ের এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে ব্যবসায়ী চিকিৎসক প্রভৃতি এরাই ছিল সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। শাসক শক্তির লুব্ধ দৃষ্টি এড়াতে এরা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতো।

পেলসার্ট জানাচ্ছেন যে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তারা শীতবস্ত্র বা জুতা কিনতে পারতো না। উচ্চশ্রেণীর বাড়ীতে ভয়ে সামান্য বেতনে তারা কাজ করতো। তারা গ্রামে মাটির ঘরে বাস করতো। এদের আহার্য ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সাধরণতঃ সারা দিনে একবার মাত্র খেত। আহার্য ছিল চাল-ডাল মেশানো খিঁচুড়ি। শাহজাহানের শাসনকালের শেষ দিকে শাসন ব্যবস্থায় শৈথিল্য দেখা দিলে সাধারণ মানুষের জীবন আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। বার্ণিয়ে কিভাবে সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অত্যাচার করতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি মূর্তি পূজার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও গ্রামগুলে মুসলমানেরা হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতো বলে উল্লেখ করেছেন। বোল্‌ট, স্ক্রাফটোন প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে পণ প্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারের কথা বলেছেন। বার্ণিয়ে শাহজাহানের সময় দোকানদার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের উপর সরকারী কর্মচারীদের নানা নির্যাতনের ঘটনা নিজে দেখেছেন। লিনস্টন, হকিন্স, টমাস রো, বার্ণিয়ে লিখেছেন সাধারণ মানুষের অপরিসসীম দারিদ্র্যের কথা। দুর্ভিক্ষ বা আকালের সময় তাদের মধ্যে মড়ক লেগেই থাকতো ।বার্ণিয়ে, মান্‌রিক, মানুচি প্রভৃতি বলেছেন কৃষকদের উপর অত্যাচার বন্ধের জন্য ঔরংগজেব যে সব নির্দেশ জারী করেছিলেন গ্রামাঞ্চলে তার কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া হয় নি। কৃষকরা একই-ভাবে উৎপীড়িত হচ্ছিল। মোগল যুগের সমৃদ্ধ ও জাঁকজমক পূর্ণ শহরগুলির পাশে গ্রাম্যজীবন ছিল আক্ষরিক অর্থেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

॥ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ॥

ইউরোপীয়গণের মধ্যে ভারতে প্রথম আসে পর্তুগীজগণ। তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল আরবীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মশলা ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব লাভ। জলদস্যুতা করেই তারা তাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু ব্যবসার স্বার্থেই তাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসতি স্থাপন জরুরী হয়ে উঠলো। তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বাস

৭ The principles were sound and the practical instructions to the officials all that could be desired. —V. Smith.

করতে আসে নি। আসতো বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। ব্যবসা শেষে তারা পর্তুগালে ফিরে যেত।

অবশ্য তাদের অন্য একটি লক্ষ্যও ছিল। তা হল ভারতীয়দের খৃষ্টানধর্মে ধর্মান্তরিত করণ। এ কাজে তারা বলপ্রয়োগেও দ্বিধা করতো না।

জাহাঙ্গীরের সংগে তাদের সংঘর্ষ হয় তাদের জলদস্যুতা বৃত্তির জন্যই। একই কারণে শাহজাহান তাদের বাংলায় হুগলীর কুঠি থেকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু পশ্চিম উপকূলে গোয়ায় তারা বেশ শক্তিশালী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত পর্তুগীজগণ তাদের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশে একচ্ছত্রভাবে বাণিজ্য করতো। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যিক সংস্থা গঠন করে ভারতে আসতে থাকে।

ডেনমার্ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে ভারতের পূর্ব উপকূলে ট্রাংকেবারে কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পেরে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজদের লক্ষ্য ছিল জাভা ও সুমাত্রার মশলা ব্যবসায়ে প্রাধান্য। তারা ভারত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। ভারতকে তারা তাদের জাহাজের বিরতি স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে চাইতো।

ইংরেজরাও এসেছিল মশলার সন্ধানে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওলন্দাজদের প্রাধান্য দেখে তারা ভারতের দিকে সরে আসে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে তারা ভারতে বাণিজ্যিক অধিকার লাভে তৎপর হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের কাছে হকিন্স ও টমাস রোকে পাঠিয়ে এই অধিকারও পেয়ে যায়। গড়ে ওঠে তাদের বাণিজ্যিক কুঠি মশলিপত্তম, সুরাট, মাদ্রাজ ও কলকাতায়। বোম্বাইও তাদের হাতে এসে যায়।

তারাই ভারত থেকে উন্নত নৌশক্তির সাহায্যে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে। ফরাসীগণ পন্ডিচেরী ও চন্দননগরে শক্তিশালী কুঠি স্থাপন করে। ইংরেজ ও ফরাসীরা সমগ্র ভারতীয় বাণিজ্যকেই যে কুক্ষিগত করে ফেলেছিল তাই নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে এদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও তাদের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়।

॥ মোগল সংস্কৃতি ॥

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মোগল শাসনকাল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমান সাংস্কৃতিক চেতনায় যে সমন্বয়বাদী প্রয়াসের সূচনা হয় তা পরিপূর্ণতা অর্জন করে মোগল-আমলে। অস্বীকার করা যায় না এই সমন্বয়বাদী প্রবণতার ভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছিল সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ। এই দুই মতবাদ মনোজগতে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পরিক সহবস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। ভারতবর্ষ যেন গ্রহণ ও আত্মীকরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। শুধু প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। আর মধ্য যুগে সেই প্রত্যাশিত দুরতিক্রম্য নেতৃত্ব আসতে পারে কেবলমাত্র শাসক-শক্তির কাছে থেকে। পরম সৌভাগ্যের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে মোগল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সমন্বয়বাদী মহামতি আকবর। সেই সূচনা, আর সমাপ্তি দারাশিকোতে। এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালে ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এসেছিল এক মহাপ্লাবন। এই প্লাবনে প্লাবিত হয়েছিল সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগ। সমৃদ্ধ হয়েছিল ভারত-সংস্কৃতি। প্রগলভ হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ঐতিহ্য। সেই সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের পুণ্য প্রবাহে আজও ভারতবর্ষ একইভাবে গৌরবান্বিত।

॥ স্থাপত্য শিল্প ॥

স্থাপত্য শিল্পে মোগল যুগের অগ্রগতি ও সাফল্য এক কথায় অসামান্য। এই শিল্পের বহু নিদর্শন আজও অক্ষুণ্ণ এবং বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। ফার্গুসন মোগল স্থাপত্যে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু হ্যাভেল এই মত স্বীকার করেন না। জন মার্শাল মনে করেন ভারতের মত বিশাল দেশে কোন বিশেষ স্থাপত্য রীতি থাকা সম্ভব ছিল না. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হেতু নানা স্থাপত্য রীতির সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া ছিল সম্রাটদের ব্যক্তিগত অভিরুচি। আকবরের শাসনকালে স্থাপত্যে যে পারসিক প্রভাব ছিল তা আর পরবর্তীকালে ছিল না। এরপর মোগল স্থাপত্য প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় স্থাপত্য হয়ে ওঠে। মোগল স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর গঠনগত সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ, আলংকারিক কারুকর্ম ও সৌন্দর্য।

ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে বাবরের ধারণা উচ্চ ছিল না। তাই তিনি এক সময় কনস্টান্টিনোপল থেকে স্থপতি আনাবার কথাও ভেবে ছিলেন। তাঁর নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে পাণিপথের কাবুলবাগ ও সম্বলের জামা মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

নাতিদীর্ঘ সময়ে হুমায়ুণের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি। তবু তাঁর নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে পারসিক প্রভাব বেশী। উল্লেখযোগ্য নির্মাণ হল ফতেবাদের মসজিদ ও দিল্লীর দিনপানহ।

আকবরের শাসনকালেই যেন মোগল স্থাপত্য জন্মলগ্নেই পরিপূর্ণ যৌবন লাভ করে। তিনি নিজে নির্মাণ কার্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং বহু প্রাসাদের পরিকল্পনা নিজেই তৈরী করেন। যে ঔদার্যবোধ দ্বারা আকবর সুপরিচিত তারও বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই ঘটেছিল তাঁর স্থাপত্য শিল্পে। আগ্রা ও ফতেপুরসিক্রিতে তাই দেখি হিন্দু ও মুসলমান রীতির সমন্বয়। হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ ভারত ও পারসিক রীতির সমন্বয়ে নির্মিত। ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদে বুলন্দ দরওয়াজা, জামা মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস, যোধাবাঈয়ের বাসগৃহ, বীরবলের বাসগৃহ আজও তাঁর অমরত্বের বার্তা বহন করে। ফার্গুসন তাই ফতেপুরসিক্রিতে একটি মহৎ প্রাণের প্রতিবিম্ব দেখতে পান। এলাহাবাদের রাজপ্রাসাদও আকবরের কীর্তি।

জাহাঙ্গীর স্থাপত্য শিল্পে বেশী আগ্রহী ছিলেন না। তবু আগ্রার ইতমদ্-দৌল্লার সমাধি-সৌধ তাঁর স্থাপত্যবোধের পরিচায়ক। এই সৌধে পার্সি ব্রাউন মোগল সম্রাটদের সৌন্দর্য-চেতনার সামগ্রিক রূপ দেখতে পেয়েছেন।

স্থাপত্য শিল্প যেন তার পরিপূর্ণ যৌবনের যাবতীয় রূপ-রস-সুধা নিয়ে উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত শাহজাহানের রাজত্বকালে। তাঁর স্থাপত্য আলংকারিক কারুকার্য ও চিত্রময়তায় সমুজ্জ্বল। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে মোগল স্থাপত্য এ সময় বিস্তৃত হয়। দিল্লীতে তাঁর নির্মিত রাজপ্রাসাদ লালকেল্লায় দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মতি মসজিদ এবং জামা মসজিদ প্রভৃতি সৌধ নিজ নিজ সৌন্দর্য-সুষমায় ভাস্বর। তাঁর নির্মিত ময়ূর সিংহাসন সূক্ষ্ম শিল্প কারুকাজের এক চমৎকার নিদর্শন। কিন্তু শাহজাহানের স্থাপত্য-কীর্তির সর্বোচ্চ রূপ হল তাজমহল। ফাদার মানরিকের মতে তাজমহলের পরিকল্পনা জনৈক ভিনিসীয় স্থপতির। কিন্তু সমসাময়িক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে এই মতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। হ্যাভেলও বলেছেন যে তাজের পরিকল্পনা যে কোন বিদেশীর এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু শিল্প-চাতুর্যে ও সুষমায় তাজ পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় বলে পরিগণিত।

শাহজাহানের পর থেকে মোগল স্থাপত্যের অবনতি ঘটে। কারণ ঔরঙ্গজেব তাঁর

ধর্মীয় অনুদার নীতি, রক্ষণশীলতার এবং সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকার জন্য শিল্প-সংস্কৃতিতে মনঃসংযোগ করেন নি।

॥ চিত্রশিল্প ॥

মোগল চিত্রশিল্পও ভারত-সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মোগল চিত্র-কলায় ভারতীয় রীতির সংগে পারসিক ও চৈনিক রীতির সংমিশ্রণ হয়েছিল। বাবর ও হুমায়ুন পারসিক চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও আকবরের সময় এই শিল্প সম্পূর্ণ পৃথক এক নিজস্ব গতিবেগ খুঁজে পায়। আকবর আবদুস সামাদের অধীনে একটি পৃথক চিত্রশিল্প বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে শিল্পীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেন। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় পারম্পরিক শিল্প-রীতির কোন কোন বৈশিষ্ট্য মোগল শিল্পকলা গ্রহণ করেছিল।

জাহাঙ্গীরের সময় মোগল চিত্রকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। জাহাংগীর ছিলেন চিত্র-শিল্পে বিশেষ উৎসাহী এবং চিত্রকলার এক বিখ্যাত সমালোচক। তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। ফলে তাঁর সময়ের চিত্রে প্রকৃতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ ধরণের চিত্রাংকণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখান ওস্তাদ মনুসর। এ সময়েই ভারতীয় শিল্পী-গণ ইউরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হন। ফলে পরিপ্রেক্ষিত, নিসর্গ দৃশ্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি মোগল-চিত্রে স্থানলাভ করতে থাকে। খৃষ্টান ধর্মের বিষয়বস্তুও মোগল-চিত্রে পরিস্ফুটিত হয়। টমাস রো মোগল চিত্রশিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। পার্সী ব্রাউন বলেছেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সংগে মোগল-চিত্রশিল্পেরও অপমৃত্যু ঘটে। শাহজাহানের সময় চিত্রশিল্পের যা কিছু উন্নতি সম্ভব হয়েছিল আমীর-ওমরাহ-দের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কেননা সম্রাট নিজে ছিলেন স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে অতি উৎসাহী। এ সময় শোভাযাত্রা, শিকার, বিবাহানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল চিত্রের প্রধান উপজীব্য বিষয়। দারাশিকো ছিলেন চিত্রশিল্পের অত্যুৎসাহী অনুরাগী। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যু চিত্র-কলা চর্চার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিল।

ঔরঙ্গজেব ছিলেন শিল্পচর্চার বিরোধী। তাঁর আদেশে বহু চিত্রের বিকৃতিসাধন করা হয়। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধের চিত্রগুলি বিনষ্ট করা হয়। সরকারী চিত্র সংস্থাও তিনি বন্ধ করে দেন।

মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবানুগতা। এই সব চিত্রে শাসক ও অভিজাত-দের বিলাসবহুল জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। ঘটনার নাটকীয়তা ও প্রতিকৃতি অংকণে মোগল শিল্পীগণ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন।

॥ সংগীত ॥

মোগল সম্রাটেরা সংগীতের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আকবরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের রচনা অনুসারে আকবর সংগীতের এত ভাল সমঝদার ছিলেন যে সংগীতজ্ঞরাও ততটা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বিশ্ববিখ্যাত তানসেন ছাড়াও তাঁর সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত সংগীত সাধকেরা হলেন বাবা রামদাস, বৈজুবাওরা, সুরদাস প্রভৃতি।

জাহাঙ্গীরও যথেষ্ট সংগীত পিপাসু ছিলেন। শাহজাহানের সংগীতানুরাগও ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরও ছিল খুবই সুমিষ্ট। কিন্তু ঔরঙ্গজেব ছিলেন সংগীতের ঘোরতর বিরোধী। তিনি সাম্রাজ্যে নৃত্য-গীতের অনুশীলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন।

॥ সাহিত্য ॥

মোগল আমলে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ সম্ভব হয়ে-ছিল। মোগল সম্রাটেরা ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। মোগল দরবারে বহু খ্যাত-

নামা পণ্ডিত বিরাজ করতেন। বাবর নিজেই আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় সুলেখক ও কবি ছিলেন। হুমায়ুনের দরবারে বহু কবি ও দার্শনিক আসন অলংকৃত করতেন।

আকবরের সময় ফার্সী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়। তখনকার ফারসী সাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অনুবাদ ও কাব্য। তাঁর আদেশে বহু সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মহাভারতের বিভিন্ন অংশ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বদাউনি অনুবাদ করেন রামায়ণ। তাছাড়া অথর্ব বেদ, লীলাবতী, কাশ্মীরের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থও অনূদিত হয়। এ সময়ের বিখ্যাত কবি ছিলেন ঘিজালী, ফৈজী, নিশাপুরের হুসেন নাজিরী। আকবরের উদার নীতির ফলে হিন্দি সাহিত্যেরও অগ্রগতি হয়। মীর্জা আবদুর রহিম, ভগবানদাস, মানসিংহ, বীরবল সকলেই ছিলেন সুসাহিত্যিক ও কবি।

জাহাঙ্গীর নিজেও ছিলেন সুসাহিত্যিক। তাঁর সময়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মীর্জা গিয়াস বেগ, নাকিব খাঁ, নিয়ামৎ-উল্লাহ্ প্রভৃতি।

শাহজাহানের সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসেবী ও দার্শনিক হলেন তাঁরই পুত্র দারাশিকো। দারাশিকো আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর উৎসাহে উপনিষদ, গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়।

॥ ইতিহাস ॥

ইসলামীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী মোগল সম্রাটেরা ছিলেন ইতিহাস-প্রেমী। ইতিহাস-রক্ষায় তাঁদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বাবরের আত্মজীবনী 'বাবর নামা' এশিয়ার নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। হুমায়ুনের অনুচর জহর লিখেছিলেন তার্জাকরাৎ-উল-ওয়াকিয়াৎ।

আকবরের প্রিয়পাত্র আবুল ফজল ছিলেন একজন প্রতিথযশা ঐতিহাসিক। তাঁর রচিত গ্রন্থ দুটি আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরী। তাছাড়া আবদুল বাকি রচিত মাসির-ই-রহিমি, নিজামুদ্দীন রচিত তাবকাৎ-ই-আকবরী, বদাউনি রচিত মুন্তকাব-উল-তোয়ারিখ উল্লেখযোগ্য।

জাহাঙ্গীর রচিত তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী একটি উচ্চমানের ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ সময়ের অন্যান্য গ্রন্থ হল মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী, ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী।

শাহজাহানের সময় বাদশাহ-নামা ও শাহজাহান-নামা নামক গ্রন্থ দুটির রচয়িতা ছিলেন যথাক্রমে আবদুল হামিদ লাহোরী ও ইনায়েৎ খাঁ। ঔরংগজেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত হয় ফতোয়া-ই-আলমগিরি। কাফি খাঁ রচনা করেন মন্তখাব-উল-লবাব। তাছাড়া মীর্জা মহাম্মদ কাজিম রচিত আলমগিরি-নামা মহাম্মদ-সাকি রচিত মাসির-ই-আলমগিরি, ঈশ্বরদাস রচিত ফতোহ-ই-আলমগিরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ॥

মোগল সম্রাটদের প্রত্যক্ষ আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে এ সময় আঞ্চলিক সংস্কৃতি ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হল রাজপুত চিত্রশিল্প। মেবারে এই শিল্প-কলার বিকাশ হয়। একই চিফতলে বিন্যস্ত প্রায় সমতল এই যুগের চিত্রগুলির সাধারণ রূপ থেকে মনে হয় গ্রামীণ ঐতিহ্য থেকেই এদের উদ্ভব। এইসব চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল রেখা ও বর্ণের দ্বিমা-

ত্রিকতা ও প্রতিটি বর্ণের স্বাতন্ত্র্য। পরে মোগল চিত্রকলার প্রভাবে এদের আরও উন্নতি ঘটে।

মেবার ছাড়া রাজপুত চিত্রশিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র হল যোধপুর ও জয়পুর। এই দুই রাজ্যে বিষয় হিসেবে যুদ্ধবিগ্রহ ও শিকার প্রাধান্য পেয়েছে।



পত্রলেখিকা (কাংড়া)

রাজপুতনা ছাড়া পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলে চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়। কাংড়া অঞ্চলের শিল্পরীতি পাহাড়ী শিল্পরীতি নামে পরিচিত।

তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে শিল্প-সাধনা নিষিদ্ধ হলে শিল্পীগণ অযোধ্যার নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষ্ণৌতে মোগল চিত্রকলার একটি আলাদা রীতি গড়ে তোলেন।

আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা ও উর্দু ভাষার অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল কৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত, বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্য ভাগবৎ, জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য মঙ্গল, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমংগল ও কাশীরামদাস রচিত মহাভারত উল্লেখযোগ্য।

গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরে উর্দু সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করেছিল। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়ালি, হাতিম খাঁ প্রভৃতি।

হিন্দি সাহিত্যে তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস এক নবযুগের সৃষ্টি করে। অন্যান্য হিন্দি কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বপ্নাবৎ, কাণ্ডারাবৎ, মধুমালতী, চিত্রাবতী, সূর্য-সাহিত্য-লহরী ইত্যাদি।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Decline and desintegration of the Mughal Empire —beginning of the process during Aurangzeb's time—threats to the Mughal Empire from different quarters—drain on the imperial finance due to wars—implications of the fast increasing jagirs—while revenue income did not increase—increased factionalism in the Mughal court—different parties and functions—weakness of the successors of Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. furtrer consolidated their powers—central control over the different Saubas and regions gradually disappeared —effects of the invasion of Nadir Shah.

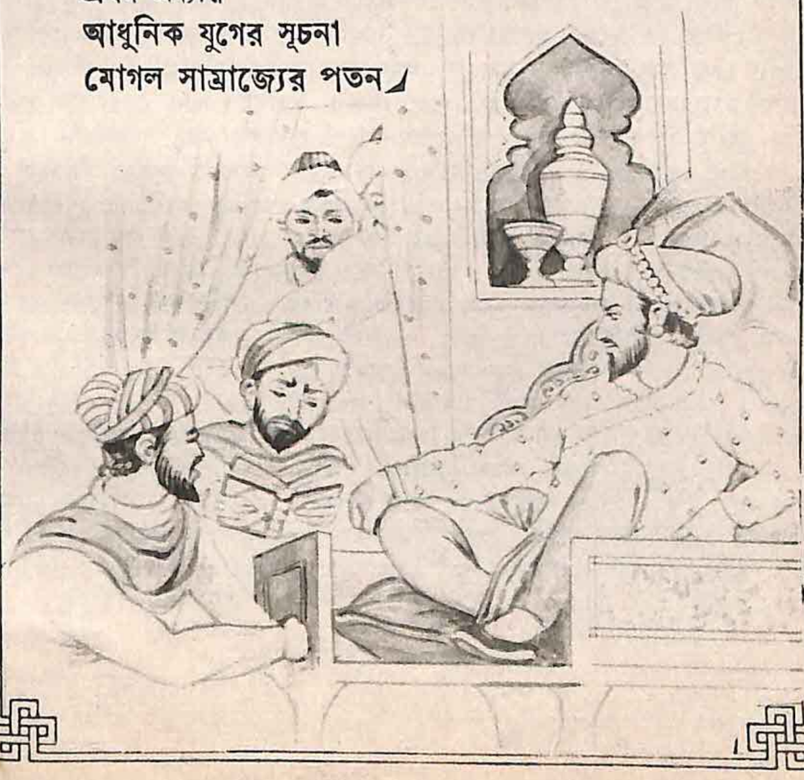
॥ বিষয়-ক্রম ॥

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু—অর্থনৈতিক পরিস্থিতি—অভিজাতদের ষড়যন্ত্র—মোগল দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব—ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ—নাদির শাহের আক্রমণ।

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক যুগের সূচনা

মোগল সাম্রাজ্যের পতন



মোগল সাম্রাজ্যের পতন

ঔরঙ্গজেবের জীবনাবসান হয় ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের শাসনেরও সমাপ্তি ঘটে সেই সঙ্গে। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গনের সূচনা হয়। তাঁর অনুসৃত ধর্মনীতি, দাক্ষিণাত্য নীতি, রাজপুত নীতি সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতিকে বিঘ্নিত করে সাম্রাজ্যের পতনের পথকে প্রশস্ত করেছিল, দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উৎসাহিত করেছিল।

গভীর হতাশায় ঔরঙ্গজেব তাঁর সারাজীবনের ব্যর্থতাকে উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের যে রক্তাক্ত পথে তিনি নিজে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন তাকে এড়াতে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন করে দিয়ে। কিন্তু তাতো সম্ভব ছিল না। কেন না তা ছিল মোগল ঐতিহ্য ও প্রথা বিরোধী। তাই তাঁর মৃত্যুর এক দশকের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংঘর্ষ ঘটেছিল সাতবার। আর সেই সব সংঘর্ষে নিহত হয়েছে যুবরাজ, অভিজাত এবং অসংখ্য সৈন্য, বিপর্যস্ত হয়েছে রাজকোষ আর সার্বিক অবক্ষয় ঘটেছে প্রশাসনের। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সংগে সংগে সমাধি ঘটে যায় মোগল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে ঔরঙ্গজেবের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না।

॥ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতেই মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা ঘনীভূত হয় ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষভাগে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ঔরঙ্গজেব যে শুধু রাজকোষকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন তাই নয়, দেশের শিল্প-বাণিজ্যকেও ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মোগল সৈন্যবাহিনী তাদের যাত্রাপথে বহু কৃষিক্ষেত্র নষ্ট করে ফেলেছিল। ফলে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের এই অচলাবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দেশের অর্থনীতির উপর। হতাশায়, ক্ষোভে কৃষকেরা কৃষিকাজ পরিত্যাগ করে দস্যুতার বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। দাক্ষিণাত্যের অস্থিরতার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও আয়ের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে সৈন্যবাহিনীর বেতনদানও সম্ভব হচ্ছিল না।

পরবর্তী মোগল সম্রাটদের শাসনকালে অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকতর সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কেন্দ্রে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে। তদুপরি ক্রমাগত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ এবং সম্রাটদের বিলাস বহুল জীবনযাত্রা রাজকোষের তলানিটুকুকেও নিঃশেষ করে ফেলেছিল। দেনা মেটাতে নিরুপায় মোগল সম্রাট একদিকে খালিসা জমিও বন্দোবস্ত দিতে থাকেন এবং আরও বেশী জায়গীর প্রদান করতে থাকেন। অথচ তখন জায়গীরদান প্রথার সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কারণ যেখানে জমির পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ সেখানে জায়গীরদারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে জায়গীর প্রদানের ঘোষণা আর বাস্তবে জায়গীরের অধিকার লাভের মধ্যে দীর্ঘ সময় কেটে যেত। অন্যদিকে জায়গীরদাররাও রাজস্বের দাবী মেটাতে মহাজনের কাছে এতটাই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে মহাজনদের কাছেই জমির বন্দোবস্ত করে দিতে বাধ্য হতেন। সুতরাং জায়গীরদারের সংখ্যা বাড়িয়ে মোগল সম্রাট আর্থিক সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে শেষ যে মরীয়া চেষ্টা করেছিলেন তাও ফলপ্রসূ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে জায়গীরদারের সংখ্যা বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়াবার কোন উপায় তখন ছিল না।

॥ অভিজাতদের ষড়যন্ত্র ॥

মোগল সাম্রাজ্যের এই সার্বিক সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ খুঁজে পাওয়া যেত যদি মোগল অভিজাতরা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী সাম্রাজ্যের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত

থাকতেন। একথা তো অস্বীকার করা যায় না মোগল সাম্রাজ্যের যে গৌরবোজ্জ্বল অতীত তার কৃতিত্ব অনেকটাই দাবী করতে পারেন নিবেদিত প্রাণ মোগল অভিজাত-রাই। কিন্তু সাম্রাজ্যের সংকটকালে যখন এই অভিজাতদের কাছেই প্রত্যাশা ছিল সব-চেয়ে বেশী, তখন তারাই হয়ে গেলেন বিলাসী, স্বার্থবাদী এবং ষড়যন্ত্রী। সাম্রাজ্য তার পতনোম্মুখ অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার শেষ স্তম্ভটিকেও এভাবে হারালো। বৈরাম খাঁর উত্তরাধিকারীদের আর অভিজাত না বলে বলা যায় সভাসদ যারা সম্রাটকে তোষা-মোদের প্রতিদ্বন্দ্বিতয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে সংকটের চরম মুহূর্তে মোগল সাম্রাজ্য বঞ্চিত হল সুযোগ্য প্রশাসকের নির্দেশনা থেকে, বঞ্চিত হল সুদক্ষ সেনা-নায়কের রণনৈপুণ্য থেকে, যা এতকাল সাম্রাজ্যের বেদীস্থলে স্বতোৎসারিত ছিল অভিজাত মহল থেকে।

॥ মোগল দরবারে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ॥

একদিকে অভিজাত সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা অন্যদিকে এদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে অনিবার্য পরিণতির দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মোগল দরবারের প্রভাবশালী অভিজাতগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছিল সম্রাটের উপর চাপ সৃষ্টি করে গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষায়। যদিও সম্প্রদায়গত পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অভিজাতদের গোষ্ঠীগুলি গঠিত হত তথাপি গোষ্ঠীস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য পেত। তাই তাঁরা দেশে কিছুতেই রাজনৈতিক স্থিরতা আসতে দিতে চাইতো না। দেশের স্বার্থ তখন উপেক্ষিত।

লক্ষ্যণীয় হল মোগল রাজবংশের শেষভাগে এই অভিজাতরাই সম্রাট বানানোর খেলায় মেতে উঠেছিল। মোগল রাজবংশে উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ যেন এক ঐতিহ্য। কিন্তু এতকাল রাজকুমাররাই ক্ষমতার জন্য লড়তো, ক্ষমতা-শালী অভিজাতগণ তাদের সমর্থন জানাতো মাত্র। কিন্তু এখন ক্ষমতার জন্য আসল লড়াই অভিজাতদের মধ্যে, আর এই লড়াইতে কেবলমাত্র সাফল্য পেতে অভিজাতদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে লাগলো যুবরাজগণ। যেমন জাহান্দার শাহ সম্রাট হয়েছিলেন নিজ যোগ্যতায় নয়, শক্তিশালী অভিজাত জুলফিকার খাঁ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন বলে। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের স্বার্থের তাগিদে ফারুকশীয়ারকে সম্রাট করেন, আবার স্বার্থ হানির আশংকায় তাঁকে অপসারিত করেন। এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন হয়ে-ছিল সম্রাটের বিরাগভাজন হয়েছিলেন বলে নয়, বরং তাদের থেকেও শক্তিমান অভি-জাত নিজাম-উল-মুল্‌ক এবং মহাম্মদ আমীন খাঁর উত্থান হয়েছিল বলে। সবচেয়ে বিপজ্জনক হল অভিজাতদের এই গোষ্ঠীগুলি আজকের মত মতবাদ ও কর্মসূচী নির্ভর কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, ছিল গোষ্ঠীগত তাৎক্ষণিক স্বার্থরক্ষার সাম-য়িক সংগঠন মাত্র। তাই প্রয়োজনে তারা দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করতো না।

আরভীন বলেছেন মোগল দরবারে এ ধরনের গোষ্ঠী ছিল অনেক। কিন্তু প্রধান ছিল চারটি—তুরাণী গোষ্ঠী, ইরাণী গোষ্ঠী, আফগান গোষ্ঠী এবং হিন্দুস্থানী গোষ্ঠী। প্রথম তিন গোষ্ঠী ছিল মধ্য এশিয়া, ইরাণ ও আফগানিস্থান থেকে আগত। এরাই ছিল মোগল আমলাতন্ত্রের মেরুদন্ড। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত তখন এদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এদের প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী ছিল হিন্দু-স্থানী গোষ্ঠী। যেসব বিদেশী মুসলমান ভারতে পুরুষানুক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল তারাই ছিল এই গোষ্ঠীভুক্ত। এরা রাজপুত, জাঠ ও অন্যান্য শক্তিশালী হিন্দু জমিদারদের সমর্থনপুষ্ট ছিল। তবে এই সব গোষ্ঠী ঠিক জাতিগত বা ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত ছিল না। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র যথার্থই বলেছেন ব্যক্তি স্বার্থ-

রক্ষার স্বার্থেই অভিজাতরা জাতি বা ধর্মের ধোঁয়া তুলতো এবং এদের গোষ্ঠীর গঠনে কোন জাতি বা ধর্মের ভিত্তি ছিল না।[১]

॥ ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ ॥

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ আরম্ভ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৬৫ বৎসর বয়স্ক বাহাদুর শাহ সাফল্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত রুচিবোধসম্পন্ন এবং যোগ্য। তিনি আপোষমূলক নীতি অনুসরণ করেন এবং ঔরঙ্গজেব অনুসৃত সংকীর্ণ নীতির পরিবর্তন করেন। তিনি অম্বরের রাজা হিসেবে জয় সিংহকে এবং মারওয়ারের রাজা হিসেবে অজিত সিংহকে স্বীকার করে নেন। মারাঠাদের সম্পর্কে তিনি দ্বিমুখী মনোভাবের পরিচয় দেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সরদেশমুখী আদায়ের দাবী তিনি স্বীকার করে নিলেও চৌথ আদায়ের অধিকার দেন নি। সাহুকেও তিনি মারাঠাদের বৈধ রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি। ফলে মারাঠা রাজ্যে তারাবাঈ এবং সাহুর মধ্যে অন্তর্কলহ চলতেই থাকে। সামগ্রিকভাবে ফল হল এই সাহু ও মারাঠা সরদারগণ অসন্তুষ্টই থেকে গেলেন এবং এই অঞ্চলে অস্থিরতারও অবসান হল না।

শিখদের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে বাহাদুর শাহ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহকে উচ্চ মনসব দান করেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরা আবার বিদ্রোহ করে। বাহাদুর স্বয়ং তাদের বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারেন নি। বুন্দেলা ও জাঠদের সঙ্গেও তিনি সমঝোতা করে নেন।

তাঁর সময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আরও অনবতি ঘটে। অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়। বাহাদুর শাহ এই সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু করার মত সময় তিনি পেলেন না। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর যোগ্যতা ছিল ঠিক। কিন্তু তিনি সিংহাসনই পেয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সে। ফলে সাম্রাজ্যের সংকট মেটাতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন ছিল সেই বয়সে তাঁর কাছে তা প্রত্যাশিতও ছিল না ডঃ সতীশ চন্দ্র এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন।[২]

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী অভিজাত জুলফিকার খাঁর সাহায্যে জাহান্দার শাহ সিংহাসন অধিকার করেন।

জাহান্দার ছিলেন দুর্বল ও বিলাসী। তাঁর সম্ভ্রমবোধ ছিল না। আচরণও ছিল শিষ্টাচার ও মর্যাদাবোধহীন। ফলে এই সময় সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার জুলফিকার গ্রহণ করেন। জুলফিকার সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা নিজের ভূমিকাকে নিরংকুশ করতে রাজপুত, মারাঠা ও হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে উদ্যোগী হন। তিনি জিজিয়া কর বাতিল করেন। অম্বরের রাজা জয়সিংহকে মালবের সুবাদার নিযুক্ত করেন। অজিত সিংহকে মহারাজা উপাধি দেওয়া হয় এবং তাঁকে গুজরাটের সুবাদার করা হয়। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহুর সঙ্গেও আপোষ করেন এই শর্তে যে মোগল কর্মচারীরাই দাক্ষিণাত্যে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করে মারাঠাদের দেবে। জাঠ ও বুন্দেলাদের সঙ্গেও মিত্রতা তিনি অক্ষুন্ন রাখেন। কেবল শিখদের সম্পর্কে

১ Slogans of race and religion were raised by individual nobles only to suit their convenience and the actual groupings but accross ethenic and religious divisions. —Prof. Satis Chandra.

২ He might have succeeded in evolving lasting solutions to some of the problems if he had lived longer. As it was he failed to reap any defininite political advantages from ris policy of coutious compromise and bequeathed to his successors a more difficult situation. —Dr. Satis Chandra.

তিনি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন।

জুলফিকার জায়গীরের সংখ্যা কমিয়ে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি মনসবদারদেরও তাদের নির্ধারিত পরিমাণ সৈন্য রাখতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি টোডরমল প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইজারাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ইজারাদারগণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ রাজকোষে জমা দিত, কিন্তু কৃষকদের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব অর্থ আদায় করতো। ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচার বহুগুণ বেড়ে যায়।

এদিকে মোগল দরবারে জুলফিকারের এই প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে অন্যান্য অভিজাত-দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তারা জুলফিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা সম্রাটকে জুলফিকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষিয়ে তুলতে থাকেন। এমন পরি-স্থিতিই প্রশাসনকে ধ্বংস করে ফেলে।

যাই হোক ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফারুকসায়ারের কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে জাহান্দার শাহর শাসনকালের অবসান ঘটে।

ফারুকসায়ার যে সাফল্যলাভ করেন তার কৃতিত্ব হল সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হলেন আবদুল্লা খাঁ এবং হোসেন আলী খাঁ। সুতরাং এবার প্রশাসন এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কুক্ষিগত হল। ফারুকসায়ারের শাসন করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। তিনি ছিলেন ভীতু, নিষ্ঠুর এবং অবিশ্বাসী। সর্বদা তিনি স্তাবকবৃন্দ দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রশাসনের উপর তাঁর কর্তৃত্ব কিছুটা কায়েম রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অন্যদিকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বাস করতেন সম্রাট যদি নামেমাত্রই সম্রাট থাকেন এবং তাদের উপর যদি সমগ্র প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে মোগল সাম্রাজ্য তার অবক্ষয় থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। ফলে সম্রাট ও তাঁর মুখ্য প্রশাসকদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফারুকশায়ারকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাটের পদ থেকে অপসারিত করে তাঁকে হত্যা করেন। এরপর দুইজন সম্রাট হন অল্প সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু উভয়েরই মৃত্যু হয় অতিরিক্ত মদ্যপানে। শেষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মহাম্মদ শাহকে মোগল সিংহাসনে বসান। ততদিনে সমগ্র প্রশাসনের উপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার স্বাধীনতাও মোগল সম্রাটের ছিল না।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মুসলমান অভিজাতদের সঙ্গে হিন্দু অভিজাতদের সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সাম্রাজ্য নিরাপদ হতে পারে না। তাই তাঁরা ফারুকসায়ার ও তাদের অন্যান্য প্রতি-দ্বন্দ্বী অভিজাতদের বিরুদ্ধে রাজপুত, মারাঠা ও জাঠদের সমর্থনলাভে উদ্যোগী হয়ে-ছিলেন। তাঁরা জিজিয়া ও তীর্থযাত্রা কর রদ করেন। বিভিন্ন উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করে তাঁরা রাজপুত জাতির সমর্থন লাভ করেন। তাঁরা সাহুর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

চারদিকে বিদ্রোহের প্রবণতা প্রতিহত করে তাঁরা মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মোগল দরবারের অন্তর্কলহ ও ষড়যন্ত্রে তাঁরা এই কাজে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এই পরিস্থিতি স্বভাবতঃই প্রশাসনিক দক্ষতাকে ব্যাহত করেছিল। চতুর্দিকে বিশৃংখলা বিস্তৃত হতে থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কারণ জমিদার ও বিদ্রোহী-গণ রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। রাজকর্মচারীগণ সেই সীমিত রাজস্বেরও অপচয়

আরম্ভ করেন। ইজারাদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণও হ্রাস পায়। ফলে কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর নিয়মিত বেতনদানও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনীতে দেখা দেয় বিশৃংখলা এমন কি বিদ্রোহর প্রবণতা।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অভিজাতদের মধ্যেও আপোষ ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা এক্ষেত্রে কোন সাফল্য পান নি। কারণ নিজাম-উল-মুলকের নেতৃত্বে অভিজাতদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরা ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিতে বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশেষতঃ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যখন ফারুকশায়ারকে হত্যা করার সাহসও দেখান তখন অন্যান্য অভিজাতগণ স্বভাবতঃই গভীরভাবে আতংকিত বোধ করতে থাকেন। কারণ শত হলেও সম্রাটকেও যদি হত্যা করা যায় তাহলে অন্য কারোরই আর কোন নিরাপত্তা থাকে না। তাছাড়া এই হত্যায় জন-মানসে ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল প্রবল। অনেক অভিজাত আবার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদারনীতি এবং হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই নীতি ছিল ইসলাম বিরোধী। তাঁরা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় জিগির তোলেন।

বিস্ময়ের হল এদের সঙ্গে সম্রাজ স্বয়ং যুক্ত হলেন। কারণ তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন। ফলে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে হোসেন আলি খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়। আর আবদুল্লা খাঁ আগ্রার কাছে এক যুদ্ধে পরাজিত হন। এইভাবে মোগল দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাধান্যের অবসান হল।

মহাম্মদ শাহ দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুব কম সময় নয়। সুতরাং মোগল পুনরুত্থানের সেটাই ছিল সর্বশেষ সুযোগ। তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখনও জনগণের মনে মোগল সম্রাটের একটা পৃথক মর্যাদা ছিল। মোগল সেনাবাহিনী, বিশেষ করে গোলন্দাজ বাহিনী তখনও যথেষ্ট শক্তিধর। উত্তর ভারতে শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছিল ঠিক, কিন্তু তখনও ভেঙ্গে পড়ে নি। মারাঠাদের গতিবিধি তখনও দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ। রাজপুতরা তখনও মোগল সম্রাটের প্রতি অনুগত। সুতরাং শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের সমর্থনে একজন বিচক্ষণ শাসকের পক্ষে পরিস্থিতির মুখ ফেরানো তখনও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মহাম্মদ সেই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটানোর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুর্বলমনা, ষড়যন্ত্রী এবং বিলাসী, আরাম প্রিয়। রাজকর্তব্য অবহেলা করে সুদক্ষ প্রশাসক নিজাম-উল-মুলককে সর্বতোমুখী সমর্থন না জানিয়ে তিনি স্তাবকবৃন্দ পরিবৃত হয়ে নিজের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, আবার সত্যি হলেও গভীর পরিতাপের যে তাঁর স্তাবকেরা অন্যায়ভাবে যে উৎকোচ নিতেন তার অংশ সম্রাট নিজেও গ্রহণ করতেন।

সম্রাটের অস্থির ও সন্দিগ্ধ চিত্ততায় এবং দরবারের নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে নিজাম-উল-মুলক এবার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে উজীর হবার পর যথার্থই তিনি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে উজীরের পদে ইস্তফা দিয়ে দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদে নিজ রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের যা কিছু মূল্যবোধ ও আনুগত্য তারও অবসান হয়। এবং এর সঙ্গেই মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

এখন থেকে অন্যান্য প্রভাবশালী অভিজাতগণ নিজ নিজ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বংশানুক্রমিক নবাব, যাঁরা এতকাল মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এসেছেন, এইবার সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে উৎসাহী। যেমন বাংলা, হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি। সাধারণ জমিদার, রাজা, নবাব প্রভৃতি এদের মধ্যেও সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়। মারাঠাগণও এই সময় উত্তর ভারতে তাদের আগ্রাসী নীতি প্রয়োগে অগ্রসর হয় এবং মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডে আক্রমণ চালায়। এই অবস্থাতেই ১৭৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন।

॥ নাদির শাহের আক্রমণ ॥

সামান্য মেষপালক থেকে নাদির শাহ পারস্যের শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হন এবং পারস্যকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। আর্ভিন বলেছেন নাদির কেবলমাত্র একজন সামান্য সমর নায়ক ছিলেন না, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতাও তাঁর ছিল।°

নাদির শাহ ভারতের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। এ সময় তাঁর যথেষ্ট অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় পারস্যের রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া নাদিরের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর জন্যও প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট অর্থের। তাঁর এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্র তাঁর কাছে ছিল অবশ্যই ভারতবর্ষ।

ভারতের তদানীন্তন আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও তাঁর লক্ষ্য পূরণের সহায়ক ছিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল উপেক্ষিত। ফলে লাহোর অধিকারের আগে পর্যন্ত কেউ নাদিরের আক্রমণের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয় নি। শেষ মুহূর্তে দিল্লী রক্ষার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অভিজাতগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারলো না। আক্রমণ প্রতিহত করার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিংবা সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদানের প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যমত আসতে পারলেন না। সুতরাং অসংবদ্ধ, উদ্দেশ্যহীন মোগল প্রতিরোধ বাহিনীকে নাদির অনায়াসেই কার্নালের যুদ্ধে পর্যুদস্ত করেন। সম্রাট মহাম্মদ শাহ নাদিরের হাতে বন্দী হলেন। নাদির দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। মোগল ব্যর্থতা সম্পর্কে ডঃ সতীশচন্দ্র বলেছেন যে মোগল অভিজাতদের সাহসী, কল্পনাপ্রবণ এবং মিলিত প্রয়াসের অভাবেই এই ব্যর্থতা। দিল্লীতে অবস্থান কালে নাদির চালালেন ব্যাপক লুটতরাজ এবং নৃশংস হত্যাকান্ড। তাঁর লুটের পরিমাণ ৭০ কোটি টাকা বলে ধারণা করা হয়। অন্ততঃ এই লুটের ফলে তিনি তাঁর নিজ রাজ্যে তিন বৎসর কোন করভার আরোপ করেন নি। যাবার সময় তিনি মোগল আভিজাত্যের প্রতীক কোহিনূর মণি এবং ময়ূর সিংহাসন সঙ্গে নিয়ে যান। শুধু তাই নয় তিনি সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের সকল অঞ্চল তাঁকে ছেড়ে দিতে মহাম্মদ শাহকে বাধ্য করেন।

ডঃ সতীশ চন্দ্রের মতে নাদির শাহের আক্রমণ বিশ্বের কাছে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা উন্মুক্ত করে দিল। বিশেষ করে যে সব ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থা এতকাল ভারতের উপকূলাঞ্চল থেকেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছিলো তারা ভারতের ইতিহাসের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল।

° Nadir Shah was no mere soldier, no savage leader of savage horde, but a master of diplomacy and states craft as well as of the Sword.
—Irvine.

এটা বিস্ময়কর যে নাদিরের প্রত্যাবর্তনের পর মোগল শক্তির পুনরুত্থানের একটা সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। কিন্তু তা যেন প্রদীপ নেভার আগে তার শেষ দীপ্তি। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আবার আরম্ভ হয় উত্তরাধিকারের বিরোধ আর আভিজাতদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তদুপরি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় নাদির শাহের অন্যতম সেনাপতি আহমদ্ শাহ আবদালির উপর্যুপরি ভারত আক্রমণের পথ সহজ হয়েছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তিনি মারাঠাদের পর্যুদস্ত করে ভারতে রাজনৈতিক শূন্যতাকে আরও গভীরে নিয়ে যান।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পর মোগল সাম্রাজ্য আর সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল না, পরিণত হয়েছিল দিল্লী কেন্দ্রিক একটি রাজ্যে। সেই দিল্লী ছিল তখন নিয়মিত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত এক বিভীষিকাময় শহর। মোগল সম্রাটেরা আর এখন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতার লড়াইয়ে নামেন না, কিন্তু তাঁদের অভিজাতরা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে মোগল সম্রাটের পদমর্যাদাকে ব্যবহার করতো মাত্র। তাই মোগল সম্রাট বলে একজনকে সিংহাসনে রাখা খুবই জরুরী ছিল। একমাত্র এই কারণেই মুমূর্ষু মোগল সাম্রাজ্যের প্রাণবায়ু নির্গত হতে এত দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম মোগল সম্রাট হন। সম্রাট হিসেবে তাঁর ছিল কিছু যোগ্যতা আর সাহস। তা সত্ত্বেও সম্রাট হবার পর তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে নিজের প্রধানমন্ত্রীর হাতে নিহত হবার আশংকায়। প্রবল প্রতাপান্বিত মহীয়ান মোগল সম্রাটের কি করুণ আর অসহায় পরিণতি! ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শাহআলম বাংলার মীর কাশিম ও অযোধ্যার সুজা-উদ-দৌল্লার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি দীর্ঘকাল এলাহাবাদে ইংরেজদের অবসর-কালীন ভাতা ভোগী হিসেবে অবস্থান করেন। তিনি ইংরেজ আশ্রয় ত্যাগ করেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। মারাঠাদের সাহায্য নিয়ে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন।

ইংরেজরা দিল্লী দখল করে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে। তখন থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইংরেজ আশ্রয়েই মোগল সম্রাট কোনমতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পরও মোগল সাম্রাজ্য যে টিঁকে ছিল তার একমাত্র কারণ হল দেশে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গণমানসে তখনও মোগল রাজবংশের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই প্রভাবকে ইংরেজরাও সমীহ করতো। তাই মোগল সম্রাটের পদমর্যাদাকে তারাও উপেক্ষা করে নি।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ার। তিনি বলেছেন মোগল সম্রাটেরা নিশ্চয়ই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা যে ইন্দো-পারসিক সংস্কৃতি ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন তা ছিল মূলতঃ বৈদেশিক অভিজাত-কেন্দ্রীক সভ্যতা। তাই সেই সভ্যতা ভারত ভূমির গভীরে প্রোথিত হতে পারে নি। আর তা না পারার জন্যই মোগল সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়া বিধ্বস্ত হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি ভারতবর্ষ সামলে নিতে পারে নি। জীবনধারা সম্পর্কে একটা ধারণা মাত্র দিয়েছিল মোগল শাসন, কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নয়। তাই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন বিকল্প শক্তির উত্থান হল না, উত্থান হল কতগুলি আঞ্চলিক শক্তির। সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবক্ষয় হয়েছিল আপোষকামী ও সহনশীল মানসিকতাও।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Growth of regional powers (emphasis on those whose encounters with the British affec.ed the later political scene).

(i) The regions to be particularly studied—Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs upto Guru Govind.

(ii) Growth and decline of Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha power—Third Battle of Panipath—its impact.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

বাংলা—মুর্শীদ কুলি খাঁ—আলীবর্দি খাঁ—হায়দরাবাদ—মহীশূর—অযোধ্যা—সাদাৎ খাঁ—সফদরজং—শিখ জাতির উত্থান—নানক—গুরু অঙ্গদ—গুরু অমর দাস—গুরু রামদাস—গুরু অর্জুন—গুরু হরগোবিন্দ—গুরু হররায়—গুরু হরকিষেণ—গুরু তেগবাহাদুর—গুরু গোবিন্দ সিংহ—মারাঠা জাতির উত্থান ও পতন—বালাজী বিশ্বনাথ—প্রথম বাজী রাও—বালাজী বাজী রাও—তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান



আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর কতগুলি স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। যেমন, বাংলা, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ, মারাঠা রাজ্য প্রভৃতি। এই শক্তিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষে পরিণত হয়। এদের মধ্যে কোন কোনটি মোগল সুবার সুবাদার থেকে স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়, কোন কোনটি মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন রাজ্য গঠন করে।

এই সব রাজ্যের শাসকেরা নিজ নিজ রাজ্যে আইনশৃংখলা কায়েম করেন, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। এঁরা স্থানীয় কর্মচারী বা জমিদারদের স্থানীয় কর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টাকে দমন করেন। এঁরা সামগ্রিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতেন, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

তবে এই সব রাজ্যের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল তারা অর্থনৈতিক সংকট অতিক্রম করতে পেরেছিল। ক্রমবর্ধমান জমিদার ও জায়গীরদারগণ তখন কৃষি থেকে ক্রমহ্রাসমাণ আয়ের ফলে বিক্ষুব্ধ ছিল। কৃষকদের অবস্থাও ছিল খুবই শোচনীয়। তাই তারা বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজতে অন্তর্বাণিজ্যের সংগে সংগে বহির্বাণিজ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত করতে পেরেছিল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বহুলাংশেই পুনরুদ্ধার করেছিল। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবসায়িক পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে কোন উদ্যোগই তারা নিতে পারে নি।

॥ বাংলা ॥

॥ মুর্শীদ কুলি খাঁ ॥

কেন্দ্রীয় মোগল রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের দুই অসাধারণ যোগ্যতা-সম্পন্ন শাসক মুর্শীদ কুলি খাঁ এবং আলীবর্দি খাঁ বাংলাদেশকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শীদ কুলি খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেও ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকেই দেওয়ান হিসেবে তিনিই ছিলেন বাংলার প্রকৃত শাসক। মোগল সম্রাটকে নিয়মিত রাজস্ব পাঠালেও তিনি স্বাধীন শাসকের মতই শাসন করতেন। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আশংকা থেকে বাংলাকে মুক্ত করে তিনি শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সময় জমিদারগণও ছিলেন অনেকটাই নিষ্প্রভ। ব্যতিক্রম কেবল প্রথমে সীতারাম রায়, উদয়নারায়ণ ও গোলাম মহম্মদ, তারপর সুজাত খাঁ এবং সর্বশেষে নাজাত খাঁর বিদ্রোহ। এদের বিদ্রোহ দমন করে মুর্শীদ কুলি সকল জমিদারী তাঁর প্রিয়পাত্র রামজীবনকে অর্পণ করেন। মুর্শীদ কুলি খাঁর মৃত্যু হয় ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে।

শাসক হিসেবে মুর্শীদ কুলি যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন। তাঁর সময়েই উড়িষ্যার শাসন দায়িত্ব বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সময়ই কলকাতার ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জন সুরম্যানের নেতৃত্বে মোগল সম্রাট ফারুক শায়ারের কাছে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। সুরম্যান সম্রাটকে যথেষ্ট উপঢৌকন দিয়ে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে এক ফরমান বা নির্দেশনামা লাভ করেন। এই নির্দেশনামা অনুসারে বাংলাদেশে ইংরেজদের কোম্পানীকে দস্তক বা বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়।

মুর্শীদ কুলির পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার নবাব হন। এই সময় বিহারের দায়িত্ব ভারও বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি ইংরেজ বণিকদের দস্তক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কোম্পানীর লবণ আটক করে বহু টাকা শুল্ক বাবদ আদায় করেন।

এই সময়ের বাংলার শাসকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতিতে ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। তাই তাঁরা স্থলপথ ও জলপথকে যাতায়াতের জন্য নিরাপদ করতে থানা ও চৌকি স্থাপন করেছিলেন। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসাও তাঁরা বন্ধ করেছিলেন। শুল্ক বিভাগের দুর্নীতি দমনেও তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা বি শী বাণিজ্য সংস্থা ও তাঁর কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে শুল্কদানে বাধ্য করেছিলেন। আলীবর্দি ইংরেজ ও ফরাসীদের তাদের কলকাতা ও চন্দননগরে অবস্থিত কুঠিগুলি সুরক্ষিত করতে অনুমতি দেন নি।

॥ আলীবর্দি খাঁ ॥

সুজাউদ্দীনের পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। তিনি ছিলেন অযোগ্য শাসক। এ সময়ই বিহারের সহকারী শাসক আলীবর্দি খাঁ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করে বাংলার নবাব হন।

আলীবর্দি দীর্ঘ সতের বৎসর বাংলার শাসন ভার বহন করেন। তাঁর সময়ে বর্গীর হাঙ্গামা বা মারাঠা আক্রমণ গুরুতর রূপ ধারণ করে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আলীবর্দি শত চেষ্টা করেও এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এক চুক্তি দ্বারা তিনি উড়িষ্যা মারাঠাদের হাতে অর্পণ করেন এবং মারাঠা পেশওয়াকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন।

তাঁর সময়েই বিহারের আফগানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা মারাঠাদের সংগে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করে। দ্রুত আলীবর্দি এই বিদ্রোহ দমন করেন।

আলীবর্দি ইংরেজ বণিকদের সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ইংরাজরাই বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ইংরেজরাও তাঁকে পছন্দ করতো না। কিন্তু আলীবর্দি ক্রমবর্ধমান ইংরেজ-প্রভাব খর্ব করতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নবাবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য প্রশাসক ছিলেন মুর্শীদ কুলি খাঁ। অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি নতুনভাবে জমি জরীপ করে বহু জায়গীরকে খালিশা জমিতে পরিণত করেন। রাজস্ব সংগ্রহে ইজারাদারী প্রথার প্রবর্তনও তিনি করেন। দুর্গতিকালে কিংবা ঠিক মত ভূমি রাজস্ব দেওয়ার জন্য তিনি কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যদিও তিনি যুক্তিসঙ্গত রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন এবং সকল প্রকার বে-আইনী কর আদায় বন্ধ করেন তথাপি জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে কর আদায় করতেন। তাঁর এই সব সংস্কারের ফলে বহু প্রাচীন জমিদার বহিষ্কৃত হয় এবং তাদের শূন্যস্থানে এক নতুন শ্রেণীর রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগ করা হয়।

সামগ্রিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে মুর্শীদ কুলি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। তাঁর সময়ে অধিকাংশ উচ্চপদ হিন্দুরাই অলংকৃত করতো। রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদেরই অগ্রাধিকার দিতেন। ফলে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে দাবী আদায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক শক্তি ব্যবহারের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল তা দমন করতে বাংলার নবাবগণ যথেষ্ট উদ্যোগী হন নি। অথচ সেই সময় এদের নিয়ন্ত্রণে আনার মত যথেষ্ট শক্তি তাঁদের ছিল। তাঁরা ইংরেজ সংস্থাকে মূলতঃ একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে ধরে নিয়েই খানিকটা উপেক্ষার মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তখনকার ঔপনিবেশিকতার অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্য-

বাদী স্বরূপ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। বহির্জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের অভাবেই তাঁদের বিচারবোধে এই বিভ্রম ঘটেছিল। নতুবা তাঁরা জানতে পারতেন এই সময়েই কিভাবে বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থা আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং লাটিন আমেরিকায় নির্মম ও অমানবিক শোষণকার্য চালাচ্ছিল।

বাংলার নবাবেরা সামরিক শক্তির অপরিহার্যতাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি। মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আলীবর্দি নিজ সামরিক শক্তির সীমাবদ্ধ সামর্থ নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন। তাঁরা তাদের কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমন কি তখন বিচার বিভাগের কর্মচারীগণও ছিলেন দুর্নীতি পরায়ণ। এই অবস্থার পরিণতি যে কি ভয়ংকর হতে পারে তা বোঝা গিয়েছিল পরবর্তীকালে যখন বিদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলি এই সব দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীদের পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে।

॥ হায়দরাবাদ ॥

দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদে স্বাধীন রাজ্যের স্থাপয়িতা হিসেবে নিজম-উল-মুলক চিহ্নিত হলেও এই স্বপ্ন প্রথম দেখেছিলেন প্রথম বাহাদুর শাহের উজীর জুলফিকার খাঁ। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বাহাদুর শাহের কাছ থেকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী লাভ করেন এবং তাঁর সহকারী দাউদ খাঁর সাহায্যে দাক্ষিণাত্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে জুলফিকারের মৃত্যুর সঙ্গে সংগে তাঁর স্বপ্নেরও মৃত্যু হয়।

ঐ বৎসরই নিজাম সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুকূল্যে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী লাভ করেন। কিন্তু ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে হোসেন আলি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অবশ্য ১৭২০ সালে হোসেন আলি নিহত হলে নিজাম পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের উজীর নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর প্রশাসনিক সংস্কারের সকল প্রয়াসে সম্রাটের বিরোধীতায় বিরক্ত হয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন এবং শিকারে যাবার অজুহাতে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন।

নিজামের এই আচরণে মোগল সম্রাট মহাম্মদ শাহ তাঁকে শায়েস্তা করতে মুবারিজ খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করে তাঁকে নিজামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নিজাম মুবারিজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। নিরুপায় সম্রাট তখন নিজামকেই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং তাঁকে আসফ খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

কিন্তু মারাঠা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত নিজামের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান প্রথম দিকে খুব সুখকর ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি মারাঠাদের দৃষ্টি উত্তর ভারতের দিকে আকৃষ্ট করে অব্যাহতি পান। তবু একবার তিনি প্রথম বাজী রাওয়ের কাছে পরাজিত হন। নাদির শাহের বিরুদ্ধে কার্নালের যুদ্ধেও তিনি মোগল সম্রাটকে অনুসরণ করেছিলেন।

সিডনী আওয়েন নিজামকে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং চতুর সুযোগ সন্ধানী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি হায়দরাবাদে যথার্থই একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কখনও প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি, কিন্তু তাঁর আচরণ ছিল একজন স্বাধীন শাসকের মতই তিনি নিজের প্রয়োজন মত যুদ্ধ করেছেন, সন্ধি করেছেন, উপাধি বিতরণ করেছেন জায়গীর দান করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর প্রভু মোগল সম্রাটের অনুমোদন প্রার্থনা করেন নি।

শাসক হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে। পূরণ চাঁদ নামে এক হিন্দু ছিল তাঁর দেওয়ান। দক্ষিণ ভারতে এক সুসংহত শাসন ব্যবস্থা

কায়েম করে তিনি সেখানে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বৃহৎ ও শক্তিশালী জমিদারগণকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন। রাজস্ব ব্যবস্থার দুর্নীতির উৎপাটনেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীর মত হায়দরাবাদেও উত্তরাধিকার নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়।

॥ মহীশূর ॥

ডঃ কালীকিংকর দত্ত মন্তব্য করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যখন উত্তর ও দক্ষিণে দুঃসাহসিক সামরিক ভাগ্যান্বেষী-দের উত্থান সম্ভব হয়েছিল। দক্ষিণে এমনি এক ভাগ্যন্বেষী হলেন মহীশূরের হায়দর আলী।

অষ্টাদশ শতকে মহীশূরে এক হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করতো। এই রাজবংশেরই মন্ত্রী ছিলেন নানরাজ। হায়দার আলী তাঁরই অধীনে একজন অশ্বারোহীর চাকুরী নিয়ে জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি নিজ যোগ্যতায় দ্রুত উন্নতি করেন। মারাঠা জাতির উত্থান ও ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি সেনাবাহিনীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। এই সেনাবাহিনীরই সাহায্যে তিনি হিন্দু রাজবংশকে অপসারণ করে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

হায়দর ছিলেন অত্যন্ত চতুর, বিচক্ষণ, বাস্তববোধসম্পন্ন এবং কূটনীতিবিদ। তিনি বুঝেছিলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভারতের যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেখানে বংশানুক্রমিক অধিকার বলে কিছু নেই, আছে সামরিকশক্তির প্রাধান্য। তাই প্রথমেই তিনি সামরিক বাহিনীকে আধুনিক পদ্ধতিতে এবং আধুনিক রণকৌশলে শিক্ষিত করে তোলেন। এরপর তিনি দদ, বেল্লাপুর, সেরা, বেদনুর প্রভৃতি স্থান দখল করেন এবং দক্ষিণ ভারতের জমিদারদের পদানত করেন।

হায়দরের এই শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে মারাঠা পেশোয়া মাধব রাও তাঁকে আক্রমণ করেন। হায়দর সাময়িকভাবে মারাঠাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু মাধব রাওয়ের মৃতার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা দুর্বলতার সুযোগে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের একাংশ দখল করে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন।

তাঁর এই শক্তি বৃদ্ধিতে নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ত্রিশক্তি জোট গঠন করে এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূর আক্রমণ করে। হায়দর কূটবুদ্ধি ও অর্থের সাহায্যে মারাঠা ও নিজামকে স্বপক্ষে নিয়ে এসে ইংরেজদের মিত্রহীন করে ফেলেন এবং ইংরেজ অধিকৃত কর্ণাট আক্রমণ করেন। দীর্ঘ দেড় বৎসর যুদ্ধ চলার পর হায়-দর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে পেঁছান। ভীত সন্ত্রস্ত মাদ্রা জের গভর্ণর হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষই পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরৎ দেয় এবং হায়দর কোন তৃতীয় শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হলে ইংরেজরা সাহায্য নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শেষ হয়।


হায়দার আলি

মাদ্রাজ সন্ধি ছিল প্রকৃতপক্ষে সামরিক যুদ্ধ বিরতি মাত্র। কারণ শীঘ্রই হায়দর অভিযোগ করেন ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করলে ইংরেজরা তাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য হায়দারকে

না দিয়ে সন্ধির শর্ত লংঘন করেছে। তাছাড়া হায়দর বুঝতে পারছিলেন ফরাসী মৈত্রী ছিল ইংরেজ মৈত্রী অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী। অন্যদিকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ফরাসী সাহায্যদানের ফলে ইংরেজরাও হায়দর-ফরাসী সম্পর্ক সুনজরে দেখে নি। ফলে ইংরেজরা যখন ফরাসী বন্দর মাহে আক্রমণ করে তখন হায়দরের পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হয় নি। এভাবেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। তিনি মারাঠা ও নিজামকে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোট গঠন করেন এবং কর্ণাট আক্রমণ করে দখল করেন। নিরুপায় ইংরেজরা মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে হায়দরকে নিঃসঙ্গ করে ফেলেন।

এ অবস্থাতেও নিঃশঙ্কচিত্তে হায়দর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু পোর্টো-নোভা ও ত্রিঙ্কোমালির যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এই সময়ই তাঁর সাহায্যার্থে এক ফরাসী নৌবহর দক্ষিণ ভারতে এসে পৌঁছানোয় হায়দরের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দরের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁর জীবদ্দশায় ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্ব অমীমাংসিতই থেকে যায়।

শুধু সামান্য অবস্থা থেকে ক্ষমতা সর্বোচ্চে পৌঁছেছিলেন বলেই নয়, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে হায়দর যেভাবে অসম-সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন তা তাঁর গভীর বাস্তববোধ, কূটনৈতিক জ্ঞান ও সামরিক দক্ষতারই পরিচায়ক। একথা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন।[২]

ভিনসেন্ট স্মিথ শাসক হিসেবে হায়দরকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলে বর্ণনা করেছেন।। কিন্তু এন. কে. সিংহ প্রমাণ করেছেন যে হায়দর আদৌ প্রজা-পীড়ক ছিলেন না। ধর্মীয় দিক থেকেও তিনি ছিলেন সহিষ্ণু। নিরক্ষর হয়েও তিনি যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তা উদাহরণ স্বরূপ। তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর তেজস্বিতা তাঁর স্বাধীনতা প্রেম ভারতের ইতিহাসে তাঁকে এক গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

॥ অযোধ্যা ॥

॥ সাদাৎ খাঁ ॥

অযোধ্যার স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সাদাৎ খাঁ বারহান-উল-মুলক। সাদাৎ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হন। তখন রাজ্যব্যাপী জমিদারগণ বিদ্রোহী। তারা ভূমি রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছে, নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করেছে, দুর্গ নির্মাণ করেছে এবং কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করেছে। এই অবস্থায় সাদাৎ অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁকে এই জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি জমিদারদের দমন করতে সফল হন এবং রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। বিদ্রোহী জমিদারদের অধিকাংশকেই নিজ নিজ জমিদারী ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জমিদারী প্রত্যর্পণের শর্ত ছিল এই যে তারা বকেয়া সহ রাজস্ব নিয়মিত জমা দেবে।

কিন্তু জমিদারদের বিদ্রোহী প্রবণতাকে নির্মূল করা যায় নি। পরবর্তী শাসক সফদরজং একথা সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন। যখনই নবাব অন্যত্র ব্যস্ত থাকতেন কিংবা তাঁর সামরিক শক্তি দুর্বল মনে হতে তখনই জমিদাররা বিদ্রোহের সুযোগ নিত।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সাদাৎ ভূমি-রাজস্ব সংস্কারে উদ্যোগী হন। রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি অভিন্ন নীতি অনুসরণ করেন এবং কৃষকদের জমিদারদের নির্যাতন থেকে

[২] Even the British acknowledged that the courage, determination and resourcefulness that they saw in Haidar in the conduct of military campaigns were rare something, that they had hardly come across earlier in India. —Bowring.

রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন।

বাংলার নবাবদের মত তিনিও হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর অধীনে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীই ছিলেন হিন্দু। ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকল বিদ্রোহী জমিদার সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ছিল সুশিক্ষিত। তাদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হত। তাঁর শাসন ছিল যথেষ্ট সুশৃংখল। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় স্বাধীনই হয়ে গিয়েছিলেন। অন্ততঃ অযোধ্যার শাসনভারকে তিনি বংশানুক্রমিক করে যেতে পেরেছিলেন।

॥ সফদরজং ॥

সাদাৎ খাঁর মৃত্যুর পর সফদরজং অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন। এলাহাবাদও অযোধ্যার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের উজীর পদেও নিযুক্ত হন।

তাঁর দীর্ঘ শাসনকাল অযোধ্যার শান্তি ও স্বস্তির সময়। তিনি যেমন বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করেন তেমনি মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করে অযোধ্যাকে মারাঠা আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখেন। তাঁকে রোহিলা ও পাঠানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। পাঠানদের বিরুদ্ধে তিনি মারাঠাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। পরে আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণ, পাঠান ও রাজপুত আক্রমণ থেকে মোগল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে তিনি পেশোয়ার সঙ্গে এক চুক্তি করেন। চুক্তি অনুসারে তিনি মারাঠাদের ৫০ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবে চৌথ আদায়ের অধিকার এবং আজমীর ও আগ্রার শাসনভার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কিন্তু পরে মারাঠাগণ সফদরের বিরোধী পক্ষে যোগদান করায় এই চুক্তি কার্যকরী হয় নি।

তিনি এক নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। শাসনকার্যে তিনিও হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর শাসনে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন একজন হিন্দু-মহারাজা নবাব রায়।

অযোধ্যার নবাবদের শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ শাসনের ফলে রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। লক্ষ্মৌ একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শীঘ্রই লক্ষ্মৌ-দিল্লীর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শহরের স্বীকৃতি লাভ করে। এখানকার হস্তশিল্প এসময় ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করে।

নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও সফদরজং ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। তাঁর ছিল এক-মাত্র পত্নী। প্রকৃতপক্ষে বাংলা, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা সবাই ছিলেন অতি উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা প্রায় সবাই অতি সরল, নিষ্ঠাবান জীবনযাপন করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক অভিজাত বিলাসী, আড়ম্বরপূর্ণ এবং উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করতেন না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদের প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ গ্রহণ করতে হয়েছে।

॥ শিখ জাতির উত্থান ॥

॥ নানক ॥

'শিখ' শব্দের অর্থ শিষ্য। নানকের প্রচারিত মতের অনুগামী যারা তাদের বলা হয় শিখ।

ভারতের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে নানক এক গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর মতে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং সৎ-জীবনযাপনই হল ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের একমাত্র উপায়। তবে সেই সান্নিধ্যলাভের জন্য প্রয়োজন গুরুর। গুরুর সাহচর্যেই ঈশ্বরানুভূতি উপলব্ধি করা যায়। নানক জীবনযাপনের প্রয়োজনে সৎ কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর

বাণীই ছিল সদিচ্ছার, সম্প্রীতির এবং সৌভ্রাতৃত্বের।

তাঁর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে ডঃ জি সি নারাং বলেছেন যে, নানক পাঞ্জাবের হিন্দুদের যে অবস্থায় দেখেছিলেন তা থেকে অনেক উন্নত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে যান। তাদের বিশ্বাস অনেক বলিষ্ঠ হয় উপাসনার পদ্ধতি অনেক পবিত্র হয় জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পায়, তারা এখন অনেক স্বাভাবিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।[৩] ক্যানিংহাম বলেছেন শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিভ্রান্তি থেকে নানক তাঁর অনুগামীদের মুক্ত করেন এবং তাদের চিন্তায় ও চরিত্রে একাগ্রতা নিয়ে আসেন।[৪] ডঃ তারাচাঁদ বলেছেন নানকের মতবাদের কঠোর নৈতিক ভিত্তি ভারতের অন্যান্য সমসাময়িক মতবাদ অপেক্ষা এই মতবাদকে এক বিশিষ্টতা দিয়েছে। ফলে এক আক্ষেপহীন মনোভাব থেকে একটি সংগঠিত ধর্মীয় সংস্থা গঠনের সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়েছিল।[৫] মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মুহূর্তের অনিশ্চিত অবস্থায় সেই সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

॥ গুরু অঙ্গদ ॥

গুরু নানক অঙ্গদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। গুরু অঙ্গদ গুরুমুখী ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। নানকের জীবন কাহিনী এই সময় সংকলিত হয়। তাঁর বাণীসমূহও গ্রথিত হয়। শিষ্যদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়। কথিত আছে হুমায়ুণ অংগদের আশীর্বাদ প্রার্থনায় এসেছিলেন।

॥ গুরু অমরদাস ॥

অঙ্গদের পর গুরু হন অমরদাস। তিনি গোবিন্দয়ালে এক শিখ উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন। লঙ্গরখানার ব্যবস্থার উপর তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিখ ধর্মাবলম্বী এলাকাকে বাইশ ভাগে বিভক্ত করে প্রতিভাগের দায়িত্ব এককেজন শিখের উপর অর্পণ করেন। শিখদের জন্য জন্ম ও মৃত্যুকালে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অমরদাসই শিখদের জন্য এক পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন। ফলে হিন্দুদের থেকে শিখগণ ক্রমেই দূরে সরে যেতে আরম্ভ করে এবং তারা নিজেরাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

॥ গুরু রামদাস ॥

গুরু রামদাসের সঙ্গে আকবরের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আধুনিক অমৃতসরের কাছে আকবর রামদাসকে পাঁচশত বিঘা জমি দান করেন। এখানেই রামদাস এক নতুন শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অমৃতসর ও সন্তোখসর নামে দুটি পুকুর তিনি খনন করেন। তাঁর সময়ে শিখধর্ম অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

॥ গুরু অর্জুন ॥

গুরু অর্জুন অমৃতসর শহরের নির্মাণ সম্পন্ন করেন। তারান, কাতারপুর শহরেরও তিনি নির্মাতা।

অর্জুনের সর্বাধিক কৃতিত্ব হল তিনি আদি গ্রন্থের সংকলণের কাজ সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে খুশবন্ত সিংহ বলেছেন গ্রন্থটি হিন্দুদের দেবতা বা খৃষ্টানদের ক্রুশ-এর মতো নয়। গ্রন্থটি হল উপাসনার উৎস, উপাচার নয়। শিখগণ এই গ্রন্থকে

---

৩ They have now become more fit to enter on the career of natural progress to which Nanak's successors were destined to lead them.
—Dr. G. C. Narang.

৪ Nanak extricated his followers from the accumulated errors of ages and enjoined upon them devotion of thought and excellence of conduct.
—Cunningham.

৫ Its spirit of uncompromise carried within the possibilities of martyrdoms and the seeds of an organised church. —Dr. Tarachand.

শ্রদ্ধা করে। কারণ তাঁদের গুরুর বাণী গ্রন্থে সংকলিত।[৩]

গুরু অর্জুন মসন্দ প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথা অনুসারে প্রত্যেক শিখকে তার উপার্জনের এক দশমাংশ গুরুকে দিতে হবে। তিনি শিখদের ঘোড়ার ব্যবসায় উৎসাহিত করেন।

আকবরের সঙ্গে সদ্ভাব থাকলেও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে গুরু অর্জুনকে হত্যা করা হয়। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় অর্জুন নাকি তাঁর বিদ্রোহী পুত্র খশরুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া দলে দলে হিন্দু ও মুসলমানদের শিখ ধর্মে দীক্ষা নেওয়াও জাহাঙ্গীর পছন্দ করেন নি। আরও বলা হয় লাহোরের দেওয়ান চন্দু তাঁর কন্যার সঙ্গে অর্জুনের পুত্রের বিবাহ দিতে চাইলে অর্জুন তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চন্দু জাহাঙ্গীরকে প্ররোচিত করেন।

ঘটনা যাই হোক, অর্জুনের হত্যা শিখদের মনোভাবের বিরাট পরিবর্তন আনে। সহসা যেন তারা উপলব্ধি করলো তাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। সুতরাং শুধু ধর্মই নয়, ধর্ম রক্ষার্থেই তারা যোদ্ধায় পরিণত হতে লাগলো।

॥ গুরু হরগোবিন্দ ॥

প্রথম থেকেই হরগোবিন্দ ছিলেন ঘোরতর মোগল বিরোধী। তিনি তাঁর অনুগামীদের মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। তিনি নিজে সাচ্চা পাদশাহ উপাধি নেন। যাবতীয় রাজকীয় প্রতীক তিনি গ্রহণ করেন। পরিধান করেন সামরিক পোষাক। অর্থের বিনিময়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছে চাইতেন ঘোড়া বা অস্ত্র। লাহোর সুরক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেন। অকাল তখ্‌ত তিনিই নির্মাণ করেন। তিনি অনেক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করেন।

হরগোবিন্দের এই নীতি সম্পর্কে সমালোচনা করে বলা হয় তিনি ধর্মের পথ ত্যাগ করে রাজনীতির পথে অগ্রসর হন। কিন্তু অন্যদিকে হরগোবিন্দ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সশস্ত্র প্রস্তুতি ছাড়া শিখদের রক্ষা করার কোন উপায় নেই।

জাহাঙ্গীর স্বভাবতঃই হরগোবিন্দের এই মনোভাবকে সহ্য করতে পারেন নি। তিনি হরগোবিন্দকে গ্রেপ্তার করে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখেন। কয়েক বৎসর পর তিনি মুক্তি পান।

কিন্তু শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর আবার বিরোধ বাঁধে। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে পাহাড়ে গিয়ে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।

॥ গুরু হররায় ॥

গুরু হররায়ের সময়ে মোগলদের সঙ্গে শিখদের সম্পর্ক মোটামুটি হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল।

॥ গুরু হরকিষেণ ॥

গুরু হবার তিন বছরের মধ্যেই হরকিষেণের মৃত্যু হয়।

॥ গুরু তেগবাহাদুর ॥

তেগবাহাদুরের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছায়। কারণ হিসেবে কেউ বলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের ইসলাম ধর্মে জোর করে দীক্ষিত করার চেষ্টায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যাই হোক ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে এনে হত্যা করেন। তাঁর হত্যা সমগ্র পাঞ্জাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। প্রতিশোধ

---

৩ It is the source and not the object of prayer or worship. Sikhs revere it because it contains the teachings of their Gurus.

—Khuswanta Singh.

স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শিখগণ।

॥ গুরু গোবিন্দ সিংহ ॥

গোবিন্দ সিংহ শেষ শিখ গুরু। আনন্দপুর ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। শিখদের তিনি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

তিনি খালসা প্রথার প্রবর্তন করেন। শিখদের জন্য কেশ, কৃপাণ, কাছা, কাংঘা ও কর পরিধানের নির্দেশ তিনি দেন। শিখদের পরিচালনার জন্য গুরুর পরিবর্তে পাঁচ পুরোহিতের সংগঠন তিনি গড়ে দিয়ে যান।

পার্বত্য প্রধানের অনুরোধে ঔরংগজেব তাদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে গুরু গোবিন্দের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনী পাঠান। গোবিন্দ পরাজিত হয়ে দমদমায় আশ্রয় দেন।

প্রথম বাহাদুর শাহের সংগে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। বাহাদুর শাহের আমন্ত্রণে দক্ষিণ ভারতে যাবার পথে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

গুরু গোবিন্দের কৃতিত্ব হল তিনি এক বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন এবং ভারতের ইতিহাসে এক নতুন গতিশীল শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের রক্ষক ছিলেন. তিনি ইসলাম বিরোধী ছিলেন, বিরোধী ছিলেন মোগল স্বৈরতন্ত্রের।

ক্যানিংহাম তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি পরাজিত জাতিকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেন. তাদের মধ্যে সামাজিক স্বাধীনতা ও জাতীয় অভ্যুদয়ের আকাংখা জাগ্রত করেন।[৭]

॥ মারাঠা জাতির উত্থান ও পতন ॥

ক্রমশঃ ক্ষীয়মান মোগল সাম্রাজ্যকে সর্বাধিক আঘাত হেনেছিল মারাঠা রাজ্য। প্রকৃতপক্ষে কেবল মারাঠাদেরই সেই শক্তি ছিল যার মোগল সাম্রাজ্যের পতন-জনিত শূণ্যতা পূর্ণ করার সামর্থ ছিল। মারাঠাদের মধ্যে ছিল বেশ কয়েকজন কুশলী সমর নায়ক এবং দক্ষ রাষ্ট্রনীতিবিদ কিন্তু মারাঠারা পারে নি. তার কারণ তাদের মধ্যে ছিল না ঐক্য, ছিল না তেমন কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে সামর্থ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তারা আঞ্চলিক শক্তিই থেকে গিয়েছিল।



গুরু গোবিন্দ সিংহ

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই শিবাজীর দৌহিত্র শাহু ছিলেন ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী। ঔরঙ্গজেব শাহু ও তাঁর মায়ের প্রতি বন্দী অবস্থায় খুবই সদয় ব্যবহার করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যদি শাহুর সংগে কোন রাজনৈতিক সমঝোতায় তিনি আসতে পারেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ শাহুকে মুক্তি দেন।

শাহুর মুক্তিলাভের পরই তার সঙ্গে তারাবাঈের বিরোধ আরম্ভ হয় মারাঠা জাতির নেতৃত্বের প্রশ্নে। এই বিরোধ নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মারাঠা সরদারগণ কোন না কোন পক্ষে যোগদান করেন। এই বিরোধের ফলেই মারাঠা

৭ He effectually aroused the dormant energies of vanquished people, and filled them with a loftly although fitful longing for social freedom and national ascendancy. —Cunningham.

শাসনে পেশোয়া পদের সৃষ্টি হয় এবং মারাঠা ইতিহাসে আরম্ভ হয় পেশোয়াতন্ত্র। প্রথম পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বালাজী বিশ্বনাথ।

॥ বালাজী বিশ্বনাথ ॥

শাহুকে তাঁর সকল শত্রুদের পরাভূত করতে বালাজী বিশ্বনাথ অসাধারণ সাহায্য করেছিলেন। কূটনীতির সাহায্যে তিনি অনেক শক্তিশালী মারাঠা সরদারকে শাহুর পক্ষে নিয়ে আসেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহু তাঁকে পেশোয়া পদে নিয়োগ করেন।

বালাজী শীঘ্রই সকল মারাঠা সরদারদের বশীভূত করেন। কেবল কোলাপুর দক্ষিণ যেখানে রাজারামের উত্তরাধিকারীগণ রাজত্ব করতো তা বাদে প্রায় সমগ্র মহারাষ্ট্রে তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁরই নেতৃত্বে পেশোয়াই মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত শাসকে পরিণত হন।

মোগল অভিজাতদের অন্তর্কলহের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তিনি মারাঠা শক্তি বিস্তারে তৎপর হন। তিনি জুলফিকারকে দাক্ষিণাত্যে চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে বাধ্য করেন। পরে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিপত্র অনুসারে দাক্ষিণাত্যের সকল সুবায় মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। বিনিময়ে মোগল সম্রাটের সাহায্যার্থে ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মারাঠাগণ দাক্ষিণাত্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তাছাড়া মারাঠাগণ বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা দিতেও প্রতিশ্রুতি দেয়।

চুক্তি অনুসারে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে বালাজী সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লীতে আসেন এবং ফাররুখশিয়ারকে সিংহাসন থেকে অপসারণে সাহায্য করেন। এই প্রথম বালাজী দিল্লীর করুণ অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। ক্রমশঃ উত্তর ভারত সম্পর্কে তাঁর উচ্চাকাংখা জাগ্রত হয়।

যথাযথভাবে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের উদ্দেশ্যে বালাজী সরদাদের পৃথকভাবে জমিদানের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার পেশোয়ার ব্যক্তিগত প্রভাব অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। অবশ্য কালক্রমে এই ব্যবস্থাই মারাঠা সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। কারণ এমনিতেই জায়গীর প্রথা মারাঠা সরদারদের যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলেছিল। তদুপরি চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের নামে দূরবর্তী মোগল অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তাদের অধিকতর উচ্চাকাংখী করে তোলে। যাই হোক ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বালাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মারাঠা শক্তির বিস্তার ঘটিয়েই তৃপ্ত ছিলেন। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ার কোন স্বপ্ন তাঁর ছিল না। কেননা তেমন সম্পদ তাঁর যে নেই এই বাস্তব বোধ তাঁর ছিল।

॥ প্রথম বাজীরাও ॥

বালাজীর পর পেশোয়া হন তাঁর পুত্র বাজীরাও। শিবাজীর পর তিনি ছিলেন গেরিলা যুদ্ধনীতির সর্বাধিক সফল প্রবক্তা। তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডের একাংশের উপর মারাঠা প্রাধান্য স্থাপন করেন। এই সময়েই মারাঠাদের গাইকোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি পরিবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে।

সারাজীবনই বাজীরাওকে নিজামের সঙ্গে বিরোধ করতে হয়েছে। নিজাম চেয়েছেন কোলাপুরের রাজা, মারাঠা সরদার এবং মোগল অভিজাতদের সাহায্যে পেশোয়ার ক্ষমতা খর্ব করতে। দুইবার তিনি মারাঠাদের সম্মুখীন হন যুদ্ধক্ষেত্রে, দুইবারই তিনি পরাজিত হন।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জঞ্জীরের সিদিদের বিরুদ্ধে অভিযান করে বাজীরাও তাদের বিতাড়িত করেন। তিনি পর্তুগীজদের অধিকার থেকে সলসেট ও বেসিন দখল

করেন।

মাত্র কুড়ি বৎসর সময়ের মধ্যে বাজীরাও মারাঠা রাষ্ট্রের চরিত্রই বদলে দেন মহারাষ্ট্রের রাজ্য থেকে একটি সাম্রাজ্যে রূপান্তর এবং যে সাম্রাজ্যের বিস্তার উত্তর ভারত পর্যন্ত এর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বাজীরাওয়ের। কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা হল তিনি কেবল রাজ্য জয়ই করেছেন, বিজিত রাজ্যকে সংহত করতে প্রয়োজনীয় শাসন কাঠামো তিনি গড়ে তুলতে পারেন নি।

॥ বালাজী বাজীরাও ॥

বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হন। তিনিও ছিলেন পিতার মতই যোগ্যতাসম্পন্ন। ১৭৪৯ সালে শাহুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্বভার পেশোয়ার উপরই অর্পণ করে যান। এত-কাল পেশোয়া পদ ছিল বংশানুক্রমিক এবং তারাই ছিল সাম্রজ্যের প্রকৃত শাসক। শাহুর নির্দেশে এই ব্যবস্থা আইনগত স্বীকৃতি পেল। এই ঘটনার প্রতীক হিসেবে মারাঠাদের মূল কর্মকেন্দ্র সাতারা থেকে পুণায় স্থানান্তরিত হল।

পিতার মতই তিনি রাজ্যজয়ের নীতি অনুসরণ করে চলেন। বার বার বাংলায় অভিযান চালিয়ে তিনি উড়িষ্যা দখল করেন। দক্ষিণে মহীশূর ও অন্যান্য অঞ্চলকে করদানে বাধ্য করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নিজামকে পরাজিত করে তিনি বিশাল এলাকা দখল করেন। মোগল সম্রাটের রক্ষাকর্তায় তিনি পরিণত হন। দোয়াব ও রাজপুতনা জয় করে মারাঠাগণ দিল্লী পৌঁছে ইমাদ-উল-মুল্ককে উজীর হতে সহায্য করে। পাঞ্জাব থেকে আহমদ শাহ আবদালীর প্রতিনিধিকে তারা বিতাড়িত করে। এর ফলেই আহমদ শাহ আরেকবার ভারত আক্রমণে প্রস্তুত হলেন মারঠাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে।

॥ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ॥

উত্তর ভারতের অধিকার নিয়ে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র হল পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ মারাঠা ও আহমদ শাহ আবদালীর মধ্যে। আহমদ শাহ রোহিলাখণ্ডের নাজির-উদ্-দৌল্লার ও অযোধ্যার সুজা-উদ্-দৌল্লার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। এই দুই রাজ্যই মারাঠা আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে বাজী রাও এক বিশাল সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীকে কার্যতঃ নেতৃত্ব দেন সদাশিব রাও ভাউ। তাছাড়া ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীও পাঠানো হয়। এই বাহিনীর নেতৃত্ব করেন ইব্রাহিম খাঁ। উত্তর ভারতে এসে তারা মিত্র খুঁজতে থাকেন। কিন্তু এই অঞ্চলের সবাই মারাঠাদের পূর্ব আচরণে ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। রাজপুত রাজ্য-গুলির আভ্যন্তরীণ শাসনে তারা হস্তক্ষেপ করে এবং বিপুল অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায় করে। অযোধ্যার প্রতি তাদের আচরণও ছিল এই রকম। তাদের ব্যবহারে শিখজাতিও ছিল অসন্তুষ্ট। জাঠরাও তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করতো। তদু-পরি তাদের সেনাপতিদের মধ্যেও ছিল না কোন সংহতি।

সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃসংগ অবস্থায় মারাঠাগণ আহমদ শাহের সম্মুখীন হল পানি-পথের রণক্ষেত্রে ১৭৬১-র ১৪ই জানুয়ারী। যুদ্ধে মারাঠারা পর্যুদস্ত হল। প্রায় আঠাশ হাজার সৈন্যসহ বিশ্বাসরাও ও সদাশিবরাও নিহত হলেন। বাজীরাও আরও সমর সম্ভার নিয়ে উত্তর ভারতে যাওয়ার পথে পরাজয়ের মর্মান্তিক খবর পান। এর-পর তিনি আর বেশী দিন বাঁচেন নি।

কোন সন্দেহ নাই এই পরাজয় মারাঠা মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করেছিল। তাদের ভারত-সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নবিলীন হয়ে গিয়েছিল।

বলা বাহুল্য পাণিপথের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক দিক নির্ণায়ক ঘটনা।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

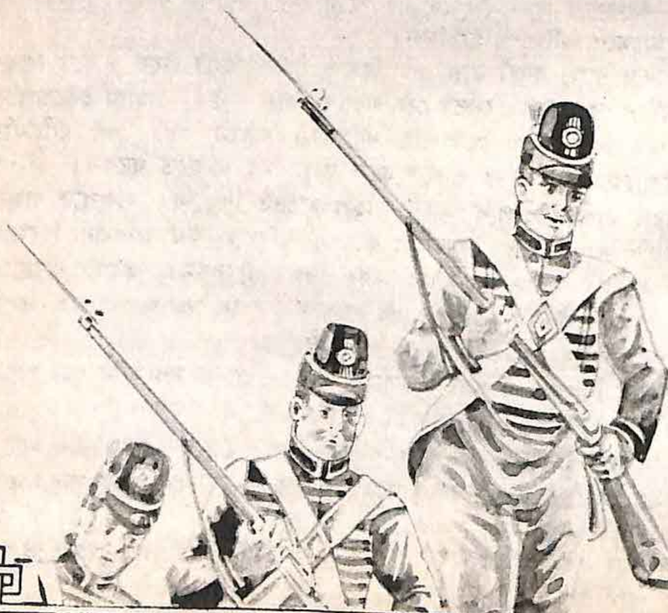
Growth of European commerce and conflict among European trading companies—Anglo-French conflict—Carnatic: the first area of conflict—Effects of the Anglo-French rivalry in Europe and elsewhere—War of Austrian Succession and Seven Year's War—Reaction of Carnatic rulers to the growing conflict—Result of the wars—causes of French failure.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্ব—প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ—দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ—তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ—ফরাসী ব্যর্থতার কারণ।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিস্তার ও স্বার্থের সংঘাত



ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুরাটই ছিল ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দীর্ঘ সময় অবধি তারা মোগল দরবারে আবেদন নিবেদন করে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করতো। ১৬২৩ সাল নাগাদ তারা সুরাট, ব্রোচ, আমেদাবাদ, আগ্রা এবং মশলীপত্তমে কুঠি স্থাপন করেছিল। সূচনা থেকেই ইংরেজরা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কূটনীতির সাহায্যে যে সব অঞ্চলে তাদের কুঠি ছিল সেই সব অঞ্চলকে সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট ছিল। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তারা সুরাটকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করলে সেখানকার কুঠির কর্তৃপক্ষদের গ্রেপ্তার করা হয়। একইভাবে ইংরেজ জলদস্যুরা মোগল জাহাজ আক্রমণ করলে সুরাটের কর্তৃপক্ষকে বন্দী করা হয় এবং আঠারো হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ভারত ছিল তাদের কার্যকলাপের পক্ষে খুবই উপযোগী। কারণ সেখানে কেন্দ্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব তত প্রবল ছিল না। বিজয়নগরের পতনের পর দক্ষিণ ভারত কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এদের প্রলুব্ধ করা বা ভীতি প্রদর্শন করা খুব কঠিন ছিল না। দক্ষিণে ইংরেজরা তাদের প্রথম কুঠি স্থাপন করে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মশলীপত্তমে। কিন্তু ১৬৩৯ সালে স্থানীয় রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজ পেয়ে তারা সেখানে সরে আসে। রাজা তাদের মাদ্রাজ সুরক্ষিত করার এবং শাসন করার অধিকারও দিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তারা মাদ্রাজের উপর তাদের সার্বভৌমত্ব দাবী করে এবং সেই দাবী প্রতিষ্ঠায় তাদের অস্ত্রধারণেও দ্বিধা ছিল না। উল্লেখযোগ্য হল প্রথম থেকেই ইংরেজরা ভারতীয় ভূখণ্ড জয় করে ভারতীয়দের কাছ থেকেই অর্থ দাবী করতো।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা পর্তুগালের কাছ থেকে বোম্বাই লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। বোম্বাই ছিল অনেক বৃহৎ ও সুরক্ষিত বন্দর। তাছাড়া মারাঠা শক্তির উত্থানে সুরাটে তাদের ব্যবসা অনিশ্চিত হয়ে যায়। ফলে সুরাটের পরিবর্তে ক্রমশঃ বোম্বাই পশ্চিম উপকূলে তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়।

পূর্ব ভারতে কোম্পানী প্রথম কুঠি স্থাপন করে উড়িষ্যায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে। ১৬৫১ সালে তাদের বাংলার হুগলীতে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়। শীঘ্রই তারা পাটনা, বালাশোর, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তারা বাংলাতেও স্বাধীন বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইলো। তারা একদিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে সহজ সাফল্যে উৎসাহিত হয়েছিল, অন্যদিকে মারাঠাদের সঙ্গে ঔরংগজেব যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাদের কাছে এক সুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। স্বভাবতঃই এখন তারা স্বপ্ন দেখতে লাগলো এমনভাবে রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে যার ফলে মোগলেরা তাদের স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার দিতে বাধ্য হবে, ভারতীয়দের বাধ্য করা যাবে সস্তায় তাদের কাছে জিনিষ বিক্রি করতে, কিন্তু তাদের জিনিষ উচ্চদামে কিনতে, তাদের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দূরে সরিয়ে দিতে এবং ভারতীয় শাসকশক্তির সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে এদেশে বাণিজ্য করতে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তি অর্জিত হলে এদেশের রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থাতেও তারা অংশ নিতে পারবে এবং এর ফলে যে আয় হবে তা দিয়েই তারা রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম বিরোধ হয় ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজরা তখনও পরিস্থিতি ও মোগল শক্তি ঠিকমত পরিমাপ করতে পারে নি। ফলে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বাংলার সবকটি কুঠি থেকে তারা বিতাড়িত হয়। সুরাট মশলীপত্তম এবং ভিজাগাপত্তমের কুঠিও অধিকৃত হয়। দখল করা হয় বোম্বাই দুর্গও।

পরাজয়ের পর ইংরেজরা আবার আবেদন-নিবেদনের পথ ধরে। ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিয়ন্ত্রণেই বাণিজ্য করতে তারা স্বীকৃত হয়।

ঔরঙ্গজেবও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কারণ তাঁর পক্ষে এই বাণিজ্য সংস্থার গূঢ় অভিসন্ধি অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বরং তিনি মনে করতেন ইংরেজদের বাণিজ্যের ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদেরও যথেষ্ট লাভ হচ্ছিল। তাই রাজকোষের উপার্জনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার থেকেও বড় কথা হল যদি তারা ভারত থেকে বিতাড়িত হতো তাহলে ভারতের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারতো। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের দিক থেকে তাদের ক্ষমা না করে কোন উপায় ছিল না। ১৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে ইংরেজরা পুনরায় বাণিজ্যিক অধিকার পেল। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা বিনিময়ে তারা বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ পায়। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তারা সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী লাভ করে। এই তিনটি গ্রাম এক সংগে মিলে পরে কলকাতা শহরের সৃষ্টি হয়। এখানেই তারা নির্মাণ করে ফোর্টউইলিয়ম। ১৭১৭ সালে তারা মোগল সম্রাটের কাছ থেকে যে নির্দেশনামা লাভ করে তার ফলে তাদের অর্জিত সুযোগগুলিরও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতেও এইসব সুবিধা সম্প্রসারিত হয়।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি ও আলীবর্দির মত শক্তিশালী শাসক। তাঁরা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কখনও তাদের প্রাপ্ত সুযোগের অপব্যবহার হতে দিতেন না। এমন কি কলকাতাকে সুরক্ষিত করতেও ইংরেজদের তাঁরা অনুমতি দেন নি। ফলে তারা নবাবের অধীনে সামান্য জমিদারই থেকে গিয়েছিল

যদিও তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা এভাবে ব্যাহত হয়েছিল তথাপি বাণিজ্যে তাদের অগ্রগতি হয়েছিল অভাবনীয় গতিতে। ইংলণ্ডে ভারতীয় সূতী ও সিল্ক বস্ত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল নিজেদের বস্ত্রবয়ন শিল্পের সংরক্ষণের স্বার্থে। দেখা যাচ্ছে যেখানে তারা ভারতে মুক্ত বাণিজ্যের অধিকার দাবী করছিল সেখানে নিজ দেশে তারা ছিল সংরক্ষণবাদী।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা ইংরেজ-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়। এই সব নগরে আকৃষ্ট হয় বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মহাজন। কারণ একদিকে এই সব স্থানে যে নতুন বাণিজ্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রলোভন, অন্যদিকে অন্যত্র মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গনের ফলে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে অনেক স্থিতিশীল ঐ সব স্থান। ফলে এখানে জনসংখ্যাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। উল্লেখযোগ্য হল এই তিন জায়গাতেই ইংরেজদের বসতি ছিল সুরক্ষিত এবং সেগুলি ছিল সমুদ্র সান্নিধ্যে যেখানে ইংরেজ নৌবহর সর্বদাই মোতায়েন থাকতো। ফলে বিপদে তাদের পালিয়ে যাবার পথ যেমন ছিল, তেমনি সুযোগে ক্ষমতা বিস্তারের কাজেও ব্যবহৃত হতে পারতো ঐ নৌবহর।

॥ ফরাসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ॥

ইংরেজরা ভারতে আসার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে ফরাসী বাণিজ্যতরী ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে দিউ বন্দরে এসে পৌঁছায়। কিন্তু তাদের পেছনে দেশের রাজশক্তির সমর্থন না থাকায় তারা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কিন্তু সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকালে অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাঁর মন্ত্রী কোলবার্ট এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় ফরাসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই কোম্পানী গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ফরাসী সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়

সূচিত হয়। এই অধ্যায়কে তিনটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথম পর্বে ফরাসীগণ ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়। দ্বিতীয় পর্ব হল তাদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিকাল। তৃতীয় পর্ব ইংরেজদের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষের কাল।

প্রথম পর্বে ভারত সম্রাট তখন ঔরঙ্গজেব। ফরাসী কোম্পানী তাঁর কাছে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে বারবার নামে এক দূত প্রেরণ করেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে সুরাটে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি অর্জন করেন এবং সেই অনুসারে কুঠি নির্মিত হয় ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে। দু বৎসর পর আরেকটি কুঠি তাঁরা নির্মাণ করেন মশলীপত্তমে। তখন ভারতে ফরাসী কোম্পানীর অধিকর্তা ছিলেন ফ্রান্সিস ক্যারণ। তাঁর নেতৃত্বে ফরাসী বাণিজ্যের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। কিন্তু ফরাসী সেনাপতি দ্য লা হে-র সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মার্টিন। মার্টিন তাঁর পূর্বসূরীর তুলনায় অনেক বেশী যোগ্য ছিলেন। কূটনৈতিক দক্ষতাও তাঁর ছিল অসাধারণ। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে তিনি বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে পণ্ডিচেরী লাভ করেন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে। শেষ পর্যন্ত এই পণ্ডিচেরী ফরাসী অধিকারেই থেকে গিয়েছিল।

পরবর্তী চল্লিশ বছরে ভারতে ফরাসীগণ কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কারণ তাদের ওলন্দাজদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এই সংকটময় মুহূর্তে মার্টিনকে আবার ভারতে পাঠানো হয়। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কোন সন্দেহ নেই ভারতে আগত ফরাসী প্রশাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়।

মার্টিনের মৃত্যুতে ফরাসীদের মধ্যে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। তদুপরি ওলন্দাজদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাও এ সময় এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল। এই অবস্থা চলেছিল ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ বৎসর জিন ল কোম্পানীর দায়িত্বভার নিয়ে ভারতে আসেন। তাঁর সুপরিচালনায় ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের আবার নবজীবন লাভ সম্ভব হয়। ১৭২৫-এ মাহে এবং ১৭৩৯-এ কারিকল ফরাসীগণ লাভ করে। তাছাড়া বাংলার কাশিমবাজার ও চন্দন-নগর এবং উড়িষ্যার বালাশোরে ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। বলা যায় ১৭৪০ সাল পর্যন্ত ফরাসী অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এরপরই ফরাসীগণ এক গভীর রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে যায়। সেই আবর্তন হল ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ।

॥ ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোলুপ লালসার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এই ভারতের মৃত্তিকাতেই ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের প্রতি যুযুধান ভারতে রাজ-নৈতিক প্রাধান্য অর্জনের প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতার অবসানে দেখা গেল ইংরেজ-রাই একমাত্র ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের যে নাটক তাকে তিনটি অংকে ভাগ করা যায়। প্রথম অংকের সময়সীমা ১৭৪৬ থেকে ১৭৪৮, দ্বিতীয় অংক ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৭ আর তৃতীয় অংক ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৩। নাটকের অভিনয় মঞ্চ দাক্ষিণাত্য—বিশেষ করে কর্ণাটক বলে পরিচিত যে স্থান।

॥ প্রথম অংকঃ প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ ॥

সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে এক সংকীর্ণ স্থান কর্ণাটক। পূর্বে বঙ্গোপসাগর।

পশ্চিমে এক পর্বতমালা কর্ণাটককে মহীশূর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। উত্তরে বহমান গুন্ডালকাম্মা নদী। দক্ষিণে মারাঠা জায়গীর তাঞ্জোর। আরো দক্ষিণে আরও কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য। তাদের মধ্যে প্রধান হল হিন্দু রাজ্য ত্রিচিনোপল্লী। কর্ণাটকের রাজধানী হল আর্কট।

॥ যুদ্ধের পটভূমিকা ॥

যে দাক্ষিণাত্য মোগল সাম্রাজ্যের কবর খুঁড়েছিল সেই দাক্ষিণাত্যেই ভারতে ফরাসী ভবিষ্যতের সমাধি হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আরম্ভ হয় মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন। চতুর্দিকে বিশৃংখল আর অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতির সুযোগে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-উল-মুলক্ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে হায়দরাবাদ শাসন করতে থাকেন। তিনি সুবাদারের পদকে বংশানুক্রমিকও করে ফেলেন। কিন্তু শীঘ্রই একই ঘটনা ঘটলো তাঁরই অধীনস্থ কর্ণাটকে।

কর্ণাটকের শাসককে বলা হত নবাব। তখন কর্ণাটকের নবাব সাদাতুল্লা। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তিনি সরাসরি মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর ভাগিনেয় দোস্ত আলীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পরে তিনি নবাবের পদকেও বংশানুক্রমিক করে নেন। কিন্তু এসব কাজে তিনি নিজামের অনুমোদন প্রার্থনা করেন নি। ফলে নিজাম তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন কিন্তু সাদাতুল্লার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবার মত অবস্থা তখন নিজামের ছিল না।

এর মধ্যে কর্ণাটকে অস্থিরতা দেখা দেয়। সাদাতুল্লার মৃত্যুর পর দোস্ত আলী নবাব হলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ঐ পদে অনুপযুক্ত। ফলে সকল ক্ষমতা তাঁর পুত্র সফদার আলী ও শ্যালক চাঁদ সাহেবের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁরা ত্রিচিনোপল্লী দখল করেন। ত্রিচিনোপল্লী হিন্দু রাজ্য হওয়ায় মারাঠারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিজামও এই সুযোগ নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে যুক্তভাবে কর্ণাটক আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দোস্ত আলী পরাজিত ও নিহত হলেন। সফদার আলী নতুন নবাব হলেন। চাঁদা সাহেব মারাঠাদের হাতে বন্দী হলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সফদার আলী নিহত হলে তাঁর পুত্র মহাম্মদ খাঁ নবাব হলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অযোগ্য। তাঁর অযোগ্যতার সুযোগে নিজাম আর্কট অধিকার করেন এবং তাঁর মনোনীত আনোয়ার উদ্দীনকে নবাবের পদে বসান।

কর্ণাটকে ফরাসী ও ইংরেজ উভয়েরই বাণিজ্য কুঠি ছিল। ফরাসী কুঠি ছিল পণ্ডিচেরীতে আর ইংরেজদের মাদ্রাজে। এই সময়ই ফরাসী কোম্পানীর দায়িত্বভার নিয়ে আসেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ডুপ্লে।

ভারতের এই পরিস্থিতিতে ইউরোপে আরম্ভ হয় অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংলন্ড ও ফ্রান্স পরস্পর বিরোধী দলে যোগ দেয়। ফলে ইউরোপের এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভারতেও হয়েছিল। পরিস্থিতি গুরুতর হয় তখন যখন এক বিশাল ইংরেজ নৌবহর ভারতে এসে পৌঁছায় এবং ফরাসী ব্যবসায়ীদের বন্দী করে। ডুপ্লে সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারউদ্দীনকে অনুরোধ করেন যেন তিনি ইংরেজদের এই আচরণ দমনে উদ্যোগী হন। নবাবের পক্ষেও নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ এসব ঘটনা ঘটছিল তাঁরই রাজ্যে। কিন্তু তিনি ইংরেজদের সংযত করতে পারলেন না। নিরুপায় ডুপ্লের অনুরোধে লা বুর্দনের নেতৃত্বে এক বিশাল ফরাসী নৌবহর ভারতে এসে পৌঁছায়। ফলে আরম্ভ হয় প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে ফরাসীগণ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। দুবার তারা ইংরেজদের পরাজিত করে। মাদ্রাজ তাদের দখলে চলে যায়। আনোয়ারউদ্দীনের বাহিনীও ফরাসীদের কাছে পরাজিত হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফলাফল অমীমাংসিত। কারণ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ আইলা-চ্যাপেলের সন্ধি দ্বারা মীমাংসিত হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে তারা ভারতেও যুদ্ধ বন্ধ করবে। উত্তর আমেরিকায় লুইবার্গের পরিবর্তে ভারতে ফরাসীরা ইংরেজদের মাদ্রাজ ফিরিয়ে দেয়।

কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রশ্নের বাইরে প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধের একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্য হল ঐতিহাসিক ম্যালিসনের ভাষায় যুদ্ধে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে করমণ্ডল উপকূলেই যে কোন একটি ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা ভারত বিজিত হবে।[১]

॥ দ্বিতীয় অংক : দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ ॥

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সুতরাং আশা করা গিয়েছিল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু এক বৎসর যেতে না যেতেই উভয়পক্ষই আরেকবার শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। অবশ্য তার জন্যও প্রয়োজন ছিল একটা পরিস্থিতি সৃষ্টির।

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী উভয়পক্ষই সম্প্রসারিত করেছিল। প্রয়োজনে তারা ভারতীয়দেরও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেছিল। যুদ্ধের পর কোন পক্ষই আর সৈন্য সংখ্যা সীমিত করতে চাইলো না। অথচ এই বিপুল পরিমাণ সৈন্য বাহিনীর তত্ত্বাবধানও ছিল ব্যয়-বহুল। তাই তারা একটা পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা হল, যদি কোনভাবে সেনাবাহিনীর ভার ভারতীয় রাজন্যবর্গের উপর চাপিয়ে দিতে পারে তাহলে একই সঙ্গে তাদের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একটি হল সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার থেকে অব্যাহতি ; আর দ্বিতীয়টি যে রাজা সেনাবাহিনী গ্রহণ করবেন প্রয়োজনে সেই রাজার রাজ্য যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

তাদের এই পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার মত পরিস্থিতিও ছিল তখন ভারতবর্ষে। কেননা ভারতীয় রাজন্যবর্গ তখন পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাকাতর এবং বিবদমান। তাই প্রয়োজনে তাঁরা বিদেশীদের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। সুতরাং এই পরিকল্পনার প্রথম বলি তাঞ্জোর। হায়দরাবাদ এবং বলাবাহুল্য কর্ণাটক-ও এই পথ গ্রহণ করে।

তাঞ্জোরের শাসক শাহজীর সঙ্গে বিবাদ ছিল তাঁর অবৈধ ভ্রাতা প্রতাপ সিংহের। শাহজী প্রতাপ সিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হলে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজরা তাঁকে তাঞ্জোরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র দেবীকোট্টাইয়ের অধিকারের বিনিময়ে সাহায্যদানে সম্মত হয়। প্রতাপ সিংহ তখন দেবীকোট্টাই ছাড়া আরও অতিরিক্ত কিছু অঞ্চলের অধিকার ছেড়ে দিতে প্রস্তাব করলে ইংরেজরা প্রতাপ সিংহকেই সমর্থন জানায়। ফলে নিরুপায় শাহজী ইংরেজ আশ্রয়ে মাদ্রাজে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। ইংরেজদের এই সাফল্য ফরাসীদেরও উৎসাহিত করে। তারাও অন্যত্র একই সাফল্যের আশায় তৎপর হয়ে ওঠে।

১৭৪৮ সালে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ জং-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির জং ও দৌহিত্র মুজাফফর জং উভয়েই নিজাম পদের দাবীদার হন। নাসির আপন শক্তিবলে সিংহাসনলাভ করেন। ফলে মুজাফফর তাঁর খুল্লতাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লুপ্ত হন। এই পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে ফরাসীদের সুবিধাই হয়েছিল।

---

১ It brought into view silently but surely the possibility of the conquest of India by one or the other of the two European powers on the Coromandel coast.
—Malleson.

অন্যদিকে কর্ণাটকের অবস্থাও ছিল ফরাসীদের অনুকূলে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদা সাহেব মারাঠা বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভ করেন। তিনি আর্কটে ফিরে আসতেই তাঁর সঙ্গে আনোয়ার উদ্দীনের বিরোধ আরম্ভ হয়। তিনি হায়দরাবাদের মুজাফফর জং-এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং তাঁরা যুক্তভাবে ডুপ্লের কাছে ফরাসী সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডুপ্লে স্বাভাবিকভাবেই সাহায্যদানে স্বীকৃত হলেন। সম্মিলিত বাহিনী আনোয়ার উদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করে। তাঁর পুত্রকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। চাঁদা সাহেব কর্ণাটকের নবাব হলেন। আর হায়দরাবাদের নিজাম হলেন মুজাফফর। এইসব ঘটনায় দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রভাব অসাধারণ বৃদ্ধি পায়।

এই পরিস্থিতি স্বভাবতঃই সহজভাবে মেনে নেওয়া ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আনোয়ারের আরেক পুত্র মহাম্মদ আলি পালিয়ে ত্রিচিনোপল্লীতে চলে আসেন এবং ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ইংরেজরা। তারা দ্রুত সাহায্যদানে স্বীকৃত হল। তাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন হায়দরাবাদের পদচ্যুত নিজাম নাসির জং।

এইভাবে দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই যুদ্ধে ফরাসী পক্ষের পুরোভাগে ডুপ্লে আর ইংরেজ পক্ষের পুরোভাগে রবার্ট ক্লাইভ।

এই যুদ্ধের প্রথম দিকে ফরাসীগণ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেও পরবর্তী পর্যায়ে ক্লাইভের রণনীতি ও কূট বুদ্ধির কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। পণ্ডিচেরী সন্ধিদ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষই দেশীয় রাজন্যবর্গের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে সম্মত হন। কর্ণাটকে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই সন্ধিকে ম্যালিসন ফরাসীদের পক্ষে চরম অসম্মানের বলে বর্ণনা করেছেন।

॥ তৃতীয় অংক ঃ তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ ॥

পণ্ডিচেরীর সন্ধি ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে নি। তার উপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে আরম্ভ হয় সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও দুই প্রতিপক্ষ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। স্বভাবতঃই এই যুদ্ধের প্রতিধ্বনি শোনা গেল ভারত ভূমিতেও।

সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের খবর ভারতে এসে পৌঁছানো মাত্র ক্লাইভ বাংলায় ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর অধিকার করেন। ফ্রান্স থেকেও ভারতে পাঠানো হয় ল্যালীকে। ল্যালীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

ক্লাইভের চন্দননগর দখলের জবাব দিতে ল্যালী মাদ্রাজ দখল করেন। এরপর তিনি হায়দরাবাদ থেকে বুসীকে ডেকে পাঠিয়ে মারাত্মক ভুল করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা মাদ্রাজ পুনর্দখল করে এবং ফরাসী অধিকার থেকে মশলীপত্তম ছিনিয়ে নেয়। এরপর বুসী ও ল্যালী যুক্তভাবে মাদ্রাজ জয় করলেও সেই জয় তাঁরা ধরে রাখতে পারেন নি। বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর কাছে ফরাসী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ই ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দেয়।

অন্যদিকে ইউরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয় প্যারিসের সন্ধির দ্বারা। এই সন্ধি ভারতের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা করে দেয়। সন্ধির সর্ত অনুসারে পণ্ডিচেরী ও চন্দননগর ফরাসীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঐ দুই জায়গা সুরক্ষিত করার অধিকার তাদের দেওয়া হয় না। তিনটি কর্ণাটকের যুদ্ধ ভারতে ফরাসী বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস করে দেয়। সেই সঙ্গে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নেরও অবসান হয়।

॥ **ফরাসী ব্যর্থতার কারণ** ॥

প্রথমদিকে ফরাসীগণ ভারতবর্ষে যে সাফল্য পেয়েছিল তাতো তারা ধরে রাখতে পারেই নি, বরং শেষ পর্যন্ত তাদের বড়ই অসম্মানজনক পরাজয় মেনে নিতে হয়। তাদের এই ব্যর্থতার কতগুলি কারণ নির্দেশ করা যায়।

প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ফরাসীগণ ইউরোপ মহাদেশীয় সমস্যায় এত বেশী জড়িয়ে ছিল যে অন্যত্র দৃষ্টি দেবার অবকাশ তাদের ছিল না। ইউরোপে ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক সীমারেখা অর্জন করা। এই জন্য তাদের জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে। ভারত বা উত্তর আমেরিকার সাম্রাজ্য অপেক্ষা ইউরোপের কয়েক শত মাইলের অধিকার অর্জন ছিল তাদের বিবেচনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ঐ মহাদেশেও কিছু অর্জন করতে পারে নি, আর বাইরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের যে সম্ভাবনা ছিল তাও তারা অবহেলায় হারায়। অন্যদিকে ইংলণ্ডের মহাদেশ থেকে পাবার কিছুই ছিল না। মূল ভূখণ্ড থেকে তো তারা বিচ্ছিন্নই। ইউরোপে তাদের শুধু লক্ষ্য ছিল শক্তিসাম্য বজায় রাখা। ইংলণ্ডের আসল লক্ষ্য ঔপনিবেশিক আধিপত্য অর্জন। এই লক্ষ্যে তারা ফরাসীদের পর্যুদস্ত করে ভারত ও উত্তর আমেরিকায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় দেশের সরকারী দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যও ফরাসী ব্যর্থতাকে ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের অপ্রতিহত স্বৈরতন্ত্র দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয় নি। ক্রমাগত যুদ্ধ করে তিনি তাৎক্ষণিক সাফল্য পেয়েছেন ঠিকই ; সেই সাফল্যই অন্যদিকে পতনকে ডেকে আনে। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন অপদার্থ। অন্যদিকে ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা ছিল অনেক উদারনৈতিক। ফরাসী শাসনের অক্ষমতার উপর আলোকপাত করে আলফ্রেড লায়ল বলেছেন, গৃহকর্ত্রী এবং অযোগ্য মন্ত্রীদের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়ে পঞ্চদশ লুই যে দূরদৃষ্টিহীন ইউরোপীয় নীতি অনুসরণ করেন তার ফলেই সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স ভারতে আধিপত্য হারায়।[২]

তৃতীয়তঃ ফরাসী ও ইংরেজ উভয়ের বাণিজ্যিক সংস্থা গঠনের মধ্যেও আছে পার্থক্য। ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি সরকারী বিভাগ। অংশীদারদের মধ্য থেকে ফরাসী সম্রাট এই কোম্পানীর পরিচালকদের নিয়োগ করতেন। সরকারীই অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতেন। ফলে কোম্পানীর সুপরিচালনায় বা সাফল্য অর্জনে অংশীদারদের কোন আগ্রহ ছিল না। অন্যদিকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি স্ব-শাসিত সংস্থা। অংশীদারগণ কোম্পানীর উন্নতিতে সর্বদাই সচেতন থাকতেন। তাঁদের কাছে প্রধান ছিল বাণিজ্য। বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার পর রাজনীতি। ফলে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য ছিল অনেক বিস্তৃত ও লাভজনক। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা এতটা স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ছিল যে একবার তাঁদের ব্রিটিশ রাজকোষে বাৎসরিক ৪00,000 পাউণ্ড দিতে বলা হয়েছিল।

চতুর্থতঃ কর্ণাটক যুদ্ধ থেকে পরিষ্কার যে, নৌ-শক্তিই ছিল ইংগ-ফরাসীর দ্বন্দ্বের গতি নির্ধারক। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে ফরাসী নৌ-শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা আর এই ক্ষতিপূরণ করে উঠতে পারে নি। অন্য-

২ It was through the short-sighted, ill managed European policy of. Louis XV, misguided by his mistresses and by incompetent ministers that France lost her Indian settlements in the Seven Years' Work.

—Alfred Lyall.

দিকে ইংলণ্ড তার নৌ-শক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহার করে কেবল ভারতেই যে সাফল্য পেয়েছিল তা নয়, ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও তারা সফল হয়। প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশ বিস্তারে ইংলণ্ডের যাবতীয় সাফল্যের মূল কাঠি হল তাদের নৌ-শক্তির অপ্রতিরোধ্যতা।

পঞ্চমতঃ বাংলায় ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে যে সাফল্য পেয়েছিল তাই প্রকৃতপক্ষে ভারতে তাদের ভাগ্য সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে ঐ সাফল্যে ভারতে তাদের মর্যাদা আকস্মিকভাবে গগনচুম্বী হয়ে যায়। তাছাড়া তারা অপরিমেয় সম্পদের অধিকারীও হয়। অন্যদিকে প্রথম দিকে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীগণ সফল হলেও তাদের সম্পদ সরবরাহ করার সামর্থ দাক্ষিণাত্যের ছিল না। ভিনসেন্ট স্মিথ তাই বলেছেন, যারা নৌ-পথ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের ডুপ্লে বা বুসীর পক্ষে পৃথক বা যুক্ত ভাবে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না।[৩] ম্যারিয়ট বলেন, ডুপ্লে ভারতে প্রবেশের চাবি মাদ্রাজে খুঁজে ভুল করেছিলেন, আর ক্লাইভ যুক্তিসংগতভাবেই তা খুঁজে পেয়েছিলেন বাংলায়।[৪]

ষষ্ঠতঃ নেতৃত্বদানের দিক থেকেও ইংরেজরা ছিল ফরাসীদের তুলনায় অনেকেটাই এগিয়ে। ডুপ্লে ও বুসীর যোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয়ই কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এক সংকটময় মুহূর্তে ল্যালীর অক্ষমতা পরিস্থিতিকে ফরাসীদের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে ইংরেজদের নেতৃত্ব ছিল অনেক বেশী সক্ষম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সাহসিকতাপূর্ণ এবং উৎসর্গীকৃত। সুতরাং সাফল্য তাদের জন্য যেন নির্দিষ্টই ছিল।

সপ্তমতঃ ফরাসীদের ব্যর্থতায় ডুপ্লের ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর প্রথম ভুল হল তিনি এদেশের রাজনৈতিক প্রশ্নে এত বেশী জড়িত হয়ে যান যে ফরাসী বাণিজ্যকে তিনি উপেক্ষা করেন। ফলে ফরাসী কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সংকটের জন্যই তিনি তাঁর বহু রাজনৈতিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে পারেন নি। সবচেয়ে বড় কথা ডুপ্লে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করেছিলেন। তিনি ভুলে যান যে ইউরোপের এই দুই শক্তির যে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যব্যাপী উচ্চাশা তারই প্রতিফলন হল ভারতের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব। সুতরাং সঠিক পরিপ্রেক্ষিত স্থির করতে না পারলে সঠিক নীতি নির্ধারণও সম্ভব নয়। ডুপ্লে তাঁর নীতি ও কর্মধারা স্থির করার ক্ষেত্রে এই মারাত্মক ভুল বিচারকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সবশেষে প্রাথমিক সাফল্যে তিনি এত বেশী উচ্চাকাংখী এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে তাঁর উচ্চতর কর্তৃপক্ষকেও নিয়মিত পরিস্থিতি অবহিতও করতেন না। তাই তিনি যে সময়মত মাতৃভূমি থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাননি তার জন্য কেবল ফরাসী সরকারকে অভিযুক্ত করলে চলবে না, দায়িত্ব ছিল তাঁরও।

৩ Neither Bussy nor Dupleix singly, nor both combined had a chance of success against the government which controlled the sea-routes and the resources of the Gangetic Valley. —V. Smith.

৪ Dupleix made a cardinal blunder in looking for the key of India in Madras; Clive sought and found it in Bengal. —Marriott.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

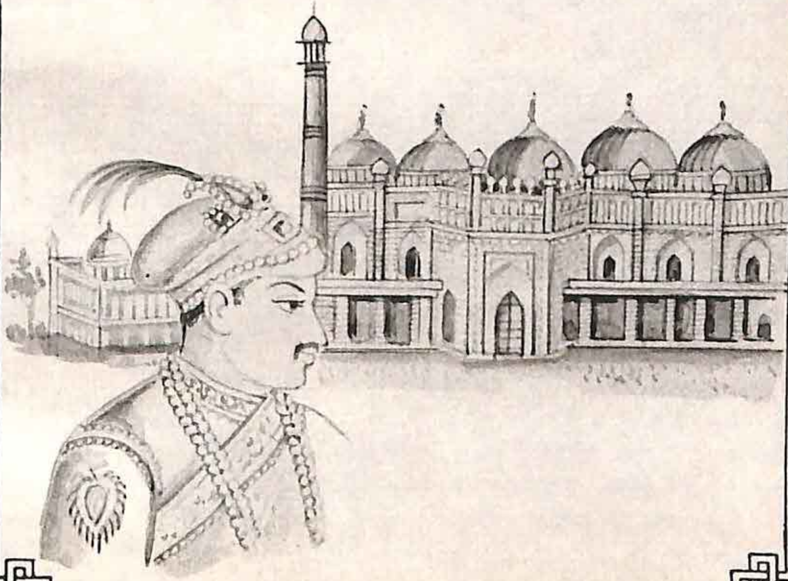
Growth of English East India Company's commerce and political power in Bengal till 1765—Growth of English trade in Bengal in the first half of 18th century—Farman of 1717—frictions with the Nawabs—conflict between the English and Siraj from 1756 to Plasey—its results—conflict with Mir Quasim—Buxar (1764)—Dewani 1765.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—সিরাজদৌল্লা—মীরজাফর—মীরকাশিম—মীরজাফর—নজমৎদৌল্লা—গভর্ণর ক্লাইভ

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলায় ইংরেজ প্রভাব বিস্তার



বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাই ছিল সর্বাপেক্ষা উর্বর ও সম্পদশালী। বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যও ছিল খুবই উন্নত। ঔরঙ্গজেবের চরম অর্থ সংকটের সময় কিংবা পরবর্তীকালে যখন কেন্দ্রীয় মোগল শক্তি যথেষ্ট দুর্বল তখনও বাংলা নিয়মিত মোগল রাজকোষে রাজস্ব জমা দিত।

স্বভাবতঃই এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল অনেক ব্যাপক ও গভীর। ১৭১৭ সালে কোম্পানী মোগল সম্রাট ফারুক শায়ারের কাছ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ফরমান বা নির্দেশনামা লাভ করেই এই নির্দেশনামা কোম্পানীকে বিনা শুল্কে আমদানী ও রপ্তানী করার অধিকার দিয়েছিল। কোম্পানীকে তার মাল চলাচলকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে কোম্পানীকে দস্তক বা অনুমোদন-পত্র দানের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদেরও এখানে ব্যবসা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ফরমানে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করার অধিকারী ছিল না। তাদের অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মতই শুল্ক দিতে হত।

কিন্তু এই ফরমানই বাংলার নবাবদের সঙ্গে কোম্পানীর যাবতীয় বিরোধের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রথম কারণ এই ফরমানের ফলে বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হল অধিকতর লাভের প্রত্যাশায় কোম্পানীর কর্মচারীগণ দস্তকের অপব্যবহার করে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রেও শুল্ক ফাঁকি দিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। মুর্শিদকুলি থেকে আলীবর্দি পর্যন্ত বাংলার সকল নবাবই ইংরেজদের ঐ ফরমানের ব্যাখ্যার বিরোধীতা করেছেন এবং ফরমানের অপপ্রয়োগের জন্য রাজকোষে প্রচুর টাকা কোম্পানীকে জমা দিতে বাধ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, দস্তকের অপব্যবহারও তাঁরা বহুলাংশেই বন্ধ করতে পেরেছিলেন। কোম্পানীও তার বাণিজ্যিক স্বার্থে নবাবের এই কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু নবাবকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে অব্যাহতই ছিল।

॥ সিরাজদৌল্লা ॥

পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে যখন আলীবর্দির পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা বাংলার নবাব হন। সিরাজ ছিলেন বয়সে তরুণ এবং অত্যন্ত বদমেজাজী। তিনি দাবী করেলেন মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে ইংরেজরা যে শর্তে বাংলায় বাণিজ্য করতো এখনও তাদের সেই শর্তেই বাণিজ্য করতে হবে। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের এই নির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তখন তারা সদ্যসদ্য দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের পরাজিত করে যথেষ্ট নৈতিক বলে বলীয়ান। তাছাড়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা সম্পর্কে তখন তারা বেশ ওয়াকিবহাল। সুতরাং তারা নবাবকে শুল্কদানের পরিবর্তে কলকাতায় সকল ভারতীয় পণ্যের উপরই অতিরিক্ত শুল্ক দাবী করলো। কারণ কলকাতা তখন তাদের জমিদারী। ফলে নবাব স্বভাবতঃই ইংরেজদের উপর ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি এমনও সন্দেহ করেন যে তারা সম্ভবতঃ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাংলার নবাবী পদে বসাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।



সিরাজ

উভয়ের সম্পর্কের তিক্ততা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালো তখন, যখন ইংরেজরা নবা-

বের অনুমতি ছাড়াই কলকাতা সুরক্ষায় উদ্যোগী হয়। আসলে ইংরেজরা চন্দননগরে অবস্থিত ফরাসীদের আক্রমণের আশংকাতেই একাজে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু সিরাজের কাছে যুক্তিযুক্ত ভাবেই মনে হল ইংরেজদের এই আচরণ বাংলায় তাঁর সার্বভৌমত্বকে অগ্রাহ্য করার সামিল। সুতরাং একজন স্বাধীন শাসকের পক্ষে একটি বেসরকারী বাণিজ্যিক সংস্থার দুর্গ নির্মাণের চেষ্টা এবং সেই সংস্থার কর্মচারীদের দেশের আইন মেনে না চলার ঔদ্ধত্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সিরাজ আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে যদি তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের সংঘর্ষ করতে দেন বাংলার মাটিতে তাহলে তাঁকেও কর্ণাটকের শাসকের মত দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হবে। সুতরাং তিনি ইংরেজ ও ফরাসী উভয়কেই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলতে এবং বাংলায় কোন সংঘর্ষে লিপ্ত না হতে নির্দেশ দেন। ফরাসীরা নবাবের নির্দেশ মেনে নিলেও ইংরেজরা কর্ণপাত করলো না। তারা যেন পূর্ব দিগন্তে এক নবীন আশার অরুণোদয়ের রক্তিম আভা দেখতে পেয়েছে। সুতরাং তারা আর থেমে থাকতে প্রস্তুত নয়। তারা নবাবী নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই বাংলায় বাণিজ্য করতে চাইলো। এমন কি তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাংলার বাণিজ্যিক অধিকার দাবী করলো। সিরাজের আর ইংরেজ অভিসন্ধি বুঝতে বাকী থাকলো না। তিনি তাদের প্রচলিত আইন মেনে চলতে বাধ্য করবেন বলে স্থির করলেন।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এবং উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই সিরাজ ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করলেন এবং কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দখল করলেন। তিনি তাঁর এই সহজলভ্য সাফল্যে প্রমত্ত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করে উৎসবে মেতে উঠলেন। সেই সুযোগে ইংরেজরা জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিল। সিরাজ এক অমার্জনীয় ভুল করলেন। শত্রুর সামর্থের যথাযথ পরিমাপ তিনি করতে পারলেন না।

সমুদ্রের কাছে ফলতায় যেখানে ইংরেজ রণতরী সব অপেক্ষামান, ইংরেজরা সেখানে অপেক্ষা কতে লাগলো মাদ্রাজ থেকে সম্ভাব্য সাহায্যের প্রত্যাশায়। অন্যদিকে তারা সিরাজের দরবারে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে উদ্যোগী হলেন। ইংরেজ ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, কলকাতার অধিকর্তা মানিকচাঁদ, ধনী ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, বিখ্যাত মহাজন জগৎশেঠ এবং খাদিম খাঁ। এই সময় মাদ্রাজ থেকে শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে কলকাতায় পৌঁছলেন রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন। ক্লাইভ এসেই কলকাতা পুনরুদ্ধার করলেন এবং নবাবকে তাঁদের সকল দাবী মেনে নিতে বাধ্য করলেন।

কিন্তু এতেই তখন ইংরেজদের খুশী হবার কথা নয়। তারা চাইলো বাংলার নবাবী পদে সিরাজের পরিবর্তে তাদের মনোনীত একজন পুতুলকে বসাতে এবং সেই পুতুল তারা খুঁজে পেলো মীরজাফরের মধ্যে। সুতরাং ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ দিয়ে তারা সিরাজের কাছে অসম্ভব দাবীসমূহ পেশ করলো। আসলে উভয়পক্ষই বুঝতে পেরেছিল কেবল মাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রেই যাবতীয় বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব। সেই অনুসারে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন মুর্শিদাবাদ থেকে কুড়ি মাইল দূরে পলাশীর প্রান্তরে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হল। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ ছিল নামেই যুদ্ধ। কারণ ইংরেজ পক্ষে মৃতের সংখ্যা ২৯ আর সিরাজের পক্ষে মৃতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত। মীরজাফর ও রায় দুর্লভ পরিচালিত নবাব সৈন্য এই যুদ্ধে অংশ নেয় নি। কেবল মীরমদন ও মোহনলাল পরিচালিত মুষ্টিমেয় সৈন্য প্রবল সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিল। সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। তারপর তিনি ধৃত হয়ে মীরজাফরের পুত্র মীরণের হাতে নিহত হন।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভের কূটনীতির সাফল্য। তিনি সুকৌশলে জগৎশেঠের ভীতি আর মীরজাফরের উচ্চাশাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় বিনাযুদ্ধে চমকপ্রদ ঐতিহাসিক সাফল্যলাভ করেন।

সামরিক দিক থেকে পলাশীর যুদ্ধ যতই তুচ্ছ ঘটনা হোক না কেন, এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী। ম্যালিসন বলেছেন, অন্য কোন যুদ্ধের ফলাফল এত ব্যাপক, এত তাৎক্ষণিক অথচ স্থায়ী হয় নি। কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ নতুন নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করে। কোম্পানী লাভ করে চব্বিশ পরগণার জমিদারী। কোম্পানী নগদে যে বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করে তা দিয়ে তারা তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারত জয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ করে। কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিপুলভাবে পুরস্কৃত হয়। ক্লাইভ একাই ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছিলেন ষোল লক্ষ টাকা। তাছাড়া তাঁকে বাংলায় ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করে সম্মানিত করা হয়।

এছাড়া কোম্পানী বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলায় স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। কোম্পানী কলকাতায় একটি টাকশাল স্থাপন করে।

তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলায় কোম্পানীর গুরুত্ব ও প্রভাব উভয়েই বৃদ্ধি পায়। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব হলেন। ইংরাজের অঙ্গুলি হেলনেই তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হত। প্রকৃত শাসনক্ষমতা সমর্পিত হয়েছিল কোম্পানীর উপর।

সর্বশেষে কোম্পানীর আরও তাৎপর্যপূর্ণ লাভ হয়েছিল অন্যদিক থেকে। বাংলার অপরিমেয় ধন-সম্পদ তারা এবার ব্যয় করার সুযোগ পেল ভারতবর্ষে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। এ্যাডমিরাল ওয়াটসন তাই পলাশীর যুদ্ধকে শুধু কোম্পানী নয় সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ জাতির দিক থেকেও অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন।[২] পলাশীর যুদ্ধও বাংলায় অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সকল স্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে ছিল।

এখন থেকেই বাংলার সীমাহীন দুর্গতির সূচনা হল। এখন থেকে বাংলায় নবাব থাকলেন, অথচ তাঁর ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে ইংরেজদের ক্ষমতা আছে, দায়িত্ব নেই। ফলে দুর্নীতিপরায়ণ, অত্যাচারী ও স্বার্থপর কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে বাংলার জনগণের লাঞ্ছনার সীমা রইলো না।

॥ মীরজাফর ॥


মিরজাফর

মীরজাফর শীঘ্রই তাঁর কৃতকর্মের ভয়াবহতা অনুভব করতে পারলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের দাবী অনুযায়ী পুরস্কার আর উৎকোচ দিতে দিতে রাজকোষ নিঃশেষিত হয়ে গেল। তখনকার পরিস্থিতি বোঝাতে ম্যালিসন বলেছেন যে তখন কর্মচারীদের লক্ষ্য ছিল যা পাওয়া যায় তাই লুটে নেওয়া, মীরজাফর যেন এক সোনার থলি—ইচ্ছেমত তাতে হাত ঢুকিয়ে তুলে নেওয়া যায় যতখানি সম্ভব।[৩] কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীও বাংলার সম্পদ অপরিমেয় ধরে নিয়ে নির্দেশ দেন

২ The battle of Plassey was of extraordinary importance not only to the Company but to the British nation in general. —Watson.

৩ The aim of Company's officials was to grasp all they could; to use Mir Jafar as a golden sack into which they could dip their hands at pleasure. —Malleson.

বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ব্যয়ভারও বাংলাকেই বহন করতে হবে। কোম্পানীর লক্ষ্য শুধু আর বাণিজ্যই নয়, নবাবকে ব্যবহার করে বাংলার সম্পদ আহরণ।

মীরজাফর শীঘ্রই বুঝতে পারলেন কোম্পানীর সকল দাবী মেটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যত তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করতে লাগলেন ততই কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের প্রত্যাশার অপূর্ণতায় নবাবের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ১৭৬০ সালের অক্টোবরে তারা মীরজাফরকে তাঁর জামাতা মীরকাশিমের অনুকূলে নবাবী ত্যাগে বাধ্য করলো। মীরকাশিমও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী দান করলেন আর কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উনত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কার বিতরণ করলেন।

॥ মীরকাশিম ॥

যে আশায় কোম্পানী মীরকাশিমকে নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করেছিল শীঘ্রই সেই আশা আতংকে পরিণত হল। মীরকাশিম ছিলেন যোগ্য, কঠোর এবং শক্তিশালী শাসক। শীঘ্রই তিনি বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁকে নবাবের পদে বসাবার জন্যে কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি তো ইংরেজদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করেছেনই, সুতরাং এবারে দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বাধীন সত্ত্বা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দরকার পরিপূর্ণ রাজকোষ এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী। সুতরাং তিনি জনজীবনে বিশৃংখলা রোধে রাজস্ব বিভাগ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণে এবং ইউরোপীয় শিক্ষায় সেনাবাহিনীকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু এর কোনটাই ইংরেজদের কাছে প্রীতিকর ছিল না।

বিশেষ করে মীরকাশিম ইংরেজ কর্মচারীদের দস্তকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কোম্পানীর কর্মচারীগণ দাবী করলো তাদের পণ্য তা সে রপ্তানীর জন্যই হোক, কিংবা দেশের অভ্যন্তরে উপভোগের জন্যই হোক, নিঃশুল্ক হবে। এতে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ অসন্তুষ্ট হল। কেননা যেখানে তাদের শুল্ক দিতে হত সেখানে ইংরেজী কর্মচারীরা নিঃশুল্ক বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করে। তা ছাড়া এই কর্মচারীরা বেআইনীভাবে দস্তক তাদের অনুগ্রহধন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতো। ফলে এরাও শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যেত। এই অসাধু ব্যবস্থায় অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৎ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর নবাবও তাঁর রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতেন। তদুপরি কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ তাদের নবলব্ধ ক্ষমতায় প্রমত্ত হয়ে এবং অর্থলিপ্সায় নবাবের কর্মচারী ও বাংলার সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। তারা তাদের উপঢৌকন ও উৎকোচ দিতে বাধ্য করতো। তারা ভারতীয় কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের তাদের কাছে স্বল্প মূল্যে মাল বিক্রি করতে এবং তাদের মাল বেশী দামে কিনতে বাধ্য করতো। তাদের দাবী অগ্রাহ্য করলেই তারা অত্যাচার করতো, বন্দী করে রাখতো। এই সময়কে পার্সিভাল স্পীয়ার খোলাখুলিভাবে নির্লজ্জ লুণ্ঠনের সময় বলে বর্ণনা করেছেন।[৮] প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই বাংলার সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় আরম্ভ হয়।

মীরকাশিম বুঝেছিলেন এই অবস্থার প্রতিকার না হলে বাংলার অস্তিত্বই রক্ষা করা যাবে না। প্রথমেই তিনি অন্তঃবাণিজ্য থেকে সকল প্রকার শুল্ক রহিত করেন। অর্থাৎ যে সুবিধা জোর করে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভোগ করতো তা তিনি আইনগত

৮ This was the period of open and unashamed plunder.
—Percival Spear.

ভাবে তাঁর দেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয়দের সঙ্গে সমদৃষ্টি মেনে নিতে রাজী ছিল না। তাঁরা অন্তঃশুল্ক পুন'প্রবর্তনের দাবী জানালো। সুতরাং আরেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। এই যুদ্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হলঃ মীরকাশিম দাবী করলেন তিনি স্বাধীন নবাব, সুতরাং যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা তাঁর আছে। অন্যদিকে ইংরেজদের বক্তব্য হল, মীরকাশিম নবাব হয়েছেন তাদের দৌলতে, সুতরাং তাঁকে আদের নির্দেশমতই চলতে হবে।

মীরকাশিম ও ইংরেজদের মধ্যেকার বিরোধকে ঐতিহাসিকগণ নানাভাবে বিচার করেছেন। ফোর্ট উইলিয়মের তদানীন্তন গভর্ণর হ্যারী ভেরেলস্ট বলেছেন যে এই বিরোধের প্রকাশ্য কারণ হল অন্তঃবাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত। কিন্তু অন্তর্নিহিত কারণ হল মীরকাশিমের স্বাধীন নবাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা। অধ্যাপক ডড্ওয়েল ও ডঃ নন্দলাল চ্যাটার্জী এই অভিমতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে মীরকাশিম রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের কোন চেষ্টাই করেন নি। যদি করতেন তা হলে যে তিনটি জেলার জমিদারী তিনি ইংরেজদের দিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। কিংবা তিনি ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসা ব্যাহত করতে উদ্যোগী হতেন। তিনি কেবল চেয়েছিলেন তাঁর এক্তিয়ারে, ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের প্রয়াসকে প্রতিহত করতে। আর এই চেষ্টাকে স্বাধীন হবার চেষ্টা বলে কখনোই অভিহিত করা যায় না।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হবার পর মীরকাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে যান। সেখানে তিনি, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ-দৌল্লা এবং পলাতক মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এক ইংরেজ-বিরোধী জোট গঠন করেন। এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর সাক্ষাৎ হয় বক্সারের রণক্ষেত্রে ১৭৬৪ সালের ২২শে অক্টোবর। যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন, পলাশীর যুদ্ধ ছিল কয়েকটি কামানের লড়াই, বক্সারের যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত বিজয়।[৫]

বক্সারের যুদ্ধে কেবল বাংলার নবাবই পরাজিত হলেন না, সেই সঙ্গে অযোধ্যার নবাবও। পলাশী যদি কেবলমাত্র ইংরেজদের বাংলার নবাব স্থির করার এবং বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ দিয়ে থাকে তাহলে বক্সার বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সঙ্গে অযোধ্যাকেও যুক্ত করেছিল। এই জনাই স্যার জন স্টিফেন বলেছেন যে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের দিক থেকে পলাশী থেকে বক্সার অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।[৬] মাইকেল এডওয়ার্ডস মনে করেন বক্সারের যুদ্ধই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেছিল।[৭] এর পর ইংরেজরা যথার্থই এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল, যার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হতে মোগল সম্রাটকেও।

তাছাড়া এই যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানী কেবল বাণিজ্যিক সংস্থা থাকার পরিবর্তে দেশের প্রশাসনের অংশীদারে পরিণত হল। এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথের উক্তির যথার্থতাঃ বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপ/পোহালে শর্বরী। রামজে মুর তাই বলেছেন বক্সারই বাংলায় কোম্পানীর শাসনের সূচনা করে।[৮]

[৫] Plassey was a cannonade but Buxar a decisive battle. —V. Smith.

[৬] Buxar deserves far more than Plassey to be considered as the origin of the British power in India. —Sir John Stephen.

[৭] The battle of Buxar was the real foundation of the British dominion. in India. —Michel Edwards.

[৮] Buxar finally reveted the Shackles of the Company's rule upon Bengal. —Ramsay Muir.

॥ মীরজাফর ॥

মীরকাশিমের পর ইংরেজরা আবার বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাংলার নবাবী পদে বসায়। মীরজাফর তাঁর বিশ্বাসভাজন দেওয়ান নন্দকুমারের সাহায্যে শাসন চালাতে চান। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা আদৌ নন্দকুমারের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

॥ নজমৎদৌল্লা ॥

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হলে কোম্পানী দ্রুত মীরজাফরের নাবালক পুত্র নজমৎদৌল্লাকে বাংলার নবাব করে। এই বালক-নবাবের সংগে কোম্পানীর এক চুক্তি হয়। চুক্তি বলে তারা নন্দকুমারকে বরখাস্ত করে কারারুদ্ধ করে। নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন রেজা খাঁ আর বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হন সিতাব রায়।

এ. এম. খাঁ বলেছেন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভে কোম্পানীর প্রধান অস্ত্র ছিল রেজা খাঁ।[১] কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থির হয় এখন থেকে কোম্পানীর অনুমোদন ছাড়া বাংলার নবাব মোগল সম্রাটের কাছে কোন সনদ দাবী করতে পারবেন না। অর্থাৎ এতকাল বাদশাহী সনদের জোরে বাংলার নবাব কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হত। এখন নবাবের সেই অধিকার খর্ব করা হয়। কার্যক্ষেত্রে নবাব এখন কোম্পানীর উপরই প্রশাসনিক বিষয়েও নির্ভরশীল হয়ে গেলেন। অবস্থা এমন হয়েছিল যে সামান্য একজন কর্মচারী নিয়োগ করতে হলেও নবাবকে কোম্পানীর অনুমতি নিতে হত। তাছাড়া শাসনকার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন যে রেজা খাঁ তিনি তো প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কোম্পানীরই প্রতিনিধি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্মচারীগণ উৎকোচ নিয়ে বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে দুর্নীতির চূড়ান্ত করে ছাড়ে। কোম্পানীর যে কোন কর্মচারী দেশের লোকদের নিপীড়ন করে অর্থ আদায় করে। নবাবের কর্মচারীদের এই অন্যায়ের প্রতিকারের কোন ইচ্ছাও ছিল না বা বিক্ষিপ্ত চেষ্টা করলেও তা ব্যার্থ হয়। বাংলার অবশিষ্ট সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে ইংলণ্ডে সঞ্চিত হয়।

॥ গভর্নর ক্লাইভ ॥

কোম্পানীর কর্মচারীদের এই ব্যাপক ও উন্মত্ত দুর্নীতির সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছলে তারা এই দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে এবং বক্সার যুদ্ধের পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোম্পানীর শাসন পুনর্গঠিত করতে রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর পদে নিয়োগ করে কলকাতায় পাঠায়।



ক্লাইভ

কলকাতার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ক্লাইভ তিনটি সিদ্ধান্তে আসেন। প্রথমটি হল বক্সারের পর কোম্পানী যে সব ক্ষমতা লাভ করেছে তার কোন আইনগত ভিত্তি নেই। কারণ তখনও বাংলার নবাব নিয়োগের ক্ষমতা আইনতঃ দিল্লীর মোগল সম্রাটের। আর মোগল সম্রাট তখনও যতই ক্ষমতাহীন হোন না কেন, জনগণের বিচারে তিনিই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং কোম্পানী মোগল সম্রাটের অনুমোদন ছাড়া যে সব ক্ষমতা অর্জন করেছে তার কোনটারই আইনগত স্বীকৃতি

[১] Reza Khan became useful to the Company as chief instrument of their political and economic control of the country. —A. M. Khan.

নেই। দ্বিতীয়টি হল, বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের সহযোগী ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব। অথচ এঁদের সঙ্গে কোম্পানীর কোনরকম চুক্তি হয় নি। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক শূন্যতা থেকে গিয়েছে। তৃতীয়টি হল বাংলার নবাব নজমৎদৌল্লার সঙ্গে কোম্পানীর যে চুক্তি হয়েছিল তা ক্লাইভের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলার নবাবকে মসনদে রেখে নবাবীর রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার ইংরেজদের হাতে তুলে নেওয়া।

সুতরাং এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে ক্লাইভ মোগল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে এলাহাবাদের দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদন করেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় শাহ আলম অযোধ্যার কারা যে এলাহাবাদ প্রদেশ পাবেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার থাকবে কোম্পানীর হাতে। এই অধিকারের বিনিময়ে কোম্পানী সরাসরি সম্রাটকে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নজরাণা দেবে। আর বাংলার নবাবকে তাঁর বাৎসরিক ব্যয়ভার মেটানোর জন্য দেওয়া হবে তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা।

কোম্পানী দেওয়ানী পেয়ে রাজস্ব আদায়ের ভার রেজা খাঁর উপর অর্পণ করে। রেজা খাঁকে দেওয়া হয় সহকারী নবাবের উপাধি। নবাবের হাতে থাকে আইনশৃংখলা রক্ষা ও বিচার বিভাগের ভার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দায়িত্বও রেজা খাঁর উপরই অর্পিত হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে নবাবের হাতে আর কোন ক্ষমতাই থাকে না।

বাংলার রাজনৈতিক অধিকার লাভের ধারাবাহিক ইতিহাসে এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধিপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সন্ধি ক্লাইভের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়ও বটে। কারণ, প্রথমতঃ এই সন্ধির ফলে বাংলার নবাব পদে একজন রইলেন ঠিকই, কিন্তু আসল ক্ষমতা কোম্পানীর করতলগত হল। অবস্থাটা হল এমন, কোম্পানী যদি হয় কায়া, নবাব হলেন তার ছায়া। যে বিচার বিভাগ নবাবের হাতে রাখা হয় তারও কোন কার্যকারিতা থাকলো না। কারণ নবাবের না ছিল পুলিশ, না ছিল সেনাবাহিনী। সুতরাং আইনের শাসন কার্যকরী করার কোন উপায় তাঁর থাকলো না। দ্বিতীয়তঃ এই সন্ধি বাংলায় কোম্পানীর অবস্থাকে আইনগত মর্যাদা দিল। এতকাল পর্যন্ত কোম্পানী যে সব ক্ষমতা ভোগ করছিল সেগুলি ছিল বাংলার নবাবের কাছে থেকে জোর করে আদায় করা। অথচ সেই নবাবের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কোন আইনগত অধিকার ছিল না। নবাব ছিলেন মোগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত, তিনি সম্রাটের পক্ষে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এই প্রয়োগ ক্ষমতাও তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল সম্রাট কর্তৃক। সুতরাং তাঁকে যদি তাঁর ক্ষমতা অন্য কাউকে দিতে হয় তার জন্য প্রয়োজন সম্রাটের অনুমোদন। অর্থাৎ কোম্পানী বে-আইনীভাবেই এতকাল বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করে আসছিল। কিন্তু এই সন্ধি সরাসরি সম্রাটের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় বাংলায় কোম্পানীর মর্যাদা ও ক্ষমতা আইনগত স্বীকৃতি লাভ করলো। তৃতীয়তঃ এলাহাবাদের সন্ধি বাংলার নবাবের অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে এল যে মীরকাশিমের মত কোন স্বাধীনচেতা নবাব অধিষ্ঠিত হলেও তাঁর পক্ষে তার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হত না। কারণ সন্ধি পত্রের বিভিন্ন ধারায় নবাবের ক্ষমতা একেবারেই খর্ব করা হয়। চতুর্থতঃ সুযোগ থাকলেও ক্লাইভ নবাবকে অপসারণ করে সরাসরি বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণ না করে অসাধারণ রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন আর তাঁর এই বিজ্ঞতার পরিচায়ক হল এলাহাবাদের সন্ধিপত্র। তার কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে কোম্পানী যদি প্রত্যক্ষভাবে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করতো তাহলে তা অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে ঈর্ষাকাতর করে তুলতো। সেক্ষেত্রে

নতুন করে এক বিরোধের পটভূমিকা তৈরী হত। ক্লাইভ অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে সে পথে গেলেন না। যে পথে গেলেন তিনি সে পথে প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতেই এল অথচ কোন দায়িত্ব থাকলো না। শুধু তাই নয়। আইনগত দৃষ্টিতেও কোম্পানীকে অভিযুক্ত করার কোন উপায় থাকলো না। এর চেয়ে সুবিধাজনক পরিস্থিতি আর কি হতে পারে? বিশেষ করে ক্লাইভের এই চালে ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গেরও ইংরেজদের মনগত অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দিহান হবার কোন কারণ থাকলো না। পঞ্চমতঃ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের তাৎপর্য হল একদিকে কোম্পানীর আয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অন্যদিকে বাংলার সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন। ১৭৬৬ থেকে ১৭৬৮—মাত্র এই দুই বৎসরের মধ্যে কোম্পানী কেবল মাত্র বাংলা থেকেই সংগ্রহ করে ৫৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। এই শোষণকার্যের সুবিধার জন্য কোম্পানী মোগল প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। পরিবর্তে প্রতি বৎসর নীলামে জমি ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর অর্থ হল একদিকে ইজারাদারদের জমির উৎপাদনশীলতা রক্ষার কোন দায়িত্ব থাকলো না, অন্যদিকে কৃষকের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব শোষণ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হল। আর এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ জমির সঙ্গে তো ইজারাদারের কোন আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হল না। ইজারাদার নিশ্চিত নন পরের বৎসর জমির উপর তার দখল থাকবে কিনা। সুতরাং সীমিত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর দাবী মিটিয়ে যত বেশী সম্ভব উপার্জন করা ছাড়া তার কোন বিকল্প ছিল না। তাদের এই মনোভাবের ফলেই কৃষকের উপর অমানবিক নির্যাতন ও শোষণ আরম্ভ হল। কৃষকের এই ভয়াবহ অবস্থার ফলেই ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সারা বাংলা জুড়ে দেখা দেয় ভয়ংকর মন্বন্তর।

অন্যদিকে অযোধ্যার নবাব কোম্পানীকে পাঁচ কোটি টাকা দিতে বাধ্য হলেন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ। কোম্পানী নবাবের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এই শর্তে যে এ কাজে যাবতীয় ব্যয়ভার নবাবকেই বহন করতে হবে। এই চুক্তির ফলে অযোধ্যার নবাবও বস্তুতঃ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে গেলেন। নবাব এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এই ভুল ধারণা থেকে যে কোম্পানী হল মূলতঃ একটি বাণিজ্যিক সংস্থা, সুতরাং তারা কখনোই নবাবের প্রকৃত শত্রু নয়। বরং তাঁর প্রকৃত শত্রু হল মারাঠা ও আফগানগণ। আর তাদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছেন ইংরেজ সাহায্যকে নিশ্চিত করে। তাঁর এই ধারণা যে কি দুঃসহ ভুল তা অল্পদিনের মধ্যেই শুধু তাঁর রাজত্বেই নয়, গোটা দেশই বুঝতে পেরেছিল। বিপরীত পক্ষে ইংরেজরা অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে বাংলায় তাদের কর্তৃত্বকে এই সন্ধিতে সংহত করেছিল। শুধু তাই নয়। বাংলায় তাদের কর্তৃত্বকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে সম্ভাব্য মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যাকে মধ্যবর্তী রাজ্য হিসেবে ব্যবহারের যে সুযোগ তারা পেয়েছিল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তারা করে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। ক্লাইভ তাঁর তখনকার মানসিকতা গোপন করেন নি। তিনি এক চিঠিতে স্পষ্টতঃই লিখেছিলেন, নামে না হলেও আমরাই প্রকৃত নবাব এবং সম্ভবতঃ তা কোন ছদ্মবেশ ছাড়াই।[১০]

[১০] We must become Nawab in fact, if not in name, perhaps totally so with out disguise.

—Clive.

British imperial expansion (The war operations to be described as briefly as possible. The main stress should be given on (a) the British motives, (b) The decisive factors in the British victory.)

(a) Marathas (one long narrative)

(b) Mysore (one long narrative)

Subsidiary Alliance (1768) as an instrument of British political control.

(c) Other conquests (Anglo-Sikh relations till the death of Ranjit Singh.)

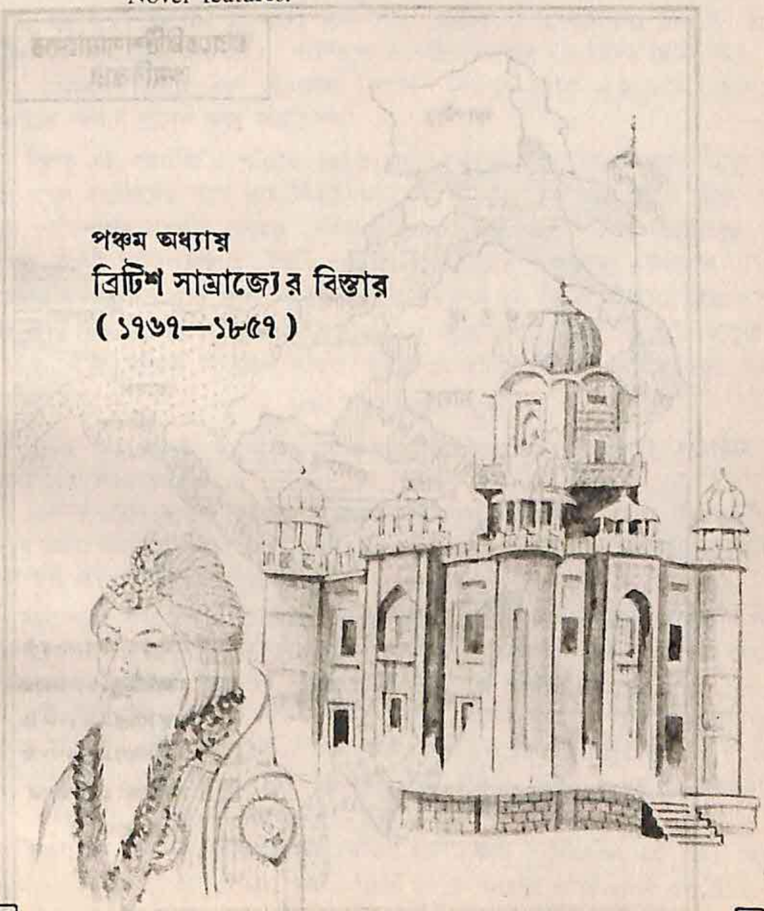
(d) Annexation of the Punjab.

(e) Dalhousie and British imperial expansion—Novel features.

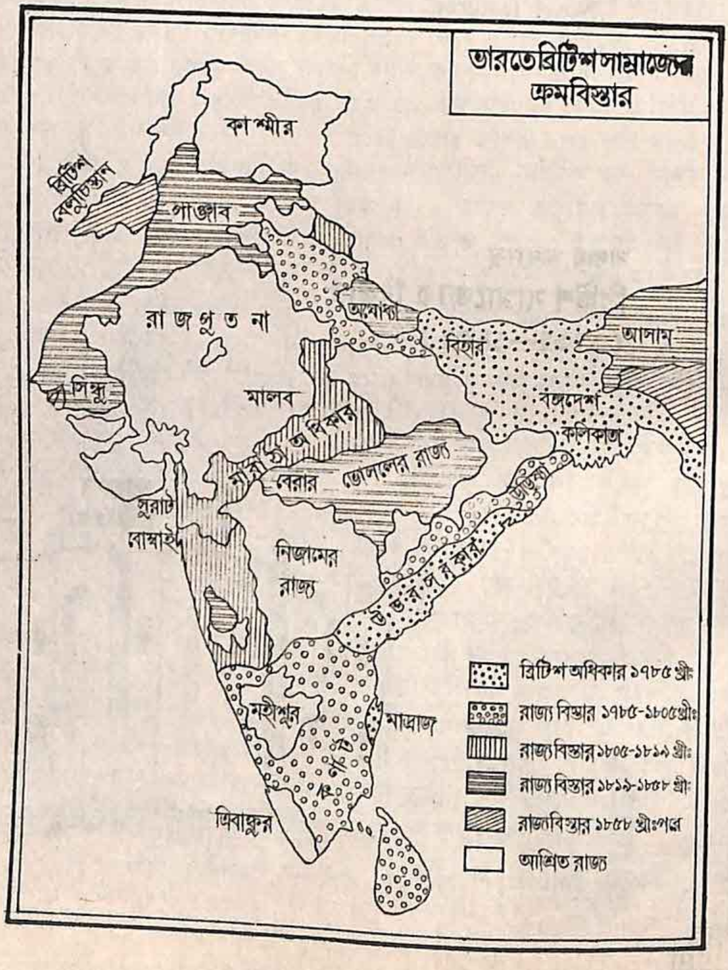
পঞ্চম অধ্যায়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

(১৭৬৭—১৮৫৭)



মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান ও পতন—প্রথম মাধবরাও—প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ—দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ—তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ—মারাঠা ব্যর্থতার কারণ—মহীশূর রাজ্যের পতন—দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি—অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির সুবিধা—এই নীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া—ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক ও রণজিৎ সিংহ—পাঞ্জাব অধিকার—দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ—সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী—স্বত্ববিলোপ নীতি—সুবিধা বিলোপের নীতি—অন্যান্য নীতি—ডালহৌসীর মূল্যায়ন।



মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান ও পতন

॥ প্রথম মাধবরাও ॥

বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর পেশোয়া হন তাঁর পুত্র প্রথম মাধবরাও। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা যে শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তা থেকে তাদের পুনরুদ্ধার করে এক নবজাগ্রত শক্তিতে পরিণত করা।

দাক্ষিণাত্যে তখন মারাঠাদের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল হায়দরাবাদের নিজাম ও মহীশূরের হায়দর আলি। মারাঠাদের গৃহবিবাদের সুযোগে নিজাম মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি মারাঠাদের হাতে পরাজিত হন। অন্যদিকে হায়দর আলি তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা রাজ্যের একাংশ দখল করে নেন। কিন্তু শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে মাধবরাও হায়দর আলিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। দুই প্রবল শত্রু পরাজিত হবার ফলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের নিরংকুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর মাধবরাও উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। এ কাজে তাঁর সবচেয়ে যোগ্য সহযোগী ছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। মালব ও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মারাঠা আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজপুত ও জাঠরা আবার মারাঠাদের চৌথ দিতে বাধ্য হয়। মোগল বাদশাহ শাহ আলমকে ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে মারাঠারাই। দিল্লীতে আবার প্রবেশ করে মারাঠাগণ।

কিন্তু এই নবঅর্জিত শক্তিকে সংহত করার আগেই প্রথম মাধবরাওয়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু মারাঠাদের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে গ্র্যান্ট ডাফ্ বলেছেন পানিপথের যুদ্ধের চেয়েও পেশোয়া প্রথম মাধবরাওয়ের মৃত্যু মারাঠাদের পক্ষে অনেক বেশী ক্ষতিকারক।[১] তিনি যেভাবে দ্রুতগতিতে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে পুনরায় মারাঠাদের শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন তাতে মনে হয় তিনি দীর্ঘায়ু হলে মারাঠাদের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। আরও দুর্ভাগ্যের কারণ হল তাঁর মৃত্যুর পর যতটুকু শক্তি সঞ্চিত হয়েছিল দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অক্ষম নেতৃত্বে তার অবক্ষয় আরম্ভ হয়।

॥ প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ॥

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের মূল কারণ হল ইংরেজদের আগ্রাসী মনোভাব এবং মারাঠাদের অন্তর্কলহ।

মাধবরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হন। কিন্তু পিতৃব্য রঘুনাথরাও ঐ পদের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। তাঁরই চক্রান্তে নারায়ণরাওকে হত্যা করা হয় এবং রঘুনাথরাও পেশোয়া হন।

এর মধ্যে সদ্য নিহত নারায়ণরাওয়ের পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পুণার দরবারের নানা ফড়নাবীশ, মহাদজী সিন্ধিয়া প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই বালককে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। বালকের নামকরণ হয় দ্বিতীয় মাধবরাও।

এই অবস্থায় পদচ্যুত পেশোয়া রঘুনাথরাও ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের সংগে সুরাটের সন্ধি স্থাপন করেন। ইংরেজরা মারাঠাদের অন্তর্কলহের সুযোগে মহারাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়। সুরাটের সন্ধি তাদের এই উদ্দেশ্যের পথে অনেকটাই অগ্রসর করে দেয়।

অন্যাদিকে দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের অভিভাবক নানা ফড়নাবীশ এই সন্ধি অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাবাহিনী পুণার দিকে অগ্রসর হলে নানা পরাজিত হয়ে

---

[১] The plains of Panipath were not more fatal to the Maratha empire than the early end of this excellent prince.

—Grant Duff.

বালক মাধবকে নিয়ে পুরন্দরের দুর্গে আশ্রয় নেন। আর ইংরেজ সাহায্যে রঘুনাথ পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন।

অন্যদিকে এই সময়ই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট নামে এক আইন পাশ করে। এই আইন অনুসারে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই কর্তৃপক্ষের যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি স্থাপনের অধিকার লোপ করা হয়। তখন বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি সুরটের সন্ধিকে অরাজনৈতিক, অবিবেচনাপ্রসূত এবং অনুমোদনহীন বলে বর্ণনা করেন এবং ঐ সন্ধিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। তিনি নানা ফড়নাবীশের সংগে নতুনভাবে পুরন্দরের সন্ধি সম্পন্ন করেন। এই সন্ধি অনুসরে ইংরেজরা রঘুনাথরাওয়ের পরিবর্তে দ্বিতীয় মাধবরাওকেই পেশোয়া বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বোম্বাই কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থায় খুশী না হয়ে ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানায়। কর্তৃপক্ষ পুরন্দরের সন্ধিকে বাতিল করে সুরাটের সন্ধিকেই বহাল রাখে। ফলে হেস্টিংস রঘুনাথকেই সমর্থন জানাতে বাধ্য হন এবং পুনরায় ইংগ-মারাঠা বিবাদ আরম্ভ হয়। কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধেও কোন মীমাংসা না হওয়ায় শ্রান্ত, ক্লান্ত উভয়পক্ষই সন্ধিতে সম্মত হয়। স্বাক্ষরিত হয় সলবাইয়ের সন্ধি। প্রথম ইংগ-মারাঠা যুদ্ধ সম্পর্কে পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন, এই যুদ্ধ যেমন ছিল অপ্রয়োজনীয় তেমনি তার পরিচালনায়ও ছিল দুর্ভাগ্যজনক।[২] কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন এই যুদ্ধে ইংরেজরা মারাঠা শক্তিকে ঘায়েল করেছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়।

॥ দ্বিতীয় ইংগ-মারাঠা যুদ্ধ ॥

ইংগ-মারাঠা দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল কেন্দ্র হল ফরাসী ভীতি। তখন ভারতে গভর্নর জেনারেল হিসেবে এসেছেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি ছিলেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন ফরাসী আশংকা থেকে ভারতকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল উত্তরোত্তর ভারতীয় রাজন্যবর্গকে কোম্পানীর সামরিক সামর্থের উপর নির্ভরশীল করে তোলা। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি মারাঠাদের উপর কোম্পানীর সামরিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে যান। কিন্তু তারা এই চাপ দীর্ঘকাল ঠেকিয়ে রাখলেও শেষ পর্যন্ত অন্তর্কলহের ফলে নতিস্বীকার করে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের মার্চে নানা ফড়নাবীশের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে পুণার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল পামার বলেন, তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে মারাঠা সরকারের যা কিছু বিজ্ঞতা ও গতিশীলতা তারও অবসান হয়।[৩] নানা ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের পরিণতি জানতেন। তাই তিনি এই হস্তক্ষেপকে কখনোই অনুমোদন করেন নি।

নানার মৃত্যুর সংগে সংগেই তদানীন্তন পেশোয়া বাজীরাও নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে এক মারাঠা প্রধানকে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েন। দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্তরাও হোলকার উভয়েই পুণার দরবারে প্রাধান্যলাভে আগ্রহী ছিলেন। প্রথম দিকে সিন্ধিয়া সাফল্যলাভ করে পেশোয়াকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এবং ইংরেজরা সিন্ধিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তাদের সাহায্য নেবার জন্য পেশোয়ার উপর চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তারা সাফল্য পায় নি।

২ The first Maratha war must be regarded as unnecessary in its inception and unfortunate in its handling. —Percival Spear.

৩ With him departed all the wisdom and moderation of the Maratha Government. —Col. Palmer.

এর মধ্যে আকস্মিকভাবে দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে পেশোয়া যশোবন্তের ভ্রাতা বিঠুজীকে হত্যা করেন। ক্ষিপ্ত যশোবন্ত পুণার দিকে অগ্রসর হয়ে পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং বিনায়ক রাওকে পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত করেন। বাজীরাও বেসিনে পালিয়ে আসেন এবং নিরুপায় হয়ে ১৮০২ সালে ইংরেজ সাহায্য গ্রহণ করে বেসিনের চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এই সন্ধি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর প্রধান লর্ড ক্যাসলরীগ বলেছিলেন, এই সন্ধির ফলে ইংরেজরা দুর্ধর্ষ মারাঠা সাম্রাজ্যের সীমাহীন জটিলতায় জড়িয়ে গেল।[৫] উত্তরে ওয়েলেসলী বলেছিলেন কোম্পানীর বিনা ব্যয়ে শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে এই সন্ধি দ্বারা, কেননা যে কোন জরুরী অবস্থায় পেশোয়ার বাহিনীকেও ব্যবহার করা যাবে।[৬] পরবর্তীকালে এডওয়ার্ডস বলেন এই সন্ধি ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত করে।[৭] কারণ এই সন্ধি দ্বারা পেশোয়ার বৈদেশিক নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পেশোয়ার রাজ্যে ইংরেজ সেনা মোতায়েন করে মারাঠা রাষ্ট্রকেই ধ্বংস করার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

স্বভাবতঃই এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হয়ে সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ভোঁসলে পরাজিত হয়ে দেওগাঁওয়ের সন্ধিতে ইংরেজ অধীনতা স্বীকার করে নেন। দৌলতরাও সিন্ধিয়াও পরাজিত হয়ে একই পথ অনুসরণ করেন অর্জুনগাঁওয়ের সন্ধির মাধ্যমে। হোলকার আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও সাফল্য পান নি।

এর মধ্যে ওয়েলেসলীর স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড বার্লো। তিনি ১৮০৫ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হোলকারের সঙ্গে রাজপুরঘাটে সন্ধি করেন। এই যুদ্ধ যেমন মারাঠা শক্তির পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে এই যুদ্ধের সাফল্যই ইংরেজদের এক সর্বভারতীয় শক্তিতে পরিণত করে।

॥ তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ॥

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মারাঠা বিরোধের তৃতীয় ও শেষ পর্বের সূচনা হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেসলীর ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে আগ্রাসী নীতিকে স্তিমিত করা হয় তাই আবার তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে লর্ড হেস্টিংসের সময়ে। তিনি ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারে কৃতসংকল্প ছিলেন।

অন্যদিকে ওয়েলেসলীর বিদায়ের পর থেকে কয় বৎসর মারাঠারা শ্বাস ফেলবার যে সময় পেয়েছিল তাকে নিজেদের সংগঠিত করার কাজে না লাগিয়ে আরও তীব্র অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শোচনীয় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে।

হেস্টিংস পিণ্ডারী নামে লুটেরা দস্যুদলকে দমনের জন্য এক পরিকল্পনা রচনা করেন। তিনি জানতেন এই দস্যুদল সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতির সমর্থনপুষ্ট।

[৫] The Treaty would involve the English in the endless and complicated distractions of that terbulent Maratha Empire.

—Castlereagh.

[৬] Our own military resources were considerably increased without expense to the Company, the army of the Peshwa likewise became bound at one call on every occasion of emergency.

—Wellesley.

[৭] British empire in India became the British empire of India.

—Edwards.

সুতরাং পিণ্ডারীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলে এরা যেন ইংরেজদের বিরোধিতা করতে না পারে সেই জন্য তিনি আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রথমেই তিনি পেশোয়ার উপর জোর করে পুণার সন্ধি চাপিয়ে দেন। এই সন্ধি অনুসারে পেশোয়ার পদ লোপ করা হয়। পেশোয়া ইংরেজদের এক বেতন-ভোগী কর্মচারীতে পরিণত হন। এর পর তিনি সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি নেতাদের কঠোর শর্তে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

হেস্টিংসের এই জবরদস্তি নীতির ফলে স্বভাবতঃই পেশোয়া ও অন্যান্য মারাঠা নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের নির্দেশে পুণার ইংরেজ রেসিডেন্টের বাসগৃহ অগ্নিদগ্ধ করা হয়। ভোঁসলে ও হোলকার পেশোয়ার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। আরম্ভ হয় তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।

কিন্তু সীতাবলদির যুদ্ধে ভোঁসলে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। হোলকারও পরাজিত হন মাহিদপুরের যুদ্ধে। পেশোয়ার সেনাপতি কোরেগাঁও ও অস্টির যুদ্ধে পরাজিত হলে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে পেশোয়ার পদ লুপ্ত হয় এবং পেশোয়ার রাজ্য কোম্পানী অধিকার করে। হোলকার কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করে নেন। হোলকারদের হাত থেকে রাজপুতানা কোম্পানী দখল করে। ভোঁসলেদের অঞ্চলের একাংশও কোম্পানীর অধিকারে আসে।

॥ মারাঠা-ব্যর্থতার কারণ ॥

গ্রান্ট ডাফ মন্তব্য করেছেন, মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের দ্রুত সাফল্য এবং মারাঠা যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি সমগ্র ভারতবর্ষকে বিস্মিত করেছে।[৭] প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে শোচনীয় বিপর্যয়ের পরও মারাঠারা যত দ্রুত আবার এক অদম্য শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তত দ্রুতই তাদের পতন প্রত্যাশিত ছিল না, কিন্তু অনিবার্যই ছিল।

প্রথমতঃ মারাঠা রাষ্ট্রের মত একটি স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উপর। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বহুবিচ্যুতি মারাঠা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। তাঁরাই মারাঠা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। তদুপরি বাজীরাও-ই বেসিনের সন্ধি দ্বারা ব্রিটিশ শক্তিকে মারাঠা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সম্ভবতঃ যশোবন্তরাও হোলকারই ছিলেন যোগ্যতম। কিন্তু তিনিও সর্বক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। নেতৃত্বের এই অক্ষমতাই মারাঠাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়তঃ মারাঠা রাষ্ট্রের গঠনই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এই রাষ্ট্র কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। মোগল আমলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মারাঠা রাষ্ট্রে স্বাধীনতা রক্ষাকেই নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী-কালে এই নৈতিক ভিত্তিও দুর্বল হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল খুবই দুর্বল। আভ্যন্তরীণ সম্পদ সীমিত হওয়ায় মারাঠাদের বহির্দেশে জোর জবরদস্তি করে অর্থ আদায় করে রাষ্ট্রীয় ব্যয় মেটাতে হত। চৌথ ও সরদেশমুখী ছিল এমন কর। মহারাষ্ট্রের বাইরে এই কর দুটি ছিল খুবই কুখ্যাত। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ না হওয়ায় যুদ্ধ এবং লুঠতরাজের উপর মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল। এই

৭ The rapidity of the conquest and the speedy termination of the war surprised all India.

—Grant Duff.

ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্র স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না।

চতুর্থতঃ গেরিলা যুদ্ধনীতি ছিল মারাঠা জাতীয় চরিত্রের অন্তর্গত। এই যুদ্ধনীতি পরাক্রান্ত মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের সাফল্য এনে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এই নীতি পরিত্যাগ করে। তারা ইউরোপীয় রণকৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু এই কৌশলে তারা তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা কোনদিনই অর্জন করতে পারে নি। বিশেষ করে এই রণকৌশলের সাহায্যে অন্য একটি ইউরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাদের পতনের পেছনে রণকৌশলের এই পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

পঞ্চমতঃ মারাঠা রাষ্ট্রে জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন খুবই ক্ষতিকারক হয়েছিল। কেননা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের জায়গীরদারগণ প্রায়ই পেশোয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। ফলে জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হত।

ষষ্ঠতঃ উত্তরাধিকার নিয়ে মারাঠাদের অন্তর্কলহ ইংরেজদের তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

সর্বশেষে শুধু ব্যক্তিগত দক্ষতাই নয়, সামগ্রিকভাবে ইংরেজদের উন্নত রণকৌশল ও তাদের সূক্ষ্ম কূটনৈতিক বুদ্ধি তাদের জয়ের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

মহীশূর রাজ্যের পতন

॥ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ॥

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালেই হায়দরের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র টিপু সুলতান।

সেই সময় মহীশূর রাজ্যের পক্ষে এক সংকটময় কাল। কারণ কিছুদিন আগেই মহীশূর রাজ্যের ঘনিষ্ঠ মিত্রশক্তি মারাঠাগণ মহীশূরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সঙ্গে সলবাইয়ের সন্ধি স্থাপন করে এবং ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। অন্যদিকে যে ফরাসী সাহায্যের উপর টিপু অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন সেই সাহায্য থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। কারণ ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় ফরাসী সেনাপতি ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে অংশ না নিয়ে তাঁর নৌবহর নিয়ে দেশে ফিরে যান।

ভাগ্যে এমন সব অপ্রত্যাশিত পরিহাস সত্ত্বেও টিপু পিতার পদাংক অনুসরণ করেই অসম সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ম্যাংগালোর পুনরুদ্ধার করেন এবং ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুসকে বন্দী করেন।

কিন্তু এর মধ্যে উভয়পক্ষই দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া ইংরেজ কোম্পানীতেও দেখা দেয় চরম অর্থসংকট। বাধ্য হয়ে মাদ্রাজের গভর্নর টিপুর সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধি ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি নামে পরিচিত।

এই সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষই পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরত দিয়ে স্থিতাবস্থায় ফিরে আসে। ওয়ারেন হেস্টিংস অবশ্য এই সন্ধির বিপক্ষে ছিলেন। কারণ তখন পর্যন্ত ইঙ্গ-মহীশূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোনমতেই আর যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না।

॥ তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ॥

ইংরেজরা প্রতিটি যুদ্ধ বিরতিকে মূল প্রশ্ন মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের পুনরায় পূর্ণোদ্যমে সজ্জিত করার অবকাশ বলে মনে করতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালও ছিল সেই সময়। তবে এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে

সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের পিটের ভারত শাসন আইন। এই আইনে আত্মরক্ষা ছাড়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে কোম্পানীর যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। ফলে সন্ধি অগ্রাহ্য করে টিপুকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না।

তাহলেও প্রস্তুতি চলতেই থাকলো। নিজাম ও মারাঠাদের টিপু-বিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস এক ত্রিশক্তি মৈত্রী গড়ে তোলেন। বিশেষ করে টিপু যখন ফরাসী ও তুর্কী সাহায্য পেতে সচেষ্ট হন তখন কর্ণওয়ালিস টিপুকে ধ্বংস করতে আরও বেশী সংকল্পবদ্ধ হন। কারণ তিনি জানতেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে কিভাবে ফরাসীরা আমেরিকানদের সাহায্য করেছিল। বিশেষতঃ এই কারণে তিনি টিপু সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন।

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ত্রিবাংকুরের ঘটনা। টিপুর করদ রাজ্য কোচিনের দুটি জায়গা ওলন্দাজদের কাছ থেকে কিনে নেন ত্রিবাংকুরের রাজা। এই কাজকে টিপু তাঁর সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করে ত্রিবাংকুর রাজ্য আক্রমণ করেন। আশ্রিত ত্রিবাংকুর আক্রান্ত হবার সংগে সংগে ইংরেজরাও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এইভাবে আরম্ভ হয় তৃতীয় ইংগ-মহীশূর যুদ্ধ।

ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধের জন্য কর্ণওয়ালিসকেই অভিযুক্ত করেন। কারণ ত্রিবাংকুর বিরোধে টিপু যখন ইংরেজ হস্তক্ষেপের আবেদন করেন তখন কর্ণওয়ালিস কর্ণপাত করেন নি। বরং তিনি নিজাম ও মারাঠাদের নিয়ে ত্রিশক্তি জোট গঠন করে টিপু-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন সবচেয়ে বড় কথা হল ত্রিবাংকুরের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েও ইংরেজরা পিটের ভারত শাসন আইনকেই অগ্রাহ্য করেছিল।

যাই হোক মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজরা একযোগে মহীশূর আক্রমণ করলে টিপু দুই বৎসরকাল অনমনীয় দৃঢ়তার সংগে যুদ্ধ করেন। শেষে কর্ণওয়ালিস নিজে ইংরেজবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করলে নিরুপায় টিপু বাধ্য হন সন্ধি করতে।

শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি অনুসারে টিপু তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে দিতে হয় প্রচুর পরিমাণ অর্থ। সুতরাং এই সন্ধি মহীশূর রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলে। কর্ণওয়ালিস এই যুদ্ধের সাফল্য পরিমাপ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ইংরেজরা তাদের শত্রুকে যেমন দমন করেছে তেমনি মিত্রদেরও শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ দেয় নি।[৮]

॥ চতুর্থ ইংগ-মহীশূর যুদ্ধ ॥

তৃতীয় ইংগ-মহীশূর যুদ্ধের অপরিমেয় গ্লানি টিপু ভুলতে পারেন নি। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জন শোর কর্ণওয়ালিসের স্থলাভিষিক্ত হলেন। শোর তাঁর পূর্বসূরীর মত ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। সেই সুযোগে নিজ শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বহির্দেশে মিত্রের সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন।

দেশের ভিতরে তিনি নিজাম ও মারাঠাসহ অন্যান্য রাজন্যবর্গের সমর্থনলাভে সচেষ্ট হন। দেশের বাইরে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের সংগেও তিনি যোগাযোগ রাখেন। তিনি অধিক নির্ভরশীল হতে চেয়েছিলেন ফরাসী সাহায্যের উপর। কারণ এই সময় ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ছিলেন প্রচণ্ড ইংরেজ বিরোধী এবং তাঁর অবিশ্বাস্য সামরিক সাফল্যে সমগ্র ইউরোপ তখন আলোড়িত। সুতরাং ফরাসীদের সাহায্য

[৮] We have effectively crippled cur enemy without making our friends too formidable.

—Cornwallis.

সম্পর্কে তাঁর অধিক আশাবাদী হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি স্বয়ং নেপোলিয়নের কাছ থেকে তিনি সুস্পষ্ট সাহায্যের আশ্বাসও পেয়েছিলেন।

এ সময়ই জন শোরের পরিবর্তে ভারতে আসেন লর্ড ওয়েলেস্‌লী। ব্রিটিশ স্বার্থ-বিরোধী যে কোন চক্রান্তকে তিনি সূচনাতেই উৎপাটিত করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি টিপুর বিরুদ্ধে ফরাসীদের সঙ্গে চক্রান্তের অভিযোগ এনে তাঁকে অনতিবিলম্বে কোম্পানীর অধীনতা মেনে নেবার আহ্বান জানান। টিপু তাতে ভ্রূক্ষেপ না করায় ওয়েলস্‌লী নিজাম ও মারাঠা সহযোগিতায় মহীশূর আক্রমণ করেন।

নিজ রাজধানী রক্ষায় টিপু মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেন। মহীশূরে স্বাধীন নবাবী শাসনের অবসান হল সেই সঙ্গে। মহীশূর তিন ভাগে বিভক্ত হল। এক ভাগ গ্রহণ করলো নিজাম। এক ভাগ কোম্পানীর আশ্রয়ে মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশ। অবশিষ্ট অংশ গেল সরাসরি কোম্পানীর অধিকারে।

ভারতের ইতিহাসে একজন বীর দেশপ্রেমিক হিসেবে টিপু এক গৌরবময় আসনের অধিকারী। অনেকে তাঁকে প্রথম জাতীয়তাবাদী এবং শহীদের মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু মহীদুর হাসান এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে তখনকার দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনার নামগন্ধও ছিল না। আসলে এটা হল বর্তমানের ধারণাকে অতীতের উপর আরোপ করা। টিপু প্রকৃতপক্ষে লড়াই করেছিলেন নিজের সামর্থ্য ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদেই। এছাড়া বৃহৎ কোন লক্ষ্য ছিল না।

॥ অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি ॥

ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলস্‌লী ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে ভারতের রাজন্যবর্গকে নিয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন ইতিহাসে তা অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি নামে পরিচিত। এই নীতি একই সঙ্গে দ্বিবিধ উদ্দেশ্যসাধন করেছিল। একটি হল ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ক্রমশঃ শক্তিশালী করা। অপরটি হল নেপোলিয়নের আক্রমণের আশংকা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা। প্রথমটির ক্ষেত্রে এই নীতি উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিল। অনেক নতুন রাজ্য এই নীতির সাহায্যে কোম্পানীর অধিকারে এসেছিল।

এই নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক আলফ্রেড লায়েল ভারতে বিভিন্ন যুদ্ধে ইংরেজদের অংশগ্রহণের চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে কোন বন্ধু ভারতীয় রাজাকে তাঁর যুদ্ধে সাহায্য করতে ইংরেজরা যুদ্ধ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই যুদ্ধ করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে সহযোগী হিসাবে কোন ভারতীয় রাজার সহযোগিতা পেয়েছে। যিনি একই কারণে ইংরেজদের সাহায্যদানে এগিয়ে এসেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে ইংরেজরাই সৈন্যবাহিনী গঠন করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে, সজ্জিত করেছে। কেবল অর্থের বিনিময়ে মিত্রভাবাপন্ন ভারতীয় রাজাকে সেই বাহিনী দিয়ে প্রয়োজনে সাহায্য করেছে। যেমন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি। শেষ পর্যায়ে ইংরেজরা বন্ধু ভারতীয় রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই রাজ্যে স্থায়ীভাবে সৈন্য মোতায়েন রেখেছে। সেই বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই রাজ্যকে তার একাংশের রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরেজদের উপরই ছেড়ে দিতে হয়েছে। যেমন ১৮০০ সালে সম্পাদিত নিজামের সঙ্গে চুক্তি।

ওয়েলেসলীই এই নীতির উদ্ভাবক বা প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁর অনেক আগে থেকেই এই নীতি কার্যকরী ছিল এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর সময়ে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। সম্ভবত ডুপ্লেই সর্বপ্রথম ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যার্থে সৈন্য-

বাহিনী অর্থের বিনিময়ে পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজরাও এই পথ অনুসরণ করে। ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল এই নীতি কোন না কোন ভাবে ব্যবহার করেছেন। ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব হল, তিনি এই নীতিকে আরও বেশী ব্যাপক করে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই নীতিই প্রযুক্ত হয়েছিল কোম্পানীর সঙ্গে অযোধ্যার নবাবের চুক্তি সম্পাদনকালে। ঐ চুক্তিতে কোম্পানী নবাবের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে এই শর্তে যে, এ বাবদ যাবতীয় খরচ নবাবই বহন করবেন। স্থায়ীভাবে লক্ষ্ণৌতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখা হয়। এই নীতির পরবর্তী রূপ হল ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকের নবাবের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি। এই চুক্তি দ্বারা কর্ণাটকের নবাবের যাবতীয় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আরেক ধাপ এগিয়ে গেল ১৭৯৮ সালে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন হলে। এবার চুক্তিবলে অন্য কোন ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার কিংবা তাদের রাজকার্যে নিয়োগ করার অধিকারও নবাব হারালেন। এই নীতির চূড়ান্ত রূপ হল সহায়ক বাহিনীর তত্ত্বাবধানের জন্য নগদ অর্থের বিনিময়ে সাহায্য গ্রহণকারী রাজ্যের একাংশ কোম্পানী কর্তৃক অধিগ্রহণ করা। সাধারণতঃ এ বাবদ কোম্পানীর নগদ অর্থের দাবী এত বেশী ছিল যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ সব সময় তা যুগিয়ে উঠতে পারতেন না, বাকী থেকে যেত। বিশেষ করে এই সব রাজন্যবর্গের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল ভূমি রাজস্ব আর এই ভূমি রাজস্ব থেকে আয় আবার নির্ভর করতো অনুকূল বৃষ্টিপাতের উপর। ভাল বৃষ্টিপাত হলে ভাল ফসল হত। ভাল ফসলে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। এই আর্থিক অবস্থায় কোম্পানীও তার সহায়ক বাহিনী বাবদ আয় সম্পর্কে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকতো। তাই এই অনিশ্চিত অবস্থার পরিবর্তে স্থিরতা আনতে ওয়েলেসলী নগদ অর্থের বিনিময়ে রাজ্যের একাংশ দাবী করলেন, যে একাংশের উপর কোম্পানীর পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে।

সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির শর্তগুলি হলঃ

(এক) কোম্পানীর অনুমোদন ছাড়া এই মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্যগুলি কোন বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে কোম্পানীকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

(দুই) বৃহৎ রাজ্যগুলি তাদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্রিটিশ সেনাপতির অধীনে এক ইংরেজ বাহিনী নিজ নিজ রাজ্যে মোতায়েন রাখবে এবং এই বাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর জন্য এইসব রাজ্য তাদের একাংশ পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধিকার সহ কোম্পানীর হাতে তুলে দেবে। ছোট রাজ্যগুলি একই উদ্দেশ্যে কোম্পানীকে অর্থ দেবে।

(তিন) এই মিত্রতায় আবদ্ধ প্রতি রাজ্যে একজন করে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট থাকবেন।

(চার) কোম্পানীর সঙ্গে পরামর্শ না করে এইসব রাজ্য তাদের রাজ-কার্যে কোন ইউরোপীয়কে নিয়োগ করতে পারবে না।

(পাঁচ) কোম্পানী এইসব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে না।

(ছয়) বিদেশী আক্রমণ থেকে মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্যগুলিকে সর্বতোভাবে রক্ষায় কোম্পানী দায়বদ্ধ থাকবে।

॥ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সুবিধা ॥

এই মিত্রতার নীতিকে ঐতিহাসিকেরা বিখ্যাত ট্রয়ের ঘোড়ার পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ কৌশল বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমতঃ এই নীতির প্রয়োগের তাৎক্ষণিক সুফল হিসেবে বলা যায়—এর ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে যে অন্তর্কলহ চলছিল তা বন্ধ হয়। বাইরের আক্রমণের আশংকা থেকে এই সব রাজ্যগুলি মুক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই নীতি নানাদিক থেকেই কোম্পানীর পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল। ভবিষ্যতে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে কোম্পানী এই সব আশ্রিত রাজ্যগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিজস্ব এলাকায় শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে কোম্পানী এক বিশাল বাহিনী সদা প্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেল। এই বাহিনীকে তারা যখন-তখন, যে কোন স্থানে এবং যার-তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পেল এবং বহু ক্ষেত্রে তারা করেও ছিল তাই।

চতুর্থতঃ পরবর্তীকালে এই বাহিনীকে আশ্রিত রাজ্যজয়ের কাজেও ব্যবহার করা হয়েছিল। লর্ড ডালহৌসী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে যে সাফল্য পেয়েছিলেন তার পেছনে ছিল এই বাহিনী। লর্ড স্যালিসবিউরী চমৎকার বলেছেন যে, এই মিত্রতা পরবর্তী কালে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেন চাঁদকে বাঁচাতে পৃথিবীকে মঙ্গলগ্রহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল।[৯]

পঞ্চমতঃ দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজধানীতে ব্রিটিশ সৈন্য স্থায়ীভাবে মোতায়েন করার মধ্য দিয়ে ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলির বিদ্বেষ জাগ্রত না করেও ইংরেজরা চমৎকারভাবে কৌশলগত অবস্থান করায়ত্ত করতে পেরেছিল এই নীতির সাহায্যে।

ষষ্ঠতঃ এই নীতির সাহায্যে কোম্পানী সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে এক মজবুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল। বিশেষ করে দেশীয় রাজন্যবর্গের উপর এই নীতি আরোপ করে ইংরেজরা ঐ সব রাজন্যবর্গের অধীনে কর্মরত ফরাসী কর্মচারীদের বিতাড়িত করতে পেরেছিল।

সপ্তমতঃ দেশীয় রাজাদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রেও বিরোধ মেটাবার দায়িত্ব নিয়েছিলো কোম্পানী। শুধু তাই নয়। যদিও এই নীতির শর্তাবলী অনুসারে রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার কোম্পানীর ছিল না তথাপি প্রতি রাজ্যেই ছিল ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট। তাঁরা দেশীয় রাজাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন আর সেই সুযোগে আভ্যন্তরীণ বিষয়েও নাক গলাবার অধিকার তাঁদের থেকেই যেত।

অষ্টমতঃ কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ বাবদ তারা যে সব অঞ্চল দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল সেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক রসিকতা করে বলেছেন, ষাঁড় কাটবার আগে তাকে যেমন খাইয়ে-দাইয়ে মোটাসোটা করে নেওয়া হয় দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি ছিল তাই।[১০]

॥ অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া ॥

তাৎক্ষণিক স্বাচ্ছন্দ্যের পর ক্রমশঃই এই নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে তারা অনুভব করতে পারে জেনেশুনে কি বিষ তারা পান করেছে।

৯ The system of Subsidiary Alliance develoved later on as one of defending the moon in order to ward off an attack on the earth from the Mars. —Lord Salisbury.

১০ The Subsidiary Alliance is a system of fattening allies as we fatten oxen till they were worthy of being devoured.

প্রথমতঃ দেশীয় রাজন্যবর্গ ক্রমশঃই অনুভব করতে পারেন যে এই মিত্রতা তাঁরা গ্রহণ করে তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছেন। স্যার টমাস মুনরো স্পষ্ট করেই বলেছেন, নিরাপত্তা কিনতে গিয়ে একটি রাজ্যকে হারাতে হত তাঁর স্বাধীনতা, জাতীয় চরিত্র এবং জনগণের মর্যাদাবোধ।[১১]

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ রেসিডেন্টগণ কালক্রমে প্রত্যেক রাজ্যে এত বেশী প্রভাবশালী হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা রাজ্য শাসনের খুঁটিনাটি বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেন। ফলে দেখা গেল রক্ষকই ভক্ষকে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অধীনতামূলক মিত্রতায় আশ্রয় পেয়েছিল অনেক অত্যাচারী শাসক। এই আশ্রয় যদি না থাকতো তাহলে জনগণই হয়তো বিদ্রোহ করে সেই শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করতো। সুতরাং এই মিত্রতা ঐ সব অত্যাচারী শাসকের কাছে আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল আর জনগণের কাছে অভিশাপ।

চতুর্থতঃ এই নীতি রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সংকটকে অধিকতর ঘনীভূত করেছিল। কোম্পানীকে দিতে হত মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ। অধিকাংশ রাজ্যের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হত না। বাকী থেকে যেত। চাপ আসতো কোম্পানীর দিক থেকে অনাদায়ী অর্থ আদায় করতে। ফলে শাসকদের উপায় থাকতো না জনগণের উপর আরো করভার না চাপিয়ে। ফলে সংকট গভীর থেকে গভীরতর হত।

কার্ল মার্কস এই নীতির প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, একটি রাজ্য যে মুহূর্তে এই মিত্রতা গ্রহণ করতো সেই মুহূর্ত থেকেই তার অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি হত। কেননা যে সব শর্তে তাদের আপাতত স্বাধীনতা রক্ষা করতে দেওয়া হত সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল তাদের স্থায়ীভাবে ধ্বংস করার শর্ত। কারণ তাদের উন্নতির কোন সম্ভাবনাই থাকতো না।[১২] মুনরো আরও তীব্র ভাষায় আত্মসমালোচনা করে বলেছেন যে, যেভাবে ভেতর থেকে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে রাজ্যগুলিকে জয় করলে তা ইংরেজ সেনাবাহিনী ও ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের পক্ষে অনেক বেশী মর্যাদার হত।[১৩]

যে সব রাজ্য অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেছিল সেগুলি হল হায়দরাবাদ, মহীশূর, তাঞ্জোর, অযোধ্যা, মারাঠা, বেরার, যোধপুর, জয়পুর, মাচেরি, বুন্দি, ভরতপুর প্রভৃতি।

॥ ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক ও রণজিৎ সিংহ ॥

শতধা বিচ্ছিন্ন শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে যিনি তাদের জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি হলেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিত সিংহ।

অখণ্ড শিখ রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হতে রণসিংহ রণজিৎ সিংহকে ইংরেজদের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে রণজিৎ তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করতে গিয়ে ইংরেজদের সম্মুখীন না হয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। কারণ

১১ "A state purchased security by the sacrifice of independence, of national character and of whatever renders a people respectable.

—Sir Thomas Munro.

১২ The conditions under which they are allowed to retain their apparent independence are at the same time the conditions of permanent decay and of an utter inability of improvement.

—Karl Marx.

১৩ The simple and direct mode of conquest from without is more creditable both to our armies and to our national character than that of dismemberment from within by the aid of a subsidiary force.

—Thomas Munro.

ভারত মহাদেশের অভ্যন্তরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন এক সম্প্রসারণশীল রাজনৈতিক শক্তি, কেবলমাত্র এক বাণিজ্যিক সংস্থা নয়।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের জামান শাহের সম্ভাব্য ভারত আক্রমণের আশংকায় আতংকিত হয়ে ইংরেজরা রণজিৎকে অনুরোধ জানায় তিনি যেন জামান শাহকে সাহায্য না করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তরাও হোলকার অমৃতসরে এসেছিলেন এবং ইংরেজ বিরোধিতায় রণজিতের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তখন রণজিৎ শিখ রাজ্য গঠনে ছিলেন ব্যাপৃত এবং সেই অবস্থায় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। তাছাড়া তিনি হোলকারের অভিসন্ধি সম্পর্কেও সন্দিহান ছিলেন।

১৮০৬ সালের ১লা জানুয়ারী রণজিতের সঙ্গে ইংরেজদের এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির সর্তানুসারে রণজিৎ হোলকারকে অমৃতসর থেকে বিতাড়িত করেন। বিনিময়ে ইংরেজরা তাঁর সাম্রাজ্য সম্পর্কে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

এদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুক্ত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো রণজিতের সঙ্গে নিরাপত্তামূলক এক চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চার্লস মেটকাফকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। রণজিৎ দাবী করেন যে শিখ-আফগান যুদ্ধ হলে ইংরেজদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং তাঁকে শতদ্রুর পূর্বে মালব সহ সমগ্র পাঞ্জাবের অধীশ্বর বলে ইংরেজদের স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু এই সব আলোচনা চুক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে নি। কারণ শতদ্রুর পূর্ব দিক সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার মেটকাফের ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা হল ততদিনের নেপোলিয়নের ভারত আক্রমণের আশংকাও অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

এর মধ্যে ১৮০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইংরেজ সেনাপতি ডেভিড অকটারলোনী ঘোষণা করেন যে, যেহেতু শতদ্রুর পূর্বদিকের রাজ্যগুলি ব্রিটিশ আশ্রিত সেইহেতু তাদের উপর যে কোন আক্রমণ ইংরেজরা বাহুবলেই প্রতিহত করবে। এই পরিস্থিতিতে নিরুপায় হয়ে রণজিৎ ঐ বৎসরই এপ্রিলে ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে শতদ্রুর পূর্বে রণজিতের রাজ্য বিস্তারের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। শতদ্রু নদীকেই তাঁর এবং ইংরেজদের সীমানা হিসেবে মেনে নেওয়ায় তাঁর আর্থিক ক্ষতিও হল। সুতরাং রণজিৎ শতদ্রুর পূর্ব দিকে তাঁর প্রত্যাশা পরিত্যাগ করে পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হলেন। তার থেকেও বড় কথা হল এই সন্ধি মেনে নিয়ে রণজিৎ ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেন। বাহের পর্যন্ত ইংরেজরা এগিয়ে আসায় ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা হল। তা ছাড়া রণজিতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর ইংরেজদের প্রভাব বহুলাংশে বর্ধিত হল।

ইংরেজ অগ্রগতি প্রতিরোধে রণজিতের ব্যর্থতা আরও বেশী স্পষ্ট হল পরবর্তী বৎসরগুলোতে। সিন্ধুতে রণজিতের অগ্রগতিতে বাধা দেয় ইংরেজরা। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রূপারে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিংক রণজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয় পক্ষই পারস্পরিক বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সিন্ধুকে বিভক্ত করার রণজিতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। রূপার আলোচনা চলাকালেই ইংরেজরা সিন্ধুর আমীরের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেন। রণজিৎকে যদিও বলা হয় যে ঐ সন্ধি এক বাণিজ্যিক চুক্তি মাত্র তবুও ইংরেজদের অভিসন্ধি বুঝতে রণজিতের ভুল হয় নি। কিন্তু তিনি তা সত্ত্বেও ইংরেজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত ছিলেন না। পরে মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতিতে আতংকিত হয়ে ইংরেজরা ১৮৩৫ সালে ফিরোজ-

পুরে এক সেনানিবাস স্থাপন করে। এতেও রণজিৎ স্বস্তিবোধ করেন নি, কিন্তু একেবারেই নিষ্ক্রিয় থাকেন।

এরপর আফগানিস্থানে রাশিয়ার প্রভাব দূর করতে ইংরেজরা কাবুলের সিংহাসনে দোস্ত মহাম্মদের পরিবর্তে শাহ সুজাকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এ পরিকল্পনায় রণজিৎকেও অংশ নিতে বলে। কিন্তু রণজিৎ রাশিয়া অপেক্ষা ইংরেজ কার্যকলাপেই তটস্থ ছিলেন বেশী। অথচ রণজিৎ অংশ নিন বা না নিন ঐ পরিকল্পনা রূপায়িত হবে বলেই ইংরেজরা যখন হুমকি দেয় তখন রণজিৎ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন।

দেখা যাচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে রণজিৎ কখনো স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র দেখাতে পারেন নি। বার বার চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন। তাই ঐতিহাসিক এন. কে. সিংহ লিখেছেন তাঁর জীবনের শেষ দশকে রণজিৎ ছিলেন হতাশ, অসহায়। যে সাম্রাজ্য তিনি গড়ে তোলেন তাঁকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে তিনি ভয় পেতেন, তাই কেবল নতি স্বীকারের নীতিই তিনি অনুসরণ করেন।[১৪]

॥ পাঞ্জাব অধিকার ॥

পার্সিভাল স্পীয়ার লিখেছেন, পাঞ্জাবে ছিল শিখজাতি। এই জাতি রণজিতের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পাঞ্জাবী জাতি গঠিত হয় নি, তাই পাঞ্জাবে ঐক্য ছিল সুদূর পরাহত।[১৫] কথাটির সত্যতা অনুভব করা যায় রণজিতের মৃত্যুর পরবর্তী পাঞ্জাবের অবস্থা থেকে। কলহে পাঞ্জাব হয়ে উঠেছিল বিষাক্ত।

ইংরেজরা এই পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখছিল। এমনিতেই শতদ্রুর অপর প্রান্তের উর্বর জমির উপর ছিল তাদের লোভ। ১৮৩৮ সালেই ইংরেজরা রণজিতের মৃত্যুর পরই পাঞ্জাব অধিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ১৮৪০ সালে লর্ড অকল্যান্ডও একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু আফগান পরিস্থিতি সে সময় তাদের পাঞ্জাবের বিষয়ে অগ্রসর হবার সুযোগ দেয় নি।

সেই আফগানিস্থানে অপদস্থ হয়ে ইংরেজরা এবার পাঞ্জাব দিয়ে তাদের আহত মর্যাদাবোধে প্রলেপ লাগাতে চাইলো।

লর্ড হার্ডিঞ্জ গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসে পাঞ্জাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। শতদ্রুর অপর প্রান্তে অবস্থিত শিখদের আর ইংরেজদের মতিগতি বুঝতে বাকী রইলো না। কোম্পানী যদিও বলেছিল তাদের প্রস্তুতি হল প্রতিরোধমূলক তথাপি পাঞ্জাবের তখনকার বিশৃংখল পরিস্থিতিতে এই যুক্তি যে একেবারেই অর্থহীন তা-ও ছিল দিবালোকের মত স্বচ্ছ।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মেজর ব্রেডফুট লুধিয়ানায় কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে আসার পর দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাঁর উদ্ধত আচরণে এবং শিখদের ধর্মীয় বিষয়েও হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর রইলো না।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধকালে লাহোরের শাসন ছিল কিছু স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকের উপর, আর সেনাবাহিনীর ছিল না কোন অধিনায়ক। শিখরা শতদ্রু অতিক্রম করে

[১৪] In the last decade of his career Ranjit Singh was a pathetic figure, helpless and inert ... He feared to expose the kingdom he had created to the risk of war and chose instead the policy of yielding, yielding and yielding.

—N. K. Sinha.

[১৫] A Sikh nation had been created within the Punjab; with the help of Ranjit it had dominated the Punjab; but no Punjab nation had been born.

—Percival Spear.

আক্রমণ করলে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। শেষ পর্যন্ত সোবরাঁওয়ের যুদ্ধে শিখ প্রধানদের বিশ্বাসঘাতকায় ইংরেজদের জয় নিশ্চিত হয়।

এই যুদ্ধের পরই পাঞ্জাব অধিকৃত হতে পারতো। রণজিতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাতেই তা করা হয়নি এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আসলে তখনই পাঞ্জাব অধিকার করলে সমস্যা সৃষ্টি হত অনেক। তাই আপাততঃ পরীক্ষামূলকভাবে সহনশীলতার নীতিকেই ইংরেজরা অনুসরণ করে। তবে লাহোর সন্ধিতে লাহোরকে সংকুচিত করা হয় এবং পাঞ্জাবের আয়তন হ্রাস করা হয়।

॥ দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ॥

কাশ্মীর হস্তান্তরের প্রশ্ন নিয়ে ইঙ্গ-শিখ বিরোধের সূচনা হয়। তাছাড়া মহারাজা দলীপ সিংহের নাবাকলকত্বের সুযোগ নিয়ে লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সকল ক্ষমতাই নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। এ কাজ শিখদের মনে প্রচণ্ড অসন্তেষের সৃষ্টি করে। এর মধ্যে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসী। মুলতানের শাসক মুলরাজ বিদ্রোহ করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

মুলতানের বিদ্রোহ সমগ্র পাঞ্জাবে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে এবং এক জাতীয় বিদ্রোহের রূপ লাভ করে। শিখ প্রধানদের সঙ্গে আফগানরাও এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়। লর্ড গফের নেতৃত্বে এক বিশাল ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। শেষ পর্যন্ত শিখগণ পরাজিত হয়। সমগ্র পাঞ্জাব কোম্পানীর অধিকারে চলে আসে।

সরাসরি পাঞ্জাব দখল করে প্রত্যক্ষভাবে তার শাসনভারের দায়িত্ব গ্রহণ করাই ডালহৌসী যুক্তিযুক্ত মনে করেন। মেজর ইভান্ত বেল মনে করেন পাঞ্জাব অধিকার বিশ্বাসভঙ্গেরই সামিল কারণ বিদ্রোহ করেছিল শিখ জনগণ ও সৈন্য বাহিনী, মহারাজা নন। সুতরাং সেই মহারাজার অভিভাবক হয়েও ইংরেজরা তাঁকে যেভাবে রাজ্যচ্যুত করেছিল তা বিশ্বাসভঙ্গেরই সামিল। আসলে ডালহৌসীর পূর্ব সিদ্ধান্তই ছিল পাঞ্জাব অধিকার। শুধু তাঁর প্রয়োজন ছিল অজুহাতের। মুলতানের বিদ্রোহ তাঁকে সেই অজুহাত যুগিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং খলের ছল খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি।

॥ সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী ॥

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উগ্র সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে রাজ্য বিস্তারই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে তিনি যুদ্ধাবস্থা বা শান্তিপূর্ণ অবস্থা উভয় পরিস্থিতিরই পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি অধিকার করেন পাঞ্জাব, নিম্ন ব্রহ্মদেশ এবং সিকিমের একাংশ। আর শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এই কৌশলের নামই স্বত্ব বিলোপ নীতি। দ্বিতীয় ব্রহ্মদেশ যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি ব্রহ্মদেশের রাজার বিরুদ্ধে প্রথম ব্রহ্মদেশ যুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত ইয়ানদাবো সন্ধিভঙ্গের অভিযোগ আনেন। তারপরই আরম্ভ হয় প্ররোচনামূলক কাজ যার ফলে ব্রহ্মদেশের পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া উপায় ছিল না। যদিও এই যুদ্ধের ফলে নিম্ন ব্রহ্মদেশের ধান ও চা উৎপাদনকারী পেগু অধিকারে এসেছিল, বাণিজ্যের সুবিধে হয়েছিল তবু এডুইন আর্ণল্ড স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ ছিল অযৌক্তিক এবং নৈতিক দিক থেকে অসঙ্গত।[১৬]

শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁর কর্ম পদ্ধতি ছিল আরো বেশী নিন্দিত।

---

১৬ The Second Burmese war was neither just in origin nor marked by strict equity in its conduct or issue. —Edwin Arnold.

॥ স্বত্ব বিলোপ নীতি ॥

ডালহৌসী ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথাঃ (ক) যে সব রাজ্য কোম্পানীকে রাজস্ব দেয় না এবং কোম্পানীর অধীনস্থ নয়, (খ) যে সব রাজ্য কোম্পানীকে রাজস্ব দেয় এবং কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করে, এবং (গ) যে সব রাজ্য কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত সনদের ভিত্তিতে গঠিত ও স্থাপিত। এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে, ডালহৌসীর মতে, প্রথম শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির শাসকদের দত্তক পুত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন এক্তিয়ার নেই, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির শাসকদের ক্ষেত্রে দত্তক পুত্র গ্রহণ কোম্পানীর অনুমোদন সাপেক্ষ আর তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির শাসকদের ক্ষেত্রে দত্তক পুত্র গ্রহণ আদৌ বিবেচনাযোগ্য নয়।

তখনকার দিনে রাজন্যবর্গ তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান না থাকলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংকট এড়াতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করতেন। ডালহৌসী রাজন্যবর্গের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়ে বললেন যে এই সব দত্তক পুত্রেরা রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু রাজপদের নয়। রাজপদের উত্তরাধিকার পেতে হলে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। সেই অনুমোদন না থাকলে রাজ্যগুলির স্বত্ব বিলুপ্ত হয়ে সেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ডালহৌসীই যে এই নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা নয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী প্রথম এই নীতির কথা ঘোষণা করেন। ডালহৌসীর কৃতিত্ব হল তিনি এই নীতিকে সুবিন্যস্ত এবং সুবিস্তৃতভাবে কার্যকরী করেন।

এই নীতি প্রয়োগের প্রথম বলি হল সাতারা। সাতারার রাজা আপ্পা সাহেব যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তাতে সরকারী অনুমোদন ছিল না। সুতরাং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সাতারার পৃথক স্বত্বর বিলোপ হল। সম্বলপুরের রাজা নিঃসন্তান ছিলেন, কোন দত্তক পুত্রও তিনি গ্রহণ করেন নি। সুতরাং ১৮৪৯ সালে সম্বলপুরের স্বত্ব বিলুপ্ত হল। ঝাঁসির রাজা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছেন সে সংবাদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সময় মত পোঁছোয় নি। সুতরাং ১৯৫৩ সালে ঝাঁসি অধিগৃহীত হল। নাগপুরের রাজা দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি চেয়েও পান নি। তা সত্ত্বেও রাজার মৃত্যুর পর নাগপুরের পৃথক স্বত্বর বিলোপ হল। একইভাবে জৈতপুর, ভগৎ, উদয়পুর অধিগৃহীত হয়।

এ যাবত নানা প্রসঙ্গে কোম্পানী বারংবার ঘোষণা করে এসেছে যে কোম্পানী ভারতীয়দের অধিকার শুধু নয় তাদের নিজস্ব প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কার বা আইনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না। দত্তকপুত্র গ্রহণ একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথা। মোগল শাসনকালেও এই প্রথাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। স্বত্ব বিলোপ নীতি সেই শাশ্বত ভারতীয় মূল্যবোধের উপরই এক নৃশংস আক্রমণ। তাছাড়া আশ্রিত রাজ্য আর নির্ভরশীল রাজ্য বলতে কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাও কোথাও নেই। অথচ রাজ্যগুলির এই শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতেই স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ডালহৌসী তাঁরই পূর্বসুরীদের অনুসৃত প্রথাকেও মূল্য দেন নি। আসলে যুক্তি-তর্ক কিছুই নয়, ডালহৌসী তাঁর সাম্রাজ্যবাদী প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতেই একটা নীতির আবরণ নিয়েছিলেন মাত্র।

॥ সুবিধা বিলোপের নীতি ॥

ভারতীয় রাজন্যবর্গ চিরকালই নানা সম্মানজনক উপাধি, ভাতা প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে ভোগ করতেন। ডালহৌসী এসে ঘোষণা করলেন এই সব সম্মান বা ভাতা ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হয়। সুতরাং তা প্রাপকদের উত্তর পুরুষের উপর বর্তায় না।

এই যুক্তিতে পেশোয়ার উপাধি ও ভাতা, কর্ণাটকের নবাবী, তাঞ্জোরের রাজপদ বাতিল করা হয়। এমন কি এই সব রাজন্যবর্গের বিধবা পত্নীদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে তিনি বঞ্চিত করেন।

॥ অন্যান্য পদ্ধতি ॥

এ ছাড়াও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদগ্র লালসায় ডালহৌসী নানা পদ্ধতি খুঁজে বের করেন এবং সেগুলি প্রয়োগ করেন।

বেরার ছিল হায়দরাবাদের অন্তর্গত। এখানে উচ্চমানের তুলা উৎপাদিত হত। সেই তুলা প্রয়োজন হত ম্যানচেস্টারের বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য। সুতরাং নিজামের দেয় রাজস্বের পরিবর্তে ডালহৌসী বেরার দখল করে নেন।

অযোধ্যা তার সম্পদ আর উর্বর জমির জন্য চিরকালই বিখ্যাত। সুতরাং ডালহৌসীর লুব্ধ দৃষ্টি পড়লো তার উপর। কুশাসনের তৈরী করা অভিযোগে অযোধ্যা দখল করে নেওয়া হল। সাম্রাজ্যবাদী নির্লজ্জতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ অযোধ্যা অধিকার। অযোধ্যার জনসাধারণ কখনোই নবাবী শাসনে অসন্তুষ্ট ছিল না। বরং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে তারা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। ঐতিহাসিক বরার্টস ডালহৌসীর এই কাজকে জাতীয় বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে বর্ণনা করেছেন। শলীম্যান বলেছেন এটা বিরাট রাজনৈতিক বিচ্যুতি।

॥ ডালহৌসীর মূল্যায়ন ॥

মাইকেল এড্ওয়ার্ডস্ ডালহৌসীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল একটি চূড়ান্ত পর্যায়। সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে তিনি যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে তিনি যে ভারতীয় রাজন্যবর্গকেই ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলেন তাই নয়, ভারতীয় প্রথা ও ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করে সাধারণ ভারতবাসীকেও তীব্রভাবে আঘাত করেছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ততায় তিনি সর্বপ্রকার ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের অনেকেই ভারতবর্ষকে না হোক ভারতীয়ত্বকে মর্যাদা দিয়ে এদেশে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন ডালহৌসী তাঁর আচরণ দ্বারা তাঁদেরও লাঞ্ছিত করেছিলেন। একথা তো অস্বীকার করা যায় না ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল বহুলাংশে দায়ী। তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতির বিরুধে সর্বস্তরে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। তাঁর সম্পর্কে ইনেস যথার্থই বলেছেন যে তাঁর পূর্বসূরীরা যেখানে সম্ভব হলে রাজ্যজয়কে এড়িয়ে যাওয়াকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেখানে তিনি আইনের সূত্রে রাজ্যজয়কেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

Administrative foundations

(i) Nature of the growth of British political power till 1765 (two short paragraphs)—Implications of Diwani of 1765—and of Diarchy in 1772.

(ii) Growth of centralisation (Hastings to cornwallis).

(iii) Organisation of a new judicial and police system.

(iv) Need for an increased income from land revenue—Types of arrangements in this connection—their broad effects.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি



ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা

॥ কোম্পানীর শাসনের লক্ষ্য ॥

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার পর তার উপর স্বাভাবিক দায়িত্ব এসেছিল অর্জিত সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের দীর্ঘ একশ বৎসরের কোম্পানী শাসনে নানা সময়েই নানা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মৌল লক্ষ্যের পরিবর্তন হয় নি কখনো। সেই লক্ষ্য হল কোম্পানীর ব্যবসায়ে লভ্যাংশ বৃদ্ধি, ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে শোষণের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং অধিকৃত অঞ্চল ব্রিটিশ-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা। অন্যান্য যে সব উদ্দেশ্যের কথা বিক্ষিপ্তভাবে বলা হয় সেগুলি সবই ছিল এই মৌল লক্ষ্যের অনুবর্তী। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এদেশে ইংরেজরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল দেশে শান্তি-শৃংখলা অক্ষুণ্ণ রাখার উপর। কারণ তাদের বাণিজ্য এবং শোষণ বিঘ্নিত হত যদি পরিস্থিতি হত বিশৃংখল।

॥ কোম্পানীর দেওয়ানীলাভ ও দ্বৈতশাসন ॥

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানীলাভের মধ্য দিয়েই ইংরেজের এদেশে রাজনৈতিক শক্তিলাভের সূচনা হয় কিন্তু ক্ষমতা পেয়েও তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে আদৌ আগ্রহী ছিল না। তাদের তখনো একমাত্র কাজ লাভজনক ব্যবসাকে অব্যাহত রাখা এবং এদেশ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে পাঠানো। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত দ্বৈতশাসন কালে তারা ভারতীয় কর্মচারীদের আগের মতই কাজ করে যেতে দিয়েছিল, কেবল তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আর বাংলার নবাবের ছিল না, ছিল কোম্পানীর। ফলে অবস্থাটা দাঁড়ালো এমন যেখানে ভারতীয় কর্মচারীদের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে কোম্পানীর ছিল ক্ষমতা, কিন্তু দায়িত্ব ছিল না।

মোগল শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনের দুই প্রধান কর্মচারী ছিলেন সুবাদার ও দেওয়ান। সুবাদার সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা করতেন আর দেওয়ান রাজস্ব বিভাগ দেখতেন। কিন্তু মোগল-শাসনের অন্তিম লগ্নে বাংলায় মুর্শীদকুলি উভয় ক্ষমতাই নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ শাহ আলম দেওয়ানী ক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর অর্পণ করেন। ঐ বৎসরই নাজম-উল-দৌল্লা বাংলার নবাব হলে কোম্পানী মনোনীত সহকারী নবাবের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে বাদশাহর কাছ থেকে লাভ করে দেওয়ানী আর প্রকারান্তরে নবাবের কাছ থেকে গ্রহণ করে সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব।

কিন্তু সেই সময় কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তাই তারা দুজন সহকারী দেওয়ান নিযুক্ত করে—বাংলায় রেজা খাঁ এবং বিহারে সিতাব রায়। আবার রেজা খাঁকে সহকারী নবাব নিযুক্ত করে তাঁর উপর সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বও অর্পিত হয়। এভাবে প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব কোম্পানীর উপর থাকলেও সেই দায়িত্ব তারা পালন করেছিল ভারতীয়দের মাধ্যমেই, প্রত্যক্ষভাবে নিজেরা নয়। এই শাসন-কাঠামোই দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত—দ্বৈত এই অর্থে যে কোম্পানী ও নবাব উভয়ের যুগ্ম শাসন।

এই অদ্ভুত শাসন কাঠামোকে ক্লাইভ সমর্থন করেছেন নানাভাবে। প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণ করলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠতো, যা অন্ততঃ সেই সময়ে কোম্পানীর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহও কোম্পানীর এই কর্তৃত্ব মেনে নিত কিনা তা নিয়েও সংশয়

ছিল। ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তা প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারতো। তাছাড়া এদেশে প্রশাসন চালাবার জন্য যোগ্য জনবলও তখন কোম্পানীর ছিল না। কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীও রাজ্যজয় অপেক্ষা ব্যবসা সম্পর্কেই তখন ছিলেন অধিক আগ্রহী। সর্বোপরি এদেশে রাজশক্তি অর্জিত হলে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টেরও ভারত-বিষয়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে বাংলার আইন-শৃংখলা ভেঙে পড়েছিল। কেননা তখন আইন কার্যকরী করার কোন কর্তৃপক্ষই ছিল না। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে শোষণই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। বাংলায় মন্বন্তর দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য অচলাবস্থায় পেঁছায়। বিশেষ করে বাংলার বস্ত্রশিল্প, যা ছিল জগৎ বিখ্যাত, তা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় কোম্পানীর নীতির ফলে। সর্বস্তরে দুর্নীতি ছিল এ সময়ের প্রশাসনের মূল কথা।

॥ প্রশাসনের কেন্দ্রিয়করণের সূচনা ॥

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বাংলার শাসনভার গ্রহণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কিন্তু একটি বাণিজ্যিক সংস্থার পক্ষে একটি দেশের শাসন পরিচালনা যে সম্ভব নয় তা শীঘ্রই অনুভূত হয়। ভারতে কোম্পানীর বিশাল লাভজনক ব্যবসা সে সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পক্ষেও দীর্ঘকাল উদাসীন থাকা সম্ভব হল না। তাই ভারতে কোম্পানীর কর্মপদ্ধতিকে নীতিগতভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পার্লামেন্টকে উদ্যোগী হতেই হল।

॥ রেগুলেটিং এ্যাক্ট, ১৭৭৩ ॥

ভারতীয় বিষয়ে পার্লামেন্টের প্রথম পদক্ষেপ হল ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেগুলেটিং আইন পাশ। এই আইনে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর গঠন পরিবর্তন করা হল এবং কোম্পানী তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হল। ভারতে বাংলা-দেশ পরিচালনার জন্য গভর্ণর জেনারেল ও তার পরিষদ নিয়োগ করা হল এবং এদের উপরই বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের নির্দেশও আইনে ছিল।

কিন্তু এই আইন কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ভারতে গভর্ণর জেনারেলকেও তার পরিষদের নির্দেশমত চলতে হয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি অক্ষুণ্ণই থাকলো।

॥ পিটের ভারত শাসন আইন, ১৭৮৪ ॥

রেগুলেটিং আইনের বিচ্যুতিগুলি দূর করতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ভারত শাসন আইন পাশ হয়। এই আইনে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী ও ভারত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে বোর্ড অফ্ কনট্রোল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনা-রেলের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিভাগকে বাংলার অধীনে আনা হয়। এই আইনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের জাতীয় নীতির রূপকারে পরিণত হল কোম্পানী এবং দেশের সকল শ্রেণীর শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষকে পরিণত হল ভারতবর্ষ।

পিটের ভারত শাসন আইনের কাঠামোই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। মধ্যবর্তীকালে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলকে তার পরিষদের মতামতকে অগ্রাহ্য করার অধিকার দেওয়া হয়, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনে কোম্পানীর এদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার খর্ব করা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ পার্লা-

মেন্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়. প্রাত্যহিক প্রশাসন যে লণ্ডন থেকে পরিচালনা সম্ভব নয় এই বাস্তববোধ থেকেই ভারতে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ ইংলণ্ডের জাতীয় স্তরে ভারতীয় প্রশাসনে কেন্দ্রিয়করণের নীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই ভারতে ইংরেজ-প্রশাসনে আসে নানা পরিবর্তন। ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে গেল গতানুগতিক শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না। সুতরাং কোম্পানী সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে বাংলার শাসনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে ব্রিটিশ শাসনের নতুন কাঠামো প্রবর্তিত হয়।

॥ বেসামরিক প্রশাসন ॥

হেস্টিংস এদেশের কর্মচারীদের দুর্নীতি রোধে এবং আইনশৃংখলার প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। দ্বৈতশাসনের ব্যর্থতা প্রতিরোধে এ ছাড়া উপায় ছিল না।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন। তিনি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, উৎকোচ ও উপঢৌকন গ্রহণ কঠোর হস্তে বন্ধ করেন। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থাও তিনি করেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেসলী বেসামরিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একটি কলেজ স্থাপন করেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অতি অল্প বয়সে যারা এদেশে সরকারী চাকুরীতে যোগ দিতে আসতো তাদের কোন প্রশাসনিক প্রশিক্ষণই ছিল না। তাছাড়া তারা ভারতীয় ভাষাও জানতেন না। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তুলে দিয়ে একই উদ্দেশ্যে ১৮০৬ সালে ইংল্যাণ্ডের হেইলীবিউরীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ স্থাপন করে।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সনদ আইন পুনর্নবীকরণের সময় এই ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতীয় বেসামরিক প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কর্ণওয়ালিসের সময় থেকেই ভারতীয়দের বর্জন করা হয়। এর কারণ অনেক। ইংরেজদের মতে তাদের ভাবধারা ভিত্তিক যে প্রশাসন তা কেবল ইংরেজদের দ্বারা কার্যকরী করা সম্ভব। কর্ণওয়ালিস বিশ্বাস করতেন ভারতীয় মানেই দুর্নীতি পরায়ণ। কিন্তু আসল কারণ হল এই প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের কাজেই ব্যবহার করা হত। স্বভাবতঃই এ কাজ ভারতীয়দের দ্বারা সম্ভব হত না। কারণ ইংরেজ স্বার্থ সম্পর্কে ভারতীয়দের সহানুভূতিশীল হবার কথা নয়। তাছাড়া ইংলণ্ডের প্রভাবশালী গোষ্ঠী ভারতীয় প্রশাসনের উচ্চপদগুলি কুক্ষিগত করে রাখতে ছিল খুবই আগ্রহী। তাই সে সব ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার তারা মেনে নিতে পারে নি। তবে নিম্নপদে ভারতীয়দের নিয়োগে কোন বাধা ছিল না।

॥ সামরিক প্রশাসন ॥

ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল সামরিক প্রশাসন। সামরিক বিভাগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করেছিল। সামরিক বিভাগের সাহায্যে ভারতীয় শক্তিসমূহকে দমন করা হয়েছিল, ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রচেষ্টা থেকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই বিভাগই রক্ষা করেছিল এবং সামরিক বিভাগই দীর্ঘকাল ভারতে ইংরেজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিল।

সেনাবাহিনীতে অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ভারতীয়। কিন্তু উচ্চ পদাধিকারীরা সবাই ছিলেন ইংরেজ। ভারতীয়দের গ্রহণ করার কারণ হল ইংরেজদের গ্রহণ করা ছিল অনেক বেশী ব্যয়বহুল। তাছাড়া ভারতবর্ষ জয় করার জন্য যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন তা ইংল্যান্ড থেকে সংগৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই ভারসাম্য বজায় রাখতে উচ্চ পদাধিকারীরা ছিলেন ইংরেজ আর অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কিছু সংখ্যক ইংরেজ সেনাবাহিনী সর্বদাই এদেশে মজুত রাখা হত।

এ অবস্থায় বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিভাবে মুষ্টিমেয় কতিপয় ইংরেজ পদস্থ কর্মচারী বিপুল সংখ্যক ভারতীয় অধ্যুষিত সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতীয়দেরই পরাজিত করেছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয়েছিল দুটি কারণে। একটি হল ভারতীয়-দের মধ্যে তখনো জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হয়নি। ভারতীয় সৈন্যরা ভাবতেই পারে নি যে মারাঠা বা পাঞ্জাবীদের পরাজিত করতে ইংরেজদের সাহায্য করে তারা ভারত-বিরোধী কাজ করছেন। দ্বিতীয় কারণটি হল আনুগত্য ছিল ভারতীয় সৈন্যের ঐতিহ্য।

॥ পুলিসী প্রশাসন ॥

ব্রিটিশ প্রশাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পুলিসী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেছিলেন কর্ণওয়ালিস। তিনি জমিদারদের আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। পরিবর্তে তিনি এক নিয়মিত পুলিসী ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই দিক থেকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় থানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে আধুনিক করে তোলেন। তিনি স্থানীয় পর্যায় প্রতি থানায় একজন করে দারোগা নিয়োগ করেন। এরা সাধারণতঃ ভারতীয় হতেন। জেলা স্তরে থাকতেন পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্ট। এই পদে ভারতীয়গণ নিযুক্ত হতে পারতেন না। গ্রামে আইনশৃংখলা রক্ষায় নিযুক্ত ছিল গ্রাম্য পাহারাদার। এই পুলিসী ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে দস্যুতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল মধ্য ভারতে ঠগীদের দমন। তাছাড়া স্থানীয় স্তরে যে কোন ষড়যন্ত্রমূলক উদ্যোগ দমনেও পুলিস বাহিনী বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুলিস বাহিনীর ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল।

॥ বিচার বিভাগ ॥

প্রতি জেলায় স্থাপিত হয় দেওয়ানী আদালত। আদালতের সর্বোচ্চে থাকতেন একজন বিচারক। কর্ণওয়ালিস. হেস্টিংস প্রবর্তিত দেওয়ানী বিচারক ও কালেকটরের পদ বাতিল করেন। জেলা কোর্টের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য প্রথমে ছিল চারটি প্রাদেশিক কোর্ট। পরে পরিবর্তন করে স্থাপন করা হয় সদর দেওয়ানী আদালত।

জেলা কোর্টের নীচে ছিল রেজিস্ট্রারের কোর্ট। এই কোর্টেরও প্রধানরা ছিলেন ইংরেজ। এদের অধীনে ছিল নিম্ন আদালত। এই সব আদালতে থাকতেন ভারতীয়রা। তাদের বলা হত মুনসেফ বা আমীন।

ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য কর্ণওয়ালিস বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চার ভাগে ভাগ করেন। গঠিত হয় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এদের নীচে ছিল ভারতীয় বিচারপতি-দের অধীনে আদালত। এই সব আদালত সাধরণ অপরাধের বিচার করতো। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য ছিল সদর নিজামত আদালত। ফৌজদারী আদালত মুসলমান আইনকে সংশোধিত আকারে প্রয়োগ করতো। অঙ্গচ্ছেদ ধরনের শাস্তি বাতিল করা হয়েছিল। দেওয়ানী আদালত চিরাচরিত প্রথাকে গুরুত্ব দিত।

১৮৩১ সালে উইলিয়ম বেন্টিংক প্রাদেশিক আপীল আদালত বাতিল করে সেই দায়িত্ব জেলা জজ এবং জেলা কালেকটরের উপর অর্পণ করেন। বিচার বিভাগে

ভারতীয়দের পদমর্যাদার উন্নতি ঘটিয়ে তিনি তাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী বিচারক এবং প্রধান সদর আমীন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপিত হয় হাইকোর্ট। ফলে সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত বাতিল করে দেওয়া হয়।

ইংরেজরা নতুনভাবে আইন সংকলনের ব্যবস্থা করেন। এতকাল ভারতে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হত প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে। তা ছিল শাস্ত্রীয়, শরিয়তি এবং সম্রাটদের নির্দেশিত আইন। ইংরেজরা প্রথাগত আইন ছাড়াও নতুন আইন রচনা করেন, প্রচলিত আইন সংকলিত করেন এবং সকল আইনকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করে আধুনিক করে তোলেন। ১৮৩৩ সালের আইনে আইন প্রণয়নের সকল অধিকার দেওয়া হয় গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদকে। এসবের অর্থ হল এখন থেকে ভারতীয়রা মানুষের তৈরী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ভাল হোক মন্দ হোক এই সব আইন রচিত হয় যুক্তির ভিত্তিতে। এতকাল যেমন আইন দৈবনির্দেশিত, সুতরাং তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যাবে না—এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল তার আমূল পরিবর্তন করেন ইংরেজরা।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেকলের নেতৃত্বে এক আইন কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনই ভারতীয় বিচার বিধি ও অন্যান্য আইন সংকলন করেন।


হেস্টিংস


কর্ণওয়ালিস

ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এদেশে আইনের শাসনের আধুনিক ধারণার বাস্তব রূপ দেন। আইনে প্রজার অধিকার ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। সেখানে ব্যক্তিগত অভিরুচির কোন মূল্য নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ স্বেচ্ছাচারী আচরণই করেছে। সাধারণ মানুষের অধিকারে বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। আইনের শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হল যে কেন কর্মচারীকে আইন ভাঙ্গার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে। অংশতঃ হলেও আইনের শাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষায় অনেকটাই সাহায্যকারী হয়েছিল। ভারতের এত-কাল যাবৎ প্রচলিত প্রশাসনিক পদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরাট পার্থক্য এইখানেই। অবশ্য আইন রচনায় বেসামরিক কর্মচারী ও পুলিশ বিভাগের উপর অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর কাছে গণতান্ত্রিক আইন কখনো প্রত্যাশা করা যায় না।

ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকের সমতা। সুতরাং একই আইন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযুক্ত হবে। সেখানে কোন ভেদাভেদ নেই। এতকাল ভারতে আইনের ব্যবহার হত জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়। এখন সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন হল। এখন একজন সামান্যতম ব্যক্তির পক্ষেও আইনের আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব ছিল না।

অবশ্য একটা ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে ছিল। তা হল ইউরোপীয়দের জন্য ছিল পৃথক বিচারালয় এবং পৃথক আইন। ভারতে থেকেও ভারতীয় আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত না। ফৌজদারী মামলায় তাদের বিচার একমাত্র ইউরোপীয় বিচারকরাই করতে পারতেন। অনেক ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, ভারতীয়দের প্রতি অনেক সময়ই শুধু রূঢ়ই নয় নৃশংস আচরণও করেছেন। কিন্তু আইন তাঁদের দেখেছে অন্য দৃষ্টিতে। সুতরাং বিচারের বাণী লাঞ্ছিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

এই যে নতুন বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল তার আদর্শগত দিক যত মহানই হোক না কেন বাস্তব ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা নতুন ব্যবস্থাপনায় বিচার পদ্ধতিই হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত ব্যয় বহুল। বিচারালয়গুলি ছিল অনেক দূরবর্তী স্থানে। বিচার পদ্ধতি ছিল দীর্ঘকালব্যাপী। তাছাড়া আইনও এমন জটিল হয়ে যায় যে অশিক্ষিত মানুষের কাছে তা বোধগম্য ছিল না। ফলে আইন বাস্তব অর্থে ধনীদের রক্ষাকবচে পরিণত হয়েছিল। কেবল দীর্ঘকালক্ষয়ী আদালতের ভয় দেখিয়েই ধনীরা দরিদ্রের শোষণ করার এতটা নতুন উপায় খুঁজে পেল। তাছাড়া কর্মচারীদের ব্যাপক দুর্নীতিও আইনের শাসনকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি।

॥ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ॥

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর ভারতীয় প্রথাকেই অপরিবর্তিত রেখেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের রাজস্ব সংগ্রহের হার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব নিতে অগ্রসর হলেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহের কাজকে নীলামের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর এই পরীক্ষা ফলবতী হয় নি। কারণ যদিও নীলাম ডাকার সময় রাজস্বের উচ্চ হার নির্ধারিত হত তথাপি বৎসর শেষে প্রকৃত আয় হত ঘোষিত আয় থেকে অনেক কম। ফলে কোম্পানীর রাজস্ব আয়ে কোন স্থিরতা থাকতো না। এ অবস্থা চলেছিল তখন, যখন কোম্পানী চলেছিল এক চরম অর্থসংকটের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া এই ব্যবস্থার আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। নীলামে যারা রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার পেত তারা কেবল রাজস্ব সংগ্রহেই আগ্রহী থাকতো। জমির উন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে তারা আদৌ উৎসাহী হত না। কারণ তারা তো নিশ্চিত ছিল না পরবর্তী বৎসরে এই অধিকার কে পাবে। সুতরাং সীমিত সময়ে কোম্পানীর দাবী মিটিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর যে চেষ্টা তাদের ছিল সেটাই স্বাভাবিক।

॥ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ॥

ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। এই ব্যবস্থার দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমটি হল জমিদার ও রাজস্ব সংগ্রাহকগণ স্থায়ী ভূস্বামীতে পরিণত হল। এখন থেকে তারা কেবল সরকারের পক্ষে রায়তদের কাছ

থেকে রাজস্বই সংগ্রহ করবে না, তারা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের জমির মালিক হয়ে গেল। এই মালিকানা বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল। অন্যদিকে কৃষকদের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হল। এতকাল ধরে কৃষকেরা জমির উপর যেসব অধিকার ভোগ করছিল এই ব্যবস্থায় সে সব অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হল। কৃষকেরা এতকাল গোচারণ জমি, জঙ্গল জমি, খালের জমি, মৎস্যচাষের জমি, বাসগৃহের জমি নিষ্কর ভোগ করতো। রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও তাদের রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নতুন ব্যবস্থায় কৃষকেরা এই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। এখন তাঁরা নতুন জমিদারদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে গেলেন। এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল জমিদাররা যেন সময় মত তাঁদের রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা দিতে পারেন সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। নতুন ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের এগার ভাগের দশ ভাগ তাদের সরকারী তহবিলে জমা দিতে হত, এক ভাগ তারা নিজের কাছে রেখে দিতে পারতো। কিন্তু রাজস্বের ন্যূনতম পরিমাণ স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত ছিল। অবশ্য কোন জমিদার যদি ফসলী জমির পরিমাণ বাড়াতে পারতো, কিংবা কৃষির উন্নতি ঘটাতে পারতো, কিংবা কৃষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করতে পারতো তাহলে যে উদ্বৃত্ত আয় হত তার উপর সরকারের কোন দাবী থাকতো না। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতেই হত, তা সে উৎপাদন হোক চাই না হোক। সে ব্যর্থ হলে তার জমিদারী বিক্রি হয়ে যেত।

কিন্তু এতকাল যে জমির উপর জমিদারদের কোন মালিকানা ছিল না, ব্রিটিশরা সেই মালিকানা স্বীকার করে নিলেন কেন। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে তখন ইংলন্ডে জমিদারদের জমির মালিকানা ছিল, একই ব্যবস্থা তারা ভারতেও প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উভয় ব্যবস্থায় যে পার্থক্য করা হল তা এই যে ইংলন্ডে জমিদারদের উপর রাষ্ট্রেরও কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, আর ভারতে সেই নিয়ন্ত্রণ ছিল সর্বব্যাপী। প্রকৃতপক্ষে তখনকার বাংলার জমিদাররা ছিল কোম্পানীর রায়ত।

আরেক দল বলেন জমির জমিদারদের মালিকানা স্বীকার করে নেওয়ার পেছনে ইংরেজদের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক উদ্দেশ্য ছিল। এই জমিদারদের মাধ্যমে ইংরেজরা সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত তাদের সমর্থকদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। তারা জানতো বিদেশী হিসেবে এদেশে তাদের ভিত্তি কখনো সুদৃঢ় হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়েও তারা তাদের সমর্থনের ভিত্তি পোক্ত করতে না পারছে। নতুন জমিদার সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তারা সেই সমর্থনের ভিত্তিকেই দৃঢ় করতে চেয়েছে। এই বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার মত। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে পর পর কয়েকটি বিদ্রোহ হয়েছিল। যদি তখন এই জমিদার শ্রেণী থাকতো তা হলে তারা নিজেদের স্বার্থেই ঐ সব বিদ্রোহ দমনে অগ্রণী হত। এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জমিদার শ্রেণীর বিরোধিতা থেকে ইংরেজদের ঐ প্রত্যাশা অমূলক ছিল তা কখনোই বলা যায় না। তাছাড়া যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কোম্পানী তখন উৎকণ্ঠিত ছিল তার জন্যও ঐ মালিকানা দানের প্রয়োজন ছিল। কারণ কোন জমিদার সময় মত রাজস্ব দিতে না পারলে তার জমিদারী বিক্রি হয়ে যেত। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের জমিদারীই কোম্পানীর আর্থিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ছিল। মুষ্টিমেয় জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় যত সহজ ছিল লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় ততটাই কঠিন ছিল। এছাড়া জমির উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও জমিদারদের মালিকানা দানের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে যখন অতিরিক্ত আয়ের উপর সরকারের কোন দাবী ছিল না।

॥ রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ॥

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা ভেবেছিলেন এই অঞ্চলে কোন বৃহৎ জমিদার নেই। তাই ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করা হলে কোন লাভ হবে না। সুতরাং মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ছিল প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হোক। তাঁরা আরও যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। কারণ তাদের রাজস্বের একাংশ জমিদারদেরই ছেড়ে দিতে হত। কৃষকদেরও জমিদারদের নির্দয় শোষণের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তাই তারা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রথার কথা বলেন। এই প্রথা অনুসারে কৃষকদেরই জমির মালিকানা থাকবে যদি তারা নিয়মিত রাজস্ব দিতে সমর্থ হয়। এই প্রথাই হল ভারতের চিরাচরিত প্রথা।

শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই প্রথা মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই প্রথায় জমির বন্দোবস্তকে কখনোই চিরস্থায়ী করা হয় নি। প্রতি কুড়ি থেকে ত্রিশ বৎসর অন্তর বন্দোবস্ত পুনরায় নবীকরণ করা হত। বলা বাহুল্য সে সময় রাজস্বের হারও বাড়ানো হত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের উৎপাদন না হলেও কৃষকের কোন রেহাই ছিল না। সুতরাং এমন অবস্থায় জমির উপর কৃষকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কখনই বলা যায় না।

॥ মহলওয়ারি প্রথা ॥

জমিদারী প্রথারই এক পরিবর্তিত রূপ হল মহলওয়ারি প্রথা। এই প্রথা প্রচলিত ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, মধ্য ভারতের একাংশে এবং পাঞ্জাবে। এই প্রথায় গ্রাম ভিত্তিক রাজস্ব স্থির করা হত। গ্রামকেই বলা হত মহল। রাজস্ব দানের দায়িত্ব ছিল গ্রামে বসবাসকারী সকল পরিবার প্রধানদের। এই প্রধানদেরই যুক্তভাবে জমির মালিক বলে ধরা হত। এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজস্বের হার সংশোধিত হত।

ভূমি বন্দোবস্তের যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে জমিদারী প্রথা এবং রায়তওয়ারী প্রথার পার্থক্য অনেক। ব্রিটিশ এই নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছিল যে প্রকৃত কৃষক যেন কোনমতেই কোন সুবিধা ভোগ করতে না পারে। সারাদেশব্যাপী এখন জমি বিক্রি করা বা বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হল। এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল কেবল সরকারের রাজস্ব সংগ্রহকে নিশ্চিত করার জন্য। কারণ জমি হস্তান্তরের সুবিধা যদি না দেওয়া হত তাহলে সরকারের পক্ষে দরিদ্র কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। ভারতের কৃষকের না ছিল কোন সঞ্চয়, না ছিল কোন সম্পত্তি। কিন্তু এখন জমি হস্তান্তরের সুবিধা দানের ফলে সরকারী রাজস্ব মেটাতে কৃষক জমি বিক্রি করতে পারতো বা জমি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করতে পারতো। যদি সে তাও না করতো তাহলে সরকার জমি নীলামে দিয়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নিতে পারতো। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দানের পেছনে অপর যে বিশ্বাস কাজ করেছিল তা হল কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাতেই জমি তথা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

জমির হস্তান্তরের যে ব্যবস্থা ভারতে ইংরেজরা চালু করেছিল তা ছিল ভারতের চিরাচরিত ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে ভারতের গ্রাম্যজীবনের স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার উপর প্রবল আঘাত হেনেছিল। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যবস্থার পর থেকেই ভারতের গ্রাম্যজীবনে ভাঙ্গন আরম্ভ হয়।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Industry & Trade

Expansion of India's foreign trade—and decline of some Indian industries—(To stress cotton-goods during the period 1765-1857).

॥ বিষয়-ক্রম ॥

সপ্তম অধ্যায়

শিল্প ও বাণিজ্য



॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীঃ ১৬০০-১৭৫৭ ॥

১৬০০ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি পুরোপুরি বাণিজ্যিক সংস্থা। তাদের দৌলতেই বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। তারাই তখন ভারতীয় হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদনে ও বিপনণে ছিল সবচেয়ে বেশী সহায়ক। ঢাকার মসলীন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক, কাশ্মীরের শাল ও গালিচা, বেনারসের সোনা ও রূপার অলংকার, হাতির দাঁতের নানা দ্রব্য প্রভৃতি ভারতীয় পণ্যের তখন ব্যাপক চাহিদা ছিল ইউরোপে। তাছাড়া ভারতের মশলা, চিনি, সোডা, নীল প্রভৃতি পণ্যেরও চাহিদা ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সব জিনিস ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতো। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উৎপাদন করে এই সব দ্রব্যের ভারতীয় উৎপাদক-দের অগ্রিম মূলধন সরবরাহ করতো। এই প্রথাকে বলা হয় দাদনী। অনেক সময় কোম্পানী ভারতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্য ভারতে কারখানা স্থাপন করতো। মোগল সম্রাটরা কোম্পানীর এই উদ্যোগে বাধা দেন নি। কারণ এতে যেমন একদিকে ভারতীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে বিদেশে ভারতীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের একটি নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

এই সব ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানীর বিনিময়ে কোম্পানী নিয়ে আসতো সোনা ও রূপা। ফলে ভারত সোনা ও রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল। এড্ওয়ার্ড টেরি স্যার টমাস রোর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। তিনি হিসেবে দিয়েছেন যে কোন ভারতীয় জাহাজ লোহিত সাগর থেকে ফেরার পথে তাতে যা থাকতো তার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ স্টারলিং পাউণ্ড-এর অধিকাংশই থাকতো সোনা ও রূপায়।[১]

॥ ভারতীয় পণ্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সংরক্ষণ নীতি ॥

ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ছিল ইংলণ্ডে ক্রমবর্ধমান এবং সেই চাহিদা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই চাহিদায় ইংলণ্ডের বস্ত্র উৎপাদনকারী চরম সংকটের সম্মুখীন হন। বস্ত্র-বয়ন শিল্পে নিযুক্ত বহু শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। 'রবিনসন ক্রুশো' গ্রন্থের লেখক ড্যানিয়েল ডিফো ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের কথা বলেছেন। এই অবস্থায় ইংরেজ বস্ত্র-প্রস্তুতকারকগণ ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের আইনে ভারতীয় সিল্ক ও ছাপা কাপড় পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৭০২ সালে সাধারণ ভারতীয় বস্ত্রের উপর পনের শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় বস্ত্রের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নি। বরং ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের উপর ছাপা কাজের শিল্প দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি ইংলণ্ডের পশমী বস্ত্রের ব্যবসায় মন্দাভাব তীব্র হয়ে ওঠে। সুতরাং ১৭২০ সালে আরো কঠোর আইন পাশ করা হয়। এই আইনে ভারতীয় সিল্কের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। আইন অমান্যকারীকে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। এত সব আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা অক্ষুণ্ণই ছিল। তারপর থেকে বৈজ্ঞানিক কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োগে ইংলণ্ডের বস্ত্র বয়ন শিল্প দ্রুত অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়।

॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীঃ ১৭৫৭-র পরে ॥

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে বাংলার রাজনৈতিক

---

১ An Indian ship returning from the Red Sea was usually worth two hundred thousand pounds sterling, most of it in gold and silver.

—Edward Terry.

ক্ষমতা অর্জন করে। এই ক্ষমতা লাভের ফলে তাদের বাণিজ্য-পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়। বাংলার আর্থিক সম্পদকে একদিকে তারা যেমন দাক্ষিণাত্যে তাদের আগ্রাসী নীতিকে সফল করে তুলতে ব্যবহার করে তেমনি তারা তাদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রাধান্যকে এদেশের সম্পদ শোষণের কাজেও প্রয়োগ করে।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ফরাসীদের ভারতে বাণিজ্য করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে ইংরেজদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় নি। একই সঙ্গে তারা এশিয়ার অন্যান্য যে সব ব্যবসায়ী ভারতে ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসাও বন্ধ করে দেয়। এমন কি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আর অধিক অগ্রসর হতে দেয় নি। ভারতীয় তাঁত শিল্পীদের তারা এক তালিকা প্রস্তুত করে এবং ইংরেজরা সেই শিল্পীদের নিজেদের প্রতিনিধিদের অধীনেই কাজ করতে বাধ্য করে। তাঁত শিল্পীরা সামান্যতম প্রতিবাদ করলে তাদের বন্দী করা হত, জরিমানা করা হত এবং নানাভাবে তাদের হেনস্থা করা হত। এ্যাডাম স্মিথ এই জন্যই কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারত লুণ্ঠনকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ছিল এক ন্যক্কারজনক ঘটনা। এই ব্যবসা বন্ধ করার জন্য ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ যে সোসাইটি অফ ট্রেড গঠন করেছিলেন তাতেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। দস্তকের অপব্যবহার বক্সার যুদ্ধকে ডেকে এনেছিল। সব মিলিয়ে কোম্পানী তখন এদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বাংলা শাসনের দায়িত্বভার কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার পর তাদের লক্ষ্য হল বাংলার গ্রাম্য অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ফেলা। জমির নতুন বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রিয় প্রশাসন প্রবর্তন, ভূমি রাজস্বের উপর অত্যধিক দাবী, মহাজনী প্রথার উদ্ভব, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা—সব মিলিয়ে ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকেই উলোট পালোট করে দিল। ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের স্বয়ং সম্পূর্ণতা ধ্বংস হয়ে গেল।

॥ ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানীতে দ্রুত পতন দেখা দেয়। এর কারণ অংশতঃ রাজনৈতিক, অংশতঃ অর্থনৈতিক। উইলসন স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, ইংরেজরা রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহার করে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করতে, যাদের সঙ্গে সুষম পরিস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা পেরে উঠতো না।[২] ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের উপর যেখানে কোনরকম বাধানিষেধ ছিল না, সেখানে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের উপর আরোপিত হয় নানা রকমের বাধা নিষেধ। ভারতের তাঁতজাত বস্ত্রের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে সংরক্ষণ পদ্ধতিও অনুসৃত হয়। ইংরেজদের এই বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতির কি প্রভাব ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর পড়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্লমার্কস বলেছেন, ব্রিটিশ আক্রমণকারীরাই ভারতের তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করে ফেলে। ইউরোপের বৃহত্তর বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের প্রবেশ ইংলণ্ডই বন্ধ করে। ইংরেজরাই এদেশে যান্ত্রিক বস্ত্রের প্রচলন ঘটায় এবং এদেশের তুলা দিয়েই তুলাজাত বস্ত্রের রপ্তানী এদেশে আরম্ভ করে।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় তাঁত শিল্পের দ্রুত অবক্ষয়ের জন্য ডঃ ডি. আর. গ্যাডগিল তিনটি কারণ নির্দেশ করেছেন।

---

২ Britain employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not contend on equal terms. —Adam Smith.

প্রথমটি হল যে রাজন্যবর্গ ছিল ভারতীয় তাঁত শিল্পের ও শিল্পীদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক তাদের অনুপস্থিতি, দ্বিতীয়টি হল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার ফলে যে নতুন আমলাতন্ত্র ও শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তারা ছিলেন স্বভাবতই ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত এবং ইউরোপীয় বস্ত্রের অনুরাগী এবং তৃতীয়টি হল যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলে দেওয়া। মেজর বি. ডি. বসু দেখিয়েছেন কিভাবে ইংলণ্ড এদেশের তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছিল। তাঁর মতে ভারতীয় তাঁত শিল্প ধ্বংস হওয়ার কারণগুলি হল ভারতে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য নীতির অনুসরণ, ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ, ভারতবর্ষ থেকে ব্যাপকভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দান, ভারতে রেলপথ স্থাপন, ভারতীয় তাঁত শিল্পীদের তাদের শিল্প কৌশল প্রকাশে বাধ্য করা, ব্রিটিশ পণ্যের ব্যাপক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রভৃতি।

তা ছাড়া ইংলণ্ড ও ইউরোপে অধিক মূলধন বিনিয়োগে যন্ত্র শিল্পের প্রসার মৃতপ্রায় ভারতীয় তাঁত শিল্পের উপর শেষ আঘাত হেনেছিল। অবশ্য এই আঘাত পৃথিবীর সব দেশেই ক্ষুদ্র শিল্পের উপর নেমে এসেছিল। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে পার্থক্য হল, অন্যান্য দেশের কুটির শিল্পের ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ করা হয়েছিল ভারতের ক্ষেত্রে তা হয় নি। ফলে এদেশে সৃষ্টি হল ব্যাপক বেকারীর, বিঘ্নিত হল কৃষি ও শিল্পের মধ্যেকার ভারসাম্য এবং স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতের অর্থনীতির বিকাশ।

॥ ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর ॥

শিল্প বিপ্লব ইংলণ্ডের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এনেছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। সেখানকার দ্রুত সম্প্রসারণশীল বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর কাঁচামালের এবং শিল্পজাত সামগ্রী বিপণনের উপযোগী বাজার। এই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতেই অপরিহার্য হয়ে গেল ঔপনিবেশিক শোষণের পদ্ধতির পরিবর্তন।

ইংলণ্ডে নবজাগ্রত শিল্পপতিগণ ছিলেন ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সমালোচক। ভারতের অপরিমিত সম্পদের যথোচিত ব্যবহারের প্রয়োজনে তাঁরা ঐ পদ্ধতির পরিবর্তন দাবী করতে লাগলেন। তাঁদের প্রথম দাবী হল ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারকে খর্ব করা। তাঁদের এই দাবী অংশত স্বীকৃত হল ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনে। আর ১৮১৩-র সনদ আইনে ভারতে বাণিজ্যের অধিকারকে অবাধ ও উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফল হল এই, ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানী অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পেল আর ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী ততটাই হ্রাস পেল।

কিন্তু এ অবস্থায় সমস্যা হল কিভাবে তাহলে বাণিজ্যিক লেন-দেনের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে এবং কিভাবে কোম্পানীর যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব, সেই সঙ্গে ইংরেজদের যে বিপুল ব্যক্তিগত সঞ্চয় তা ইংলণ্ডে পাঠানো হবে। এই পরিস্থিতিতে একটি সম্ভাব্য প্রতিকার হল ভারতের কৃষি উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করা, বিশেষ করে তুলা, নীল, আফিং, পাট, চা, কফি প্রভৃতি উৎপাদনে ভারতকে উৎসাহিত করা। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুবিধা হল ভারতীয় কাঁচামালের মান খুব উন্নত ছিল না। আর এই অসুবিধা দূর করতে ঐ সব দ্রব্যের উৎপাদন মানকে উন্নত করতে ব্যাপকভাবে ইংরেজদের এদেশে

* It was the British intrudtr who broke up the Indian handloom and destroyed the spinning wheel. England began with depriving the Indian cottons from the European market: it then introduced twist into Hindustan and in the end inundated the very mother country of cottons with cottons. —Karl Marx.

আসতে অনুমতি দিতে হয়। তাই ১৮৩৩-র সনদ আইনে ইংরেজদের ভারতে আসার ক্ষেত্রে সকল প্রকার বিধিনিষেধের বিলোপসাধন করা হল এবং এদেশে তাদের ভূ-সম্পত্তি অর্জনে অনুমতি দেওয়া হল।

তাই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ভারতে পাট, কফি, নীল উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ হতে লাগলো। ভারত সরকারও এই বিনিয়োগের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। যেমন আসামে তিন হাজার একর পর্যন্ত পরিত্যক্ত জমি সর্ব প্রকার রাজস্ব থেকে অব্যাহতি পেল। সেই জমিতে চা-বাগিচা গড়ে তুলতে শ্রমিক সংগ্রহে আরম্ভ হল নির্যাতন। এই নির্যাতনও পেল সরকারী আইনের সমর্থন।

যথোচিতভাবে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের কৃষি খামারে পরিণত করতে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হল। উপকূলভাগের সংগে দেশের অভ্যন্তর ভাগের যোগাযোগকে সহজ করে তুলতে স্টীমার চালু হল, স্থাপিত হল ভারতীয় রেলপথ।

॥ কৃষির রূপান্তর ॥

এই সময়ই ভারতের কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ভারতীয় কৃষি এখন আর খাদ্য-শস্য উৎপাদনে আগ্রহী নয়। বরং যে সব দ্রব্যের শিল্পগত প্রয়োজন আছে সেগুলি সম্পর্কেই আগ্রহ সৃষ্টি হল। যেমন, তুলা, পাট, নারকেল, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি। স্বভাবতঃই এই সব দ্রব্যের উৎপাদন ছিল অনেক বেশী লাভজনক। তাই ভারতীয় কৃষকেরা আকৃষ্ট হল এ সব দ্রব্যের উৎপাদনে।

কৃষিজ সামগ্রী উৎপাদনের এই পরিবর্তনে স্বাভাবিক কারণেই সরকারী আনুকূল্য লাভের কোন অভাব ঘটে নি। কারণ এসব দ্রব্য কাঁচামাল হিসেবে পাঠানো হত নিজ দেশের শিল্প কল-কারখানায়। আবার সেই কাঁচামাল থেকে শিল্পজাত দ্রব্যই বিদেশের বাজারে বিক্রি করা হত।

কৃষির এই পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে মূলধনী অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ফলে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। যেমন ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মহাজনদের অর্থ লগ্নীর সুদের হার বৃদ্ধির ফলে কৃষক বাধ্য হত তার উৎপাদনের অধিক অংশটাই বাজারে বিক্রি করতে। নতুন ফসল ওঠার সময় পণ্যের বাজার দর থাকে নিম্নমুখী। দায় মেটাতে কৃষককে সেই দামেই তার উৎপাদন বিক্রি করতে হত। অথচ ছয়মাস পর সেই পণ্যই তাকে কিনতে হত উচ্চমূল্যে। ভারতের কৃষকের শোচনীয় পরিস্থিতির সেই সূচনা।

সেই সংগে গ্রামীণ হস্তশিল্পের অপমৃত্যুর ফলে কৃষকের অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগও সংকুচিত হয়ে আসছিল। আবার গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিপর্যয়ে এই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবন ধারণের নির্মম তাগিদে কৃষিকাজেই যোগ দিতে হচ্ছিল। ফলে জমির উপর চাপ বাড়ছিল ক্রমশঃ। লক্ষণীয় হল কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষির উৎপাদন বাড়লো না, বাড়লো কেবল কৃষকের দুর্গতি। কারণ নানা কারণেই ভারতের কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব হল না। এইভাবে একদিকে কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতা, ভারতের কৃষকের দারিদ্র্য এবং মাঝে মাঝেই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কারণ।

॥ ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ ॥ ভারতে ইংরেজদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আরেক বৈশিষ্ট্য হল অধিক পরিমাণে তাদের শিল্পকেন্দ্রিক মূলধন বিনিয়োগ। এই মূলধনের অধিকাংশই ব্যয়িত হল বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে। যেমন, রেলপথ ও

রাস্তাঘাট নির্মাণ, চা-কফি-রবার উৎপাদন এবং ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি মূলধনী সংস্থা গঠন। এইসব বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে যেমন ভারতের কৃষির শোষণ আরও সূক্ষ্ম হয়েছিল তেমনি ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

॥ **সম্পদের স্থানান্তর** ॥ ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রতি বৎসর ইংলন্ডে নিয়ে যাওয়া হত, তার বিনিময়ে ভারত পেতো না কিছুই। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সম্পদ আহরণ করা হত কিভাবে, এর ব্যাপকতাই বা কতটুকু ছিল এবং ভারতের অর্থ-নীতিতে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

প্রতি বৎসর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী নানা অজুহাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ইংলন্ডে পাঠাতো। যেমন ভারত-সচিব ও তাঁর লন্ডনস্থিত কার্যালয় বাবদ খরচ, কোম্পানীর গৃহীত ঋণের সুদ, ইংলন্ডের সামরিক ও নৌ-বাহিনী বাবদ খরচ, চীন ও পারস্যে ব্রিটিশ দূতাবাস বাবদ খরচ, এমন কি ইংলন্ডের পাগলা-গারদ বাবদ খরচ। এছাড়া ছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, যাকে তারা বলতো বিনিয়োগ এবং এই বিনিয়োগের লভ্যাংশ।,

ঠিক কি পরিমাণ সম্পদ তারা প্রতি বৎসর ইংলন্ডে পাঠাতো সে বিষয়ে ঐতি-হাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এইসব মতবিরোধের মধ্যে না গিয়েও পরিস্থিতি চমৎকার বোঝা যায় মাদ্রাজ বোর্ড অফ রেভেনিউ-র সভাপতি জন সুলি-ভানের মন্তব্য থেকে। তিনি বলেছিলেন যে ইংরেজদের পদ্ধতি কাজ করে স্পঞ্জের মত, গঙ্গার তীর থেকে সব ভালটুকু শুষে নিয়ে টেমসের তীরে তা উগরে দেওয়াই ছিল এই পদ্ধতি।[৪] অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেছেন সম্পদ আহরণের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক বাইশ মিলিয়ন পাউন্ড।

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়মিত এই সম্পদ আহরণের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দাদাভাই নোরোজী বলেছেন ভারতবর্ষ এমনই এক লুণ্ঠিত দেশ, যা শাসিত হয় লুন্ঠনকারীদের দ্বারাই এবং যে দেশ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়মিতই দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। ডঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত পরিস্থিতি বোঝাতে আরও চমৎকার ভাবে বলেছেন, ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতের মৃত্তিকা থেকে যা বাষ্পীভূত হত তা বৃষ্টির আকারে অঝোরে ঝরতো ইংলন্ডের মৃত্তিকার উপর সেখানকার মাটির উর্বরতা বাড়াতে।

নিয়মিত সম্পদ আহরণের প্রত্যক্ষ পরিণতি হল ভারতীয় জন জীবনের অপরিসীম দারিদ্র্য এবং উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় মোট চব্বিশ বার আর তাতে মারা যায় সাড়ে আঠাশ কোটি লোক। আর এইসব দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ দিক হল দুর্ভিক্ষ হয়েছিল খাদ্য-শস্যের অভাবে নয়, খাদ্য-শস্য কেনার সামর্থ্য লোকের ছিল না বলে। দুর্ভিক্ষের সময়ও কিন্তু এদেশ থেকে খাদ্য-শস্য রপ্তানী বন্ধ করা হয় নি। তাতেই আরও স্পষ্ট হয় যে খাদ্য-শস্যের অভাব দুর্ভিক্ষ চলাকালেও ছিল না।

৪ Our system acts very much like a sponge, drawing up all the good things from the banks of the Ganges and squeezing them down on the banks of the Thames.

—John Sullivan

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

The Cultural Scene

(i) Brief note on the old educational system The changes—English education—decline of vernacular education—Contact with western culture.

(ii) A history of social and cultural movements—with special reference to Bengal and Maharastra.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

শিক্ষার ঐতিহ্য—পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন—বাংলাদেশ—রাজা রামমোহন রায়—রামমোহনের মূল্যায়ন—ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল—ব্রাহ্মসমাজ—বিদ্যাসাগর—মহারাষ্ট্র—দাদাভাই নোরোজী—পরিশিষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট



সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

॥ **শিক্ষার ঐতিহ্য** ॥ একজন ইংরেজ লেখক দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছেন ভারতে শিক্ষা কোন বহিরাগত কিছু নয়। বরং পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে ভারতবর্ষের মত অতি প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার সূচনা হয়।[১]

তখন ইউরোপও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ভারত শিক্ষার সূচনা তখনই। প্রাচীন ভারতের তপোবনে ত্রিকালদর্শী ভারতীয় মুনি-ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে শিক্ষার মূলমন্ত্র। শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে আত্মোপলব্ধি। বিশ্ববাসীকে অমৃতের সন্তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। শিক্ষাকে ভাগ করা হয়েছিল দুই ভাগে। একটি ভাগ এই পার্থিব জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অন্য ভাগ হল উচ্চতর জ্ঞানের অন্বেষণ যা জাগতিক বন্ধনের ঊর্ধ্বে মানুষকে এক অন্য মহান জীবনের সন্ধান দেয়। শিক্ষার এই মূলধারা বয়ে চলেছে আবহমান কাল ধরে। ইতিহাসে ঘটে গিয়েছে কত ঘটনা। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের নামে এই ভারতেই ঘটে গিয়েছে ধর্মীয় বিপ্লব। নতুন চিন্তা-চেতনা সংযোজিত হয়েছে। তাতে ভারতে শিক্ষার মূল প্রবাহই অধিকতর সঞ্জীবিত হয়েছে।

তারপর ভারতে এসেছে মুসলমান শাসন। তারা ভারতে এনেছিল এক বিজাতীয় সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি ভিত্তিক শিক্ষা তারা এদেশে প্রবর্তন করেছে। প্রথমে কিছু সংঘাত অবশ্যই ঘটেছে। তারপর কালক্রমে এসেছে সহনশীলতা। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষা—উভয় শিক্ষারই পাস্পরিক সহাবস্থান ভারতের মাটিতেই সম্ভব হয়েছে, ঐতিহ্যগত পারম্পর্য রক্ষা করেছে।

এরপর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসন। ব্রিটিশ শাসন কালে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষা একত্রে পরিচিত হয়েছে দেশীয় শিক্ষা বলে। এই শিক্ষার ব্যাপকতা ও গভীরতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তিন প্রেসিডেন্সীতেই ইংরেজরা অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধানে তাঁরা দেখছেন কি অপরিসীম জীবনীশক্তি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার। শত-সহস্র রাজনৈতিক ঘটনার ঘূর্ণাবর্তেও এই শিক্ষা হারিয়ে যায় নি, স্তব্ধ হয় নি এর গতিবেগ। কিন্তু এমন গতিশীল প্রাণবন্ত যে শিক্ষা তারও অপমৃত্যু ঘটানো হল জোর করেই ইংরেজ শাসনাধীনে।

॥ **পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা** ॥ রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের প্রথম ষাট বৎসর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শিক্ষা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করে নি। আর সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ বাণিজ্যিক সংস্থা—তাদের লক্ষ্য তখন ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা করা। সুতরাং জনস্বার্থে জ্ঞান বিস্তারের তাগিদ তাদের অনুভব না করারই কথা। তবু এ সময়ে দুটি ব্যতিক্রমের ঘটনা ঘটলো। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেস্টিংস স্থাপন করেন কলকাতা মাদ্রাসা, ইসলামীয় আইন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে। আর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বেনারসের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু আইন ও দর্শন চর্চার উদ্দেশ্যে। অবশ্য উভয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার একটি প্রশাসনিক প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন হল ভারতে ইংরেজরা যে নতুন বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল সেই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় হিন্দু ও মুসলমান আইন বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করা।

এর মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ ধীরে ধীরে ভারতে এসে পৌঁছুচ্ছে। তারা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করে। তারা একসময় কোম্পানীর উপর

---

১ Education is no exotic to India. There is no country in the world like India where education had such an early beginning. —James.

চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এদেশে আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য। তাদের অবশ্য এই আগ্রহের পেছনে প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা।


বেন্টিক

শেষ পর্যন্ত কোম্পানী আইনগতভাবে এদেশে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী হতে বাধ্য হল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসরের সনদ আইনে বলা হল এখন থেকে কোম্পানী এদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বৎসরে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা খরচ করবে। আইনের এই বিধান থাকলেও কোম্পানী ১৮২৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করে নি।

কোম্পানীর দিক থেকে কোন উদ্যোগ না নেওয়ার কারণ হল ১৮১৩-র সনদ আইনে বরাদ্দীকৃত অর্থ কি ভাবে ব্যয় করা হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাব ছিল। ফলে সৃষ্টি হয় এক প্রবল মত-বিরোধের। এক পক্ষ বললেন ঐ অর্থ কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। অন্য পক্ষ বললেন ঐ অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্য পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা হলেও প্রাচ্য শিক্ষাকেই উৎসাহিত করা। তাছাড়া মতবিরোধ ছিল শিক্ষাদানের মাধ্যম সম্পর্কে। কেউ চাইলেন ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে। কেউ প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সমূহকে।

এই মতবিরোধের অবসান হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা লর্ড মেকলের সুপারিশ অনুসারে। স্থির হল ঐ অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে। লক্ষণীয় হল রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে তখনকার শিক্ষিত ভারতীয়রাও পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছেন। তবে অজ্ঞতাবশতঃ লর্ড মেকলে যেখানে প্রাচ্য জ্ঞান জগৎকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন ভারতীয়রা সেখানে ভারতীয় জীবনকে জড়তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে নতুনভাবে গতিশীল করে তুলতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই মনোভাব সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তাই তাঁরা নানা-ভাবে ব্রিটিশ সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে গিয়েছেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য।

সুতরাং এতদিনে শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশীয় শিক্ষার অপমৃত্যু অপরিহার্য হয়ে গেল। বিশেষ করে যেখানে সামান্য পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগে কোম্পানীর অধীনে চাকুরী এবং সেই সংগে এক পৃথক সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হয় সেখানে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে ক্রমশঃ নিরুৎসাহ বোধ করাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ঘটেও ছিল তাই।

অন্যদিকে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ করে বাংলায় স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবজ্ঞা করে নতুন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হয়। এই নীতি পরবর্তীকালে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাকে অবজ্ঞা করার অর্থ জনশিক্ষাকে উপেক্ষা করা। এই প্রসংগে

সরকারী বক্তব্য ছিল যে অর্থের সীমিত সংস্থানে জনশিক্ষার বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ যেখানে সম্ভব নয় সেখানে মুষ্টিমেয়কে শিক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা সম্ভব হতে পারে। তাই উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই মতবাদকে বলা হয় নিম্ন পরিশ্রুতের মতবাদ।

কিন্তু এই মতবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয় ১৮৫৪-র ঐতিহাসিক শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলে। সাধারণভাবে এই দলিল উডের ডেস্‌প্যাচ নামে পরিচিত। এই দলিলে সরকারকে জনশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়। শুধু শিক্ষার নীতি নির্ধারণ নয়, শিক্ষার কাঠামো ও সেই কাঠামোকে কার্যকরী করতে এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে ঐ দলিল ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ এই তিন স্তরে বিভক্ত হয়। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য প্রতি প্রদেশে একজন করে শিক্ষা অধিকর্তা এবং তাঁর অধীনে বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগের কথা বলা হয়। জনসাধারণের সক্রিয় উদ্যোগে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্যদানের নীতিও ঐ দলিলে উল্লিখিত হয়।

বলা বাহুল্য এই দলিলের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেই বিস্তার ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যতটুকু শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটেছিল তার কারণ ছিল একাধিক। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ, শিক্ষিত ভারতীয়গণ, এমন কি কোম্পানীর অধীনস্থ উদার মনোভাবাপন্ন কর্মচারীগণও ভারতীয়দের শিক্ষিত করার দাবী জানাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পেছনে কোম্পানীর নিজেরও একটা স্বার্থের দিক ছিল। সেই স্বার্থ হল কোম্পানীর নীচের তলার পদগুলিতে ভারতীয়দের শিক্ষিত করে নিয়োগ করা। এতে কোম্পানীর প্রশাসনিক ব্যয় যেমন হ্রাস পেত তেমনি সকল স্তরের কর্মীই ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা বাস্তব দিক থেকেই ছিল অসম্ভব। তাই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ছিল, কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য প্রশাসনেরই সহায়ক। তাই তারা ইংরেজী ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল, কেননা ইংরেজী ভাষাই ছিল প্রশাসনের ভাষা। তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পেছনে সরকারী উদ্যোগের আরেকটি অভিসন্ধিও কাজ করেছিল। তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে যদি ভারতীয় জনগণকে পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন করে তোলা যায় তাহলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ পণ্যের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে আর তাহলে কোম্পানীর বাণিজ্য আরও স্ফীত হবে। চতুর্থতঃ তারা চেয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে এমন একদল ভারতীয় তৈরী করতে যারা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অন্ধ স্তাবকে পরিণত হবে। লর্ড মেকলে খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তারা ভারতে এমন এক শ্রেণী তৈরী করতে চান যারা তাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভাতরবাসীর সংযোগ রক্ষা করবে আর এই শ্রেণী কেবল রক্তে এবং রঙে থাকবে ভারতীয়, তাছাড়া রুচিতে মতে, নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে হবে ইংরেজ।[২]

নব প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার সবচেয়ে বিপদজনক দিক হল জনশিক্ষাকে অবজ্ঞা করা। এর ফল হয়েছিল এই ১৮২১-র শিক্ষিতের হারের সঙ্গে ১৯২১-র শিক্ষিতের হারের ব্যবধান ছিল একেবারেই নগণ্য। তার উপর ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম

২ We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the milions we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.
—Lord Macaulay.

হিসেবে গ্রহণ করায় জনশিক্ষার অগ্রগতি আরও বেশী ব্যাহত হয়েছিল। ফলে বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজে আরেক নতুন ব্যবধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল—তা হলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান। বিশেষ করে এই শিক্ষা ধনী সম্প্রদায়েরই কুক্ষিগত হয়ে যায়। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল ব্যয়বহুল। দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে তার ব্যয় সংকুলান সম্ভব ছিল না।

নতুন শিক্ষায় উপেক্ষিত হয়েছিল নারী শিক্ষাও। অবশ্য এর জন্য সরকারী নিষ্ক্রিয়তা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় মানসিকতা। এই শিক্ষা বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষাকেও উপেক্ষা করেছিল। ১৮৫৭ সাল নাগাদ সারা ভারতে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল তিনটি আর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছিল মাত্র একটি—তার দরজাও আবার ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। অবশ্য এই সব ব্যর্থতার মূলে ছিল শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়বরাদ্দের কার্পণ্য।

তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলের দিক অস্বীকার করা যাবে না। তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষার সীমিত সম্প্রসারণের মধ্যেই ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। আর এই সুযোগ ভারতীয় মানসিকতায় নতুন আলোক-পাত ঘটায়। সব কিছু নতুনভাবে বিচার করবার, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে পর্যালোচনা করবার, কুসংস্কার অন্ধত্ব পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করবার সামর্থ্য অর্জন করে ভারতীয়রা। এই নতুন উপলব্ধিই ছিল ভারতীয় সমাজ-জীবনে আধুনিকতা আনয়নের অগ্রদূত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এই পরিবর্তিত মানসিকতারই ফসল।

॥ **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন** ॥ সীমিত হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক বিচ্ছুরণে ভারতীয় মানসিকতা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগে নি। ইংরেজদের অনায়াস সাফল্য ভারতীয় সমাজজীবনের দুর্বলতা প্রকট করে দিয়েছিল। তাই কিছু চিন্তাশীল ভারতীয় তাদের সমাজজীবনের ব্যর্থতা অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারে ব্যাপৃত হলেন। যদিও তখনো অধিকাংশ ভারতীয় গতানুগতিক সমাজজীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছিলেন তথাপি অন্যান্যরা বিশ্বাস করতেন কেবল পাশ্চাত্য চিন্তাধারাই তাদের সমাজজীবনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি করতে পারে। পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারা বলতে তাঁরা বুঝতেন আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ। তার উপর সমাজের ধনী সম্প্রদায়, শ্রমিক শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীগণ আধুনিকতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কারণ পরিবর্তন তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার সহায়ক ছিল।

॥ **বাংলাদেশ** ॥ সূচনা থেকেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রথম উন্মেষ বাংলাদেশে। সুতরাং বাংলাদেশই এখন নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রধান লীলাক্ষেত্রে চিহ্নিত হল।

আর শুধু বাংলাদেশ নয় সারা ভারতেরই আধুনিকতার অগ্রদূত বলে যাঁকে অভিনন্দিত করা হয় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়।

॥ **রাজা রামমোহন রায়** ॥ দেশ ও দেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল রামমোহনের। তাই তিনি সারা জীবন দেশের সামাজিক, ধর্মীয়, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণের জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

তখনকার জাতিভেদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনের সংকীর্ণতা ও দুর্নীতিতে গভীর ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন রামমোহন। তখনকার ধর্ম ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং মূর্খ পুরোহিত শ্রেণীর শোষণক্ষেত্র। তখনকার সমাজ ছিল বিত্তশালী সম্প্রদায়ের নিজ

স্বার্থ সংরক্ষণ ক্ষেত্র। আর দেশ ছিল ইংরেজ শাসনের স্বেচ্ছাচার দ্বারা লাঞ্ছিত। রামমোহন প্রাচ্য দর্শনের অনুরাগী ছিলেন ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একমাত্র রামমোহনই জানতেন আধুনিকতার তাৎপর্য কি। তাই তিনি দেশবাসীকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নতুনভাবে চিনিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। কারণ বিচ্ছিন্নতা আধুনিকতা নয়, আধুনিকতা হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

সমাজজীবনে তিনি চেয়েছিলেন নারীকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই সতীদাহ প্রথার মত এক নারকীয় প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি মেয়েদের পুনর্বিবাহও সমর্থন করেছেন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার মেয়েদের দিতে চেয়েছেন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেছেন। সর্বোপরি মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারী শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

তিনি ছিলেন জাতিভেদ প্রথার ঘোরতর বিরোধী। জাতিভেদ প্রথার জন্যই যে সামাজিক সংহতি বিপর্যস্ত তা তিনি জানতেন। জাতিভেদ প্রথার জন্যই দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব। এই জাতিভেদ দূরীকরণে তিনি শৈব বিবাহ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি ধর্মকে বাস্তব উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে আবিষ্কার করে তিনি গঠন করেন ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন বলেছেন দেশ, জাতি, বিশ্বাস নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে বিশ্বপিতার চরণপ্রান্তে সম্মিলিত করতেই ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়।[৩]

শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এই শিক্ষা দেশবাসীকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারে, সামাজিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় দেশবাসীকে অংশ গ্রহণ-যোগ্য করে তুলতে পারে।

রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ইংরেজ শাসনের সমর্থক ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন ইংরেজ শাসনই দেশবাসীকে আধুনিক জগতের নৈকট্যে নিয়ে আসতে পারে। আর সেই নৈকট্য থেকেই দেশবাসী আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের সেভাবে গড়ে তুলতে পারবে। তাই তিনি দায়িত্ব সরকার চান নি, চেয়েছিলেন প্রশাসনিক দায়িত্ববোধ ক্ষমতা পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে, অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের প্রশাসনে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

আন্তর্জাতিক চেতনায় তিনি ছিলেন আর্ত মানুষের পক্ষে। তাই স্পেনে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কলকাতায় বিজয়োৎসব করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন, মানুষের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট কিভাবে অতিক্রম করা যায় তা দেখিয়েছেন রামমোহন।[৪]

৩ The Brahmo Samaj was established to bring together the peoples of the world, irrespective of caste, creed and country at the feet of the One Eternal God —Keshab Chandra Sen.

৪ Rammohan pointed the way to the solution of the larger problem of international culture and civilisation in human history. —Brojendra Nath Seal.

॥ রামমোহনের মূল্যায়ন ॥ সমালোচকেরা রামমোহনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। তাঁকে অনেকে বলেছেন ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী অবশ্য ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে ভারতীয় নবজাগরণের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক সুশোভন সরকার বলেছেন প্রকৃত সমন্বয়সাধন বলতে বোঝায় দুটি পরস্পর বিরোধী ভাবধারার সমন্বয়ে উন্নত একটি তৃতীয় ভাবধারা সৃষ্টি।[a] সেই সমন্বয় কি রামমোহন পেরেছিলেন? তাঁর সাফল্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সুমিত সরকার লিখেছেন সেই সীমাবদ্ধতা তাঁর ব্যক্তিগত ছিল না, ছিল তাঁর সময়ের।[b]

রামমোহন তাঁর কর্মযজ্ঞে সহযোগিতা পেয়েছিলেন কয়েকজন যোগ্য সহযোগীর। যেমন ডেভিড হেয়ার, আলেকজান্ডার ডাফ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি।



রামমোহন



ডিরোজিও

॥ ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ॥ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উন্মেষ হয়েছিল তার মূর্ত প্রতীক ছিল ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। এই আন্দোলনের সকল অনুপ্রেরণার উৎস ও নেতা ছিলেন তরুণ এ্যাংলো ইন্ডিয়ান হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ডিরোজিও ছিলেন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ শিক্ষক। তিনি তাঁর ছাত্রদের যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে, বিচার করতে, সত্যানুসন্ধানী হতে এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের উপাসক হতে শিক্ষা দিতেন। ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের বলা হত ইয়ং বেঙ্গল। এরা সবাই ছিলেন গভীরভাবে দেশপ্রেমিক। বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্যই ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে

[a] The true synthesis lies in the fusion of two opposites into a third higher entity which supersedes the earlier stages of development.
—Susobhan Sarker.

[b] ...The limitations were basically those of his times which marked the beginning of a transition.
—Sumit Sarker.

তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

ডিরোজিও পন্থীরা সকল প্রকার প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু প্রথা, রীতি এবং ঐতিহ্যকে আক্রমণ করতেন। নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার সমর্থক ছিলেন তাঁরা।

কিন্তু তাঁরা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। কারণ তখনকার সামাজিক পরিস্থিতি এমন বৈপ্লবিক আন্দোলনের অনুকূল ছিল না। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষকশ্রেণী সম্পর্কে তাঁদের কোন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। ভারতীয় সমাজের কোন অংশের সমর্থনই তাঁরা পান নি। তাঁরা নিজেরাও সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বিপ্লববাদ ছিল তাত্ত্বিক, প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খুবই কম।

তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে ডিরোজিওপন্থীগণ জনগণকে সচেতন করে তুলতে অনেকটাই সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাঁরা কোম্পানীর সনদ আইনের সংস্কার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতীয়দের প্রতি আচরণ, জুরীর সাহায্যে বিচার, জমিদারদের অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা, সরকারী উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ, প্রভৃতি গুরুতর জন-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে গণআন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের প্রতি আধুনিক বাংলার রূপকার বলে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।[৭]

॥ ব্রাহ্মসমাজ ॥ রামমোহনের পর যে ব্রাহ্মসমাজে স্থবিরতা এসে গিয়েছিল তাকে নবজীবন দান করেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামমোহনের আদর্শ প্রচার কল্পে তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন তত্ত্ববোধিনী সভা। এক সময় রামমোহন ও ডিরোজিও-র সকল অনুগামীরাই এখানে সমবেত হয়েছিলেন। এই সভা বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন করেন। সমাজ সক্রিয়ভাবে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ রোধ, নারী শিক্ষা, রায়তদের রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমর্থন জানান।

॥ বিদ্যাসাগর ॥ এ সময়ের বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরেকটি পরম শ্রদ্ধেয় নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট সংবেদনশীল। তাঁর মত ও পথের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নির্যাতীত মানবতার প্রতি তাঁর আকুলতা ছিল অপরিসীম।

আধুনিক ভারত গঠনে তাঁর কর্মপ্রয়াস ছিল বহুমুখী। সংস্কৃত শিক্ষাদানে তিনি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন। তাঁর বর্ণপরিচয় ও শিশু শিক্ষা আজও সমানভাবে আদৃত। অব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ তিনি সম্প্রসারিত করেন। সংস্কৃত কলেজে তিনিই পাশ্চাত্য দর্শন পাঠের ব্যবস্থা করেন।

নারী জাতির কল্যাণসাধনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। এদিক থেকে তিনি যথার্থই রামমোহনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনে তিনি সকল প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে নিরলস সংগ্রাম করে যান। এবিষয়ে তিনি সরকারকে আইন প্রণয়নে বাধ্য করেন। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তিনি প'য়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

৭ ...the pioneers of the modern civilisation of Bengal, the conscript fathers of our race whose virtues will excite veneration.

—Surendranath Banerjea.

এর মধ্যে কতগুলি বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন। বেথুন স্কুলে সম্পাদক হিসেবে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা তিনিই করেন।



॥ **মহারাষ্ট্র** ॥ বাংলার পর মহারাষ্ট্রেই নবভারত গঠনের আন্দোলন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে গঠিত হয় পরমহংসমণ্ডলী। এই মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতারা একেশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। মণ্ডলীর সভায় সদস্যগণ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের রান্না করা খাবার খেতেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষিত তরুণেরা ছাত্রদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ গঠন করেন। পরিষদের দুটি শাখার একটি ছিল গুজরাটী, অপরটি মারাঠী। পরিষদ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতো। পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যোতিবা ফুলে ও তাঁর পত্নী পুণায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারপরই অন্যত্র অনেক মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন জগন্নাথ শংকর শেঠ ও ভাওদাজি। ফুলেই প্রথম মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করেন। তারপর বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত বিধবা বিবাহ সংগঠন গড়ে তোলেন। বিধবা বিবাহের আরেকজন বিশিষ্ট প্রবক্তা হলেন কার্শোনদাস মুলোজী।

মহারাষ্ট্রে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হলেন গোপাল হরি দেশমুখ। তিনি লোকহিতবাদী নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি যুক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবতাবাদকে আদর্শ হিসেবে সম্মুখে রেখে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে অগ্রসর হন। যোতিবা ফুলে নিজেও জন্মেছিলেন নিম্নশ্রেণীতে। তাই তিনি জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন মহারাষ্ট্রের সমাজে অব্রাহ্মণ ও নিম্নশ্রেণীর কি মর্মান্তিক অবস্থা। সেই জন্যই তিনি আজীবন সমাজে ব্রাহ্মণ আধিপত্য খর্ব করতে আপোষহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

॥ **দাদাভাই নৌরোজী** ॥ দাদাভাই নৌরোজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সি. ওয়াই. চিন্তামণি লিখেছেন যে ভারতের জনজীবনে এসেছেন অনেক প্রগাঢ় বুদ্ধিজীবী এবং নিঃস্বার্থ বুদ্ধিজীবী। কিন্তু দাদাভাই নৌরোজী ছিলেন তাঁর সময়ে অতুলনীয়।[৮] মহামতি গোখলে বলেছেন, মানুষের মধ্যে দেবত্ব বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তিনি হলেন দাদাভাই।[৯]

অল্প বয়স থেকেই দাদাভাই দেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই তিনি প্রথমে এই সব সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন। তিনি ছিলেন নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অক্লান্ত কর্মী। জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডলী নামে এক সংগঠন তিনি গড়ে তোলেন। বোম্বাইতে তিনি স্থাপন করেন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। পার্শী ল এ্যাসোসিয়েশন গঠন করে তিনি মেয়েদের আইনগত মর্যাদা, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত

৮ The public life of India has been adorned by a galaxy of brilliant intellects and selfless patriots, but there has been in our time none comparable with Dadabhai Naoroji. —C. Y. Chintamani.

৯ If ever there is the divine in man it is in Dadabhai. —G. K. Gokhale.

বিষয়ে একই ধরনের আইন প্রণয়ন এবং পার্শীদের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেন। জরাস্ট্রিয়ান ধর্মমতের সংস্কারের জন্যও তিনি একটি সংস্থা গঠন করেন।

॥ **পরিশিষ্ট** ॥ যে ভারতীয় সামাজিক কাঠামো একদা ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিল, ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে সেই সামাজিক কাঠামোতেই আঘাত হেনেছিল। এ সমাজে ভাঙন আসতোই, ইংরেজরা কেবল সেই ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস প্রশ্ন তুলেছিলেন এশিয়ার সামাজিক কাঠামোয় কোন ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটিয়ে মানুষ কি তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে? যদি না পারে তাহলে শত অপরাধ সত্ত্বেও ইংলন্ড তার অজ্ঞাতসারেই সেই পরিবর্তন সংঘটিত করার ঐতিহাসিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।[১০] তাই ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট চেতনা এবং কোন সুপরিকল্পিত সংগঠন না থাকাতেও দেশের মানুষের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সেই বহিঃপ্রকাশের পেছনে ছিল না দেশের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন স্পষ্ট ভূমিকা। বরং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা ছিল ইংরেজ-গুণমুগ্ধ। আর সেই মুগ্ধতা থেকেই তারা ক্রমশঃ কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই উপলব্ধি করতে থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক মুক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাদের সেই উপলব্ধির মুহূর্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরেক পটপরিবর্তনের সূচনা।

---

১০ Can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England, she was the uncoscious tool of history in bringing about that revolution. —Karl Marx.

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

Peasant unrest and uprisings

(a) Peasant rebellions—Ferazi—Wahabi movement.

(b) Tribal movements—Kols—Santhals.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকা—ফরাজীদের বিদ্রোহ—শরিয়তুল্লা—মহাম্মদ মহসীন—ফরাজী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য—ওয়াহাবী আন্দোলন—আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—বারাসত বিদ্রোহ ও তিতুমীর—কোল বিদ্রোহ—সাঁওতাল বিদ্রোহ।

নবম অধ্যায়

কৃষক বিদ্রোহ



কৃষক বিদ্রোহ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষক-বিদ্রোহ কোন নতুন ঘটনা নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই বিদ্রোহ ভিন্ন নামে ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালে কৃষক-বিদ্রোহ গুরুত্বে ও বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ। ভারতে বৈদেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে নতুন সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব এ যুগের কৃষক-বিদ্রোহের এক পৃথক পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে দিয়েছে। কারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থেই ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভিন্ন সামন্ততন্ত্রের প্রসার ঘটায়। সুতরাং মূল সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ না হওয়া অবধি তার সৃষ্ট সামন্ত-তন্ত্রের অবসান ঘটানো সম্ভব ছিল না। তাই চরিত্রগত দিক থেকে এ সময়ের কৃষক-বিদ্রোহ ছিল একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী।

॥ কৃষক-বিদ্রোহের পটভূমিকা ॥ ভারতে ইংরেজরা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরি-বর্তন করে যে প্রথা প্রবর্তন করে তা হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা না দিলে জমির মালিককে জমি থেকে উচ্ছেদ করে অন্য কারো হাতে জমি দেওয়া হত। কারণ কৃষকদের কাছ থেকে নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব ছিল না তার অপরিসীম দারিদ্র্যের জন্য। ফলে জমি বার বার হস্তান্তরিত হত। তা সত্ত্বেও রাজস্ব সংগ্রহের কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে দশ বৎসরের জন্য জমির বন্দোবস্ত দানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতেও সুবিধা হচ্ছে না দেখে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডের ভূমি ব্যবস্থার অনুকরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়।

এই ব্যবস্থার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা দিয়ে জমিদারেরা কৃষকের কাছ থেকে ইচ্ছে মত রাজস্ব আদায় এবং অনাদায়ে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার অবাধ অধিকার লাভ করে। সুতরাং জমির উপর কৃষকের স্বত্ব বা অধিকার অস্বীকৃত হল এবং তাদের জমিদারের শোষণের শিকারে পরিণত হওয়া আরম্ভ হল।

এই পরিস্থিতির ফলে কৃষকের জীবনে আরেক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা হয়। জমিদারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কৃষকের প্রয়োজন অর্থের। গ্রামে সেই অর্থের যোগান দিতে সৃষ্টি হল মহাজন গোষ্ঠীর। এরা কল্পনাতীত হারে কৃষককে ঋণ দিত। জমিদারের চাহিদা মেটাতে কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিত জমি, বাড়ী বন্ধক দিয়ে। এই ঋণ তারা কোনদিন মেটাতে পারতো না। ফলে এক সময় তাকে মহাজনদের কাছেই তার জমি-বাড়ী হারাতে হত। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হচ্ছিল এক নতুন শ্রেণীর জমিদার।

তাই বাধ্য হয়ে কৃষক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে অগ্রসর হল। শিল্পে প্রয়োজন এমন কাঁচামাল জাতীয় ফসলের তখন ব্যাপক চাহিদা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কৌশলের ফলে। কিন্তু সেখানেও কৃষকের স্বস্তি ছিল না। কারণ ফসল উৎপাদিত হত যখন, তখন ফসলের দাম এমনিতেই কম থাকতো। তার উপর কোম্পানীর কর্ম-চারীরা জোর করেই কম দামে কিনতো। সুতরাং কৃষির চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়েও কৃষকের শোচনীয় অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। তার তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অসহনীয় শোষণ-যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে যাবার উপক্রম।

আসলে শাসক ইংরেজ, জমিদার ও মহাজনদের গঠিত এক বিশাল ও ভয়ংকর পিরামিডে তখন ভারতীয় কৃষক নিষ্পেষিত। তার সামনে উন্মুক্ত তখন দুটি পথ— একটি হল অসহায় ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, অন্যটি হল

বিদ্রোহ করে বেঁচে থাকার আপ্রাণ সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া। ভারতের কৃষক মরীয়া হয়ে দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিল। পরাধীন ভারতের কালিমালিপ্ত ইতিহাস এবার পরিণত হল কৃষকের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্তাক্ত ইতিহাসে।

॥ **ফরাজীদের বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭)** ॥ ফরাজীগণ হল পূর্ব বাংলার ফরিদপুরের এক ধর্মীয় সম্প্রদায়। ফরাজী কথাটির অর্থ হল আল্লার আদেশ অনুসরণকারী। ফরিদপুরের শরিয়তুল্লা এবং তাঁর পুত্র মহাম্মদ মহসীন বা দুদু মিঞা ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক। প্রচলিত মুসলমান ধর্মের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে এই মতবাদ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চলের দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধর্মমত ও আচরণের সরলতাই ছিল এই মতবাদের জনপ্রিয়তার মূল কারণ।

॥ **শরিয়তুল্লা** ॥ শরিয়তুল্লার ধর্মীয় সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল মোল্লা-মৌলভী দ্বারা উৎপীড়িত মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা। প্রচলিত মুসলমান ধর্মে পীর ও মুরিদ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। পীর অর্থ প্রভু. মুরিদ অর্থ শিষ্য। উৎপীড়ক প্রভুর নিকট উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমিক অনুগত থাকতে পারে না। তাই শরিয়তুল্লা শব্দ দুটি বাতিল করে ওস্তাদ ও সাগরেদ শব্দ দুটি গ্রহণ করেন। তিনি উৎপীড়ন-মূলক বহু ধর্মীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করে মোল্লা-মৌলভীদের অত্যাচার থেকে সাধারণ মুসলমানদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

ধর্মীয় অত্যাচার বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তুল্লা তাঁর অনুগামীদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শোষণ থেকে রক্ষা করতেও উদ্যোগী হন। তাই তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছে ছিলেন পিতৃতুল্য।

তাঁর এই সব উদ্যোগে ধনী মুসলমানগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমান কৃষকগণ জমিদারদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে জমিদারগণও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। শরিয়তুল্লা তাঁর জীবনকালে অত্যাচারিত মুসলমান কৃষকসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

॥ **মহাম্মদ মহসীন** ॥ শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহাম্মদ মহসীন পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহাম্মদ মহসীন দুদু মিঞা নামেই সমধিক পরিচিত।

শরিয়তুল্লার ধর্মসংস্কার ও প্রচার কার্যের ফলে জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই ভিত্তি করে দুদু মিঞা এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। পিতার মতই তিনিও ছিলেন দরিদ্র মানুষের কাছে শিক্ষক, বন্ধু ও পিতা।

তাঁর প্রচারের মূল কথা ছিল আল্লার কাছে সবাই সমান। সুতরাং এই পৃথিবীতে কর ধার্য করার অধিকার কারো নেই। এই প্রচারে মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে এক অভাবনীয় জাগরণ দেখা দিল। এই প্রচার ছিল অত্যাচারিত মানুষের অব্যাহতি লাভের পথ নির্দেশ।

তাই দ্রুত দুদু মিঞা তাঁর অনুগামীদের কাছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জীবন্ত প্রতীকে পরিণত হন। তিনিই তাদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করেন, জমি-জমার বিরোধ নিষ্পত্তি করেন এবং বিচার-কার্য নির্বাহ করেন। জমিদারদের অন্যায় কর আদায় থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, জমিদারদের বিরুদ্ধে মামলায় তিনি আর্থিক সাহায্য দান করেন এবং প্রয়োজনে জমিদারের বিরুদ্ধে

লাঠিয়াল বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের কাছে এক অদম্য ত্রাসে পরিণত হলেন।

দুদু মিঞার সংগ্রাম ছিল জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। এরা কেবল মুসলমান নয়, হিন্দু কৃষকদেরও শত্রু। তাই তিনি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় এক মজবুত সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রতি অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একজন করে খলিফা নিয়োগ করেন। খলিফাগণ নিজ নিজ অঞ্চলে ফরাজী মতাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতেন, তাদের উপর উৎপীড়ন রোধের ব্যবস্থা নিতেন এবং অর্থ সংগ্রহ করে কেন্দ্রিয় তহবিলে পাঠাতেন।

দুদু মিঞার এই দুর্দমনীয় সংগঠন দেখে সকল জমিদার ও নীলকরগণ ঐক্যবদ্ধ হলেন। তারা প্রজাদের ফরাজী দলে যোগদান নিষিদ্ধ করেন। এই আদেশ লঙ্ঘিত হলে অমানুষিক নির্যাতনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সকল প্রকার নির্যাতন উপেক্ষা করে ফরাজী ও কৃষক সমাজ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত হলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে দুদু মিঞা ও তাঁর অনুচরগণ জমিদার, নীলকর ও রক্ষণশীল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। দুদু মিঞার নির্দেশে মুসলমান প্রজাগণ সকলপ্রকার বেআইনী করদান বন্ধ করলো। জমিদারের জমি ত্যাগ করে খাস জমিতে বসবাস করতে আরম্ভ করলো। যে কোন অত্যাচার প্রতিহত করতে দুদু মিঞার লাঠিয়াল বাহিনী জমিদার ও নীলকরদের লাঠিয়াল দলকে উচিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলো। এই সব সংঘর্ষে বহু নীলকুঠি ও জমিদারদের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

এ অবস্থায় ইংরেজ সরকারের পক্ষে আর নীরব দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব হল না। তারা এই কৃষক-অভ্যুত্থান দমনে প্রথমে পুলিস, পরে সামরিক বাহিনী পাঠাতে আরম্ভ করে।

দীর্ঘকাল যাবৎ এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। শেষে কৃষকদের মনোবল ভেঙে দিতে লুণ্ঠনের অভিযোগে দুদু মিঞাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অচিরেই তিনি মুক্তিলাভ করেন। আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮৪৪ সালে। এবারও অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি মুক্তি পান।

কিন্তু স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুদুমিঞার অগ্রগতি বন্ধ করা যায় নি। তাঁর শাসন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সর্বত্র জমিদার ও নীলকরদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। মহাজনদের ঋণশোধও নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধদের নিয়ে আদালত স্থাপিত হয়। চারদিকের খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বাহিনী নিযুক্ত হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরের পাঁচচর নামক স্থানের নীলকুঠির কুখ্যাত ম্যানেজার ডানলপ্ সাহেবের উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করলে দুদু মিঞা অগ্রসর হন। এই ডানলপ্ সাহেবের প্ররোচনাতেই দুদু মিঞা কয়েকবার গ্রেপ্তার হন। পাঁচ শত কৃষকের এক সশস্ত্র বাহিনী পাঁচচর নীলকুঠি ধ্বংস করে ফেলে। পার্শ্ববর্তী জমিদারের বহু সম্পত্তি বিনষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীকে প্রতিহত করতে সামরিক বাহিনীকে আনা হয়। দুদু মিঞা ও তাঁর বাষট্টিজন অনুচর গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু উচ্চতর আদালত তাঁদের সর্বপ্রকার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ কালে দুদু মিঞা শেষবারের মত গ্রেপ্তার হন।

কিন্তু এবারও সরকার প্রমাণাভাবে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। সমগ্র জীবনব্যাপী নিরলস সংগ্রাম এবং বারংবার কারাবাসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদার ও নীলকরদের পৈশাচিক অত্যাচারে কৃষক-দের সংগ্রাম-শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান কৃষকগণ ফরাজী সম্প্রদায় ত্যাগ করে অন্যান্য সম্প্রদায়ে যোগদান করে।

॥ **ফরাজী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য** ॥ ফরাজী আন্দোলন মুসলমান ধর্মকে সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ঐ ধর্মকে জনগণের ধর্মে পরিণত করে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তিকে বাস্তব রূপ দিতে এই আন্দোলন একটি স্বাধীন রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করে। এই আন্দোলন শোষিত, উৎপীড়িত ও হতাশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে নতুন আশায় উজ্জীবিত করে তাদের নতুন জীবনের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য বৃহৎ গণ-সংগ্রামের মত ফরাজী বিদ্রোহও ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে আরম্ভ হলেও শেষ পর্যন্ত তা রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল সূচনায় এই আন্দোলন মুসলমান ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে আরম্ভ হলেও কালক্রমে তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে হিন্দু কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশকেও সামিল করতে পেরেছিল।

অস্বীকার করা যায় না দুদুমিঞার নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠন, স্বেচ্ছাসেবী কৃষকদের নিয়ে স্বাধীন সরকারের সেনাবাহিনী গঠন, স্বাধীন বিচারালয় স্থাপন এবং এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনগণের কাজ থেকে কর আদায় প্রভৃতি সাফল্য ফরাজী আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপদান করেছিল।

॥ **ওয়াহাবী আন্দোলন** ॥ তিতুমীর পরিচালিত বাংলার বারাসত-বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ওয়াহাবী আন্দোলনেরই বিশিষ্ট অংশ।

রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন সারা ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক। তিনি মক্কায় গিয়ে ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। আরব দেশের আবদুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরই নামানুসারে এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত।

তখন আরবে ও সমগ্র মুসলমান জগতে মুসলমান ধর্ম ও রীতি-নীতির মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। সেই সব কুসংস্কার দূর করে মুসলমান ধর্মকে নতুনভাবে গড়ে তুলতেই আবদুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তাই প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহবান নিয়ে সৈয়দ আহম্মদ মক্কা থেকে ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৮২০ থেকে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করে এই নতুন ধর্মসংস্কারের আদর্শ প্রচার করেন।

মক্কায় অবস্থান কালে সৈয়দের সঙ্গে আর যে দুইজন ভারতীয়র যোগাযোগ হয় তারা হলেন তিতুমীর ও দুদুমিঞা। এঁরা দুজনও ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

ভারতে ফিরে আসার পর সৈয়দ ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিহারের পাটনায় আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশেও সৈয়দ ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করেন। এরপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পাঞ্জাব, বিহার ও বঙ্গদেশে একযোগে ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ভ হয়।

॥ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ॥ মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে আরম্ভ হলেও এই আন্দোলন দ্রুত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। যতই এই আন্দোলন বিস্তৃত হয়, ততই সাধারণ মানুষ আন্দোলনে শামিল হয়, ততই আন্দোলন তার ধর্মীয় চরিত্র হারাতে থাকে।

ভারতের অধিকাংশ মুসলমান ছিল ধর্মান্তরিত হিন্দু। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে মুসলমান ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ তখন মুসলমান ধর্মে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু তারা মুসলমান হলেও বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ হিন্দু রীতি-নীতি একেবারে পরিত্যাগ করে নি। তার উপর ইংরেজ-শাসনের অত্যাচারে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই অনেকটাই পরস্পরের নৈকট্যে আসে। ফলে হিন্দু রীতি-নীতি মুসলমান সমাজের আরও গভীরে প্রবেশ করে।

সৈয়দ মুসলমান ধর্মে এই সব বিজাতীয় প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি মুসলমান ধর্মকে তার নিজস্ব স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমান সমাজ ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের হতাশা থেকে মুক্ত হয়, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন উদ্দীপনা এবং তারা তাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। এইভাবে ধর্ম সংস্কারকে ভিত্তি করেই ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা।

ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলমান শক্তিকে পরাজিত করে। ফলে মুসলমানগণ দীর্ঘকাল তাদের রাজ্যগ্রাসকারী ইংরেজদের মেনে নিতে পারে নি। তাই দেখা যায় ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে ওয়াহাবী আন্দোলন পর্যন্ত হিন্দুরা ছিল ইংরেজ শাসনের সহায়ক আর মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনের প্রবল প্রতিপক্ষ। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমানদের লক্ষ্য ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ। এই লক্ষ্যেরই চরমতম বহিঃপ্রকাশ হল ওয়াহাবী আন্দোলন।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসানে বিদ্রোহী নায়কদের বিচারকালে যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয় তা থেকে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়। কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলায় সওয়াল করতে আসেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী অ্যানেস্টি সাহেব। তিনি এই আন্দোলনকে নানা তথ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে বর্ণনা করেন। এই আন্দোলন যে প্রথম স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে অনুপ্রাণিত করেছিল বিপিন চন্দ্র পাল তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সৈয়দ আহম্মদও ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষকে দার-উল-হারাব্ বলে ঘোষণা করেন। তাঁর অনুচরগণ বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ করে দার-উল-ইসলাম বা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ নিতেন। এর পরই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের আরম্ভ হয় জেহাদ বা যুদ্ধ।

পাঞ্জাবে শিখশক্তির বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের সংঘাত শিখ জায়গীরদার ও জমিদার গোষ্ঠীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আবার পেশোয়ারের অত্যাচারী মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমান চাষীগণ বিদ্রোহ করে। বিহার ও বাংলায় এই বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারী জমিদার গোষ্ঠী ও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিতানা নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ

করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। এই দুর্গই তখন সারা ভারতবর্ষে বিদ্রোহ পরিচালনার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিদ্রোহ যত বেশী বিস্তৃত হয় তত বেশী সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে যোগদান করে। এমন কি হিন্দুরাও। কারণ বিদ্রোহ অত্যাচারী জায়গীরদার, জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। ফলে ধর্মকে সম্মুখে রেখে এই আন্দোলন সূচিত হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির চাপে আন্দোলন তার ধর্মীয় চরিত্র হারাতে থাকে।

ওয়াহাবী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মুসলমান জন-গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হতে পারে না অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তখনকার দিনে শোষক শক্তি হচ্ছে ইংরেজ, জায়গীরদার, জমিদার, নীলকর ও মহাজন। অর্থাৎ কৃষকের মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্ন এসেই যায়। আবার মুসলমান কৃষক শ্রেণীর সংগ্রাম যে শোষক-শক্তির বিরুদ্ধে সেই শোষকশক্তি হিন্দু কৃষক-শ্রেণীরও শত্রু। সুতরাং উভয়ের শত্রু যখন অভিন্ন তখন উভয়ের মধ্যে সামীপ্য এবং সান্নিধ্য থাকাই স্বাভাবিক।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়েছে, হয়তো পারি-পার্শ্বিকতার বিচারে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যেমন বঙ্গদেশে। ফরিদপুর বা বারাসতে অধিকাংশ জমিদার ও মহাজন ছিল হিন্দু আর কৃষকদের অধিকাংশই মুসলমান। সুতরাং এখানকার সংগ্রামকে অনায়াসে সাম্প্রদায়িক চরিত্রে চিত্রিত করে সংগ্রামী জনগণকে বিভক্ত করা ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এক অতি সহজ ও পরিচিত কৌশল। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলন তার গতিপথে সর্বদাই সাম্প্রদায়িক ছিল এমন অভিযোগ যুক্তিনিষ্ঠ নয়।

॥ বারাসত বিদ্রোহ ও তিতুমীর ॥ বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন তিতুমীর। তিনি বারাসতে কৃষক সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে এক ঐতি-হাসিক সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁকে দমন করতে ইংরেজ সরকারকেও নাস্তানাবুদ হতে হয়। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব-পূর্ণ।

ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে বারাসত বিদ্রোহ এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দুর্বল সংগঠন এবং শত্রুর উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রর কাছে এই বিদ্রোহ আত্মসমর্পণ করে একথা ঠিক। কামানের গোলার মুখে তিতুমীরের বহুখ্যাত বাঁশেরকেল্লা খড়-কুটোর মত উড়ে গেলেও পরাক্রান্ত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর অনুচরদের আত্মত্যাগের কাহিনী বংশ পরম্পরায় বাঙালী জনচিত্তভূমিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্ষয়দুর্গ রচনা করেছিল।

তবে একথা ঠিক ইংরেজ, জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদ্রোহের নায়কগণ সমসাময়িক কালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধর্মীয় জিগির তুলেছিল, তিতুমীরকে বিদ্রোহীরা বলতো বাদশাহ, তাদের সংগঠন ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রবল শত্রুর ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্রর সম্মুখীন হয়ে তারা ভুল রণকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং এসব কারণেই তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

সেই সঙ্গে এই কথাও স্বীকার্য পরাধীন ভারতে ওয়াহাবীর বিদ্রোহী নায়কগণ সর্বপ্রথম সচেতনভাবে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সেই আহ্বানকে কার্যকরী করতে অকুতোভয়ে জীবন বিসর্জনে

দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। তাই ওয়াহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই আন্দোলনের গুরুত্ব কোনমতেই কম নয়। এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য হলো সেই সময়ে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও শাসক-শক্তির সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীত প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল।

॥ কোল-বিদ্রোহ ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আদিবাসী জাতি সমূহের অবদান শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, প্রশংসনীয়ও বটে। ব্রিটিশ শাসনের আক্রমণ থেকে নিজস্ব সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচর জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর শোষণের উৎপীড়ন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এই আদিবাসী সম্প্রদায় বারংবার বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছে। তাই ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে কোল উপজাতির সংগ্রামের ইতিহাসও যথেষ্ট গৌরবময়।

ছোটনাগপুর বিভাগের আদিবাসী কোলগণ হো, মুন্ডা, ও'রাও প্রভৃতি নানা-ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশ শাসনের আগে কোন শাসকই এই অঞ্চলের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে নি।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটের রাজ্য ব্রিটিশ শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ফলে ইংরেজদের দাবী অনুযায়ী বিপুল করের দাবী মেটাতে কোলদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে কোলগণ বিদ্রোহ করে। অতি কষ্টে ইংরেজ সেনা-বাহিনী সেই বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু বিদ্রোহ দমিত হলেও কোলদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হল না।

এর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ মহাজনগণ এই অঞ্চলে খাজনা আদায়ের ইজারা নিয়ে এলে কোলদের সমাজ জীবনের উপর আঘাত হানে এবং খাজনা আদায়ের কৌশলে কোলদের জমি জমা কেড়ে নিতে আরম্ভ করে। ফলে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাঁচি জেলার মুন্ডা ও ও'রাও সম্প্রদায়ের সকল চাষী একযোগে বিদ্রোহ করে। দ্রুত সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। দুই বৎসরের চেষ্টার পর সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহের ভয়ংকর রূপ দেখে ছোটনাগপুরকে একটি পৃথক সীমান্ত রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। অবশ্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ছোটনাগপুরকে বিহারের একটি বিভাগে পরিণত করা হয়।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ কালে কোলগণ সুযোগ বুঝে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করে। পোড়াহাটের রাজাকে বন্দী করে কোলগণ তাকে তাদের পক্ষে যোগদানে বাধ্য করে। এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সিংভূমের হো এবং পালামৌ-র আদিবাসীগণ। কিন্তু এই বিদ্রোহও সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

॥ সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) ॥ ১৮৫৫-৫৭ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে এক তুলনা রহিত অধ্যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ যে সাঁওতাল অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম তা ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং শাসক-গণও স্বীকার করেছেন।

সাঁওতালদের এই বিদ্রোহের পেছনে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার স্পৃহা এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। এই বিদ্রোহ সাঁওতালদের সহজাত নিষ্ঠুরতার আকস্মিক বিস্ফোরণ মাত্র নয়। বিদ্রোহের গভীরে ছিল অর্থনৈতিক বিক্ষোভ। বিক্ষোভ বাঙ্গালী ও পশ্চিম ভারতের মহাজনদের উৎপীড়ন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে। এদের শোষণ পদ্ধতি ছিল পৈশাচিক। প্রতারণার সাহায্যে সাঁওতালদের

অর্থ ও শস্য হস্তগত করে তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে। এদের সুদের হার ছিল অসম্ভব বেশী।

মহাজনদের পরে ছিল জমিদার শ্রেণী। জমিদারদের শোষণে সাঁওতালরা শুধু ভূমিহীন হয়েছিল তাই নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। প্রকৃত-পক্ষে জমিদার-মহাজন সহ সমগ্র ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাই ছিল সাঁওতালদের চরম দুর্দশার জন্য দায়ী। কারণ ইংরেজ শাসনই শোষণের সুবিধার জন্য জমিদার ও মহাজনদের সৃষ্টি করেছিল। এই তিন শক্তি মিলিতভাবে সাঁওতালদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়েছিল।

এই বিদ্রোহে সাঁওতালরা একা ছিল না। বাংলার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর জেলার শ্রমজীবী মানুষেরা সাঁওতালদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। কারণ সাঁওতালদের শত্রু ছিল তাদেরও শত্রু। হান্টার সাঁওতালদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন।

শোষণ, অত্যাচার আর অবিচার থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের সৃষ্টি। আর সেই বিদ্রোহের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় নেতৃত্ব। সেই নেতৃত্ব হল ঐতিহাসিক সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তাঁদের নেতৃত্বে এক বিশাল জনতা কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। পাঁচ ক্ষেতিয়ার বাজারে পাঁচজন কুখ্যাত বাঙ্গালী মহাজনকে যারা সাঁওতালদের উপর উৎপীড়ন চালাতো, হত্যা করা হয়। তারপর দিঘী থানার দারোগাকে হত্যা করা থেকেই ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই বিদ্রোহের সংবাদে ব্রিটিশ সরকার স্তম্ভিত হয়ে যায়। শেষে মেজর বারোজের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী ভাগলপুরের কাছে পরাজিত হবার পর বিদ্রোহ দমনে ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হয়। এর মধ্যে বীরভূম থেকে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা সাঁওতালদের অধীনে চলে আসে এবং এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে। নিরুপায় ইংরেজ সরকার সামরিক আইন জারী করে।

এইবার আরম্ভ হয় ইংরেজ সামরিক বাহিনীর উন্মত্ত আচরণ। শেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সিধু ইংরেজদের হাতে ধৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহের অপর দুই নায়ক চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের কাছে এক যুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচন্ড আঘাত শাসক শক্তি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। এদের সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলে ঘোষণা করা হয়। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ছাড়া এই জেলায় সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের ভিত্তি নিঃসন্দেহে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই দিক থেকে এই বিদ্রোহকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনে সৃষ্ট মহাজন গোষ্ঠীর উপর এক নির্মম আঘাত।

অবিচল নিষ্ঠা এবং মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করেও সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। আর তাই ছিল সেদিন স্বাভাবিক। কারণ একদিকে সারা ভারতের বিপুল সামরিক শক্তি সংহত করে ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করেছিল অন্যদিকে বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ গ্রামীণ অস্ত্রসম্ভার নিয়ে কেবল নিপীড়িত মানুষের ঐকান্তিক সমর্থনকে সম্বল করে সাঁওতালগণ যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা আগামী দিনে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যতের পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

॥ পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম ॥

The Revolt of 1857—Causes—Extent of popular participation—leadership—Nature of the Revolt.

॥ বিষয়-ক্রম ॥

১৮৫৭-র বিদ্রোহ—কারণসমূহ এবং সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি—নেতৃত্ব—বিদ্রোহের প্রকৃতি।

দশম অধ্যায়

মহাবিদ্রোহ : ১৮৫৭





ডালহৌসী


লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে
ভারতে ইংরাজ আধিপত্য
লর্ড ডালহৌসী
১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ
কাবুল
কান্দাহার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
লাহোর
সিমলা
দিল্লী
তিব্বত
লাসা
নেপাল
রাজপুতনা
আজমীর
জয়পুর
যোধপুর
এলাহাবাদ
কাশী
পাটনা
মুর্শিদাবাদ
আসাম
ঢাকা
ব্রহ্মদেশ
মালব
গোয়ালিয়র
ইন্দোর
গুজরাট
বরোদা
সুরাট
দিউ
দমন
বোম্বাই
নাগপুর
বেরার
আকিয়াব
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
হায়দরাবাদ
গোয়া
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
রেঙ্গুন
বেসিন
সিংহল
মহাসাগর

মহাবিদ্রোহ : ১৮৫৭

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের সূচনা। পরবর্তী একশ বৎসরের মধ্যে সেই শক্তি যত সম্প্রসারিত হয়েছে তত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন স্বরূপ। থরে থরে ভারতবাসীর মনে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করেছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তারপর সেই প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যাপকভাবে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে।

মহাবিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসকে দুটি সুস্পষ্টভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম ভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত বিস্তার। আর দ্বিতীয় ভাগে সেই বিস্তৃতির ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের সূচনা। মহাবিদ্রোহ হল সেই অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ মাত্র।

॥ মহাবিদ্রোহের কারণ ॥ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অবশ্য সেনাবাহিনীর অভাব অভিযোগ এবং চর্বি মাখানো বন্দুকের টোটা ব্যবহারের ঘটনাকেই বিদ্রোহের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। ঐ টোটার ঘটনা নিঃসন্দেহে বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশে অগ্নি-শলাকার কাজ করেছিল। কিন্তু এমন ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারী ঘটনা যে এই সামান্য কারণেই সংঘটিত হতে পারে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাসের কোন যুগান্তকারী ঘটনা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না। তার পেছনে থাকে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াই ঘটনার পটভূমিকা রচনা করে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ-ও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

॥ রাজনৈতিক কারণ ॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় রাজন্যবর্গকে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ এবং পরে তাদের অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তোলার যে নীতি সূচনা থেকেই অনুসরণ করে চলেছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করে লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি দ্বারা। আর এই নীতিকেই অধিকতর আক্রমণমুখী করে তোলেন লর্ড ডালহৌসী তাঁর স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগের দ্বারা। ফলে অচিরেই রাজন্যবর্গের মধ্যে যে সংশয় ঘনীভূত হচ্ছিল তা সংকটে রূপান্তরিত হল। দত্তক পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত করা, আশ্রিত রাজ্য এবং নির্ভরশীল রাজ্যের মধ্যে কূট কৌশলী ব্যবধান সৃষ্টি, যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল রাজন্যবর্গের সংকটের বিভিন্ন দিক। বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত করা, তাঁদের রাজ্য অধিকার করে নেওয়া রাজন্যবর্গকে ইংরেজদের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল। সুতরাং অনিবার্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এ সময়ের ইংরেজ-মনোভাবের যথার্থ প্রতিধ্বনি শোনা যায় চার্লস নেপিয়ারের কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি বারো বছরের জন্য ভারতের সম্রাট হই তাহলে ভারতে আর কোন যুবরাজ থাকবে না।'[১] ম্যালিসন মনে করেন মেষের আবরণে কোম্পানীর নেকড়ের আচরণ ভারতীয়দের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল।

মোগল বাদশাহের উত্তরাধিকারীদের উপর কোম্পানী যে সব আচরণ করেছিল এবং যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। মোগল বাদশাহ তাদের কাছে শুধুমাত্র একজন শাসকই ছিলেন না, ছিলেন ইসলামীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সুতরাং তাঁর লাঞ্ছনা তারা কখনই মেনে নিতে পারে নি। ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোই হয়ে যায় তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

১ Were I Emperor of India for twelve years .... no Indian prince should exist. —Charles Napier.

অন্যান্য বহু বহিরাগতদের মত ইংরেজরাও ছিল এদেশে বিদেশী শাসক। কিন্তু অন্যান্যদের সঙ্গে ইংরেজদের পার্থক্য হল অন্যান্যরা যেখানে এদেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে তা এদেশের মানুষের জন্যই ব্যয় করেছেন ইংরেজরা সেখানে সেই সংগৃহীত সম্পদ মাতৃভূমিতে পাঠিয়েছে সেখানকার সমৃদ্ধি ঘটাতে। তাই অন্যান্য বহিরাগত শাসকেরা যেখানে বিদেশী হয়েও দেশীয় শাসকে পরিণত হতে পেরেছিলেন, ইংরেজরা সেখানে বিদেশী শাসকই থেকে যায়। এই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডালহৌসী যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন ভারতের বাহ্যিক স্থিতিশীলতার গভীরে সঞ্চিত হয়েছিল বিস্ফোরক পদার্থ। যে কোন সামান্য ঘটনা সেই পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হলে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।[২]

॥ অর্থনৈতিক কারণ ॥ নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপকে উন্মুক্ত করে দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এমন এক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছিল যার এক-মাত্র লক্ষ্যই ভারতবর্ষের বিনিময়ে ইংলণ্ডকে সমৃদ্ধ করে তোলা। এই নীতি অনুযায়ী ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে তারা ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিল।

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ভোগ করতো। তারা ভারতবর্ষকে তাদের দেশের শিল্প-কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীর দেশে পরিণত করেছিল। এই কাঁচামাল তারা এদেশ থেকে সংগ্রহ করতো অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে। আবার সেই কাঁচামাল যখন তাদের দেশের কল-কারখানায় শিল্পজাত-পণ্যে পরিণত তখন সেই পণ্য আবার তারা ভারতবর্ষের বাজারেই বিক্রি করতো অধিক মূল্যে। এইভাবে ভারতে তাদের শোষণ পদ্ধতি ছিল দ্বিমুখী। এইভাবেই তারা তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের অপব্যবহার করতো। এই নীতির ফলে ভারতের জগৎ-বিখ্যাত তাঁত শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। কার্ল মার্কস ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন, ভারত ইংলণ্ডের কাছে ছিল যেন এক দুগ্ধবতী গাভী, যার দুগ্ধ ইংল্যাণ্ড পান করতো, অথচ গাভীর নিজের বাচ্চাই থাকতো অনাহারে।[৩]

কৃষির ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক ভূমি রাজস্ব নীতি অনুসরণ করে যার ফলে ভারতের বহু জমিদার এবং সমগ্র কৃষকসমাজের সর্বনাশ হয়ে যায়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভূমি রাজস্বের গুরুভার এবং তা অনাদায়ে নির্যাতন বহু কৃষককে ভূমিহীন করে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক নিযুক্ত ইনাম কমিশন। এই কমিশন প্রায় কুড়ি হাজার পরিবারকে ভূমিহীন করেছিল। কিন্তু এই সব পরিবার দীর্ঘকাল যাবত নিঃশুল্ক জমি ভোগ করে আসছিল।

সুতরাং সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করে সর্বনাশা ভূমি রাজস্ব নীতি গ্রহণ এবং তার সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ ভারতবাসীর চরম বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

॥ প্রশাসনিক কারণ ॥ প্রশাসনিক দিক থেকেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি-ভঙ্গী অপরিসীম অসহনশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। ভারতীয় বংশানুক্রমিক

২ When Dalhousie left India in 1856 the apparent public tranquility concealed an explosive mixture which some incident might bring to a flash point.

—Percival Spear.

৩ India became a milch cow to feed England while her own sons were gradually pushed to the starvation wage.

—Ishwari Prasad.

অভিজাতগণ তাঁদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হারিয়েছিলেন এবং তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের লুপ্ত মর্যাদা ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই যতকাল ভারতে ব্রিটিশ শাসন বহাল থাকবে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সেই ব্যবস্থার মূল কথাই ছিল ভারতবাসীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। কোন ভারতীয়কে উচ্চ এবং দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা হত না। তাদের যেন কাষ্ঠ সংগ্রাহক এবং জলবাহকে পরিণত করা হয়েছিল। স্যার টমাস মুনরো দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন বিদেশীরা ভারতীয়দের প্রতি সবাই হিংস্র এবং নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন, কিন্তু কেউই ইংরেজদের মত তাদের প্রতি এমন ঘৃণ্য মনোভাব প্রকাশ করে নি, কেউই ইংরেজদের মত তাদের এমন অবিশ্বাসী, অসৎ এবং অযোগ্য বলে চিহ্নিত করে নি, অথচ তাদের ছাড়া ইংরেজদের চলার কোন উপায় ছিল না।[৪] ১৮৩৩-র সনদ আইনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

॥ সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ ॥ একথা অস্বীকার করা যায় না ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল সামাজিক জীবনে। সেই অসহ পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা মনে প্রাণে চেয়েছিল এমন এক শক্তিশালী শাসন যা দেশে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। সেই শাসন বৈদেশিক হলেও আপত্তি ছিল না, তাও গ্রাহ্য হত কেবল একটি শর্তে। তা হল দেশের চলমান সামাজিক ও ধর্মীয় গঠনকে অবিকৃত রাখা। মোগলেরা সাফল্য পেয়েছিল এই পথেই। ইংরেজরাও ওয়ারেন হেস্টিংসের নেতৃত্বে আরম্ভ করেছিল একই ভাবে। কিন্তু বেণ্টিংক সেই পথের পরিবর্তন ঘটালেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা, খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতাই ভারতবাসীর উপর আরোপিত হল। পুরাতন ধ্বংস হল না, কিন্তু নতুন এসে গেল। আর এই নতুনের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ইংরেজ শাসন তার নিরপেক্ষ চরিত্র হারালো। ফলে ভারতের রক্ষণশীল গোষ্ঠী ক্রমশঃই সংঘবদ্ধ হতে লাগলো এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

ভারতে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের প্রয়াস ধর্মভীরু ভারতবাসীকে সচকিত করে তোলে। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে ভারতে খৃষ্টান ধর্মের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর ইংলণ্ডের হাতে এক বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য তুলে দিয়েছেন। এই ঘোষণার পর ভারতীয়দের সংশয়ের কোন সুযোগ থাকলো না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং এক আইন দ্বারা খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করেন।

এই ধরনের পারস্পরিক অবিশ্বাসের এবং সন্দেহের পরিবেশে কেউ কারো শুভ বুদ্ধিকে সুস্থিরভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই সতীদাহ, শিশু হত্যা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে যখন ব্রিটিশ সরকার অগ্রসর হয় ভারতবাসী তাদের শুভ ইচ্ছাকে সন্দেহের চোখে দেখে। যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানো

৪ Foreigners have treated the natives with violence and often with cruelty, but none has treated them with so much scorn as we; none has stigmatized the whole people as unworthy of trust, as incapable of honesty and as fit to be employed only where we cannot do without them.

—Sir Thomas Munro.

হয়, নারী শিক্ষার সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে, ভারতীয়রা এসব কার্যাবলী তাদের ধর্মচ্যুতি ঘটানোর সুপরিকল্পিত প্রয়াস বলেই বিশ্বাস করে। সুতরাং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামান্যতম ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ অন্তর্হিত হয়।

॥ সামরিক কারণ ॥ আফগান যুদ্ধের পর থেকেই সামরিক বিভাগে ক্রমশঃ শৃংখলাহীনতা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে বাঙ্গালী বাহিনীর সৈন্যদের এক পারস্পরিক সৌভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে। যে কোন কাজই তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে করত। সেনা বিভাগের চাকুরীও তখন ছিল পুরুষানুক্রমিক। এই বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আগত। এদের অধিকাংশই ছিল রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ। এদের আনুগত্য সম্পর্কে অনেক আগেই সংশয় প্রকাশ করে-ছিলেন চার্লস নেপিয়ার। বিশেষ করে অযোধ্যা দখলের ফলে সেখান থেকে আগত সিপাহীগণ যেন এক আকস্মিক তড়িৎ প্রবাহে সচেতন হয়ে ওঠে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, তারা হঠাৎই উপলব্ধি করে যে তাদের কাজে এবং কেন উচ্চ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় তাঁদের নবাবের উচ্ছেদ সাধনে।[৫]

এ ছাড়া সামরিক বিভাগের কতকগুলি নীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সিপাহী-দের স্বার্থের পরিপন্থী। ভারতীয় সৈন্যরা যতই যোগ্যতার অধিকারী হোন না কেন উচ্চ পদে তারা অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় তাদের বেতন ও ভাতা উভয়েই ছিল কম। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের এক আইন দ্বারা যে কোন জায়গায় সিপাহীদের নিয়োগ সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পোস্ট অফিস আইন দ্বারা তাদের বিনা শুল্কে চিঠিপত্র পাঠাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। সেনাবাহিনীতে সাধারণ সিপাহীর কোন মর্যাদা ছিল না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি অত্যন্ত অশালীন মন্তব্য করতো। তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেও বাধা দেওয়া হত। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের খৃস্টান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। তাছাড়া তখন সেবাহিনীতে ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয়দেরই ছিল সংখ্যাধিক্য।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর বিপর্যয় ভারতীয় সিপাহীদের উৎসাহিত করে। প্রথম আফগান যুদ্ধ, পাঞ্জাব যুদ্ধ, ক্রিমি-য়ার যুদ্ধে, এমন কি বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ বাহিনীর বিপর্যয়ে ইউরোপীয় বাহিনীর অপরাজেয়তার প্রবাদ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এমন সময় ইংরেজ শাসন ভারতে একশ বৎসরের বেশী স্থায়ী হবে না এই মর্মে এক প্রচার সিপাহীদের যথেষ্ট উৎসাহিত করে। পলাশীর যুদ্ধ থেকে, সেই প্রচার অনুযায়ী, হিসেব ধরলে সিপাহীগণ ইংরেজদের বিদায় লগ্ন আসন্ন ধরে নিয়ে মানসিকভাবে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

॥ প্রত্যক্ষ কারণ ॥ এ সময়েই সামরিক বাহিনীতে এনফিল্ড রাইফেলের প্রচলন ঘটে। প্রচারিত হয় এই রাইফেলের টোটা গরু ও শূকর চর্বি মিশ্রিত এবং সেই টোটা দাঁত দিয়ে কেটে রাইফেলে ঢোকাতে হয়। ফলে ধর্মনাশের আশংকায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীগণ এই টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত না করে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করলে

[৫] .... they suddenly realised that the power which the Company had acquired through their service and sacrifice was utilised to liquidate their own king.

—Moulana Abul Kalam Azad.

ব্যারাকপুরের সামরিক ছাউনিতে প্রথম বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়, যা দ্রুত দাবানলের মত মধ্য ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়।

॥ **বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীগণ** ॥ রাজ্যহারা ক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ, জমিদার, জমি ও গৃহহারা কৃষক, জীবিকা থেকে বিচ্যুত শ্রমিক ও কারিগর, মোল্লা ও পুরোহিতের দল মহাবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশার অবসানকল্পে। ভারতে আসার পর ব্রিটিশ শক্তি এই প্রথম ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মিলিত শক্তির সম্মুখীন হল। কিন্তু সেনাবাহিনীর ভারতীয় সিপাহীগণ এই বিদ্রোহের পুরোভাগে থাকার জন্য এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ-ও বলা হয়। তা হলেও উত্তর ভারতের কৃষক ও কারিগর শ্রেণীই ছিল এই বিদ্রোহের প্রাণশক্তি স্বরূপ। ভারতীয় সিপাহীরাও ছিল প্রধানতঃ কৃষক পরিবারেই সন্তান। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই স্বীকার করেছেন বহু স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করার আগেই জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

ঐতিহাসিক কে ও ম্যালিসন স্বীকার করেছেন অযোধ্যা রোহিলাখন্ড, বুন্দেলখন্ড ও নর্মদা—উত্তর ভারতের এই চারটি প্রদেশে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণের প্রায় সকল অংশই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। ঐতিহাসিক লো-র মতে রাজপুত, ব্রাহ্মণ, গোঁড়া মুসলমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মারাঠীগণ সকলে একই লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মীরাট ও আলীপুরে জনসাধারণই সিপাহীদের বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করে। তাছাড়া যে সব স্থানে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটেছিল সেই সব স্থানে জনসাধারণই স্বাধীনতা রক্ষায় অস্ত্রধারণ করেছিল।

কিন্তু সমাজের উচ্চ বিত্তশালী অংশ, কোম্পানীর সৃষ্ট নতুন জমিদার ও মহাজনগণ স্বাভাবিক কারণেই এই বিদ্রোহে অংশ নেয় নি। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দেশীয় সরকারী কর্মচারীগণ উৎসাহের সঙ্গে এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

ডঃ এস. বি. চৌধুরী দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মানুষ এই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। অন্যদিকে এরিক স্টেকস এই মত অগ্রাহ্য করে বলেন গ্রামাঞ্চলের তারাই অংশ নিয়েছিল যারা নতুন ভূমি ব্যবস্থায় ভূমিহারা হয়েছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিদ্রোহকালে কোন কোন অঞ্চলে গণসমর্থন এবং অংশ গ্রহণের ব্যাপকতা থেকে সেই সব অঞ্চলে এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস বলে বর্ণনা করেছেন।

॥ **বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ** ॥ সারা ভারতে বিদ্রোহের প্রতীক বলে গৃহীত মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বিদ্রোহের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আস্থাশীল ছিলেন না। সিপাহীরাও তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না। তিনি ছিলেন বিদ্রোহের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান। তাঁর পত্নী জীনাত মহল ও পুত্রদের ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। অস্বীকার করা যায় না তাঁর দুর্বল ব্যক্তিত্ব, বৃদ্ধ বয়স ও নেতৃত্বদানের অক্ষমতা বিদ্রোহের ভীষণ ক্ষতি করেছিল। অথচ দিল্লী ছিল বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল।

কানপুরে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তিনি কানপুর থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটান। এবিষয়ে তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন তাঁতিয়া তোপী। তোপী তাঁর দেশপ্রেম, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং গেরিলা

যুদ্ধ নীতিতে দক্ষতার জন্য অমরত্ব অর্জন করেছেন। নানার অপর সহকর্মী ছিলেন আজিমুল্লা। প্রচারকার্যে তাঁর দক্ষতা ছিল সীমাহীন।

অযোধ্যার বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন অযোধ্যার বেগম। তাঁকে যথোচিত সহায়তা দিয়েছিল লক্ষ্মৌর সিপাহীগণ এবং অযোধ্যার জমিদার ও কৃষকশ্রেণী। বেগম ইংরেজদের লক্ষ্মৌ ত্যাগে বাধ্য করেন। ইংরেজরা সেখানকার রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীগণ রেসিডেন্সী অবরোধ করেও সাফল্যলাভ করতে পারে নি।

ঝাঁসীতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ। ইংরেজরা তাঁর দত্তক পুত্রকে ঝাঁসীর উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার না করে ঝাঁসী দখল করলে লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর নির্ভীকতা ও রণকৌশলে ঝাঁসী থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন এবং তাঁতিয়া তোপীর সাহায্যে গোয়ালিয়র দখল করেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন।

বিহারে বিদ্রোহের সংগঠক ছিলেন আরার নিকট জগদীশপুরের বিধ্বস্ত জমিদার কুনওয়ার সিং। আশী বৎসর বয়সেও তিনি ছিলেন বিদ্রোহের অন্যতম যোগ্য নায়ক। নানাসাহেবের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি অযোধ্যা ও মধ্য ভারতেও অভিযান চালিয়েছিলেন। আরার কাছে এক যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের পরাজিত করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি এমন ভাবে আহত হন যে তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফৈজাবাদের মৌলভী আহমাদুল্লা ছিলেন বিদ্রোহের আরেক বিখ্যাত নাম। প্রথমে তিনি ফৈজাবাদের উত্তরাংশে অগ্রসর হলে এক ব্রিটিশ বাহিনী তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। বিদ্রোহ আরম্ভ হলে তিনি সমগ্র অযোধ্যার অন্যতম নেতা হিসেবে গৃহীত হন। রোহিলাখণ্ডে বিদ্রোহ পরিচালনাকালে তিনি পুতয়াইনের রাজা কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার বলি হন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও তাঁর দেশপ্রেম, সাহস, সামরিক দক্ষতা ও সংগঠনী শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

॥ বিদ্রোহের স্বরূপ ॥ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের স্বরূপ নির্ধারণ ভারতের ইতিহাসের এক বহু বিতর্কিত বিষয়। ঐতিহাসিকেরা এই প্রসঙ্গে প্রায় পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই বিদ্রোহকে সিপাহীদের বিদ্রোহ বলেই চিহ্নিত করেছেন এবং বিদ্রোহের পেছনে কোন গণ সমর্থন খুঁজে পান নি। সমসাময়িক অনেক ভারতীয়ও একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। অন্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন বিদ্রোহ হল খৃষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় যুদ্ধ, কেউ বলেছেন বিদ্রোহ হল কৃষ্ণকায় বর্ণের পক্ষে শ্বেতকায় বর্ণের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, আবার কেউ বলেছেন বিদ্রোহ হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত। অন্যরা বলেছেন ব্রিটিশ শাসনেরর উচ্ছেদে এই বিদ্রোহ হল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রয়াস। আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিক মনে করেন সুপরিকল্পিত এই বিদ্রোহ হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

স্যার জন লরেন্স ও সীলি বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেই মনে করেন। সীলি বলেছেন দেশ বিরোধী ও স্বার্থপর কিছু সিপাহী বিদ্রোহ করেছিল যাদের পেছনে ছিল না কোন যোগ্য নেতৃত্ব বা জন সমর্থন। আর ডালহৌসীর আগ্রাসী নীতিতে অসন্তুষ্ট কিছু দেশীয় রাজ্য বিদ্রোহীদের সমর্থন জানিয়েছিল মাত্র। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিদ্রোহ সামরিক বিভাগে আরম্ভ হলেও সেখানেই কেবল কেন্দ্রীভূত থাকে নি। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে প্রসারিত হয়েছিল। অযোধ্যাই তার প্রমাণ।

রীস বিদ্রোহকে খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু ধর্মান্ধদের বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন।[৬] কিন্তু এই মতও গ্রাহ্য নয়। কারণ বিদ্রোহের তুঙ্গাবস্থায় ধর্মের কোন ভূমিকাই ছিল না। উভয় পক্ষই ধর্মের দোহাই দিয়েছে বিদ্রোহের উন্মত্ততার পক্ষে সাফাই গাইতে। শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে খৃষ্টানগণ, খৃষ্টধর্ম নয়। পরাজিত হয় হিন্দু ও মুসলমানগণ, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম নয়। বিদ্রোহের পরবর্তীকালে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যও পান নি।

বিদ্রোহ কোন বর্ণবৈষম্যগত বিরোধও ছিল না। সন্দেহ নেই সকল শ্বেতকায়-গণ ঐক্যবদ্ধ ছিল, কিন্তু সকল কৃষ্ণকায়গণ নয়। বরং শ্বেতকায় পক্ষে প্রতি শ্বেতকায় পিছু ছিল কুড়িজন কৃষ্ণকায়।[৭] কৃষ্ণকায়দের বাদ দিলে কেবল শ্বেতকায়দের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হত না।

টি. আর. হোমসের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক ইংরেজ ঐতিহাসিক বিদ্রোহকে সভ্যতার সঙ্গে বর্বরতার সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।[৮] কিন্তু এই মত তীব্র জাতিগত বিদ্বেষ প্রসূত। বিদ্রোহকালে উভয়পক্ষই নানা ঘটনায় অমানুষিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে। আর যারাই এই নৃশংস আচরণ করে তারা কিছুতেই সভ্যতার বড়াই করতে পারে না।

আউটরাম ও টেইলার এই বিদ্রোহকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান ষড়যন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন।।[৯]

কিন্তু এই অভিমতের সমর্থনে তারা কোন তথ্যনিষ্ঠ অকাট্য যুক্তি দেখাতে পারেন নি।

রক্ষণশীল দলের সমসাময়িক নেতা বেঞ্জামিন ডিসরেলী বিদ্রোহকে এক জাতীয় জাগরণ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুনিশ্চিত অভিমত দিয়েছেন। বিদ্রোহ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, চর্বি মিশ্রিত টোটাই মাত্র এমন ঘটনা ঘটাতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা।

জাতীয়চেতনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রথমদিকের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ভারতীয় গণ-জাগরণ বলে চিত্রিত করেছেন। ডি. ডি. সাভারকার বিদ্রোহকে স্বাধীনতা অর্জন প্রয়াসে প্রথম সুপরিকল্পিত যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তীকালের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক আদর্শ উদাহরণ।

সাম্প্রতিককালে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিদ্রোহের স্বরূপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণে উভয়ের মধ্যে মত-পার্থক্য থাকলেও উভয়েই স্বীকার করেছেন বিদ্রোহের পেছনে না ছিল কোন সতর্ক পরিকল্পনা, না ছিল কোন যোগ্য নেতৃত্ব। তাঁরা তখনও ভারতে জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব খুঁজে পান নি।[১০] বিভিন্ন ভারতীয় জাতির মধ্যে ভারতীয়ত্ব বোধ ছিল

৬ A war of fanatic religionists against Christians. —L. E. R. Rees.

৭ In fact for every white man in camp there were certainly twenty black ones. —Capt. G. G. Medley.

৮ A conflict between civilisation and barbarism. —T. R. Holmes.

৯ It was Mahammedan conspiracy making capital of Hindu grivances. —Outram.

১০ India in the first half of the 18th century was a geographical expression. —Dr. S. N. Sen.

না, ছিল না কোন জাতীয় নেতৃত্ব।

রমেশ মজুমদার বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করতে রাজী নন। বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ বিভিন্ন রূপ লাভ করেছিল। বিদ্রোহের প্রধান অংশীদার সিপাহীগণও কোন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন নি, তাঁদের বিদ্রোহের কারণ ছিল জীবিকাগত নানা সমস্যা। তবে এই বিদ্রোহে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাবার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল তা স্বীকার করেছেন ডঃ মজুমদার।[১১]

অন্যদিকে ডঃ সেন-এর মতে এই বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাঁর এই মতের পেছনে যুক্তি হল, বিপ্লব করে, মুষ্টিমেয়ই, পেছনে গণ-সমর্থন থাকতেও পারে, নাও পারে। ফরাসী বিপ্লব বা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধই তার প্রমাণ। তিনি আরও বলেছেন, বিদ্রোহ সামরিক থেকে রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে তখন, যখন মীরাটের বিদ্রোহীগণ দিল্লীর বাদশাহকে নেতা বলে মেনে নেয়, জমিদার ও সাধারণ জনসংখ্যার একাংশও যখন একই পথ অনুসরণ করে।

ডঃ এস. বি. চৌধুরী বলেছেন এই বিদ্রোহের দুটি ভাগ—একটি সামরিক অন্যটি বেসামরিক। কিন্তু উভয় ভাগই যখন নিজ নিজ পৃথক স্বার্থ ও লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও নৈকট্যে আসে তখনই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

মার্কসবাদীগণ অবশ্য বিদ্রোহকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তাদের মতে সিপাহী ও কৃষকের গণতান্ত্রিক জোট সংঘবদ্ধ হয়েছিল বিদেশী শোষক ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের গোটা বন্ধনের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সংগ্রামের পেছনে ছিল না কোন রাজনৈতিক আদর্শ যা একটি বিদ্রোহকে সাফল্যের পথে উত্তীর্ণ করতে পারে। তাদের সংঘবদ্ধতার পেছনে ছিল স্থানীয় কিছু অভাব-অভিযোগ এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব।

পার্সিভাল স্পীয়ার অবশ্য বিদ্রোহকে পাশ্চাত্যের আগমনের বিরুদ্ধে গতানুগতিক ভারতের শেষ মরীয়া প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন।[১২]

মতের বিভিন্নতা যাই হোক একথা অনস্বীকার্য এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সিপাহী ও সাধারণ মানুষের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্পর্কে কোন মতৈক্য ছিল না। ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহ ভারত-ইতিহাসের এক জলবিভাজিকা, এক দিক নির্ণায়ক ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের যাত্রা হল শুরু এক নতুন গতি পথে।

---

১১ Whatever might have been its original character, it soon became a symbol of challenge to the mighty British power in India.

—R. C. Majumder.

১২ It may be described as a last consultive movement of protest against the coming of the west on the part of traditional India.

—Percival Spear.

অনুশীলনী

প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায়

১। ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের গঠন আলোচনা কর। কিভাবে এই গঠন এই দেশের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে ?
২। বিভেদের মধ্যেই ভারতের ঐক্য—এই কথাটি বিশ্লেষণ কর।
৩। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলি বিশ্লেষণ কর।
৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) ভারতবর্ষকে নৃতত্ত্বের যাদুঘর বলা হয় কেন ?
(খ) হিমালয় পর্বতমালা কিভাবে ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে ?
(গ) প্রাচীন ভারতের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থটির নাম কি ? ঐ গ্রন্থে কোথাকার এবং কোন্ সময়ের ইতিহাস বিধৃত ?
(ঘ) উপকরণ হিসেবে শিলালিপির গুরুত্ব কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। পুরাতন ও নব্য প্রস্তর যুগের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে উভয় যুগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
২। সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয় দাও।
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ যাযাবরের মত জীবনযাপন করতো কেন ?
(খ) সিন্ধু সভ্যতাকে অধুনা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয় কেন ?
(গ) হরপ্পা সভ্যতা যে রক্ষণশীল তার প্রমাণ কি কি ?
(ঘ) কোন কোন দেশের সঙ্গে এবং কিভাবে হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতগুলি আলোচনা কর।
২। আর্যদের সামাজিক ও অর্থজীবন বিশ্লেষণ কর।
৩। আর্যদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠলো ব্যাখ্যা কর।
৪। আর্যসভ্যতা কিভাবে ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করে ব্যাখ্যা কর।
৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) বেদ বলতে কি বোঝায় ?
(খ) বেদাঙ্গ কি ?
(গ) আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়েছিল কেন ?
(ঘ) আর্য সমাজে নারীর স্থান কেমন ছিল ?
(ঙ) আর্য সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগুলি কি কি ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়

বিবরণ দাও।

২। জৈন ও বৌদ্ধধর্মমতের মধ্যে তুলনা করে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

৩। বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে কি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
উপনিষদ, আজিবিক মতবাদ, চতুর্যাম, ত্রিপিটক, অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

পঞ্চম অধ্যায়

১। বিম্বিসার থেকে অজাতশত্রু পর্যন্ত মগধের উত্থানের কাহিনী বিবৃত কর।

২। রাজ্য বিজেতা ও শাসক হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩। অশোকের ধম্ম বলতে কি বোঝ ? এই ধম্ম প্রচারের জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

৪। অশোককে মহান বলা হয় কেন ? ইতিহাসে অশোক কি স্থান লাভ করেছেন ?

৫। আলেকজান্ডার ভারতে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন ? তাঁর আক্রমণের ফলাফল কি হয়েছিল ?

৬। মৌর্যযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও।

৭। মৌর্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য কি কি ? এই শিল্প সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। শাসক হিসেবে প্রথম কনিষ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৯। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর শাসনকালে সাতবাহন রাজ্যের গৌরব কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল বর্ণনা কর।

১০। "সমুদ্রগুপ্তই হলেন প্রথম ভারত সম্রাট"—উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

১১। কি কি কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল ?

১২। গুপ্তযুগকে গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন ? গুপ্ত-সংস্কৃতি উল্লেখ করে বিশ্লেষণ কর।

১৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—
(ক) ষোড়শ মহাজনপদ বলতে কি বোঝায় ?
(খ) মগধের ইতিহাসে মহাপদ্মনন্দের গুরুত্ব কি ?
(গ) অশোকের রাজ্যসীমা কিভাবে নির্ধারণ করা হয় ? কতদূর বিস্তৃত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য ?
(ঘ) অশোক বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলী রূপায়িত করেছিলেন কেন ?
(ঙ) অশোকের বৈদেশিক নীতির মূলকথা কি ছিল ?
(চ) কুষাণ কারা ?
(ছ) এলাহাবাদ প্রশস্তি কার রচনা ? এই প্রশস্তিতে কি বলা হয়েছে ?
(জ) ফা হিয়েনের বিবরণ থেকে কি কি জানা যায় ?
(ঝ) স্কন্দগুপ্ত সাধারণতঃ কি নামে পরিচিত ? এবিষয়ে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন ?
(ঞ) গুপ্ত যুগের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দাও।

১৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
অজাতশত্রু, বিন্দুসার, ধর্মমহাপাত্র, পারসিক অভিযান, রুদ্রদামন, অশ্বঘোষ, মহাযান মতবাদ, গান্ধার শিল্প, নাসিক প্রশস্তি, গুপ্ত স্থাপত্য শিল্প।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বাংলার ইতিহাসে শশাংকর স্থান নির্দেশ কর।

২। শেষ হিন্দু সম্রাট হিসেবে হর্ষবর্ধনের সাফল্য আলোচনা কর।

৩। ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝ ? এই দ্বন্দ্বের পরিণতি কি হয়েছিল ?

৪। বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালের শাসনকালকে এক গৌরবময় অধ্যায় বলা হয় কেন ?

৫। চোল শক্তি বিস্তারে প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোলের অবদান আলোচনা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) হূণ কাদের বলা হয় ? তারা কিভাবে ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করে ?
(খ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা কি ছিল ?
(গ) পালবংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয় ?
(ঘ) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন ? তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ কি ?
(ঙ) পল্লব কারা ? তাঁদের সঙ্গে কাদের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি হয় ? এই বিরোধের মূল কারণ কি ছিল ?

৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
মিহিরকুল, যশোধর্মণ, সি-ইউ-কাই, রামপাল, বিজয়সেন।

সপ্তম অধ্যায়

১। পালযুগে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও।
২। "বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে পালযুগ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।
৩। পল্লব-শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও।
৪। চোলদের সমাজ ও সভ্যতা বর্ণনা কর।
৫। বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিভাবে ? এই প্রসঙ্গে সুবর্ণদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের শাসনের পরিচয় দাও।
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয় বলে বলা হয় কেন ?
(খ) পালযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
(গ) সেন শাসনকালে বাংলায় সামাজিক গঠন কেমন ছিল ?
(ঘ) চান্দেল্লা কারা ? তাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল ?
(ঙ) পল্লব স্থাপত্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?
(চ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দাও।
৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
মহাযান মতবাদ, সন্ধ্যাকর নন্দী, পাহাড়পুরের মন্দির, সূর্যমন্দির, মহাবলীপুরমের মন্দির, পল্লবযুগের ভক্তি আন্দোলন, চোল-স্থাপত্য, কাম্বোজের স্থাপত্য।

মধ্য যুগ

প্রথম অধ্যায়

১। ভারতের ইতিহাসের মধ্য যুগের ইতিহাস জানার উপাদানগুলি আলোচনা কর।
২। ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয় কেন ? ভারতের ইতিহাসের কোন্ সময়কে মধ্য যুগ বলা হয় এবং কেন বলা হয় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। আরবেরা সিন্ধু অভিযান করেছিল কেন ? এই অভিযানে তাদের সাফল্যলাভের কারণ কি কি ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। মুসলমান অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল ? সুলতান মামুদের অভিযানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। অভিযানের ফলাফল কি হয়েছিল ?
২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
অলবেরুণী।

অনুশীলনী- ৪

চতুর্থ অধ্যায়

১। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইলতুৎমিসের অবদান আলোচনা কর।

২। গিয়াসউদ্দীন বলবন কিভাবে দিল্লীর সুলতানী শাসনকে শক্তিশালী এবং সংযত করেছিলেন আলোচনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—

(ক) কুতুবুদ্দীন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে দাসবংশ বলা হয় কেন ?

(খ) সীমান্ত সুরক্ষায় গিয়াসউদ্দীন বলবন কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ?

(গ) রাজপদ সম্পর্কে বলবনের ধারণা কি ছিল ?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—

তরাইনের যুদ্ধ, চেঙ্গীজ খাঁ, তুঘিল খাঁ।

পঞ্চম অধ্যায়

১। রাজ্য বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দীন খলজীর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২। শাসক হিসেবে আলাউদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল ? এই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ?

৩। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারক হিসেবে আলাউদ্দীন খলজীর পরিচয় দাও।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—

(ক) খলজী বিপ্লব কাকে বলে ?

(খ) আলাউদ্দীনের উত্তর ভারত জয়ের পেছনে উদ্দেশ্য কি ছিল ?

(গ) রাজপদ সম্পর্কে আলাউদ্দীনের ধারণা কি ছিল ?

(ঘ) অভিজাতদের বিদ্রোহী মনোভাবের পেছনে আলাউদ্দীন কি কি কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন ?

(ঙ) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আলাউদ্দীন অগ্রণী হয়েছিলেন কেন ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মহাম্মদ বিন তুঘলুকের কার্যাবলী আলোচনা করে শাসক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন কর।

২। শাসন সংস্কারক হিসেবে ফিরোজ তুঘলকের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—

(ক) উলেমাদের দমনে মহাম্মদ বিন তুঘলক কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন ?

(খ) মহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন ? শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হন কেন ?

(গ) "মহাম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রা সংস্কার পরিকল্পনা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

(ঘ) ফিরোজ তুঘলককে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী বলা হয় কেন ?

সপ্তম অধ্যায়

১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—

তৈমুর লঙ্গ, মোবারক খাঁ, সিকন্দর লোদী।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—

(ক) লোদী বংশ দিল্লীতে স্থায়ী শাসন গড়ে তুলতে পারেনি কেন ?

(খ) ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে আফগানদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল কেন ?

অষ্টম অধ্যায়

১। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান আলোচনা কর।

২। হুসেন শাহী শাসনকে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলা হয় কেন ? আলোচনা কর।

৩। বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে বিরোধের কারণ কি কি ? এই বিরোধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। বিজয়নগর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও।
৫। বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও।
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) ইলিয়াস শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয় ?
(খ) "হুসেন শাহ ছিলেন মধ্য যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ নরপতি।" মন্তব্যটির যৌক্তিকতা প্রমাণ কর।
(গ) হুসেন শাহী আমলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পরিচয় দাও।
(ঘ) বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি কিভাবে এবং কেন হয়েছিল ?
(ঙ) বিজয়নগর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন ? তাঁর সাফল্যের পরিচয় দাও।
(চ) বিজয়নগরের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দাও।
৬। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
বাংলায় হাবসী শাসন, মামুদ গাওয়ান, হুসেন শাহী স্থাপত্য, অমর নায়েক, বিঠল স্বামী মন্দির।

নবম অধ্যায়

১। ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছিল কিভাবে ?
২। ভক্তি মতবাদ বলতে কি বোঝ ? কি ভাবে এই মতবাদের সৃষ্টি হয় ? এই মতবাদের কয়েকজন প্রবক্তার পরিচয় দাও।
৩। সুফী মতবাদ কি ? এই মতবাদ ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল কিভাবে এবং কেন ?
৪। সুলতানী শাসনকালে ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ আলোচনা কর।
৫। সুলতানী শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ হয়েছিল কি ভাবে ? এ সময়ের প্রাদেশিক শিল্পরীতির পরিচয় দাও।
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকেরা কোন্ কোন্ ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করেছিল ?
(খ) কি কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভক্তি আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ?
(গ) ভক্তি আন্দোলন কি কি প্রভাব বিস্তার করেছিল ?
(ঘ) সুলতানী যুগে হিন্দি ও উর্দু ভাষার বিকাশ আলোচনা কর।
৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
কবীর, নামদেব, শ্রীচৈতন্য, নানক, খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তি, নিমাজুদ্দীন আউলিয়া, আমীর খসরু, বাংলার স্থাপত্য, গুজরাটী স্থাপত্য।

দশম অধ্যায়

১। মোগল যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলি আলোচনা কর।
২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
বাবর-নামা, আকবর-নামা, পাদশাহ-নামা।

একাদশ অধ্যায়

১। বাবর কিভাবে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) মোগল বলতে কাদের বোঝায় ?
(খ) বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল ?
(গ) কার কার মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল ? কে জয়লাভ করেছিলেন ? তিনি কেন জয়লাভ করেছিলেন ?
(ঘ) খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?
(ঙ) বাবর রচিত আত্মজীবনীর নাম কি ? এই গ্রন্থে তাঁর কি পরিচয় পাওয়া

যায় ?
(চ) বাবরের সাফল্যের মূল্যায়ন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। "শাসক হিসাবেই শেরশাহ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন"—তাঁর শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা করে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা প্রমাণ কর।
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) রাজ্যলাভ করেই হুমায়ুণ কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন ?
(খ) শাসক হিসেবে শেরশাহের নীতি কি ছিল ?
(গ) শাসনকার্যে শেরশাহের সর্বাধিক কৃতিত্ব কোন্ ক্ষেত্রে ? সেখানে তিনি কি অভিনবত্বের পরিচয় দেন ?
৩। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
বাহাদুর শাহ, কনৌজের যুদ্ধ, পাট্টা ও কবুলিয়ৎ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। রাজ্যজয়ে আকবর কি নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেলেন ? তাঁর রাজ্যজয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২। আকবরের শাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর।
৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে আকবর কি নীতি অনুসরণ করেছিলেন ? এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহীর যৌক্তিকতা আলোচনা কর।
৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) রাজপুত জাতি সম্পর্কে আকবরের নীতি কি ছিল ? এই নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন কেন ?
(খ) আকবরের গুজরাট জয়ের তাৎপর্য কি ?
(গ) শাসক হিসেবে আকবরের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল ?
(ঘ) রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের জমি কয় ভাগে বিভক্ত করেন ? ভাগগুলি কি কি ?
(ঙ) আকবর প্রাদেশিক শাসনের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন কিভাবে ?
(চ) মনসব কথাটির অর্থ কি ? মনসবদারগণ নিযুক্ত হতেন কিভাবে ?
(ছ) আকবরের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে কি কি প্রভাব ছিল ?
(জ) দীন-ই-ইলাহী মতবাদের মূল কথা কি ?
(ঝ) আকবর কিভাবে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন ?
(ঞ) আকবরের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর।
৫। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
বৈরাম খাঁ, রাণা প্রতাপ সিংহ, অসীরগড় দুর্গ জয়, জাবাতি প্রথা, অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা, ইবাদৎখানা, ফতেপুরসিক্রি।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। "স্মিথ জাহাঙ্গীরের শাসনকালকে অগৌরবের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন"—মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।
২। শাহজাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা কর।
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) পর্তুগীজদের সঙ্গে শাহজাহানের বিরোধের কারণ কি ? এই বিরোধের পরিণতি কি হয়েছিল ?
(খ) ইংরেজদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক আলোচনা কর।

(গ) চিত্রশিল্পে জাহাঙ্গীরের অনুরাগের পরিচয় দাও।
(ঘ) শাসক হিসেবে শাহজাহানের সাফল্যের প্রমাণ দাও।
(ঙ) স্থাপত্যশিল্পে শাহজাহান কি নতুনত্ব এনেছিলেন ?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
টমাস রো, ময়ূর সিংহাসন, শাহজাহানের উদ্যান চর্চা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। "ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়েছিল"—আলোচনা কর।

২। শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা কর। শাসক হিসেবে শিবাজীর কৃতিত্ব নিরূপণ কর।

৩। "দাক্ষিণাত্য ক্ষতই ঔরঙ্গজেবের পতনের কারণ।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৪। ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল ব্যাখ্যা কর।

৫। মোগল শাসন-ব্যবস্থায় ঔরঙ্গজেব কি কি পরিবর্তন এনেছিলেন ? এই সব পরিবর্তনের ফলাফল কি হয়েছিল ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব সফল হয়েছিলেন কেন ?
(খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঔরঙ্গজেবের সমস্যা কি ছিল ? এই সমস্যা সমাধানে ঔরঙ্গজেবের গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল কি হয়েছিল ?
(গ) রাজপুতদের সম্পর্কে ঔরঙ্গজেব যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল ?
(ঘ) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের পেছনে ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
(ঙ) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক তাৎপর্য কি ছিল ?
(চ) শিবাজী কি যথার্থই সর্বভারতীয় রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করেছিলেন ? ব্যাখ্যা কর।
(ছ) ভারতে পর্তুগীজগণ প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ হয় কেন ?

৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
সমুদ্রগড়ের যুদ্ধ, পুরন্দরের সন্ধি, অষ্টপ্রধান, চৌথ ও সরদেশমুখী, ফ্রাঁসোয়া মার্তা।

ষোড়শ অধ্যায়

১। মোগল শাসনের প্রকৃতি কি ছিল ? মোগল আমলের কেন্দ্রীয় শাসন আলোচনা কর।

২। মোগল সম্রাটদের সঙ্গে তাদের জায়গীরদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। মোগল সংস্কৃতির স্বরূপ কি ছিল ? মোগল স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দাও।

৪। সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় মোগল যুগের অবদান আলোচনা কর।

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) দীর্ঘ মোগল শাসনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য কি ? ঐ সাফল্য কিভাবে অর্জিত হয়েছিল ?
(খ) পেলসার্টের বর্ণনা থেকে মোগল গ্রামজীবনের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?
(গ) মোগল শাসনকালে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের পরিচয় দাও।
(ঘ) জাহাঙ্গীরের সময়ের মোগল চিত্রকলার পরিচয় দাও।
(ঙ) মোগল যুগে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি আলোচনা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
মোগল যুগের আমলাতন্ত্র, ওয়াতন জায়গীর, বার্গিয়ে, শাহজাহানের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, দারাশিকো, আবুল ফজল, রাজপুত চিত্র শিল্প।

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

১। অযোগ্য উত্তরাধিকার কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল ? আলোচনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) ঔরংগজেবের পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?

(খ) মোগল দরবারে অভিজাতদের অন্তর্কলহের পরিচয় দাও।

(গ) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন ?

(ঘ) নাদির শাহের ভারতে অনায়াস সাফল্যের কারণ কি ? তাঁর আক্রমণ কিভাবে মোগল সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল ?

(ঙ) মোগল অভিজাতরা কয়ভাগে বিভক্ত ছিল ? ভাগগুলি কি কি ? এদের গঠন কেমন ছিল ?

৩। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
জুলফিকার খাঁ, প্রথম বাহাদুর শাহ, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল-মুলক, দ্বিতীয় শাহ আলম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। মুর্শিদকুলি ও আলীবর্দীর শাসনকালে বাংলার ইতিহাস আলোচনা কর।

২। নিজাম-উল-মুলক কিভাবে হায়দরাবাদ রাজ্য স্থাপন করেন ? শাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩। ভারতের ইতিহাসে হায়দর আলি গৌরবময় আসনের অধিকারী কেন ? ব্যাখ্যা কর।

৪। শিখগুরুদের নেতৃত্বে শিখগণ কিভাবে এক সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় ?

৫। প্রথম তিন পেশোয়ার অধীনে মারাঠা জাতির উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৬। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের কারণ কি ? এই যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ?

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) মোগল সাম্রাজ্যের পতনে আঞ্চলিক শক্তিগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল ?

(খ) মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার কি কি পরিবর্তন করেছিলেন ?

(গ) বাংলার নবাবগণ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেন ?
(ঘ) সফদরজং-এর শাসনকালকে অযোধ্যার ইতিহাসে শান্তি ও স্বস্তির কাল বলা হয় কেন ?
(ঙ) কোন শিখগুরু শিখজাতিকে সামরিক জাতিতে পরিণত করতে উদ্যোগী হন ? কেন তিনি ঐ পথে গিয়েছিলেন ?
(চ) মহারাষ্ট্রকে রাজ্য থেকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন কে এবং কিভাবে ?

৮। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
১৭১৭ সালের ফরমান, বঙ্গে বর্গী আক্রমণ, প্রথম ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ, আদিগ্রন্থ, গুরু গোবিন্দ সিংহ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, কর্ণাটকের ঘটনাবলীর সাহায্যে বিশ্লেষণ কর।
২। ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর।
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের পরিচয় দাও।
(খ) ইউরোপের ঘটনাবলী কিভাবে ভারতের ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রভাবিত করেছে আলোচনা কর।
(গ) প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধের কারণ কি ?
(ঘ) ফরাসী ব্যর্থতায় দুপ্লের দায়িত্ব কতখানি ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। পলাশীর যুদ্ধের কারণ কি ? এই যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
২। ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের বিরোধের কারণ কি ? এই বিরোধে মীরকাশিমের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
৩। ভারতের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর।
৪। গভর্ণর হিসাবে ক্লাইভের সংস্কারাবলী আলোচনা কর।
৫। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের তাৎপর্য কি ? এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদ সন্ধির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) ১৭১৭ সালের মোগল ফরমান বলতে কি বোঝায় ? এই ফরমান নবাব ও কোম্পানীর মধ্যে বিরোধের কারণ হয় কেন ?
(খ) কোম্পানীর কর্মচারীরা কিভাবে দস্তকের অপব্যবহার করতো ?
(গ) বক্সার যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য কি ?
(ঘ) গভর্ণর হিসেবে ক্লাইভ তদনীন্তন পরিস্থিতি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন ?

৭। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
মীরজাফর, রেজা খাঁ, দ্বিতীয় শাহ আলম।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষে মারাঠাদের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর।

২। টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কারণ কি? ভারতের ইতিহাসে টিপুর স্থান নির্দেশ কর।
৩। অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি বলতে কি বোঝ? এই নীতির সুবিধাগুলি কি কি? এই নীতি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল?
৪। ইংরেজদের সঙ্গে রণজিৎ সিংহের সম্পর্ক আলোচনা কর। এক্ষেত্রে রণজিতের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।
৫। "পাঞ্জাব অধিকার ডালহৌসীর নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের উদাহরণ"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।
৬। স্বত্ব বিলোপ নীতি কাকে বলে? এক্ষেত্রে ডালহৌসীর ভূমিকা আলোচনা কর।
৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—
(ক) কার কার মধ্যে সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়? এই সন্ধি স্বাক্ষরের পটভূমিকা কি?
(খ) বেসিনের চুক্তির গুরুত্ব পর্যালোচনা কর।
(গ) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ হয়েছিল কেন?
(ঘ) অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির শর্তগুলি কি কি?
(ঙ) আফগানিস্থান প্রশ্নে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে কারা অংশ নিয়েছিল? এই চুক্তির উদ্দেশ্য কি ছিল?
(চ) ডালহৌসীর পাঞ্জাব অধিকার কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছিল?
(ছ) ডালহৌসী সাম্রাজ্যের জন্য কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর।
৮। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
প্রথম মাধব রাও, রেগুলেটিং এ্যাক্ট, পুরন্দরের সন্ধি, টিপুর বৈদেশিক যোগাযোগ, অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। দ্বৈত শাসন কাকে বলে? এই শাসনের প্রবর্তক কে? এই শাসনের ফলাফল আলোচনা কর।
২। কোম্পানীর শাসনে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট হস্তক্ষেপ করে কেন? এই হস্তক্ষেপের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা কর।
৩। ভারতে কোম্পানীর শাসনের বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা কর।
৪। ভারতে কোম্পানীর বিচার-ব্যবস্থা বর্ণনা কর। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলাফল কি হয়েছিল?
৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কি বোঝায়? এই ব্যবস্থার ফলাফল কি হয়েছিল?
৬। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর।
৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—
(ক) ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের লক্ষ্য কি ছিল?
(খ) দেওয়ানী পেয়েও কোম্পানী সরাসরি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিতে চায়নি কেন?
(গ) কোম্পানীর বেসামরিক প্রশাসনে ভারতীয়দের বর্জন করা হয়েছিল কেন?
(ঘ) সামরিক বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যের আনুগত্য কোম্পানী পেয়েছিল কেন?
(ঙ) ইংরেজ প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(চ) ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় হেস্টিংস কি কি পরিবর্তন এনেছিলেন? তার ফলাফল কি হয়েছিল?
৮। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন, রেগুলেটিং আইন (১৭৭৩), পিটের ভারত শাসন আইন (১৭৮৪), কোম্পানীর পুলিসী প্রশাসন, মহলওয়ারি প্রথা।

সপ্তম অধ্যায়

১। ভারতীয় পণ্যের বিরূদ্ধে ব্রিটিশ সংরক্ষণ নীতি বিশ্লেষণ কর। এই নীতি কি-ভাবে ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ঘটিয়েছিল?

২। ইংরেজ বাণিজ্যনীতি কিভাবে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) ভারতের বস্ত্রশিল্পকে কিভাবে ইংরেজরা ধ্বংস করে দেয়?
(খ) ইংরেজরা ভারত থেকে সম্পদ আহরণ করতো কিভাবে?
(গ) ভারতের কুটিরশিল্প ধ্বংসের ফল কি হয়েছিল?

অষ্টম অধ্যায়

১। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ভারতের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা কর।

৩। মহারাষ্ট্রে নবভারত গঠনের প্রয়াস বর্ণনা কর।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের শিক্ষার কোন্ কোন্ দিক উপেক্ষা করেছিল?
(খ) পাশ্চাত্য শিক্ষা একদিক থেকে ভারতের উপকার করেছিল, কিভাবে?
(গ) ইয়ংবেঙ্গল কাদের বলা হয়? তাদের মতবাদ কি ছিল? তাদের কর্ম-পদ্ধতিই বা কি ছিল?
(ঘ) সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান কি ছিল?

৫। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

উডের ডেস্প্যাচ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিরোজিও, যোতিবা ফুলে, দাদাভাই নৌরোজী।

নবম অধ্যায়

১। ফরাজী কাদের বলা হয়? এই বিদ্রোহে মহাম্মদ মহসীনের ভূমিকা আলোচনা কর। বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য কি কি?

২। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। "সাঁওতাল বিদ্রোহ এক নতুন যুগের বার্তাবহ" — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করে তার যৌক্তিকতা দেখাও।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) ভারতের কৃষকের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি হয় কেন?
(খ) দুধুমিঞা যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার প্রমাণ কি?
(গ) মুসলমান সমাজ ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ ছিল কেন?
(ঘ) ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি ছিল?

৫। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

শরিয়তুল্লা, সৈয়দ আহম্মদ, তিতুমীর, কোল বিদ্রোহ।

দশম অধ্যায়

১। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কারণ কি কি?

২। তুমি ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? এই বিদ্রোহের স্বরূপ আলোচনা কর।

অনুশীলনী-১২

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—
(ক) অন্যান্য বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে ইংরেজদের কি পার্থক্য ছিল ?
(খ) কি কি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভারতীয়গণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ?
(গ) সমাজজীবনে ভারতের রক্ষণশীল গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয় কেন ?
(ঘ) সামরিক বিভাগে ভারতীয়দের প্রতি কি কি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত ?
(ঙ) বিদ্রোহে কারা অংশগ্রহণ করেছিল ?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ—
এনফিল্ড রাইফেল, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, কুনওয়ার সিং, মৌলভী আহমাদুল্লা।

